সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

কারওয়ানে জিন্দেগী

(২য় খণ্ড)

মাওলানা মোঃ মহীউদ্দিন
অনূদিত

(18) کاروانِ زندگی دوم از سیدابوالحسن علی ندویؒ
مترجم: مولانا محی الدین
ناشر: محمد برادرس38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা

কারওয়ানে জিন্দেগী - ২য় খণ্ড
মূল ঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)
অনুবাদ ঃ মাওলানা মোঃ মহীউদ্দিন

প্রকাশকাল
৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ ঈসায়ী
অগ্রহায়ণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ; সফর, ১৪৩৭ হিজরী

গ্রন্থস্বত্বঃ প্রকাশক

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
সেলঃ 01822-806163; 01728-598440

মুদ্রণে ঃ মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
সালসাবিল

ISBN : 978-984-91840-1-0

মূল্য: ৩২০.০০ (তিনশত কুড়ি) টাকা মাত্র

Karwaney Zindegee-2nd Vol.: Written by Allama Sayeed Abul Hasan Ali Nadvi (R) in Urdu and translated by Moulana Muhammad Mohiuddin into Bengali and Published by Muhammad Abdur Rouf, M/s Muhammad Brothers, 38 Bangla Bazar, Dhaka-1100. BANGLADESH. Price: Taka 320/- only & US $ 10 only Cell Phone: 01822-806163, 01728-598440

উৎসর্গ

'মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত
দা'ঈ ও মুবাল্লিগ, মশহুর বুযর্গ,
আমাদের রূহানী উস্তাদ, মুফাক্কির-এ ইসলাম
আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর
অমর রূহের ছওয়াব রেছানীর উদ্দেশ্যে- যিনি ১৯৯৯ সালের
৩১ ডিসেম্বর/২২ রমযান শুক্রবার ১১.৫০ মিনিটে পবিত্র কুরআন
শরীফের সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াতরত অবস্থায় পরম প্রভুর আহ্বানে
তাঁর প্রিয় সান্নিধ্যে গমন করেন। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'

প্রকাশকের কথা

আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বিশ্বখ্যাত ও জননন্দিত এক মনীষী ও বরেণ্য ইসলামী দা'ঈ। মেধা ও মননের বহুমাত্রিকতা তাঁর আলোকিত জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আরবী সাহিত্যিক, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষক ও সীরাত গবেষক হিসেবে গোটা দুনিয়ায় রয়েছে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ পরিচিতি। জীবদ্দশায় তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার বহু এলাকা পরিভ্রমণ করেন। কেবল পর্যটন নয় বরং দাওয়াতী মেহনত, শিক্ষাবিষয়ক ও ধর্মতাত্ত্বিক সেমিনারে অংশগ্রহন ছিলো এসব সফরের উদ্দেশ্য। 'কারওয়ানে যিন্দেগী' তাঁর বিশ্বপরিভ্রমণ ও জীবন অভিজ্ঞতার নির্ভরযোগ্য বিবরণ এবং মুসলিম উম্মাহর এক অমূল্য সম্পদ।

সাত খণ্ডে বিন্যস্ত কালোত্তীর্ণ এ গ্রন্থটিতে রয়েছে নানা জাতি-গোষ্ঠির জীবন ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ এবং ইসলামী সভ্যতা ও উত্তরাধিকার ঐতিহ্যের অনুপুঙ্খ ও আনন্দঘন পরিবেশনা। সর্বোপরি, বিজ্ঞ গ্রন্থকারের উপস্থাপনার নৈপুন্যশৈলী পাঠককে বিস্মিত ও শেকড়সন্ধানী করে তোলে। 'কারওয়ানে যিন্দেগী'-এর প্রতিটি ছত্রে, প্রতি পাতায় লেখকের পাণ্ডিত্য ও সৃজন-সামর্থের অভিব্যক্তি লক্ষনীয়।

এ গ্রন্থটি বিশ্ববিশ্রুত আফ্রিকান পর্যটক ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৬৮)-এর 'রিহলা' ও চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান (৩৩৭-৪২২) রচিত Memories of Eminent Monks-এর সমপর্যায়ের তো বটেই বরং নানা ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর আঙ্গিকে রচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও প্রতিভাসিত করেছে। বাংলাদেশে 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' হযরত নদভী রহ.-এর কিতাবগুলো বাংলায় ভাষান্তর করে প্রকাশের ক্ষেত্রে এক অনন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এ প্রসঙ্গে হযরত নদভী (রহ.)-এর খিলাফতপ্রাপ্ত প্রিয়ভাজন আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (রহ.)-এর উদ্যোগ প্রচেষ্টার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

'কারওয়ানে যিন্দেগী' বাংলা ভাষায় তরজমা এটাই প্রথম। বেশ ক'জন বিজ্ঞ অনুবাদকের মাধ্যমে মার্জিত বাংলায় ভাষান্তর করে অনূদিত কপি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহ তা'য়ালার শোকরিয়া আদায় করছি। হযরত নদভী রহ.-এর

অন্যান্য গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থটিও পাঠকপ্রিয়তা পেলে আমাদের আয়াসাধ্যশ্রমকে সার্থক মনে করবো।

অনেকের অনুরোধে বইটি দ্রুত প্রকাশের কারণে প্রথম সংস্করণে অনিচ্ছাকৃত কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠক তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন– এটাই প্রত্যাশা। আগামীতে আরো যত্নবান হয়ে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে বইটি প্রকাশের প্রয়োজনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে সাহায্য, আপনাদের আন্তরিক সহোযোগিতা ও দোয়া প্রার্থী।

আমার বন্ধুবর অধ্যক্ষ অশোক তরু একজন অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও হযরত নদভী রহ.-এর প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে এবং উজ্জীবিত করেছে। জীবনের কঠিনতম সময়ে পাশে থেকে আমার বিশেষ অনুরোধে হযরত নদভী রহ.-এর কিতাবসমূহ প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে বিশেষ সতর্কতার সাথে সেগুলো সংশোধন, পরিমার্জন ও সম্পাদনা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এ জন্য তাঁর কাছে আমার অশেষ ঋণ।

এ গ্রন্থ প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকলের মেহনত মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন কবুল ও কামিয়াবি করুন। আমিন!

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ ঈসায়ী, ঢাকা — মুহাম্মদ আবদুর রঊফ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Phones: 73864, 72336, 72338

Abul Hasan Ali Nadwi
P. O. BOX, No. 93, NADWATUL ULAMA,
LUCKNOW—226 007. U. P. (INDIA)

أبو الحسن علي الحسني الندوي
ندوة العلماء - لكهنؤ - الهند

Ref :

التاریخ: ۱۴ ربیع الاول ۱۴۱۸ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مجھے یہ معلوم کرکے بہت مسرت ہوئی کہ ڈھاکہ میں چند مخلص
و اہل علم حضرات نے دینی و اسلامی اور اصلاحی کتابوں کی تیاری
اور اشاعت کے لئے ایک ادارہ قائم کیا ہے اسکے ذریعہ میری
کتابیں بھی شائع ہونگی، ان میں سے جن کتابوں کے ترجمہ کی ضرورت سمجھی جائیگی
ترجمہ کرکے شائع ہونگی، ادارہ کا نام مجلس نشریات اسلام تجویز
ہوا ہے اور چاٹگام کے عالم دین مولانا سلطان ذوق صاحب ندوی
اور ڈھاکہ کے مولانا محمد علی صاحب اور مولانا سلمان صاحب اس ادارہ
کے ذمہ دار ہیں، میں ان حضرات کو اجازت دیتا ہوں کہ میری
جن کتابوں کو یہ مفید سمجھیں ترجمہ کراسکتے ہیں اور شائع کرسکتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطاء فرمائے اور قبول
فرمائے آمین

ابوالحسن علی ندوی
ندوۃ العلماء لکھنؤ

۱۱ر۳ر۱۴۱۸ھ

بسم الله الرحمن الرحيم
Phones: 73864, 72336, 72338

Abul Hasan Ali Nadwi
P. O. BOX, No. 93, NADWATUL ULAMA,
LUCKNOW—226 007. U. P. (INDIA)

Ref:

أبو الحسن علي الحسني الندوي
ندوة العلماء - لكهنؤ - الهند

التاريخ: ١٨ ربيع الاول ١٤١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

আমি এ কথা জানতে পেরে অত্যাধিক আনন্দিত হয়েছি যে, ঢাকার কিছু মুখলেছ আহলে ইল্‌ম হযরত ধর্মীয় ও ইসলামী এবং সংশোধিত ও সংস্কারমূলক কিতাব ছাপানো ও প্রচারণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। তার মাধ্যমে আমার রচিত কিতাবও প্রকাশ করবেন। তার মধ্যে আমার যে কিতাবগুলো অনুবাদ করার প্রয়োজন মনে করবেন, অনুবাদ করে তা প্রকাশ করবেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম 'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম' (Academy of Islamic Publications) স্থির হয়েছে।

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা সুলতান যওক নদভী সাহেব এবং ঢাকার মাওলানা ওমর আলী সাহেব ও মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান সাহেব ঐ সংস্থার দায়িত্বশীল ব্যক্তি। আমি ঐ হযরতদেরকে অনুমতি দিচ্ছি যে, তাঁরা আমার যে কিতাব গুলো উপকারী মনে করবেন, সেগুলো তরজমা করে প্রকাশ করতে পারবেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের প্রচেষ্টায় বরকত দিন এবং মঙ্গল করুন। আমিন!

আবুল হাসান আলী নদভী
নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ
ভারত

১৮ রবিউল আউয়াল, ১৪১৮ হিজরী

মজলিস নাশ্‌রিয়াত-ই-ইসলাম

(Academy of Islamic Publications)

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; বাংলাদেশ

সূত্রঃ.................... তারিখ....................

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ইসলামী গ্রন্থের রচিয়তা আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী বাংলাদেশে অনুবাদ ও প্রকাশের জন্য একমাত্র 'মজলিস নাশ্‌রিয়াত-ই-ইসলাম' ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-কে তাঁহার ১৮ই রবিউল আউয়াল, ১৪১৮ হিজরী তারিখের এক পত্র দ্বারা অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। 'মজলিস নাশ্‌রিয়াত-ই-ইসলাম' গ্রন্থগুলি প্রকাশনা ও বাজারজাত করার জন্য 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স', ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-কে শর্তাধীনে অনুমতি প্রদান করায় 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' গ্রন্থগুলি প্রকাশ ও বাজারজাত করিয়া আসিতেছে। অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত রূপ অনুমতি প্রদান করা হয় নাই।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কতিপয় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অননুমোদিত ও বে-আইনীভাবে গ্রন্থগুলো অনুবাদ, প্রকাশনা ও বাজারজাত করার অবৈধ চেষ্টায় লিপ্ত আছেন। কাজেই এই মর্মে সতর্ক করা যাইতেছে যে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অননুমোদিত ও বে-আইনীভাবে মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. রচিত গ্রন্থগলো অনুবাদ, প্রকাশনা ও বাজারজাত করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম'-এর পক্ষে

সাধারণ সম্পাদক

মজলিস নাশ্‌রিয়াত-ই-ইসলাম
(Academy of Islamic Publications)
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; বাংলাদেশ

সূত্রঃ.. তারিখ..

সংশ্লিষ্ট মহলের জ্ঞাতার্থে

বিশ্বখ্যাত ইসলামী দাঈ, মণীষী ও আধ্যাত্মিক রাহবার আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর বাংলাদেশ সফরের পূর্বেই তাঁর রচিত কয়েকটি কিতাব 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ দশকের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এরপর অজ্ঞাত কারণে 'ইফাবা' কর্তৃপক্ষ তাঁর কিতাবগুলো প্রকাশে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

হযরত আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ.-এর উদ্যোগে হযরত মাওলানা সুলতান যওক সাহেব ও আমি মুহাম্মাদ সালমান 'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করি । এ সংস্থার মাধ্যমে ৯০ দশকের শেষের দিকে হযরতের 'নবীয়ে রহমত', 'হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া', 'ইসলাম-ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি' ও 'দাওয়াতের উপহার' নামক ৪টি বই প্রকাশিত হয়। বইগুলো বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে 'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম'-এর সম্পাদক ঢাকার বাংলাবাজারস্থ 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর স্বত্ত্বাধিকারী ও 'ঢাকা কলেজ'-এর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক জনাব মুহাম্মদ আবদুর রউফ-এর উপর হযরতের বইগুলো প্রকাশনার ব্যাপারে সার্বিক দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

একাডেমিক প্রকাশনা বাদ দিয়ে ২০০৬ সাল থেকে নিরলসভাবে 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' সেই গুরু দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে এ যাবত প্রায় ৩৫টিরও অধিক বই বাংলাভাষার পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, 'নদওয়াতুল উলামা'-এর প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.-এর জীবনী 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' প্রকাশ করে আমাদের কৃতার্থ করেছেন এবং সাত খণ্ডে রচিত সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর আত্মজীবনীমূলক আলেখ্য 'কারওয়ানে যিন্দেগী'-এর দু'আ ও এজাযত লিখে দিতে পেরে নিজেকে বড়ই সৌভাগ্যবান মনে করছি। এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই পুস্তক প্রকাশ করে। এতে আখিরাতের নাজাত প্রাপ্তিই যে একমাত্র উদ্দেশ্য– তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

আমরা এটা জেনে আরো আনন্দিত যে, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর বইগুলো প্রকাশের ক্ষেত্রে 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে এবং হযরত মাওলানা সুলতান যওক সাহেবকে সভাপতি করে 'মানশুরিয়াত-ই-ইসলাম সোসাইটি' নামক ট্রাস্টের মাধ্যমে 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' তার সারা জীবনের অর্জিত সম্পত্তি ইসলামী প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ– বিশেষ করে, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর কিতাবসমূহ প্রকাশের নিমিত্তে ওয়াক্ফ করে দেবেন। আই ইউ টি-এর সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. ফজলে ইলাহী, বিচারপতি মোঃ আশরাফুল ইসলাম, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন ও প্রফেসর ড. মোঃ নূর ইসলাম প্রমুখ উক্ত ট্রাস্টের সম্মানিত সদস্য। 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর স্বত্বাধিকারী মুহাম্মদ আবদুর রউফ সাহেবের অনুরোধে এ মহতী উদ্যোগের সাথী হতে পেরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের নিকট শুকরিয়া আদায় করছি।

আমি কায়মনবাক্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রার্থনা করছি, 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর এ নিঃস্বার্থ উদ্যোগ আল্লাহ্ কবুল করুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ কাফেলা সুনামের সাথে এগিয়ে যাক। আমিন।

'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম'-এর পক্ষে

মুহাম্মদ সালমান
২৫.১২.১৫

(মুহাম্মদ সালমান)

Md. Sultan Zauq Nadwi

Principal: Jamiah Darul Ma'arif Al-Islamiah, Chittagong.
Member: International League of Islamic Literature.
Member: International Union for Muslim Scholars.
Chairman: Anjuman-e-Ittihadul Madaris
(Qawmi Madrasah Education Board) Bangladesh.
Chief Editor: The Monthle Al-Hoque
Phone : 031-2581693, Fax : 031-2581687
Mobile : 01819-313242
E-mail : sultanzauq.bd@gmail.com

محمد سلطان ذوق الندوي

مدير : جامعة دار المعارف الإسلامية شيتاغونغ
عضو : مجلس الأمناء لرابطة الأدب الإسلامي العالمية
عضو : الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
رئيس : هيئة إتحاد المدارس الأهلية ببنغلاديش
رئيس تحرير : مجلة "الحق" الشهرية
الهاتف: ٨٨٠٣١٢٥٨١٦٩٣+ الفاكس والرقم الخاص : ٨٨٠٣١٢٥٨١٦٨٧+
جوال : ٨٨٠١٨١٩٣١٣٢٤٢+

التاريخ :

بنگلہ دیش میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی کتابوں کا
بنگلہ زبان میں ترجمہ مولانا کے سفر سے پہلے شروع ہوا، اس میں محب گرامی محترم
پروفیسر محمد علی صاحب کی محنت اور مخلصانہ کاوش سب سے پہلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے
خیر دے، اس کے بعد اسلامک فاؤنڈیشن نے ترجمہ شروع کیا، لیکن مسلسل طباعت
و ترجمہ کا کام چلا نہیں، اس پر مولانا نے افسوس کیا، پروفیسر محمد علی صاحب کے
ساتھ مشورہ کر کے جناب پروفیسر عبد الرؤف صاحب (مالک محمد لائبریری، بنگلہ بازار
ڈھاکہ) نے بھی کافی کتابوں کا ترجمہ اور نشر کرایا، یہ سن کر خوشی ہوئی کہ اس دفعہ
آپ نے کاروان زندگی (حضرت مولانا کی خود نوشت سوانح) کا ترجمہ کرا کے اشاعت کا
کام شروع کیا، اس اہم کتاب کی سات جلدیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے
اور ان کی حیات میں برکت عطا کرے، موصوف عزیزم ڈاکٹر اے ایف ایم خالد حسین کو
لیکر کلمۂ دعائیہ کے لئے ڈھاکہ سے میرے گھر تک پہنچے، میں اسکے لئے شکر گزار ہوں،

محمد سلطان ذوق ندوی

٦/١١/١٥م

Md. Sultan Zauq Nadwi

Principal: Jamiah Darul Ma'arif Al-Islamiah, Chittagong.
Member: International League of Islamic Literature.
Member: International Union for Muslim Scholars.
Chairman: Anjuman-e-Ittihadul Madaris
(Qawmi Madrasah Education Board) Bangladesh.
Chief Editor: The Monthlc Al-Haque
Phone : 031-2581693, Fax : 031-2581687
Mobile : 01819-313242
E-mail : sultanzauq.bd@gmail.com

محمد سلطان ذوق الندوي

مدير : جامعة دار المعارف الإسلامية شيتاغونغ
عضو : مجلس الأمناء لرابطة الأدب الإسلامي العالمية
عضو : الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
رئيس : هيئة إتحاد المدارس الأهلية بنغلاديش
رئيس تحرير : مجلة "الحق" الشهرية
الهاتف: ٢٥٨١٦٩٣-٣١-٠٨٨+ الفاكس والرقم الخاص: ٢٥٨١٦٨٧-٣١-٠٨٨+
جوال : ٣١٣٢٤٢-٠١٨١٩-٠٨٨+

التاريخ :

আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দাঃ বাঃ)-এর অভিমত ও দু'আ

বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর গ্রন্থাবলী বাংলাভাষায় তরজমা করার কাজ মাওলানার বাংলাদেশ সফরের আগেই শুরু হয়। এতে আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ওমর আলীর মেহনত ও আন্তরিক প্রয়াস সবার আগে। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, আমিন!

এরপর 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' অনুবাদের কাজ শুরু করে কিন্তু ধারাবাহিক মুদ্রণ ও প্রকাশের কাজে ছেদ পড়ে এবং তা বেশীদূর এগোয়নি। এ জন্য আল্লামা নদভী রহ.-এর আফসোস ছিলো। অধ্যাপক ওমর আলী সাহেবের সাথে পরামর্শ করে ঢাকার বাংলাবাজারস্থ 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর স্বত্বাধিকারী মুহাম্মদ আবদুর রউফ সাহেব হযরত মাওলানার বহু গ্রন্থ বাংলায় ভাষান্তর করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

এটা শুনে আনন্দিত হয়েছি যে, এবারে তিনি 'কারওয়ানে যিন্দেগী' (হযরত মাওলানার আত্মজীবনী) অনুবাদ করিয়ে তা প্রকাশের কাজে হাত দিয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থ সাত খণ্ডে বিন্যস্ত। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে তাওফিক দিন এবং হায়াতে বরকত দান করুন, আমিন! আমার স্নেহভাজন ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনকে সাথে নিয়ে তিনি আমার বাসায় হাযির হন। এ জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

محمد سلطان ذوق ندوی

০৬.১১.২০১৫ খ্রীষ্টাব্দ

(মুহাম্মদ সুলতান যওক)

10/11/15

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ
মাওলানা মোঃ মহীউদ্দিন খান সাহেবের অভিমত ও দু'আ

বিগত শতাব্দীর বিশ্বসেরা প্রাজ্ঞ আলেমেদ্বীন ও বরেণ্য আধ্যাত্মিক রাহ্‌বার হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর আত্মজীবনী বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে দেখে বিশেষ আনন্দবোধ করছি। 'কারওয়ানে যিন্দেগী' অর্থাৎ জীবনের কাফেলা নামক সাত খণ্ডে রচিত এ বইটি বলতে গেলে মুসলিম উম্মাহ্‌র একটি দর্পণ বিশেষ। হযরত মাওলানা তাঁর আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে সমকালীন মুসলিম উম্মাহ্‌র একটি সঠিক চিত্রই আঁকেননি, একই সঙ্গে অনুকরণীয়, অনুসরণীয় জীবনের একটি রূপরেখাও অঙ্কন করেছেন।

বিগত শতাব্দীর শেষ দশকব্যাপি হযরত আল্লামার কিছুটা সান্নিধ্য লাভ করার আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো। পবিত্র মক্কাকেন্দ্রিক বিশ্ব মুসলিম সংস্থা 'রাবেতা আলমে ইসলামী'-এর একজন নগণ্য সদস্য হিসেবে অন্যূন দশ-বারোটি সম্মেলনে আমি হযরত আল্লামার সান্নিধ্য লাভ করেছি। তাঁর দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে কিছু জানার সুযোগ হয়েছে।

সময়টা ছিল মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য বিশেষ সমস্যাসংকুল- ইরানের কথিত ইসলামী বিপ্লব এবং সউদী আরবসহ আরব বিশ্বের সাথে ইরানের বিপ্লবী কর্মকর্তাদের মতপার্থক্য মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য খুবই বিব্রতকর অবস্থা। এ সময় সঠিক পথের সন্ধানে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর প্রাজ্ঞ অভিমত ছিল সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য অনুকরণীয়।

মাওলানা আলী মিয়া রহ. বিগত শতাব্দীর শেষ দিনটিতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এর দ্বারাও অনেকে অনুমান করেন যে, আলী মিয়া ছিলেন সত্যিকার অর্থেই বিগত শতাব্দীর একজন বরণীয় মুজাদ্দেদ। তাই তাঁর জীবনসংগ্রামের বর্ণনার প্রতিটি ছত্রই মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য অনুকরণীয়। 'কারওয়ানে যিন্দেগী' নামক গ্রন্থটি এই দিক বিবেচনায় মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য অবশ্য পঠনীয় একটি মহাগ্রন্থ।

বাংলাভাষায় তাঁর সেই মহাগ্রন্থের অনুবাদ একটি নেয়ামত বিশেষ। আশা করি, বইটির সব কয়টি খণ্ড অনুবাদ করার তৌফিক আল্লাহ্‌পাক দান করবেন। আমিন!

(মোঃ মহীউদ্দিন খান)
সম্পাদক, মাসিক মদীনা

তারিখঃ ২৪-১২-২০১৫ খ্রীস্টাব্দ, ঢাকা

مدرسة دار الرشاد ميربور ڈھاکا بنغلاديش

মাদরাসা দারুর রাশাদ
১২/ ডি-ই, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন ঃ ৮০১৩১৬৩, মোবা ঃ ০১৭১১-৯৭০৫৮৮, ০১৫৫২-৩৫৬৪২১

Madrasah Darur Rashad
12/ D-E Mirpur, Pallabi, Dhaka-Bangladesh
Ph : 8013163, Mob : 01711-970588, 01552-356421

দারুর রাশাদ মাদরাসার মুহতামিম ও হযরত আলী নদভী রহ.-এর খলীফা মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান সাহেবের দু'আ ও অভিমত

মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতার সিজদা আদায় করছি যে, আমার মুরশিদ ও পীর হযরত মাওলানা আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর আত্মজীবনী 'কারওয়ানে যিন্দেগী' বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

আল্লামা সাইয়িদ আলী মিয়া নদভী রহ-এর জীবন বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সংস্কার ও পুনর্জাগরণের আলোকবর্তিকা। সারা বিশ্বে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র গৌরবময় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের নির্দেশিকা উপস্থাপনের যে ধারা তিনি 'মা যা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমীন' গ্রন্থের মাধ্যমে সূচনা করেছিলেন, তা অব্যাহত ছিলো তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

ইব্নে বতুতার পরে মুসলিম বিশ্ব ও সমকালীন পরাশক্তিকে সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে হয়ত তিনিই ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি। জীবনের ধারা ও প্রবাহ বর্ণনা করতে গিয়ে মূলতঃ তিনি নিজের চিন্তা, দর্শন ও দিকনির্দেশনা তুলে ধরেছেন অভিজ্ঞতার আলোকে।

তাঁর এই জীবনের কাফেলা দেশ ও মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদ লালন, সংরক্ষণ ও বিস্তার জাতীয় কর্তব্য এবং বাংলাভাষী মুসলমানদের কাছে তা পৌঁছে দেয়া আমাদের দায়িত্ব ছিল। 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর স্বত্বাধিকারী জনাব মুহাম্মদ আবদুর রউফ আমাদের পক্ষে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। এ জন্য শুকরিয়া আদায় করছি।

দু'আ করি বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে সমাদৃত হোক এবং হযরতের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের মুসলিম জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী মহল উম্মাহ্র সংস্কার ও পুনর্জাগরণে কর্মসূচী গ্রহণ করুক। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলের নেক মকছুদ কবুল করুন। আমিন!

মুহাম্মাদ সালমান
২৫.১২.১৫
(মুহাম্মাদ সালমান)
মুহতামিম, দারুর রাশাদ মাদরাসা

তারিখঃ ২৫-১২-২০১৫ খ্রীস্টাব্দ, ঢাকা

লেখকের ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

এটি 'কারওয়ানে যিন্দেগী'র দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম খণ্ডটি ১৯৬৫ সালের ইতিবৃত্ত পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছিল। এই খণ্ডে ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত জীবনের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও ইতিবৃত্ত, অনেকগুলো সফর, গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো রচনা ও ভাষণের সারাংশ এবং সেগুলোর প্রেক্ষাপটের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এই খণ্ডে প্রাসঙ্গিকভাবে ভারত ও মুসলিম বিশ্বের সেসব অবস্থা ও ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে, যেগুলোর সূত্র ধরে আমাকে এই ভাষণগুলো প্রদান করতে হয়েছে এবং এই গ্রন্থগুলো রচনা করতে হয়েছে, যেগুলো জানা ব্যতিরেকে সেই প্রাণ ও চেতনা উপলব্ধি করা কঠিন হবে, যেগুলো এসব ঘটনার মূল প্রতিপাদ্য। এই খণ্ডটি পাঠ করে পাঠক লেখকের দেশ ভারত ও মুসলিম বিশ্বে; বিশেষ করে আরব দেশগুলোতে এই সময়ে সংঘটিত অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা নিতে সক্ষম হবেন, যেগুলো স্ব-স্ব দেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতির ইতিহাস লেখকগণ কিংবা বিশ্লেষক সাংবাদিকগণের দৃষ্টিতে তেমন কোনো গুরুত্ব বহন করে না। আমার এই পর্যালোচনার সূত্র ধরে ভবিষ্যত ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষকগণ সঠিক ইতিহাস রচনায় মূল্যবান উপাদান খুঁজে পাবেন।

প্রথম খণ্ডের মতো এই খণ্ডেও পাঠকগণ সম্ভবত এই বলে হোঁচট খাবেন যে, আমি 'ঘটনা বর্ণনা'র চেয়ে 'চিন্তাধারা' বেশি উপস্থাপন করেছি, রচনাবলি ও ভাষণ-বক্তৃতার বিপুলসংখ্যক ও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি, যেগুলো পাঠকগুণ মূল কিতাবগুলোতে ও ভাষণসমগ্রে পড়ে নিতে পারেন। কিন্তু একাজটি আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছি। কারণ, আমার কাছে আমার নিজের ইতিবৃত্তের চেয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বেশি প্রিয়। আর আমি এর মাঝেই বেশি উপকারিতা আছে বলে মনে করি। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, আমার জীবনচরিতে কোনো অভিনবত্ব ও বিশিষ্টতা নেই। কিন্তু আমার চিন্তাধারা, অনুভব-অনুভূতি, চেতনা, নিজের জীবন ও চারপাশের পরিবেশের অধ্যয়ন, মুসলিম বিশ্ব ও মনুষ্য জাতি-গোষ্ঠীগুলোর উত্থান ও পতনের কারণ পর্যালোচনা,

বর্তমান বিপদ-সমস্যা ও সেগুলোর প্রকৃত কারণ নির্ণয়, ভারত ও সমকালীন বিশ্বের জন্য সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণ আমার কুরআন ও সীরাতে রাসূল অধ্যয়নের সুফল এবং হেদায়াতের এই মশালহাতে মানবীয় ইতিহাসের নিরপেক্ষ পর্যালোচনার ফলাফল এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো, এটি মহান আল্লাহর তাওফীকের কারিশমা।

কবি ইকবালের ভাষায়—

فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی

'পথের ভিখারী পেয়ে গেল রাজার ধন।'

বেশ কজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও বড়মাপের লেখকের জীবনী রচনা ও পর্যালোচনা লেখার সুবাদে আমার অভিজ্ঞতা আছে, একজন লেখক ডজন-ডজন; বরং অনেক সময় শত-শত গ্রন্থের রচয়িতা হয়ে থাকেন। কিন্তু আল্লাহপাকের ইচ্ছায় অনেক সময় সেই লেখকের প্রিয় দাওয়াত ও মৌলিক চিন্তাধারা কোনো একটি গ্রন্থের মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকে এবং ভবিষ্যত বংশধর কেবল সেই গ্রন্থটির মাধ্যমেই উক্ত লেখক কিংবা দাঈর মন-মানসিকতা, চিন্তাধারা ও কর্মনীতির ধরন বুঝে নিতে সক্ষম হয়। ইচ্ছে করলে এ ব্যাপারে আমি অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারি। কিন্তু কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সেদিকে আর গেলাম না। অন্যথায় দূর অতীত, নিকট অতীত ও খোদ হাল আমলের বেশ কজন লেখক ও চিন্তাশীলের এমন কতগুলো গ্রন্থের নাম উল্লেখ করতে পারি যে, শুধু সেগুলোর মাধ্যমে তাঁদের শ্রম, সাধনা, চিন্তা ও দাওয়াত জীবন্ত ও সুরক্ষিত আছে। তা ছাড়া এটিও একটি বাস্তবতা যে, বেশিরভাগ পাঠক বহুসংখক ও বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ সংগ্রহ করার এবং সেগুলো পড়ার সময় ও সামর্থ্য রাখেন না। তাদের জন্যও এমন গ্রন্থই যুৎসই, যেগুলোতে বহুসংখ্যক গ্রন্থের সারনির্যাস ও প্রয়োজনীয় মৌলিক আলোচনা চলে এসেছে। এই অভিজ্ঞতা-অনুভূতিও আমাকে 'কারওয়ানে যিন্দেগী'তে আমার এমবসব প্রিয় সফরসঙ্গীদের আলোচনা সন্নিবেশিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, যাঁরা তাঁদের কাজ সমাপ্ত করে ফেলেছেন এবং যার-যার গন্তব্যে পৌঁছে গেছেন। কারণ, সফরসঙ্গী ও সমচিন্তার লোকদের বিরাট হক আছে।

এই দুটি খণ্ডের বিন্যাসে আমি সেই বন্ধুদের অনেক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছি, যারা আমার উপর গবেষণামূলক (থিসিস) নিবন্ধ লেখার ও ডক্টরেট করার কাজে নিয়োজিত আছেন।

এই খণ্ডটিকে আমি ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সমাপ্ত করে দিয়েছি। ১৯৮৪ সাল এখনও চলমান। এ বছরের শুরুর দিকে আমি বিভিন্ন দেশে গুরুত্বপূর্ণ

তিনটি সফর করেছি। তার একটি হলো বাংলাদেশ সফর, যেটি মার্চ মাসের শুরুর দিকে হয়েছিল। আর এটি ছিল আমার বাংলাদেশের প্রথম সফর। ফলে তাতে ব্যস্ততাও খুব বেশি ছিল আবার ভাষণগুলোও হয়েছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই সফরের ভাষণগুলো সংকলিত হয়ে 'তোহফায়ে মাশরেক' নামে প্রকাশিত হচ্ছে। দ্বিতীয় সফরটি হয়েছিল ওমান ও পূর্ব জর্ডানে। ওখানকার গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'মুআসসাসা আহিলিল বাইত'-এর বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণের জন্য তার পৃষ্ঠপোষক শাহজাদা হাসান ইবনে তালাল হাশেমিয়ার পীড়াপীড়িতে আমাকে এই সফরের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। যেহেতু ওমান অবস্থানকালে ইসরা ও মি'রাজের তারিখ এসে পড়েছিল, তাই এ বিষয়ের উপর আমাকে ২-৩টি ভাষণ দিতে হয়েছিল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জনাকীর্ণ এই সভাগুলোতে আমি ইসরা ও মি'রাজের সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেছি এবং এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছি।

এই ধারাবাহিকতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফরটি ছিল সান'আর, যেটি '৮৪ সালের মে মাসের ১২ ও ১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঈমানের খনি ও ইয়ামানি মাটিতে এটি ছিল আমার প্রথম সফর। এখানে এসে আমার মনটা একদম প্রফুল্ল হয়ে গিয়েছিল এবং আলোচনায় বিষয়বস্তু যেন ফোয়ারার মতো ফুটতে শুরু করেছিল, যার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে কমই হয়েছে। এখানে আমি এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি, যেমনটি এর আগে কোনো দেশের সফরে পাইনি। এই দুটি দেশের ভাষণাবলির সংকলন 'নাফাহাতুল ঈমান বাইনা সান'আ ও উম্মান' নামে অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডে এই সফরগুলোর কাহিনী এবং তার ভাষণগুলোর সারমর্ম অন্তর্ভুক্ত করিনি। চিন্তা করেছি, পরিশ্রান্ত কলমও তো খানিক বিশ্রাম চায়।

আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী
৯, বেনজির বিল্ডিং, বাইকেলা, বোম্বাই।
২৮ শাওয়াল ১৪০৪
২৮ জুলাই ১৯৮৪

প্রথম অধ্যায়
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা ও গবেষণামূলক কাজ
আপন ঠিকানায় /২৫
'আল-আরকানুল আরবা'আ' রচনা /২৫
'নুযহাতুল খাওয়াতির' অষ্টম খণ্ড ও 'জান্নাতুল মাশরিক' /৩১
নিষ্ঠাবানদের সঙ্গে আল্লাহপাকের আচরণ /৪০
আস-সুরাউ বাইনাল ফিকরাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল ফিকরাতিল
গারবিয়্যা (ইসলাম ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব) /৪১
আত-তারীকু ইলাল মাদীনাহ (কারওয়ানে মদীনা) /৪৪
'নাহ্উত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যা আল-হুররাহ' (ইসলামি
দেশগুলোর জন্য স্বাধীন ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা) /৪৭
হায়াতে আবদুল হাই (রহ.) /৫১
দ্বিতীয় অধ্যায়
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও দুর্ঘটনা
একটি গুরুতর দুর্ঘটনা ও তার থেকে আমার অঙ্গের জন্য রক্ষা পাওয়া /৫৩
আম্মাজান (রহ.)-এর মৃত্যু /৫৬
নদওয়াতুল ওলামার পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি
লাভের চেষ্টা, তার নামঞ্জুরি ও দারুল উলূমে স্ট্রাইক /৫৮
হায়দারাবাদের একটি সফর /৬১
একটি স্মরণীয় হেজায সফর /৬৩
ইংল্যান্ডের তৃতীয় সফর /৬৪
লাখনৌর তাবলীগি মারকায থেকে বাসা স্থানান্তর /৬৭
তৃতীয় অধ্যায়
আরব জাতীয়তা ও সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহী
প্রেসিডেন্ট নাসেরের বিরোধিতা
১৯৬৭ সালের ৫ জুনের দুর্ঘটনা ও জীবনের একটি নতুন মোড় /৭১
মিশরের নতুন নেতৃত্ব, আরবদের মাঝে তার গ্রহণযোগ্যতা
ও তার কারণসমূহ /৭২
আমার বিরোধিতার কারণগুলো /৭৪
আরব বিশ্ব, তার ঘটনাবলি ও পরিস্থিতির সঙ্গে
আমার অসাধারণ সম্পৃক্ততা /৭৭
হেজায ও কুয়েতের ভাষণসমূহ /৭৯
একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতকার /৮২
ভবিষ্যত আরবদেরই জন্য /৮৫

চতুর্থ অধ্যায়
ভারতের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলির সঙ্গে সম্পৃক্ততা
ও মাঠ পর্যায়ে তৎপরতা
একটি পারস্পরিক বিরোধ ও তার সমাধান /৮৯
একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার /৯২
মহিশুর রাজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সফর /৯৫
প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানানো এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা /৯৬
শহীদ টিপু সুলতানের সমাধিতে /৯৭
জনকোলাহলের মাঝে নির্জনতা /৯৮
শাসনের পরিবর্তন ও মর্যাদা-প্রতাপের ক্ষয়িষ্ণুতা /৯৮
গুলবারগার ভাষণ, স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যতের গ্যারান্টি ও জনগণের
আত্মপর্যালোচনা না করা ক্ষমতার জন্য ক্ষতিকর /৯৯
একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি /১০১
মজলিসে মুশাওয়ারাতের বিশৃঙ্খলা ও মতানৈক্যের কাল /১০৯
পঞ্চম অধ্যায়
তাহরীকে পয়ামে ইনসানিয়াত
অনুপ্রেরণা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য
আন্দোলনের চিন্তাগত ও বাস্তবগত প্রেক্ষাপট /১১৩
আন্দোলনের সূচনা ও উন্নতি /১১৮
ষষ্ঠ অধ্যায়
তিন বছরের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা
পাক-ভারত যুদ্ধ /১২৯
পূর্ব পাকিস্তানে ভাষাগত ও আদর্শগত বাড়াবাড়ির ঝড় /১৩০
মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড প্রতিষ্ঠা /১৩৬
অল ইন্ডিয়া আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি
কনভেনশন দিল্লির সূচনা /১৩৮
শিক্ষানিয়ন্ত্রণের ভয়ানক ঝোঁক /১৩৯
সপ্তম অধ্যায়
মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি মুসলিম দেশ ভ্রমণ ও
আরব উপসাগর সফর
ভ্রমণের জন্য দেশনির্বাচন /১৪৩
আফগানিস্তান ও ইরানের সঙ্গে হৃদ্যতা /১৪৪
'দরিয়ায়ে কাবুল ছে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক' /১৪৫
পরিবর্তনের আগে /১৪৬
আফগানিস্তানের অতীত ও বর্তমান /১৪৭
সাক্ষাত ও পরিদর্শন /১৪৯

সুলতান মাহমুদ গজনবির রাজধানীতে /১৫০
ইরানে /১৫১
দাওয়াত ও তাবলীগের পথে সবচেয়ে বড় বাধা /১৫৩
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন লেবাননে /১৫৫
নানা আশঙ্কা ও বিপদের ভয় /১৫৬
দামেশ্‌কে দুদিন /১৫৬
স্বপ্ন, নাকি বাস্তব? /১৫৭
হারুন রশীদের সিংহাসন বাগদাদে /১৫৮
কুরআনের সমাধান /১৫৯
শহীদদের মাটি জর্ডানে /১৬০
জীবনের একটি ক্রিয়াশীল দৃশ্য /১৬২
উপসাগরীয় এলাকার একটি সফর /১৬৩
অষ্টম অধ্যায়
নদওয়াতুল উলামার ৮৫সোলা
সমাবর্তন অনুষ্ঠান
নদওয়াতুল উলামার একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের চিন্তা /১৬৫
আন্দোলনের সূচনা /১৬৮
কয়েকটি পরীক্ষামূলক ধাপ /১৭০
আসল প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা /১৭৫
মেহমানদের আগমন /১৭৭
সম্মেলন /১৭৭
স্বাগত ভাষণ /১৭৮
কোনো জমশেদের পানপাত্র নই আমি /১৮৩
ফজর নামাযের পর দাওয়াতি বক্তব্য /১৮৫
আমার বোন আমাতুল্লাহ তাসনীম সাহেবার ইন্তেকাল /১৮৬
নবম অধ্যায়
জরুরি অবস্থার সময় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে
আমার সাক্ষাত এবং একটি ঐতিহাসিক পত্র ও
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা
জরুরি অবস্থা জারির প্রেক্ষাপট /১৯১
জরুরি অবস্থা জারি /১৯৪
লেখকের ইন্দিরাজির সঙ্গে সাক্ষাত ও খোলা চিঠি /১৯৭
ইন্দিরাজির সঙ্গে সাক্ষাত ও পত্র /১৯৯
ইমারজেন্সির অবসান এবং তার থেকে সংগৃহীত
কয়েকটি ফলাফল /২১১
১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচন, তার ফলাফল ও

ইন্দিরাজির আমার বাড়িতে আগমন /২১৩
জনতা সরকার ও তার অবসান /২১৫
জনতা পার্টির কয়েকজন নেতার সঙ্গে আমার
একটি হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা /২১৬
দশম অধ্যায়
মরক্কো ও আমেরিকা সফর
জিদ্দা থেকে রাবাত /২১৯
আমেরিকা ভ্রমণ /২২৪
এম.এস.এর কনফারেন্সে /২২৫
উত্তর আমেরিকা ও কানাডা সফর এবং তার বক্তৃতাবলি /২২৬
চোখের অপারেশনের ব্যাপারে দ্বিধা এবং
অবেশেষে সিদ্ধান্ত /২৩১
চোখের সফল অপারেশন /২৩২
শিকাগোতে /২৩৩
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন /২৩৪
একাদশ অধ্যায়
পাকিস্তান সফর ও দুটি গুরুতর দুর্ঘটনা
রাবেতার এশীয় কনফারেন্স ও পাকিস্তান সফর /২৩৭
বক্তৃতাবলি ও মজলিসসমূহ /২৪২
গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতসমূহ ও প্রাসঙ্গিক সফর /২৪৮
একটা গুরুতর পারিবারিক দুর্ঘটনা ও পরীক্ষা /২৫২
আরও একটা দুর্ঘটনা /২৫৪
দ্বাদশ অধ্যায়
সৌদি রাষ্ট্রপ্রধান ও দায়িত্বশীলগণের নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ লিখিত বার্তা,
হারাম শরীফের অপ্রীতিকর ঘটনা, কাতারের সীরাত কনফারেন্স
ও ফয়সাল এওয়ার্ড
একটি গুরুত্বপূর্ণ লিখিত বার্তা /২৫৫
একটা দুর্ভাগ্য /২৬২
হারাম শরীফের অপ্রীতিকর ঘটনা /২৬২
কাতারের সীরাত কনফারেন্স /২৬৫
ফয়সাল এওয়ার্ড /২৭০
নিজের মূল্য বোঝো ইয়ায! /২৭৩
ত্রয়োদশ অধ্যায়
দারুল উলূম দেওবন্দের শতবর্ষপূর্তি সম্মেলন মুরাদাবাদ ট্রাজেডি
পয়ামে ইনসানিয়াত কনভেনশন
দারুল উলূম দেওবন্দের শতবর্ষপূর্তি সম্মেলন /২৭৭

শতবর্ষপূর্তি সম্মেলনের পর /২৮৭
মুরাদাবাদ ট্র্যাজেডি /২৮৯
মুসলিম মজলিসে মুশাওরাতের কার্যকরী কমিটির বৈঠক
ও মুরাদাবাদের ঘটনাস্থল পরিদর্শন /২৯৩
পয়ামে ইনসানিয়াত কনভেনশন লাখনৌ /২৯৬

চতুর্দশ অধ্যায়

ইসলামি সাহিত্য আলোচনা, একটি শিক্ষাসম্মাননা
কাশ্মিরবিষয়ক ভাষণাবলি, পারিবারিক দুর্ঘটনা
দারুল মুছান্নিফীন ও আলজেরিয়ার সেমিনার

ইসলামি সাহিত্য আলোচনা নদওয়াতুল উলামা /৩০১
হাদীছের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ /৩০৫
একটি শিক্ষাসম্মাননা /৩০৭
একটা গুরুতর পারিবারিক দুর্ঘটনা /৩১৬
'ইসলাম ও পাশ্চাত্য' বিষয়ের ওপর দারুল
মুসান্নিফীন-এর সেমিনার /৩১৮
আলজেরিয়ার সেমিনার /৩২১

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীলঙ্কা সফর, হায়দারাবাদের ভাষণাবলি, বৈরুত ট্রাজেডি, আফগান
জিহাদ বিষয়ে ভাষণ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ইসলামিক সেন্টারের
উদ্বোধন ও 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য' শিরোনামের নিবন্ধ

শ্রীলঙ্কা সফর /৩২৭
বৈরুত ও আফগানিস্তানের ব্যাপারে আমার আত্মিক
অনুভূতি ও চেতনার বহিঃপ্রকাশ /৩৩২
হায়দারাবাদের ভাষণসমূহ /৩৩৫
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামিক সেন্টার এবং
'ইসলাম ও পাশ্চাত্য' নামক নিবন্ধ /৩৪০
আমিরাত ও কুয়েত সফর /৩৪৫

কারওয়ানে যিন্দেগী

২য় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা ও গবেষণামূলক কাজ

আপন ঠিকানায়

ক্ষণস্থায়ী জীবনের দুর্বল ও পুরোনো সুতা 'কারওয়ানে যিন্দেগী'র ৫১৮ নং পৃষ্ঠাটি সেই অবস্থায় ফেলে রেখেছিলাম যে, তখন ১৯৬৬ সাল শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং আমি সিতাপুর হাসপাতাল থেকে বিদায় নিয়ে নিজবাড়ি রায়বেরেলি চলে এসেছিলাম। সেখানে এই সুতায় জীবনের বায়ান্ন বছরের গিরাটি পড়ে গিয়েছিল। এখন সেই সুতাটি – যেটি সত্তর বছর বয়সে আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে – ওখান থেকেই (মার্চ ১৯৬৬ থেকে) হাতে তুলে নিচ্ছি, যেখানে তাকে রেখে দিয়েছিলাম। পূর্বাপর সবকিছুরই মালিক আল্লাহ।

আমার কাছে সঙ্গত মনে হলো, প্রথমে আমি সেই গুরুত্বপূর্ণ ও গবেষণামূলক কাজগুলো একই ধারাবাহিকতায় আলোচনা করব, যেগুলো ১৯৬৬ সাল থেকে শুরু হয়ে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত আঞ্জাম পেয়েছিল। তারপর আমি সেসব ঘটনা-দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করব, যেগুলো এই সময়টিতে আমার জীবনে ঘটেছিল। তারপর আমি সেসব গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও আন্দোলন-সংগ্রামের কথা আলোচনা করব, যেগুলোকে আমি সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি এবং দ্বীন ও মিল্লাতের সেবা ও সুরক্ষার কাজ মনে করে আঞ্জাম দিয়েছিলাম।

প্রথম খণ্ডের শেষ দু-পৃষ্ঠায় আমি যেসব রচনামূলক কাজের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলাম, সেগুলোকে এই অধ্যায়ে কিছুটা বিস্তারিতভাবে লিখব। কারণ, এগুলো দাওয়াতি ও ইলমি কাজে বেশ গুরুত্ববহ।

'আল-আরকানুল আরবা'আ' রচনা

সিতাপুর হাসপাতালে অবস্থানকালীন দিনগুলো একধরনের জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বের কাল ছিল। লেখালেখি তো ভিন্ন কথা, আমি আমার আত্মীয়-বন্ধুদের

জিজ্ঞেস করতাম, সেই দিনটি কি আর আসবে, যখন আমি রুটিন অনুযায়ী জীবন যাপন করব? আমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করব? আত্মীয়-বন্ধুদের আসরে অংশগ্রহণ করব? কিন্তু আশা-নিরাশার এই দোলাচলের মাঝে আমার হৃদয়ে তীব্রভাবে বাসনা জাগল যে, এখান থেকে ছুটি পেতেই আমি ইসলামের চার আমলি রোকনের ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার কাজে হাত দেব। এই চিন্তাটি আমার মন ও মস্তিষ্কের ওপর এমনভাবে চেপে বসল যে, এই রোগগ্রস্ত অবস্থায়ও এবং হাসপাতালের শোকাবহ পরিস্থিতি এবং বারংবার চোখের ব্যথাও এই ভাবনাটি আমার মন থেকে সরাতে পারেনি।

এই চিন্তা মাথায় আসার বড় কারণটি হলো, ইসলামের এই সুমহান মৌলিক আমলি রোকনগুলোর (নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ব) আত্মা, এগুলোর তাৎপর্য, স্বরূপ, উপকারিতা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বোঝা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের লেখক সম্প্রদায়ের মাঝে বেশ কিছুদিন যাবত একধরনের বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। অত্যন্ত লৌকিকতা সঙ্গে এই রোকনগুলোকে সমকালের দার্শনিক, রাজনীতি ও অর্থনীতিবিদগণের চিন্তা-চেতনা ও পরিভাষার অনুগামী বানানোর একটা প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছিল। ফলে মনে প্রবল শঙ্কা জাগল, আল্লাহ্ না করুন, এই বিশেষ চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে পাঠকগণ দ্বীনের এই মৌলিক রোকনগুলোর আসল রূপ ও সেগুলোর প্রকৃত শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং সেগুলোর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে হাত ধুয়ে বসে। আধুনিক বস্তুগত ব্যাখ্যায় প্রভাবিত হয়ে যদি ঈমান ও ইহ্তিসাবের (পরকালীন হিসাবের অনুভূতি) মর্মই আমাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে যায় এবং ইবাদাত ও ইখলাসের আত্মার ওপর বস্তুগত চিন্তাধারা বিজয়ী হয়ে যায়, তা হলে এটি উম্মাহর জন্য বিরাট এক ঝুঁকি ও গভীর এক তাত্ত্বিক বিকৃতি বলে বিবেচিত হবে।

চোখের ব্যথা, স্বাস্থ্যের দুর্বলতা ও সতর্কভাবে চলার ডাক্তারি পরামর্শ সত্ত্বেও এই গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর কাজটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমার সাহসী হয়ে ওঠার পেছনে আরও একটি কারণ আছে। আমার বন্ধুবর ডক্টর সাঈদ রমজানের পীড়াপীড়িতে আমি হজ্বের লক্ষ্য ও তাৎপর্য বিষয়ে (যেটি এই অর্থে আরকানের আরবা'আর সবচেয়ে নিপীড়িত রোকন যে, বেশ কিছু দিন যাবত একে 'একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলন' আখ্যায়িত করা হচ্ছে। লেখক মিনা ও আরাফাতে তাকে এই পরিচয়ে পরিচিত করতে

নিজকানে শুনেছে) একটি ধারাবাহিক নিবন্ধ রচনা করেছিলাম, যেটি তিন কিস্তিতে তিন বছরে হজ্বের সময় 'আল-মুসলিমূন' পত্রিকা প্রকাশ করেছে এবং সৌদি রেডিও স্টেশন থেকে কয়েকবার প্রচারিত হয়েছে। শিক্ষিত যুবসমাজ ও সচেতন শিক্ষিতসমাজের কাছে আমার এই নিবন্ধটি বেশ সমাদৃত হয়েছে। এই নিবন্ধে এমন একটি নতুন রচনাশৈলি পরিলক্ষিত হয়, যেটি বর্তমান আরবি রচনারীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি লেখকের কোনো যোগ্যতা বা কলমের শক্তির ফল নয়। এটি বিষয়েরই মেজাজ ও আত্মার কারিশমা এবং সেই আশেকানা সম্পর্কের ক্রিয়া, যেটি ছিল এই রোকনটির প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একক বৈশিষ্ট্য।

হজ্ব ছাড়া দু-বছর আল-মুসলিমূন-এরই ফরমায়েশে রোযা ও তার তাৎপর্য বিষয়ে আমার দুটি নিবন্ধ লেখার সুযোগ ঘটেছিল। সেই নিবন্ধগুলোও আল-মুসলিমূন-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এভাবে এই বিশাল ও স্পর্শকাতর কাজটি আমার কাছে বেশ সহজ হয়ে গেল যে, এই ধারাবাহিকতার অর্ধেক কাজ তো সম্পন্ন হয়েই আছে। এখন আমাকে শুধু নামায আর রোযার ওপর লিখতে হবে। ১৯৬৬ সালের ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে এলাম। কিছুদিন একান্ত প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও এক-দুটি সফরের পর ৮ এপ্রিল ১৯৬৬ (১৬ যিলহজ্ব ১৩৮৫) আল্লাহর নাম নিয়ে আমি কাজটি শুরু করে দিলাম।

গরম শুরু হয়ে গিয়েছিল। চোখের ব্যাপারে গরমের দিনে অধিক সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যকতা ছিল। আমি শাহ ইল্‌মুল্লাহ (রহ.) ও সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর বরকতধন্য মসজিদের (রায়বেরেলির দায়েরা শাহ ইল্‌মুল্লাহ্‌য় যার অবস্থান) এককোণে বসে লেখানোর কাজ শুরু করে দিলাম। আমি বলতাম আর মৌলভী নেছারুল হক নদভী লিখত। গ্রন্থটি মূলত আরবিতেই লিখবার প্রয়োজন ছিল। আমার রচনারীতি অনুসারে প্রথমে আমি উপাদান সংগ্রহ করলাম। যেমন– নামাযের জন্য প্রথমে একবার পুরো কুরআনে চোখ বোলালাম এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো নোট করালাম। হাদীছের জন্য 'জাম্‌উল ফাওয়ায়েদ' ও মাজ্‌মাউল ফাওয়ায়েদ'-এর সেই অধ্যায়গুলোর ওপর চোখ বোলালাম, যেগুলো এই রোকনগুলোর ফজিলত, লক্ষ্য ও উপকারিতাসংশ্লিষ্ট এবং সেগুলো নোট করালাম। তারপর বিশেষভাবে ইমাম গায্‌যালি, হাফেয ইবনে কায়্যেম ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) এঁরা আপন-

আপন গ্রন্থ ইহ্‌য়াউল উলূম, যাদুল মা'আদ ও হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ইত্যাদিতে এসব বিষয়ে যা-কিছু লিখেছেন এবং যেসব সূক্ষ্মতত্ত্ব এঁদের রচনাবলিতে স্থান পেয়েছে সেগুলো নোট করলাম। এবার সব কিছু সামনে নিয়ে লেখাতে শুরু করলাম এবং গরমের তীব্রতা শুরু হওয়া পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকল।

এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু আমার মন ও মস্তিষ্কের ওপর এমনভাবে ঝেঁকে বসল যে, অন্য সময়গুলোতেও এটি আমার সঙ্গ ছাড়ত না। দীর্ঘদিন যাবত এটি আমার জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে থাকল এবং এর বিপরীত কিছু করা সাধারণ অবস্থায় আর সম্ভব রইল না। এই সময়টিতে আমার একধরনের 'তাসনীফি ই'তিকাফ' চলত, যার থেকে বের হওয়া তখনই সম্ভব হলো, যেদিন গ্রন্থটির 'তাম্মাত' -এর তা ঈদের চাঁদ হয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

হজ্ব ও রোযার ওপর মৌলিক বিষয়বস্তুগুলো যদিও আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল; কিন্তু তারপরও গ্রন্থটির সুবিশাল কাঠামো ও মানের বিবেচনায় সেখানে অনেক কিছু সংযোজন করতে হলো। এ-ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা আমি শাহ সাহেব (রহ.)-এর কিতাব 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' থেকে পেয়েছি।

১৯৬৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি (যিলকদ ১৩৮৬) গ্রন্থটির রচনার কাজ সমাপ্ত হয়। গ্রন্থটিতে এই রোকনগুলোর লক্ষ্য, গূঢ়তত্ত্ব ও কার্যকারিতা বর্ণনার পাশাপাশি আরও যে-বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্বসহকারে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, তা হলো, অন্যান্য ধর্মে এই ইবাদাতগুলো কোনভাবে পাওয়া যায়, সেগুলো ও ইসলামের এই রোকনগুলোর মাঝে আকার, গঠন ও কার্যকারিতায় পার্থক্য কী। এই তুলনামূলক অধ্যয়নের (Comparative Study) জন্য আমাকে অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থাদি ও ইংরেজি ভাষায় লেখা হাজার-হাজার পৃষ্ঠা উল্টানোর প্রয়োজন ছিল। একাজে (চোখের এই দুর্বলতা ও শারীরিক অক্ষমতার অবস্থায়) দারুল উলূম নদ্‌ওয়াতুল উলামার সাবেক ওস্তাদ আমার শ্রদ্ধাভাজন শাহেদ আলী সাহেব এম.এ মরহুম থেকে আমি অনেক মূল্যবান সহযোগিতা পেয়েছি। গ্রন্থটির হজ্ব অধ্যায়ের বৃহদাংশ আমি মহপতমিউ পল্লীতে সম্পন্ন করেছি। এই এলাকাটি কাকুরি ও মালিহাবাদের পথে লাখনৌ থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় আমি সপ্তাহদুয়েক সময়ের জন্য এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম বা আত্মগোপন (Underground) করেছিলাম।

গ্রন্থটির রচনার কাজ সমাপ্ত হওয়ামাত্র আমি আমার আরবি রচনার সবচেয়ে বড় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'মাকতাবা দারুল কলম কুয়েত'-এ পাঠিয়ে দিলাম। ওখান থেকে ১৯৬৭ সালে (১৩৮৭ হিজরি) এর প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হয় এবং একই বছর এই সংস্করণটি নিঃশেষ হয়ে গেলে ১৯৬৮ সালে (১৩৮৮ হিজরি) এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়।

দারুল মুসান্নিফীন-এর ব্যবস্থাপক ও মা'আরিফ-এর পরিচালক মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দীন আহমাদ সাহেব নদভী আরবি সংস্করণের ওপরই একটি অসাধারণ পর্যালোচনা লিখেন। তিনি লিখেছেন, '... উর্দু তরজমায় এর মূল কিতাবের আসল শক্তি ও প্রাণ উঠে আসবে কিনা, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে যদি-না লেখক নিজে কাজটা সম্পাদন করেন।' কিন্তু আমার ভাতিজা স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ মিয়া মরহুম (আমার লেখনি, রুচি ও ধারার সঙ্গে যার এত সম্পর্ক ছিল যে, তার অনূদিত আমার গ্রন্থগুলোকে আমারই রচনা বলা যেত) অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই দায়িত্বটি আঞ্জাম দিল এবং অতি অল্প সময়ে তরজমা সম্পন্ন করে ফেলল, যেটি 'মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম'-এর পক্ষ থেকে ১৯৬৯ সালে (১৩৮৯ হিজরি) প্রকাশিত হয়। এই উর্দু সংস্করণে 'বুরহান'-এর সম্পাদক মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবরাবাদি ও 'যিন্দেগী'র সম্পাদক মাওলানা সাইয়িদ আহমাদ আরুজ কাদেরী বেশ চমৎকার পর্যালোচনা লিখেছেন। তারপর অতি অল্প সময়ের মধ্যে এর ইংরেজি ও তুর্কি অনুবাদও প্রকাশিত হয়। Four Pillars Of Islam নামে ডক্টর মুহাম্মাদ আসিফ সাহেবের সাহিত্যপূর্ণ কলমে ও তুর্কি অনুবাদ কেনিয়ার 'নাশরিয়াতে ইসলামে'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে জামেয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ রিয়াদ-এর পক্ষ থেকেও এর তুর্কি অনুবাদ প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে।

কোনো-কোনো আলেমের কাছে এই গ্রন্থটিতে বড় ধরনের একটা অভাব ও শূন্যতা অনুভূত হয়েছে। তা হলো, আমলি চার রোকন (সালত, যাকাত, সাওম ও হজ্ব) -এর আগে ইসলামের মৌল বিশ্বাস আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাওহীদে বিশ্বাস, রিসালাতে বিশ্বাস ও আখেরাতে বিশ্বাস এই বিষয়গুলো নিয়ে কিছু লেখা হয়নি। অন্তত তাওহীদ নিয়ে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় থাকা দরকার ছিল।

১৯৭৪ সালে হজ্বের সময় রাবেতার মিনার অফিসে প্রথমবারের মতো জামেয়া আযহারের স্বনামধন্য ওস্তাদ শায়খ আবদুল হালীম মাহমুদ-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলো, যিনি ইতিমধ্যেই মিসরে বসে আমার 'আল-আরকানুল আরবা'আ' পড়ে ফেলেছেন। তিনি আমাকে প্রশ্ন তুললেন, আপনি আকায়েদের আলোচনাটি এই কিতাবে স্থান দিলেন না কেন? আমি বললাম, এই বিষয়টিতে আমার স্বতন্ত্রভাবে লেখার ইচ্ছা আছে। এর জন্য একটি অধ্যায় নয় – একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। তিনি বললেন, এই গ্রন্থটির রচনার কাজ সম্পন্ন হলে আমাকে জানাবেন। সেটি ইনশাআল্লাহ জামেয়া আযহার থেকে প্রকাশিত হবে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম।

ঘটনাও এটিই ছিল যে, আমার 'আল-উসূলুছ ছালাছা' নামে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র কিতাব লেখার পরিকল্পনা ছিল। তত্ত্ব-উপাত্ত সংগ্রহের কাজও শুরু করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি অনুভব করলাম, এটি অত সহজ হবে না। এর জন্য আমাকে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মদর্শিতা, সুগভীর অধ্যয়ন ও অনেক দুর্লভ উৎসের (ইহুদিবাদ, খ্রিস্টবাদ ও সনাতন ধর্মের) নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদি দেখার প্রয়োজন হবে, যার বেশিরভাগই ইংরেজিতে লেখা। আমার দৃষ্টিশক্তি ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত (যখন আমেরিকায় আল্লাহর মেহেরবানিতে সফল অপারেশন হয়েছিল) এর যোগ্য ছিল না যে, আমি সরাসরি অধ্যয়ন করব। যারা লেখালেখি ও গবেষণার কাজের সঙ্গে জড়িত, তারা জানেন, যতক্ষণ-না লেখক স্বয়ং সরাসরি অধ্যয়ন করতে সক্ষম হন, ততক্ষণ পর্যন্ত কাজের জিনিস প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। পরে যখন আমি অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম এবং অনুমিত হলো, এখন আর খুব তাড়াতাড়ি স্বতন্ত্র ও সুবিস্তৃত কোনো গ্রন্থ রচনার সুযোগ হাতে আসবে না, তখন আমি আহলে সুন্নাতের মৌল বিশ্বাসগুলোকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এবং এ বিষয়ের নির্ভরযোগ্য মুখপাত্রদের রচনাবলির সাহায্যে আমার রচিত গ্রন্থ 'আল-আকীদাহ ওয়াল ইবাদাহ ওয়াস সুলূক'-এ সন্নিবেশিত করে দিলাম, যেটি আরবিতে ১৯৮২ সালে এবং তার উর্দু তরজমা 'দসতুরে হায়াত' নামে 'মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম'-এর পক্ষ থেকে ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। প্রবাদ আছে, 'যার সবটুকুর নাগাল পাওয়া যায় না, তার সবটুকু পরিত্যাগও করা যায় না।' এখানে আমি তারই প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করেছি।

'নুযহাতুল খাওয়াতির' অষ্টম খণ্ড ও 'জান্নাতুল মাশরিক'

'নুযহাতুল খাওয়াতির' মোট সাত খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। অষ্টম খণ্ডটি এজন্য আটকে রাখা হয়েছিল যে, তাতে বেশ কটি জীবনালোচনা অসম্পূর্ণ ছিল। এই অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করার জন্যই এ-খণ্ডটি প্রেসে দেওয়া হয়নি। গ্রন্থটির রচনার সময় পর্যন্ত এ-খণ্ডে যেসব ব্যক্তিত্বের আলোচনা এসেছে, তাঁরা খ্যাতির যে-স্তরগুলো অতিক্রম করেছিলেন, তাঁদের জীবনের যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল এবং সে সময় পর্যন্ত তাঁরা যেসব রচনার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন, শুধু সেগুলোর আলোচনা এখানে স্থান পেয়েছিল। লেখকের ইচ্ছা ছিল, তাতে আবশ্যক পরিমাণ সংযোজন করে কাজটি সম্পন্ন করে ফেলবেন। কিন্তু ১৯২৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি হঠাৎ তাঁর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে গেল এবং এই খণ্ডটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। তা ছাড়া এই খণ্ডের যেসব ব্যক্তিত্ব লেখকের মৃত্যুর পরে মারা গেছেন, তাঁদের মৃত্যুতারিখ ও বিবরণ তাঁর কলমে এই গ্রন্থে স্থান পাওয়া সম্ভব ছিল না।

এই খণ্ডে ৫৫৯ ব্যক্তিত্বের জীবনচরিতের আলোচনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু লেখক যাঁদের আলোচনা জায়গা শূন্য রেখেছেন কিংবা অসমাপ্ত রেখেছেন বা যাঁদের মৃত্যু লেখকের মৃত্যুর পরে হয়েছে, তাঁদের সংখ্যা ৩৫০। তাঁদের বেশ কজন ব্যক্তিত্ব এমনও গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন, যাঁদের মেধা ও বিদ্যাগত উন্নতি কিংবা ইলমি ও আমলি সফর লেখকের যুগেই শুরু হয়েছিল এবং তাঁদের খ্যাতির মোরগ সবে পালক গজিয়েছিল। লেখক তাঁর মনের উদারতা, পাণ্ডিত্য ও দূরদর্শিতার বলে তাঁদেরও এই গ্রন্থে শামিল করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের আলোচনা পূর্ণাঙ্গ ছিল না, যা কেবল পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। যেমন– মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রহ.), মাওলানা সাইয়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.), মাওলানা সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভী (রহ.), হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানুভী (রহ.) মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরি (রহ.), মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শিরওয়ানি (রহ.), শায়খ খলীল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন ইয়ামানি (রহ.), মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহ.), মাওলানা সাইয়্যিদ তালহা হাসানি (রহ.), মাওলানা আবদুর রহমান মোবারকপুরি (রহ.) মাওলানা আবদুশ শাকুর ফারুকি কাকুরি (রহ.), ডক্টর হাকীম মৌলভী সাইয়্যিদ আবুদল

আলী সাহেব (রহ.), (লেখকের পুত্র) মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি (রহ.), মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ দেহলভী (রহ.) ও মাওলানা মুহাম্মাদ সুরতি (রহ.)।

ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুল মুঈদ খান আমাকে খুব করে ধরলেন, আমি যেন এই জীবনীগুলো সমাপ্ত করে গ্রন্থটিকে ছাপার উপযুক্ত বানিয়ে দেই। যেহেতু গ্রন্থটি বিপুলসংখ্যক সমকালীন ব্যক্তিত্বের জীবনচরিত ও এই চতুর্দশ হিজরির আলেখ্য নিয়ে রচিত, যেটি কিনা আমাদেরই শতাব্দি; তাই এর গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। পাঠকদের জন্য এর প্রতি বিশেষ একটি আকষর্ণও ছিল। কিন্তু বাহ্যিক বিচারে আমার পক্ষে এই কাজটি আঞ্জাম দেওয়া অসাধ্য সাধন বলে মনে হচ্ছিল। সপ্তম খণ্ডটি প্রকাশিত হওয়ার পর দশটি বছর কেটে গেছে। বোদ্ধা পাঠক ও গবেষক মহল অষ্টম খণ্ডটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন।

আরও একটি কারণে আমি এ-কাজে হাত দিতে সাহস করছিলাম না। তা হলো, আরবি গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনায় আমার বেশ অভিজ্ঞতা আছে। এ-যাবত এক ডজনেরও বেশি আরবি গ্রন্থ আমি রচনা করেছি এবং সেগুলো আরব বিশ্বে বেশ সমাদর লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তথাপি শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের কলমের সঙ্গে কলম মেলানো আমার কাছে একটি সুকঠিন কাজ বলে মনে হচ্ছিল। কারণ, তাঁর রচনাগুলোতে এমন সংক্ষিপ্তি, সাবলীলতা, মাধুর্য ও একজন সূক্ষ্মদর্শী লেখক ও সমালোচকের কর্তব্যানুভূতি ও ঐতিহাসিকসুলভ দায়িত্ববোধের উপস্থিতি পাওয়া যায় যে, তাঁর ধারায় দুটি লাইন লেখাও আমি কঠিন মনে করছিলাম। তাঁর রচনা অল্প কথায় অনেক পুরো ভাব ফুটিয়ে তোলার একটি নমুনা ছিল। ফলে এই জীবনীগুলো সমাপ্ত করার কাজে কয়েকটি লাইন লেখার তুলনায় বরং কারও পুরো জীবনী রচনা করা সহজ মনে করছিলাম।

কারণ, সেখানে কলম স্বাধীন থাকে। তারপর অস্পূর্ণ তথ্যাদি একত্রিত করা এবং মৃত্যুতারিখ সংগ্রহ করা সে ছিল আরেক দুরূহ কাজ। এদিকে নিজের শরীর-স্বাস্থ্যেরও অবস্থা এমন ছিল যে, সরাসরি অধ্যয়ন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ডক্টর আবদুল মুঈদ খান সাহেবের পীড়াপীড়ি ও এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটির সমাপ্তির প্রয়োজনীয়তা (যেটি ভারতবর্ষের ইসলামি যুগ থেকে শুরু

করে হিজরি চতুর্দশ শতাব্দি পর্যন্তকার বিশিষ্ট ইসলামি ব্যক্তিত্বগণের প্রামাণ্য জীবনচরিত জানার একমাত্র উপায় এবং যার দৃষ্টান্ত ভাষাগত ও ভৌগোলিক বিস্তৃতি পূর্ণাঙ্গতার ক্ষেত্রে অন্য কোনো দেশে পাওয়া যায় না)।[১]

এই গুরুদায়িত্বটি মাথায় তুলে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রথমে আমি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সেই ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ করেছি, যাদের মৃত্যুতারিখ জানা আমার আবশ্যক ছিল। এই বিষয়বস্তুটি সাইক্লোস্টাইল করে আমি বিভিন্ন আলেমের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এতে উপকার তেমন হয়নি। কখনও-কখনও আমার কোনো-কোনো বন্ধুকে এভাবে কষ্ট দিলাম যে, আপনি আপনার এলাকার কবরস্তানগুলোতে গিয়ে নেমপ্লেট পড়ে মৃত্যুতারিখটা নোট করে নিন। হায়দারাবাদের কোনো-কোনো বন্ধু এই কষ্টটা বরণ করে নিলেন এবং কবরস্তান থেকে কিংবা মরহুমের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের কাগজপত্র থেকে মৃত্যুতারিখ সংগ্রহ করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।[২]

---

১. তুরস্ক থেকে নিয়ে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সমস্ত ইসলামি দেশের জীবনীমূলক গ্রন্থাদি হয় কোনো শতাব্দির সঙ্গে কিংবা কোনো অঞ্চল বা শ্রেণী-পেশার মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু 'নুযহাতুল খাওয়াতির'-এর জন্য উপমহাদেশের গর্ব করা উচিত যে, এই গ্রন্থটি একদিকে প্রথম শতাব্দি থেকে শুরু করে লেখকের যুগ পর্যন্ত আবার অপর দিকে খায়বারগিরি থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের সর্বশেষ পূর্ব সীমানা পূর্ব পর্যন্ত সকল ইসলামি ব্যক্তিত্বের আলোচনা স্থান দিয়েছে। তৃতীয়ত এই গ্রন্থটি বিদ্বান ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিটি শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

২. এ-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো একটি ঘটনা আছে, যার দ্বারা অনুমিত হয়, এ-কাজে আল্লাহপাকের সাহায্য ছিল। যে-কজন ব্যক্তির মৃত্যুতারিখ পাওয়া যাচ্ছিল না, তাঁদের একজন হলেন 'তুহ্ফাতুল হিন্দ-এর নিষ্ঠাবান লেখক মাওলানা উবায়দুল্লাহ পায়েলি। কোথাও থেকে আমি তাঁর মৃত্যুতারিখ সংগ্রহ করতে পারলাম না। সে সময় হঠাৎ একদিন আমার রায়বেরেলির পাঠকক্ষে একজন লোক এসে হাজির হলো। আমি লোকটাকে গভীর চোখে দেখে বুঝতে পারলাম, ইনি তো জম্মুর মৌলভী আবদুর রহমান সাহেব এমপি। তিনি কথায়-কথায় হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, আজকাল কী লিখছেন? আমি বললাম, 'নুযহাতুল খাওয়াতির'-এর অষ্টম খণ্ডটি সমাপ্ত করছি। তারপর বললাম, কিছু-কিছু মৃত্যুতারিখ চেষ্টা করার পরও জানা সম্ভব হয়নি। তিনি বললেন, যেমন? আমি বললাম, মাওলানা উবাইদুল্লাহ সাহেব পটিয়ালভীর 'তুহ্ফাতুল হিন্দ'পড়ে অনেক মানুষ মুসলমান হয়েছিল, যাদের একজন হলেন মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী। এই উবাইদুল্লাহ পটিয়ালভীর মৃত্যুতারিখ আমার সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তিনি বললেন, আজিব ব্যাপার! এই সফরেই তো আমি 'শাহ্নামে

এবার আমি আল্লাহর নাম নিয়ে কাজ শুরু করলাম। কোনো ব্যক্তিত্বের মর্যাদাগত অবস্থান ও গুণাবলি লেখার জন্য লেখক যে-জায়গাগুলো খালি রেখে দিয়েছেন, সেগুলো আমাকে বারবার দেখতে হয়েছে এজন্য যে, পাছে আবার উপস্থাপনা ও বর্ণনায় বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ির ঘটনা ঘটে গেল কিনা। লেখক যদি নিজে লিখতেন, তা হলে এখানে কোন শব্দটি ব্যবহার করতেন, কোথায় গিয়ে তিনি সীমানা টানতেন এ বিষয়গুলো আমাকে লক্ষ রাখতে হয়েছে। আমি লক্ষ রাখতাম, আমার শব্দমালার ব্যারোমিটার গ্রন্থটির সাধারণ শব্দমালার ব্যারোমিটার থেকে কমে বা বেড়ে যায় কিনা এবং আসল ও বৃদ্ধির টেম্পারেচারে কোনো হেরফের তৈরি হয়ে গেল কিনা। আমার ভাষা ও বর্ণনায় আমাকে বারবার কাটাছেঁড়া করতে হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে আমি লেখকেরই বর্ণনাধারা ও মাপকাঠি থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি, যেটি রপ্ত করতে কিতাবটি আমাকে বারবার অধ্যয়ন করতে হয়েছে। একপর্যায়ে এই পরিশিষ্টটি তৈরি হয়ে গেল। আমি এই পরিশিষ্ট ও আমার রচনাকে আদবের স্বার্থে বন্ধনির মাঝে স্থান দিয়েছি, যাতে এগুলোর দায়দায়িত্ব আমারই থাকে। আমি গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি ডক্টর সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। পরে ১৯৭০ সালে সেটি ছাপার অক্ষরে বাজারে এল। এভাবে গ্রন্থটি পরিপূর্ণতা লাভ করল।

হিন্দ' (মুরাদাবাদ)-এর একটি পুরাতন ফাইল বিক্রি হতে দেখলাম। কিন্তু আমার সেই ফাইলটির কোনো প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও সেটি ক্রয় করে নিলাম। তারই একস্থানে তাঁর মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণ ও তারিখ লেখা আছে। এটি এমন একব্যক্তির লেখা, মৃত্যুর সময় যিনি মাওলানাকে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছিলেন। সেই ফাইলটি দিয়ে তিনি আমাকে কৃতার্থ করেছেন। আমি তাঁর মৃত্যুতারিখ ও মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণ আমার এই গন্থে সন্নিবেশিত করে নিলাম। (মাওলানা উবাইদুল্লাহ পায়েলি ৮/৩০২, ৩০৩ দ্রষ্টব্য)। ফাইলটির কোনো প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও সেটি ক্রয় করে নিলাম। তারই একস্থানে তাঁর মৃত্যুর তারই একস্থানে তাঁর মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণ ও তারিখ লেখা আছে। এটি এমন একব্যক্তির লেখা, মৃত্যুর সময় যিনি মাওলানাকে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছিলেন। সেই ফাইলটি দিয়ে তিনি আমাকে কৃতার্থ করেছেন। আমি তাঁর মৃত্যুতারিখ ও মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণ আমার এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে নিলাম। (মাওলানা উবাইদুল্লাহ পায়েলি ৮/৩০২, ৩০৩ দ্রষ্টব্য)।

আমার এক ফুফা ছিলেন মাওলানা সাইয়িদ তালহা সাহেব হাসানি এম.এ । করাচিতে থাকতেন । (যিনি আরবি ভাষার একজন সাহিত্যিক ও ভালো একজন গ্রন্থসমালোচক ছিলেন এবং লেখকের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ও তাঁর লেখনির ধারা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন ।) তিনি গ্রন্থটি পড়ে স্বীকৃতি দিলেন, গ্রন্থটি পূর্ণতাদানকারী তার জোড়াতালির কাজে অনেকখানিই সফল হয়েছেন ।

গ্রন্থটির শেষ খণ্ডে – যার রচনার কাজ সম্ভবত লেখকের শেষ জীবন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল – ভারতবর্ষের অনেক আলেম ও ব্যক্তিত্বের আলোচনা বাদ পড়েছে । তার কারণ, হয়ত তাঁরা লেখকের জীবদ্দশায় অতটা খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি যে, এই গ্রন্থে স্থান পেতে পারেন । কিংবা হয়ত তাদেরও গ্রন্থটিতে স্থান দেওয়ার ইচ্ছা লেখকের ছিল; কিন্তু মৃত্যু তাঁকে সেই সুযোগ দেয়নি । আমার কোনো-কোনো বন্ধু-সুহৃদের দাবি ছিল, এই অষ্টম খণ্ডেই পরিশিষ্ট হিসেবে তাঁদেরও অন্তর্ভুক্ত করে নিন । কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম, এঁদেরও তালিকা অনেক দীর্ঘ । এমনিতেই এই খণ্ডটি ছাপার সময় ৫৫৭ পৃষ্ঠা হয়ে গেছে । তা ছাড়া এঁদের নিয়ে লিখতে গেলে আবার আমাকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে, যার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন । তদুপরি আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বলতা, নানা কাজ ও সফরের আধিক্য আমাকে এই পরিকল্পনা থেকে বিরত রাখল । এই কাজটি এখনও বাকি আছে । আল্লাহই জানেন এর জন্য কার কখন তাওফীক হয় ।

'আল-আরকানুল আরবা'আ' থেকে অবসর গ্রহণের পর আমার মনে ভাবনা জাগল, জীবনের তো আর কোনো ভরসা নেই । আব্বাজান (রহ.)-এর গৌরবময় রচনা 'জান্নাতুল মাশরিক ওয়া মাত্লাউন নূরিল মাশরিক' ছাপার ব্যবস্থা করা দরকার । এই গ্রন্থটি ভারতবর্ষের মুসলিম শাসনামলের এক দিকে একটি ঐতিহাসিক ডাইরেক্টরি ও ভারতবর্ষের ইসলামি যুগের বিস্তারিত পর্যালোচনা । এখানে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান, উৎপাদন, শাসক মুসলিম পরিবারগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সেকালের ব্যবস্থাপনা-শৃঙ্খলা, রাষ্ট্রের বিভক্তি, বিচারপদ্ধতি, ডাকব্যবস্থা, সেবামূলক কাজ, সড়ক, বাগান, হাসপাতাল, কর আদায়ের পদ্ধতি, নির্মাণসংক্রান্ত কীর্তি, মুদ্রা, আবিস্কার, রাজকোষ, সামরিক শক্তির পর্যালোচনা ও যুদ্ধরীতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে । বললে বেশি বলা হবে না যে, এই গ্রহন্থটিতে

হাজার-হাজার পৃষ্ঠা ও বছরের-পর-বছর পরিশ্রমের নির্যাস এসে পড়েছে। গ্রন্থটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির আকারে রাখা ছিল। স্থানে-স্থানে উঁইপোকা বেশ ক্ষতি করে ফেলেছিল। কোথাও একটি শব্দ খেয়ে ফেলেছে। কোথাওবা একটি বাক্য, যাকে পুনরুদ্ধার করে পাণ্ডুলিপিটি পূর্ণাঙ্গ করতে অনেক সাধনার প্রয়োজন। এই গ্রন্থটি যেসব দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে, তার বিবরণ এর আরবি ও উর্দু সংস্করণের ভূমিকায় বর্ণনা করা হয়েছে।[১]

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির খালি জায়গাগুলো পূরণ করা পাহাড় কেটে দুধের নহর বের করে আনার নামান্তর ছিল। এদিকে আমার অবস্থা ছিল, চোখে সূক্ষ্ম লেখা একটি পৃষ্ঠাও পড়া কঠিন ছিল। আমার বেশ মনে আছে, কাজটি শেষ করার পর গ্রন্থটির ভূমিকা লেখাচ্ছিলাম। লিখতে চাচ্ছিলাম, বিভিন্ন যুগে মুসলমানরা সেসব দেশে, যেখানকার তারা অধিবাসী ছিল কিংবা যেখানে ইসলামের দাওয়াত ও মানবতার সেবার তাদের নিয়ে গিয়েছিল, ওখানে তারা কী-কী সেবা করেছিল, নিজেদের মেধা ও শ্রম দ্বারা তারা কীভাবে কাজ করেছে, সেই হারানো ইতিহাসকে লেখক কীভাবে সংকলিত ও সংরক্ষিত করেছেন এবং কীভাবে সেগুলোকে অন্ধকার থেকে বের করে ইতিহাস ও জ্ঞানের আলোতে নিয়ে এসেছেন। আর এভাবে তিনি সত্যিকার দেশপ্রেমের প্রমাণ দিয়েছেন।

কিন্তু বিষয়বস্তু আয়ত্তে আসছিল না। আমার বুঝে আসছিল না, এই উপাখ্যান আমি কোথা থেকে শুরু করব। কিন্তু হঠাৎ বিষয়বস্তুটি মাথায় এসে পড়ল। সবে আমি কয়েকটি লাইন লেখালাম। স্নেহাস্পদ মৌলভী নাযরুল হাফীয নদভী লিখছিল। এমন সময় আমার চোখে ব্যথা শুরু হয়ে গেল – এমন ব্যথা যে, আমি চোখে ঔষধ দিয়ে শুয়ে পড়তে বাধ্য হলাম। আমি লেখানো বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু মস্তিষ্ক কাজ বন্ধ করেনি। মাথায় ভূমিকাটির বিষয়বস্তু পাক খাচ্ছিল এবং জিদ ধরছিল যে, আমাকে এখনই কাগজের হাতে অর্পণ করো। কিন্তু এতক্ষণে লেখানো সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এখন আমাকে পরবর্তী দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সেই ব্যথার কথা আমার এখনও মনে আছে যে, আমার মাথাটা পিষে ফেলছিল। তার মূল্য আমার স্নায়ুগুলোর পরিশোধ করতে হয়েছিল। আমি সবুজ ক্ষেতে গিয়ে পায়চারি

১. দেখুন– 'হিন্দুস্তান ইসলামী আহ্দ মেঁ'

করে মস্তিষ্কে প্রশান্তি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলাম এবং কোনোমতে দিনটা কাটিয়ে দিলাম। রাতও অতিবাহিত হলো। পরদিন লেখাটা শেষ করলাম।[১]

এটি একজন হিন্দুস্তানি আলেমের এমন একটি গ্রন্থ, যার নজির ভারতবর্ষের কোনো ভাষায় (ইংরেজি, উর্দু, হিন্দী কিংবা অন্য কোনো আঞ্চলিক ভাষা) পাওয়া যায় না। আর ভারতবর্ষের বাইরেও এই ধারা ও এই মানের গ্রন্থ একমাত্র আল্লামা মুক্‌রিযীর গ্রন্থ 'খুতাতে মিস্‌র'।[২]

কিন্তু গ্রন্থটি ছাপানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আমি ১৯৫১ সালে মিসর গেলাম। তখন গ্রন্থটির আরবি কপি সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম এবং ডক্টর আহমাদ আমীন সাহেবকে এই আশায় দেখালাম যে, তিনি হয়ত তাঁর প্রতিষ্ঠান 'লাজ্‌নাতু তালীফ ওয়াত তারজামা ওয়ান নাশ্‌র' থেকে প্রকাশ করবেন। তিনি আগে সেই অংশটি সংযোজন করার ফরমায়েশ করলেন, যেটি ভারত বিভক্তির পর আবশ্যক হয়ে পড়েছিল।

আমি পাণ্ডুলিপিটি সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। ভারত বিভক্তির পরের পরিবর্তনের কিছু অংশ আমার ভাই অত্যন্ত চমৎকারভাবে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। প্রদেশগুলোর নতুন বণ্টন, নতুন আদমশুমারি, আঞ্চলিক ভাষাসংক্রান্ত নানা তথ্য ও মুসলমানদের আবাদির হার ইত্যাদি বিষয়গুলো তাঁর কলমে লিখে দিয়েছেন। চক্ষু ও জ্ঞানহীন উঁই গ্রন্থটির যেসব শব্দ ও বাক্য চেটে খেয়ে যে-শূন্যতা তৈরি করেছিল, ভাইজান অনেক পরিশ্রম করে সেগুলো পূরণ করে দিয়েছেন। কিন্তু তথাপি আরও কিছু কাজ সম্পূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়ে গিয়েছিল।

এ-সময়ে এই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির ওপর পুনরায় উঁইপোকার আক্রমণ হলো এবং পুনরায় তাতে মেহনত করার প্রয়োজন দেখা দিল। আমি ভাইজানের কাছে শুনেছি, এই গ্রন্থটির জন্য আব্বাজানের এতই গর্ব ছিল যে, সে-পরিমাণ গর্ব একজন লেখকের সেই গ্রন্থের জন্য হয়ে থাকে, যার পেছনে তিনি সবচেয়ে বেশি শ্রম দেন। একটি ভাবনা থেকে-থেকে আমাকে অস্থির

---

১. এই বিষয়বস্তুটি 'আল-হিন্‌দু ফিল আহ্‌দিল ইসলামী'র ১ নং পৃষ্ঠা থেকে শুরু হয়ে ২৩ নং পৃষ্ঠায় শেষ হয়েছে।

২. লেখকের পুরো নাম আল্লামা তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবনে আবদুল কাদের। মৃত্যু ৮৪৫ হিজরি। কিতাবটির পুরো নাম 'কিতাবুল মাওয়ায়িযি ওয়াল ই'তিবার ফী যিকরিল খুতাতি ওয়াল আছার'। কিতাবটি বড় দুটি ভলিউমে সমাপ্ত এবং মিসর থেকে প্রকাশিত।

করে তুলত এবং মনের ওপর খটকা জাগাত যে, একজন লেখাপড়া জানা সন্তানের জন্য এ বড়ই ব্যর্থতা যে, সে তার খ্যাতিমান সুযোগ্য পিতার এ-কর্মটি সম্পন্ন করবে না এবং তাকে জনসম্মুখে উপস্থাপনের সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালাবে না। সত্যিকার জযবা ও কর্তব্যের অনুভূতি অনেক সময় স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যগত নানা প্রতিবন্ধকতার ওপর বিজয়ী হয়েছে। কাজের লোকেরা ইকবালের এই পঙ্ক্তিটির ওপর আমল করেছে–

اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل
لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے

'এটা ভালো যে, বিবেকের প্রহরী সব সময় হৃদয়ের সঙ্গে থাকবে। তবে মাঝে-মধ্যে তাকে একাকিও ছেড়ে দিতে হয়।'

খালি জায়গাগুলো পূরণ করা এবং পোকায়খাওয়া শব্দ-বাক্যগুলোর পূর্ণতার জন্য মাঝে-মধ্যে আমাদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে এবং বিভিন্ন অফিসের রেকর্ডের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। বন্ধুরা একাজে আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।[১]

সেকালেই আমার সুপ্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ পাশা শিরালি মরহুম আমাকে তার ভটকলের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। স্নেহাস্পদ নযরুল হাফীযও আমার সঙ্গে ছিল। আমি তার বাড়িতে বসে – যেটি শহর থেকে বিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল শিরালিতে অবস্থিত – একাজেই ব্যস্ত থাকলাম। আলহামদুলিল্লাহ্ কিছুদিন পরই কাজটি পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

এবার তার ছাপার চিন্তা মাথায় এল। সেকালে ভারতবর্ষে এমন কোনো প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বা একাডেমি ছিল না, যে ভারতেবর্ষের এই ইল্‌মি কীর্তিটি, যা কোনো একাডেমি নয় – একজন ব্যক্তি আঞ্জাম দিয়েছেন – প্রকাশ করে ভারতবর্ষের নাম উঁচু ও একজন ভারতীয় নাগরিকের কীর্তি ফুটিয়ে তুলত।

১. যেমন– হায়দারাবাদের খাল-নদী সম্পর্কে সেখানকার বন্ধু মৌলভী আবদুল কাদের সাহেব ও স্নেহাস্পদ সাইয়িদ গোলাম মুহাম্মাদ ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ আমাকে সাহায্য করেছেন। আরও যারা সাহায্য করেছেন, তারা হলেন হুসাইন সাগের, মীর আলম সাগের ও উদা সাগের প্রমুখ। কোনো-কোনো জায়গায় আসেফিয়া সরকারের আমীরগণের উপাধিগুলো উঁইপোকা খেয়ে ফেলেছিল। সেগুলোও আমরা ওখানকার ঐতিহাসিক কাগজপত্রে সাহায্যে পুনরুদ্ধার করেছি।

তখন 'দায়েরাতুল মা'আরিফ আল-উছমানিয়া'র কথা আমার মনে পড়ল, সে সময় যার ব্যবস্থাপক ও সেক্রেটারি ছিলেন মুহাম্মাদ আবদুল মুঈদ খান সাহেব, যিনি স্বয়ং একজন গবেষক ও বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এর আগে তিনি এই লেখকেরই জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'নুয্হাতুল খাওয়াতির'-এর শেষ খণ্ডটি প্রকাশ করেছেন এবং তারই পীড়াপীড়িতে সেই খণ্ডটির কাজ আমি দ্রুত সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি।

ঘটনাক্রমে সে সময়ই রায়পুরের একটি সীরাত মাহফিলে অংশগ্রহণের জন্য আমি আমন্ত্রণ পেলাম। চোখের ব্যথা সত্ত্বেও আমি এই লোভে আমন্ত্রণ কবুল করে নিলাম যে, হায়দারাবাদে ডক্টর সাহেবকে পেয়ে যাব। সেখানে আমি তার সঙ্গে গ্রন্থটির ছাপার ব্যাপারে আলোচনা করব। স্নেহের ভাই হাসান আসকারি তারেক এই সফরে আমার সঙ্গী হয়ে গেল। আমি ডক্টর সাহেবকে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি দেখালাম এবং এ-ব্যাপারে তার সহযোগিতা কামনা করলাম। তিনি গ্রন্থটি খুব পছন্দ করলেন এবং বললেন, আইনগত কার্যক্রমে অনেক সময় লেগে যাবে। ভারত সরকারের কাছে অনুমোদনের আবেদন জানাতে হবে এবং একে আগামী বছরের প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। কিন্তু আমি এর জন্য একটি সাব কমিটি গঠন করে দিচ্ছি, যার একজন সদস্য আপনি নিজেও থাকবেন। আর আমি কাজ শুরু করে দিচ্ছি। মহান আল্লাহ ডক্টর সাহেবকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

তিনি এই পরামর্শও দিলেন যে, আপনি গ্রন্থটির একটি নাম ঠিক করে দিন। নামটি এমন দিতে হবে, যার মাধ্যমে এর ভেতরকার বিষয়বস্তু পরিস্কারভাবে ফুটে ওঠে। আমি নানাজনের সঙ্গে পরামর্শ করে الهند في العهد الاسلامي (ইসলামি যুগে ভারত) নাম ঠিক করলাম। তারপর ডক্টর সাহেবের প্রচেষ্টায় ১৯৭২ সালে (১৩৯২ হিজরি) গ্রন্থটি বেরিয়ে গেল। পৃষ্টা হলো ৪২৯। তারপর অতি দ্রুত তার উর্দু তরজমাও শুরু হয়ে গেল। 'মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম'-এর সদস্য মৌলভী শাম্‌স তাবরিজ খানের অনূদিত সংস্করণটি 'হিন্দুস্তান ইসলামী আহ্‌দ মেঁ' নামে প্রকাশিত হলো। এই তরজমায় গ্রন্থটির সেই অংশটি বাদ দেওয়া হলো, যেটি সাধারণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন– ভৌগোলিক পরিভাষাগুলোর বিশ্লেষণ ও শাসক পরিবারগুলোর বিবরণ ইত্যাদি। কিছুদিন পর আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু সাইয়্যিদ মুহিউদ্দীন সাহেব Munlim Ruleinding ইংরেজিতে এর অনুবাদ করে দিলেন।

নিষ্ঠাবানদের সঙ্গে আল্লাহ্‌পাকের আচরণ

এই আলোচনা শেষ করার আগে পাঠকদের শিক্ষালাভের নিমিত্ত আরও একটি ঐতিহাসিক তথ্য আমি লিপিবদ্ধ করছি। আমি বারবারই প্রত্যক্ষ করেছি, নিষ্ঠাবানের শ্রম কখনও ব্যর্থ যায় না। মুখলিসের তরী বারবার পাকে পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও একসময় কূলে এসে ভিড়ে। তীরে দাঁড়ানো দর্শনার্থীরা দেখতে পায়, লোকটা এই বুঝি ডুবে গেল! কিন্তু তারপরও সে কূলের নাগাল পেয়ে যায়। আর অনিষ্ঠের তরী কূলে ভিড়তে-ভিড়তেও ডুবে যায়। আমি বারবারই দেখেছি, একব্যক্তির খ্যাতির সূর্য বেলা দ্বি-প্রহরে এসে পৌঁছেছে। গোটা জগত তার গুণ গাইছে। কিন্তু পরে তারই জীবদ্দশায় বা তার জীবন চলে যাওয়ার পর তার পতন শুরু হয়ে যায়। এমন একজন সমালোচক জন্মে যান যে, যেন তার সমালোচনার (পোস্টমর্টেম) জন্যই তিনি জন্মলাভ করেছেন। আচমকা তার খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতার মোহ ভেঙে খানখান হয়ে যায়।

বিপরীতে একজন লোক ঘরের কোণে বসে কাজ করতে থাকেন। তাঁর জীবদ্দশায় এই কাজের কোনো প্রচার পায় না। কেউ তাঁকে চিনতে পারে না। কিন্তু পরে হঠাৎই এমন একটি আয়োজন এসে পড়ে যে, তাঁর ঝরানো এক-এক ফোঁটা ঘাম তার জন্য আবেহায়াতে পরিণত হয়ে যায়। তাঁর কলমের আঁচড়ের সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য কুদরতের পক্ষ থেকে এমন ব্যবস্থা হয়ে যায় যে, ভেবে কূল পাওয়া যায় না।

আব্বাজানের ব্যাপারটাও এ-রকমই ছিল যে,[১] হঠাৎই একদিন তাঁর মৃত্যু এসে পড়ল। তখন ঘরে পুরুষ বলতে অল্পবয়সের একটি বালক (আমি) ছাড়া আর কেউ ছিল না, যার কাছে তিনি কিছু বলে যাবেন যে, তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলো কোথায়, কোনটিতে আর কী কাজের প্রয়োজন ইত্যাদি। তাঁর জীবদ্দশায় উর্দুতে লেখা অল্পকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।[২] তাঁর রচনার সবগুলো গ্রন্থ পাণ্ডুলিপির আকারে তাঁর পাঠকক্ষে রাখা ছিল। তাঁর বড় ছেলে মানে আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই ডক্টর সাইয়িদ আবদুল আলী সাহেব হাজার-দেড় হাজার মাইল দূরে মাদ্রাজে ছিলেন। কিন্তু তারপরও আল্লাহ্‌পাক তাঁর

---

১. বিস্তারিত জানতে 'হায়াতে আবদুল হাই' দেখুন।

২. সেগুলোর নাম হলো 'ইয়াদে আয়্যাম' (তারীখে গুজরাট) 'তা'লীমুল ইসলাম' 'নূরুল ঈমান' ও 'তাবীবুল আয়েলা'। 'গুলে রা'নাও তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে।

আরবি কিতাবগুলো ছাপানোর জন্য[১] যে-গায়েবি ব্যবস্থা করে দিলেন, তা বিস্ময়করও, আবার শিক্ষামূলকও।

আস-সুরাউ বাইনাল ফিক্‌রাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল ফিক্‌রাতিল গারবিয়্যা (ইসলাম ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব)

এ-সময়েই আমার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা – যাকে 'মাযা খাসিরাল আলামু বি-ইন্‌হিতিতাতিল মুসলিমীন'-এর পরিপূরক মনে করা উচিত – 'আস-সুরাউ বাইনাল ফিক্‌রাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল ফিক্‌রাতিল গারবিয়্যা' সংশোধনী ও সংযুক্তির সঙ্গে (১৯৬৮ সালে দারুল কলম কুয়েত থেকে) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির প্রথম এডিশন ১৯৬৫ সালে দারুল ফিক্‌র বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

লেখক এই গ্রন্থে মুসলিম দেশগুলোতে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিবরণ, এই দ্বন্দ্বের ফলাফল ও এই যুদ্ধে মুসলিম দেশগুলোর কর্মনীতি ও অবস্থান নিয়ে বিস্তারিত পরিসংখ্যান নিয়েছেন, যেটি কিনা খোদ তাঁরই ভাষায় মুসলিম দেশগুলোর সবচেয়ে বড় ও প্রকৃত সমস্যা ছিল। পশ্চিমা সভ্যতার ব্যাপারে এই দেশগুলো কী-কী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করছে, আপন সমাজকে বর্তমান জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল বানাতে এবং সময়ের চাহিদাগুলো মোকাবেলায় কী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং তাতে তারা কতটুকু দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিচ্ছে এখানে তিনি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি বিশ্বমানচিত্রে এই মুসলিম জাতিগুলোর অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই দেশগুলোতে ইসলামের ভবিষ্যত কী তার বিবরণ দিয়েছেন।

লেখকের মতে এটি একটি প্রকৃত ও চূড়ান্ত লড়াই, যেটি বর্তমানে সবগুলো ইসলামি দেশে – যারা কিনা পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত –

---

১. তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সবগুলো আরবি কিতাব আলহামদুলিল্লাহ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো নাম হলো, 'নুযহাতুল খাওয়াতির' (১-৮) দায়েরাতুল মা'আরিফ হায়দারাবাদ প্রকাশিত। 'আছ-ছাকাফাতুল ইসলামিয়্যা ফিল হিন্‌দ' আল-মাজ্‌মাউল ইল্‌মী আল-আরাবী প্রকাশিত। 'আল-হিন্‌দু ফিল আহ্‌দিল ইসলামী' দায়েরাতুল মা'আরিফ প্রকাশিত। 'তাহযীবুল আখলাক'। কতগুলো হাদীছের একটি সংকলন। আল-মাকতাবুল ইসলামী প্রকাশিত।

পুরোপুরি জোশ ও উত্তাপের সঙ্গে চালু আছে এবং এই যুদ্ধ এখন ভরযৌবনে অবস্থান করছে। এটি ছাড়া অন্য যে-যুদ্ধগুলোর চিত্র অঙ্কনে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করা হচ্ছে, সেগুলো হয়ত আনুসঙ্গিক, নতুবা সেগুলোর অবস্থান দ্বিতীয় পর্যায়ে। এই যুদ্ধই একসময় সরকার ও জনতার মাঝে সংঘাতের রূপ নেয়। আর তখন একদিকে থাকে তাদের ভাষায় আধুনিকতাপ্রিয় ও 'উন্নয়নকামী' সরকার, যারা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারার অনুসারী এবং একনিষ্ঠভাবেই তাদের প্রতিনিধি ও ধ্বজাধারী, আর অপরদিকে থাকে সরলমনা জনসাধারণ, ইসলামের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক এখনও নিঃশেষ হয়নি এবং যাদের মাঝে কুরআন ও ঈমানের ভাষা, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান ও ইশ্‌কে রাসূলের আলোচনা ব্যতীত আর কোনো ভাষা, উত্তেজনার আর কোনো পন্থা-পদ্ধতি, কোনো জোশ-জযবা সৃষ্টি করতে পারে না।

তাদের বেশিরভাগ মুসলিম সরকার বৈদেশিক শত্রুর পরিবর্তে স্বয়ং আপন দেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। এই জনসাধারণকে তারা তাদের ক্ষমতার ও কাল্পনিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক মনে করে। এই সরকারগুলো তাদের সবটুকু উপকরণ ও শক্তি এই ঈমানি চেতনাকে অবদমিত করার এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী এই ধ্বংসাবশেষগুলো (যারা কিনা তাদের মনে শুধু অকেজোই নয় – বরং দেশের শোভা-সৌন্দর্য ও উন্নতির পথে 'আবর্জনা'র মর্যাদা রাখে) অপসারিত করার কাজেই ব্যয়িত হচ্ছে। ফলে এই হতভাগ্য দেশগুলো একটা অপ্রয়োজনীয় গৃহযুদ্ধ, শক্তি ও সময়ের অপচয়, পারস্পরিক অনাস্থা ও একটা ভীতিকর পরিবেশ দ্বারা জর্জরিত।[১]

লেখক এ-ক্ষেত্রে এক-একটি দেশের চিন্তাধারা ও তাতে এই যুদ্ধের গন্তব্যগুলোর পরিসংখ্যান নিয়েছেন এবং বলেছেন বিষয়গুলো এখন কোন পর্যন্ত গড়িয়েছে। তার মনে পাশ্চাত্যের ব্যাপারে – যেটি সময়ের আসল চ্যালেঞ্জ এবং ইসলামি বিশ্বের জন্য একটি প্রশ্নবোধক – মুসলিম দেশগুলোর

---

১. কালে-ভদ্রে এর বিপরীত চিত্রও দৃষ্টিগোচর হয়। আর তা হলো, যেসব দেশে ইসলামপন্থী নেতৃত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটে কিংবা সরকার যদি ইসলামি আইন বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়, তা হলে ওখানকার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীটা (যারা পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত) সবার আগে এর বিরোধিতায় মাঠে নামে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগকে ব্যর্থ বানাবার চেষ্টা চালায়। এটিও আমাদের সেই দাবিরই প্রমাণ যে, পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামি চিন্তাধারা ও ইসলামি আদর্শ-চরিত্র অবলম্বনে প্রস্তুত নয় এবং এই ধারা ইসলামের পথে একটা বাধা।

তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে। ১. নিরেট নেতিবাচক। (মানে যেন পাশ্চাত্য থেকে গ্রহণ করার মতো কিছুই নেই এবং তাদের উন্নতি থেকে একদম বিমুখ ও সম্পর্কহীন থাকা।)[১]

২. নিরেট ইতিবাচক। (মানে পশ্চিমা সভ্যতাকে পুরোপুরি গ্রহণ করে নেওয়া এবং তাকে নিজের দেশে হুবহু বাস্তবায়ন করা।[২]

৩. পশ্চিমা সভ্যতার ব্যাপারে একটি স্বতন্ত্র ও গবেষণামূলক আচরণ, পাশ্চাত্য থেকে উপকৃত হওয়ার সঠিক ক্ষেত্র নির্বাচন ও তার সীমানা নির্ধারণ করে নেওয়া।

লেখকের মতে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটি অগ্রহণযোগ্য ও ব্যর্থ। যারা শুরুতে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি অবলম্বন করেছিল, তারা পরে খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে এসে পশ্চিমা সভ্যতাকে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি কোনো ইসলামি দেশ ও জাতিগোষ্ঠীর জন্য মর্যাদাপরিপন্থী, অসঙ্গত, ইসলামি শিক্ষামালা ও সভ্যতার সঙ্গে বিদ্রোহের সমার্থক এবং আত্মহত্যার শামিল। তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি – যার জন্য বুদ্ধিমত্তা, ইচ্ছাশক্তি ও সঠিক নেতৃত্বের প্রয়োজন এবং একজন পরিপূর্ণ নেতা কাম্য – একটি ইসলামি রাষ্ট্রের শোভা বাড়ায়, বর্তমানে এরই মাঝে ইসলামি বিশ্বের সুরক্ষা, নতুন যুগের নেতৃত্ব ও মুসলমানদের শক্তির রহস্য লুকায়িত। এই গ্রন্থটিতে লেখক পশ্চিমা সভ্যতার বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার কারণ ও তার প্রতিকারও বর্ণনা করেছেন।

লেখকের গ্রন্থগুলোর মাঝে এই গ্রন্থটি সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এটি মুসলিম বিশ্বের মেধাবী শ্রেণীর জন্য চিন্তার আহ্বান ও অধ্যয়নের বিষয়। আরবি, উর্দু ও ইংরেজি এই তিন ভাষায় এটি প্রকাশিত হয়েছে। উর্দু নাম 'মুসলিম মামালেক মে ইসলামিয়াত ও মাগরিবিয়াত কী কাশমকাশ' আর ইংরেজি নাম 'Western Civilsation Islam & Muslims ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন ডক্টর মুহাম্মাদ আসিফ সাহেব।[৩]

---

১. সৌদি আরব, আফগানিস্তান ও ইয়েমেন কিছু দিন এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করেছিল। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এত দ্রুততার সঙ্গে তাকে বরণ করে নিয়েছে যে, আগেকার সম্পর্কহীনতারও প্রতিকার করে নিয়েছে।

২. এর জন্য তুরস্ককে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা যায়।

৩. সম্প্রতি মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ও তাদের নেতৃত্বে পরিবর্তনের সুবাদে বর্তমান পরিস্থিতির পরিসংখ্যান নিয়ে গ্রন্থটিতে নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। একাজে

আত-তারীকু ইলাল মাদীনাহ্ (কারওয়ানে মদীনা)

আরব দেশগুলোতে বারবার ভ্রমণ, দীর্ঘ অবস্থান, সেখান থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা পড়ে এবং আরবদের সঙ্গে উঠাবসা করে আমি তীব্রভাবে অনুভব করলাম, আরব দেশগুলোর শিক্ষিত শ্রেণীটির সেই মহান সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল ও দুর্বল হয়ে হতে চলছে, যিনি তাদের সব ধরনের সৌভাগ্যের উৎস এবং যাঁর উসিলায় তারা দ্বীন ও দুনিয়ার সম্পদ ও সম্মানের অধিকারী হয়েছে। আর যেখানে কিছুটা সম্পর্ক আছে, সেখানেও বিষয়টি বেশিরভাগ আইন ও প্রথার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, যার মাঝে প্রেমের উন্মাদনা, জীবনের প্রাণবন্ততা নেই। আরব জাতীয়তাবাদের আন্দোলন তাদের আরও বেশি ক্ষতি করেছে। আর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জাগতিক দর্শনগুলোর লুটেরা বাহিনী অনারব ছেড়ে এখন খোদ আরবে এবং দূর-দূরান্তের মুসলিম দেশগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে হেরেমের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। আক্ষেপের বিষয় হলো, বর্তমান সাহিত্যিকদের মাঝে এমন কোনো মানুষ নেই, যিনি আরবি ছন্দে সেই চেতনাটিকে সেভাবে জাগিয়ে তুলবেন, যেভাবে জাগিয়ে তুলেছিলেন কাসীদায়ে বুরদার রচয়িতা বুসিরি,[১] ও আবদুর রহীম আল-বারয়ী[২] তাঁদের জীবন্ত কবিতার মাধ্যমে। এই প্রয়োজনটি পূরণ করা এবং নবীপ্রেমের সেই অঙ্গারটিকে জ্বালিয়ে তোলার জন্য, যেটি এখনও আরবদের ছাইয়ের মাঝে বিদ্যমান আছে, আমার মনে পরিকল্পনা এল, নবীপ্রেমে উজ্জীবিত এমন একদল কলমসৈনিক তৈরি করা দরকার, যারা আরবের তরুণসমাজ, লেখক ও চিন্তাশীলদের হৃদয়গুলোকে গরম করে তুলবে এবং একজন অনারবের নবীপ্রেমের আলোচনায় তাদের আত্মমর্যাদা জেগে উঠবে। লেখক ইকবালের ভাষায় বলতে পারবে—

আমাকে আমার তিন সুপ্রিয় সহকর্মী মুহাম্মাদ মিয়া মরহুম ও মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে' ও মৌলভী মুহাম্মাদ ওয়াজেহ্ সক্রিয়ভাব সহযোগিতা করেছেন।

১. পুরো নাম মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ ইবনে হাম্মাদ বুসিরি মিসরের অধিবাসী ছিলেন। ৬৯৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার রচিত কাসীদায়ে বুরদা সেই গ্রহণযোগ্যতা ও খ্যাতি অর্জন করেছে, যেমনটি নবীজির প্রশংসামূলক কোনো কাসীদা কমই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

২. পুরো নাম আবদুর রহীম ইবনে আহমাদ ইবনে আলী আল-বারয়ী। ইয়েমেনের বারা' নামক অঞ্চলে বাস করতেন। ৮০৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেছেন। নবীজির প্রশংসায় রচিত তাঁর পঙ্‌ক্তিমালার সংকলন অনেক সমাদৃত হয়ে আছে।

سپاہ تازہ بر انگیزم از ولایت عشق
کہ در حرم خطرے از بغاوت خرد است

'হেরেমের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র একটি বিদ্রোহের আশঙ্কায় প্রেমের রাজ্য থেকে তাজাদম সৈনিকরা ক্ষেপে উঠেছে।'

আর আরব পাঠকরা কুরআনের ভাষায় বলতে পারবে—

بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا

'আমাদের পাত্র আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

আমি যখন আমার সীরাতবিষয়ক নিবন্ধ ও ভাষণগুলো দেখলাম, যেগুলো খোদ আরবি ভাষায় সীরাতের নানা দিক, নবীজির ব্যক্তিসত্তা, তাঁর মর্যাদা ও তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্ব হওয়া ও তাঁর দান-অবদানের ওপর আরব দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উপস্থাপন করেছিলাম; তদুপরি কয়েকটি উর্দু নিবন্ধ ও ভাষণ, যেগুলো অনায়াসে আরবিতে ভাষান্তরিত করা যায়, তখন অনুমিত হলো, এগুলোকে একত্রিত করে সহজেই 'আরমুগানে হেজায' প্রস্তুত ও পেশ করা যায়। এই সংকলনটির খুবসম্ভব সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী নিবন্ধ হলো 'উফূদুল উম্মাতি বাইনা ইয়াদাই নাবিয়্যিহা' (উম্মতের নানা প্রতিনিধিদল নবীজির সকাশে)। এই নিবন্ধটি মূলত সৌদি রেডিও থেকে সম্প্রচারের জন্য জিদ্দায় বসে লেখা হয়েছিল। পরে এর উর্দু অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল এবং রেডিও থেকে একাধিকবার প্রচারিত হয়েছিল।

সংকলনটি প্রস্তুত হয়ে গেলে আমি শায়খ আলী তানতাভীকে (যাঁকে আমি আরবির সবচেয়ে শক্তিশালী কথাশিল্পী ও প্রভাবশালী সাহিত্যক মনে করি) ফরমায়েশ করলাম, এই বিষয়টির ওপর আপনি একটি ভূমিকা লিখে দিন। তিনি প্রথমে কিছুটা দ্বিধা করলেও পরে এমন একটি ভূমিকা লিখলেন, যেটি গ্রন্থটির শক্তি ও মূল্য বাড়িয়ে তুলেছে। গ্রন্থটি পড়ে তিনি এমনও পর্যন্ত লিখেছেন—

'নিজের ব্যাপারে আমার আস্থা টলমল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভাই আবুল হাসান! যখন আমি আপনার গ্রন্থ "আত-তারীকু ইলাল মাদীনা" পড়লাম, তখন আমি অনুভব করলাম, আমার মাঝে রুচিবোধ পুনরায় জাগ্রত হতে শুরু করেছে এবং আমার বুকে এখন আবার সেই পূর্বেকার উত্তাপ বিরাজ করছে। অনুরূপভাবে আমি নিশ্চিন্ত হলাম, আমার হৃদয় নবীপ্রেমের প্রতিভা থেকে

একেবারে শূন্য হয়ে যায়নি। কিন্তু কালের নানা চিন্তা ও সময় সেই প্রতিভাটিকে মলিন করে দিয়েছিল। আপনার গ্রন্থটি সেই মলিনতাকে পরিষ্কার করে দিল।'

তিনি আরও লিখেছেন–

'(আরবি) সাহিত্যের দিক থেকেও আমার আস্থা উঠে যেতে শুরু করেছিল। কারণ, (আরব) সাহিত্যিকদের মাঝে দীর্ঘদিন যাবত সেই আসমানি সুর কানে বাজছিল না, যার লয় শরীফ রজীর[১] সময় থেকে শুরু করে আবদুর রহীম বারয়ী পর্যন্ত কবিরা আবৃত্তি করতেন। আমি যখন আপনার গ্রন্থটি পড়লাম, তখন সেই হারানো সুর আবার পেয়ে গেলাম। এই সুর আমি এমন একটি গদ্যে পেলাম, যেটি মূলত কবিতা – ছন্দবিহীন কাব্যচর্চা। আবুল হাসান ভাই! আমি আপনার হাজারো শুকরিয়া আদায় করি যে, আমার মাঝে আপনি আপনার ব্যক্তিসত্তা ও আপনার সাহিত্যের ওপর আস্থা বহাল করে দিয়েছেন।'

এই সংকলনটি 'আত-তারীকু ইলাল মাদীনা' নামে ১৯৬৫ সালের শেষের দিকে কিংবা ১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে স্বয়ং মদীনা তায়্যেবার মাকতাবায়ে ইল্‌মিয়্যাহ থেকে – যার স্বত্বাধিকারী একজন বুখারি আলেম শায়খ মুহাম্মাদ আন-নামনিকানি – প্রকাশিত হয়েছে। পরে দারুল কলম দামেশক ও বৈরুত থেকে এর একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বরাবরের মতো এই গ্রন্থটিরও আরবি নিবন্ধগুলোর উর্দু অনুবাদ বেশিরভাগ আমার স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ মিয়া করেছে। আর যেসব নিবন্ধ ও বক্তব্য মূলতই উর্দু ছিল, সেগুলো হুবহু সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।[২]

লেখক এই গ্রন্থটিকে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় গ্রন্থগুলোর মাঝে গণ্য করেন এবং একে নিজের জন্য শাফায়াতের উসিলা মনে করেন। মিসরের একটি রেডিও ও একটি টিভি চ্যানেলের এক আলোচনা অনুষ্ঠানে – যেটি মদীনা তায়্যেবার

---

১. আব্বাসি যুগের একজন খ্যাতিমান হাশেমি কবি, যাকে অনেক রুচিশীল ও বিজ্ঞজন শীর্ষস্থানীয় আরব কবিদের মাঝে গণ্য করেন। নবীজির প্রশংসায় রচিত তাঁর কাব্যসংকলন "আল-হিজাযিয়াত" নামে পরিচিত।

২. উর্দু সংস্করণটি 'কারওয়ানে মদীনা' নামে বাজারে এসেছে। সম্প্রতি PATHWAY TO MEDINA নামে তার ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। ডক্টর মুহাম্মাদ আসিফ কুদওয়ায়ি তাঁর সাহিত্যপূর্ণ কলমে অনুবাদের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। প্রকাশ করেছে মজলিসে তাহকীকাতে নশরিয়াতে ইসলাম।

এমন একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখান থেকে সবুজ গম্বুজ দেখা যাচ্ছিল – আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, আপনার রচনাগুলোর মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় রচনা কোনটি? তখন উত্তরে আমি বলেছিলাম 'আত-তারীকু ইলাল মাদীনা'।

'নাহ্উত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যা আল-হুররাহ্' (ইসলামি দেশগুলোর জন্য স্বাধীন ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা)

মুসলিম বিশ্ব, বিশেষ করে আরব দেশগুলোতে ইসলামি শিক্ষার বিষয়টি ১৯৫০, ৫১ সাল থেকে (যখন আমার প্রথম নিবন্ধ 'কাইফা তুওয়াজ্জাহু আল-মা'আরিফু ফিল বিলাদিল ইসলামিয়্যাহ' হেজাযের একমাত্র পত্রিকা 'আল-বিলাদুস সুউদিয়্যা'য় প্রকাশিত হয়েছিল, যার আলোচনা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এসেছে) আমার একটি বিষয় ও আন্তরিকতার ময়দান হিসেবে স্বীকৃত। শুরু থেকেই আমি এই ফলাফলে উপনীত হয়েছিলাম যে, ইসলামি দেশগুলোর, বিশেষ করে আরব দেশগুলোর বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্বাসের দোদোল্যমানতা, মানসিক অস্থিরতা, চারিত্রিক অধঃপতন ও ইসলামের নেতৃত্বসুলভ যোগ্যতার ব্যাপারে অনাস্থা ও তার ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশা সেই শিক্ষাব্যবস্থারই ফলাফল বা দান, যেটি পাশ্চাত্য থেকে কোনো প্রকার মৌলিক পরিবর্তন ও গবেষণামূলক চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে আমদানি করা হয়েছে। শুরু থেকেই আমার বুঝ ছিল, শিক্ষাব্যবস্থা এমন একটি পোশাক, যাকে এই জাতি ও প্রজন্মের আকার-গঠন, সাইজ, তার অতীত-বর্তমান ও আবহাওয়া অনুপাতে তৈরি হওয়া উচিত, যার মাঝে এই জাতি-প্রজন্ম জন্মলাভ করেছে এবং তারই মাঝে তাকে বাঁচতে ও মরতে হবে। তা ছাড়া এক্ষেত্রে তার শুধু আকারের প্রতি লক্ষ্য রাখাই যথেষ্ট নয় – মূল্যের প্রতি নজর রাখাও জরুরি। শুধু তা-ই নয় – মিল্লাতে ইসলামিয়ার মূল্য (ওজন ও উপকারিতা) তার আকারের (সংখ্যা ও রাজনৈতিক অবস্থান) চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষ্যণীয়।

এই শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানকে অতীতের সঙ্গে, তারপর এদুটিকে ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তোলার কার্যকর ও স্থায়ী উপায়। আর তার লক্ষ্য সেই বিশ্বাস ও বাস্তবতার ওপর সেই প্রজন্মের বিশ্বাস ও সম্পর্ককে শুধু সুদৃঢ় করাই নয়, বরং তাদের জন্য ইল্‌মি ভিত্তি ও প্রমাণাদি সরবরাহ করা, তাদের

সৎকর্মপরায়ণ ও শ্রেষ্ঠতর প্রমাণিত করা, যেগুলো দ্বারা এই জাতিটির ভিত রচিত হয়েছে এবং তাকে তাদের পতাকাবাহী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যে-শিক্ষাব্যবস্থা এই লক্ষ্যটিকে না শুধু পূর্ণতা দান করে, বরং তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে (তার চেয়েও বেশি সঙ্গিন পরিস্থিতি হলো, সেসবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে) এমন শিক্ষাব্যবস্থা এই জাতি ও প্রজন্মের সবচেয়ে বড় শত্রু, তার প্রিয় সম্পদের লুটেরা ও জীবনসংহারী হলাহল।

এই বিষয়টির ওপর বিভিন্ন সময়ে আমি লিখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে নিজের মতামত প্রকাশ করতে থাকি। আমার মতে ইসলামি দেশগুলোতে রাজনৈতিক ও সামরিক বিপ্লবগুলো, সরকার ও জনগণের মধ্যকার স্নায়ু লড়াই ও পারস্পরিক অনাস্থার সবচেয়ে বড় কারণটি হলো, মিল্লাতের বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি ও চাহিদা এক আর দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থা আরেক। ব্যাপার কেবল এটুকুই নয় যে, এই সরকারগুলোর বাইরে থেকে আমদানিকৃত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের বিশ্বাস-চেতনার কোনো সম্পর্ক নেই; বরং এই শিক্ষাব্যবস্থা তাদের মূল উপড়ে ফেলতে চায় এবং পরে তার ধ্বংসাবশেষের ওপর একটি নতুন ইমারত নির্মাণ করে চায়। এভাবে মুসলিম দেশগুলোর অবয়ব সেই বাহনের মতো হয়ে গেছে, যার সঙ্গে পরস্পরবিরোধী দুই দিকে ঘোড়া বা ইঞ্জিন জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

আমার এই চিন্তাধারা আমি আমার সেই ভাষণটিতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ও জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছি, যেটি সৌদি শিক্ষামন্ত্রী শায়খ হাসান আবদুল্লাহর আমন্ত্রণে ১৩৮৮ হিজরির ২২ শা'বান (১৩ নভেম্বর ১৯৬৮) রিয়াদ ইউনিভার্সিটির সুপরিসর হলে প্রদান করেছিলাম। এই ভাষণে আমি পশ্চিমা শিক্ষাবিদদের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত করেছি, শিক্ষাব্যবস্থা সেই তৈরী পোশাক বা পণ্যের মতো নয়, যেগুলো চাইলেই কোনো একটি দেশ থেকে আমদানি করা যায়। আর কোনো জাতি যখন এই রীতি অবলম্বন করে, সেই জাতি তার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও আপন জাতিগত বৈশিষ্ট থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় কিংবা কঠিন মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে।

তারপর আমি আরবদের অনুভূতি ও পরিবেশ-পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বললাম, আপনারাই দেখুন; ইসরাইলে ধর্মীয় শিক্ষা ও নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সুরক্ষায় কতটা গুরুত্ব আছে এবং এব্যাপারে তারা কতখানি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও অনুভূতিশীল। আমি 'ইসরাইলে উচ্চশিক্ষা' শিরোনামের

একটি নিবন্ধ থেকে (যেটি একটি গবেষণামূলক কমিটির রিপোর্টে এসেছিল) কিছু অংশ পাঠ করে শোনালাম যে, ইসরাইলে উচ্চশিক্ষার সবচেয়ে বড় লক্ষ্যটি হলো ইহুদি বোধ-বিশ্বাসে খোরাক পৌঁছানো, তার প্রতিপালন, বেড়ে ওঠা ও উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালানো এবং নতুন প্রজন্মকে আজীবন তার অনুগত থাকতে শেখানো।

তারপর আমি প্রমাণ করেছি, অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও উচ্চতর শিক্ষা কখনোই রোগের প্রতিকার নয়। এগুলো উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষগুলোকে কখনও নৈতিক অধঃপতন ও প্রবৃত্তিপূঁজা থেকে এবং উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত জাতিগুলোকে জাতিপূঁজা, প্রজন্মপূঁজা ও বিশ্বযুদ্ধগুলো থেকে বিরত রাখতে পারে না। অবশেষে আমি স্পষ্ট ভাষায় বলেছি, মনে রাখতে হবে, জাযিরাতুল আরবের এই ভূখণ্ড, এই সভ্যতা-সংস্কৃতি, এই উন্নতি ও এখানকার সরকারগুলো হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দান ও তাঁর ঋণ। এই ভূখণ্ডের ওপর আজীবনের জন্য ইসলামের মালিকানা ও নেতৃত্বের অধিকার আছে এবং এটি তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থসহ তার হেরেম ও দুর্গ। কাজেই এখানে কাউকে বাইরে থেকে আমদানিকৃত দর্শনের প্রচার-প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া যায় না। না কাউকে তার সেই ভিত্তিগুলোর গায়ে কুড়াল চালানোর অনুমতি দেওয়া যায়, যেগুলো মহান সাহাবা, ইসলামের দাঈ ও মুজাহিদগণ নির্মাণ করেছিলেন। যে-বুদ্ধিজীবি, চিন্তাবিদ ও লেখক এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত হবেন না, তাদের এই ভূখণ্ড থেকে বিদায় জানাতে হবে। নিজেদের মতাদর্শ ও চিন্তাধারার প্রচারের জন্য পুরোটা জগত পড়ে আছে। তারা অন্য কোথাও গিয়ে কাজ করুক। এখানে তাদের এই ধ্বংসাত্মক ও বিশৃঙ্খলামূলক কাজের অনুমতি দেওয়া যায় না।

ইকবালের ভাষায়–

نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا
محمد عربی سے عالم عربی

'সীমানা আর পরিধি দ্বারা তার অস্তিত্ব নয়। আরব বিশ্ব অস্তিত্ব পেয়েছে মুহাম্মাদে আরাবির কল্যাণে।'

এই ভাষণের সময় ইউনিভার্সিটির সভাকক্ষ লোকে লোকারণ্য ছিল। হলের ভেতরটা কানায়-কানায় পরিপূর্ণ হয়ে বাইরেও অনেক মানুষ ছিটকে

পড়েছিল। স্বয়ং মহামান্য শিক্ষামন্ত্রী, ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, প্রফেসর, শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এত বেশি সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন যে, সাধারণত এমন সমাগম খুব কম সময়ই হয়ে থাকে। এমনটি শ্রদ্ধেয় শায়খ হাসান আবদুল্লাহ তাঁর একটি নিবন্ধে – যেটি 'রিয়াদে পাঁচ দিন'[১] শিরোনামে একটি সৌদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল – এই বলে আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, এই প্রোগ্রামটি অস্বাভাবিক রকম সফল হয়েছিল।

এ বিষয়ের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ছিল সেটি, যেটি আমি কুয়েতে অনুষ্ঠেয় আরব দেশগুলোর শিক্ষামন্ত্রীদের একটি কমিটির জন্য লিখেছিলাম, যেটি কুয়েতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। একবন্ধু আমাকে ফরমায়েশ করলেন, আপনি আপনার চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতা লিখে পাঠিয়ে দিন।

তৃতীয় নিবন্ধটি ছিল, যেটি আমি নদওয়াতুল ওলামার অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৫-এর শিক্ষাবিষয়ক বৈঠকে পাঠ করেছিলাম। এই নিবন্ধে আমি মুসলিম বিশ্ব ও আরব দেশগুলোর অনিঃশেষ মানসিক দ্বন্দ্ব, সরকার ও জনসাধারণের পারস্পরিক বিরোধ, সামরিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের এই ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম যে, এই দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিম জাতিসত্তা ও ইসলামি ফিতরাতের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণই নয় শুধু; বরং সংঘাতমূলকও বটে। আর তারই ফলে না এই জাতিগুলো দ্বারা পুরোপুরি উপকৃত হওয়া সম্ভব হচ্ছে, না দেশগুলোর সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে স্থিরতা তৈরি হচ্ছে।[২]

এই নিবন্ধগুলোর সংকলন 'নাহউত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যা আল-হুররা ফিল হুকুমাতি ওয়াল বিলাদিল ইসলামিয়্যা' নামে বৈরুত ও কায়রো থেকে

---

১. রিয়াদে আমি পাঁচ দিন অবস্থান করি। আর এই সম্মেলনে প্রতিদিন প্রায় দুটি করে বক্তৃতা হতো। প্রতিটি ভাষণে বিপুলসংখ্যক শ্রোতার সমাগম হতো। রিয়াদের ট্রেনিং কলেজের ভাষণটিও আমার এই সময়ে প্রদত্ত।

২. পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা সিলেবাসকে হুবহু প্রাচ্য ও বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে চালু করা এর চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত আমি একজন পশ্চিমা শিক্ষাবিদের একটি বইয়ে পড়েছি। যার সারাংশ হলো, গাছের উপর বসে এক বানর দেখল, একটা মাছ প্রবল ঢেউয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলছে। তাতে মাছটার জন্য বানরের খুব দয়া হলো। সে গাছের উপর থেকে নেমে মাছটাকে ধরে নদী থেকে ডাঙায় তুলে আনল। তারপর ফলাফল যা হওয়ার তা-ই হলো। পানির প্রাণী ডাঙায় এসে কিছুক্ষণ প্রাণটাই হারিয়ে ফেলল। আমার এই পুরো নিবন্ধটি 'ইসলামি দেশগুলোতে শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব' শিরোনামে রোয়েদাদে চেমন-এর ১৭২-১৮৭ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে।

প্রকাশিত হয়েছে এবং তার একাধিক সংস্করণ বের হয়েছে। এই মুহূর্তে আমার সম্মুখে ১৯৭৬ সালে ছাপা তৃতীয় সংস্করণের একটি কপি আছে, যেটি আল-মুখতারুল ইসলামী কায়রো প্রকাশ করেছে।

হায়াতে আবদুল হাই (রহ.)

১৯৬৬ সালে সিতাপুর হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বেশিরভাগ রচনা আমি আরবিতেই লিখতে থাকি। (মানে লেখাতে থাকি)। এই সময়টিতে আমার সেই রচনাগুলো সুবিন্যস্ত ও পরিপূর্ণ হয়ে গেল, যেগুলোর আলোচনা উপরে চলে এসেছে। ৪-৫ বছরের এই সময়ে একটি উর্দু গ্রন্থ লেখা হয়েছে মাত্র। আর তা হলো 'হায়াতে আবদুল হাই'। তার ভূমিকায় গ্রন্থটির রচনার পেক্ষাপট, লক্ষ্য ও উপকারিতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। সেখানে আমি একথাও লিখেছি, একজন কম যোগ্যতাসম্পন্ন; অথচ অনেকগুলো গ্রন্থের রচয়িতা সন্তানের পক্ষে তার সুযোগ্য ও সুপরিচিত পিতার জীবনী রচনা করা বিদ্যাচর্চা ও লেখালেখির ইতিহাসে নতুন কোনো কাজ নয় এবং ইতিহাস ও লেখালেখির আইনে অভিনবও নয়। বিশেষ করে এই পদক্ষেপ যদি সেই ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে হয়, যিনি সমকালের একজন মহান ঐতিহাসিক ও জীবনীকার এবং হাজার-হাজার মানুষের জীবনী ও যোগ্যতার প্রচার ও সংরক্ষণের বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন।

আমি এটাই ভালো মনে করলাম যে, এই গ্রন্থটি এমন একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হোক, যার সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই এবং তার পরিচালনায় আমার কোনো হাত নেই, যাতে কেউ এই অপবাদ আরোপ করার সুযোগ না পায় যে, আমি প্রতিষ্ঠানটিকে নিজস্ব লোকের প্রচার-প্রসারের কাজে ব্যবহার করেছি। জানেনই তো, এ যুগে কারও বদনাম ছড়াতে মানুষের বাধে না। যুগটাই এখন কুধারণা পোষণ করার।

এ সময়ে ঘটনাচক্রে গুজরাটে শ্রদ্ধেয় মাওলানা আতীকুর রহমান সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। দুজন একসঙ্গে থাকলাম। আমি বিষয়টি তার সামনে উপস্থাপন করলাম। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে নদওয়াতুল মুসান্নিফীন দিল্লির পক্ষ থেকে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন এবং এই সুযোগ পেয়ে তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন। আমি গ্রন্থটি তাঁর হাতে তুলে দিলাম। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে নদওয়াতুল মুসান্নিফীন-এর পক্ষ থেকে বইটি প্রকাশিত হয়ে গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও দুর্ঘটনা

একটি গুরুতর দুর্ঘটনা ও তার থেকে আমার অল্পের জন্য রক্ষা পাওয়া

আমি রাবেতার সভায় অংশগ্রহণের জন্য – যেটি ১৩৮৭ হিজরির শাবান মাসে (নভেম্বর ১৯৬৭) অনুষ্ঠিত হয়েছিল – গিয়েছিলাম। স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ মিয়া মরহুম প্রথমবারের মতো আমার সঙ্গে গিয়েছিল। আমরা সভার কয়েকদিন আগেই অক্টোবরে পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং মক্কা মুকাররমার শুবরা হোটেলে অবস্থানরত ছিলাম। ওখানে আমার পুরনো বন্ধু বিখ্যাত ইরাকি মুজাহিদ ও দাঈ শায়খ মুহাম্মাদ মাহমূদ সাওয়াফ – যিনি সৌদি শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাও বটে – আমাকে বললেন, শিক্ষামন্ত্রী শায়খ হাসান আবদুল্লাহ আপনার সঙ্গে গায়েবানা সম্পর্ক রাখেন এবং আপনার গ্রন্থাদি ও 'আল-বা'ছুল ইসলামী' অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেন। বর্তমানে তিনি তায়েফে আছেন। রাবেতার সভা এখনও শুরু হয়নি। ভালো হবে, আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন।

১৩ রজব মোতাবেক অক্টোবর ১৯৬৭ আমরা দুজন তার সঙ্গে রাবেতারই গাড়িতে করে তায়েফ গেলাম এবং শিক্ষামন্ত্রী শায়খ হাসান আবদুল্লাহর সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করলাম। এখানে আমাদের চমৎকার একটি বৈঠক হলো। তিনি অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় তাঁর সম্পর্ক ও আন্তরিকতার কথা প্রকাশ করলেন এবং 'আল-বা'ছুল ইসলামী'র প্রসংশা করলেন।

এই সাক্ষাতপর্ব শেষ করে আমরা অবস্থানস্থলে ফিরে এলাম। দুপুরের খাবার আমরা শায়খ মুহাম্মাদ মাহমূদ আস-সাওয়াফ-এর পরিচিত ইরাকি বন্ধুদের সঙ্গে খেলাম। আসরের সময় আমরা তায়েফ থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

গাড়িতে আমি ও মুহাম্মাদ মিয়া ছাড়া আর কেউ ছিল না। আমরা ইহরাম বেঁধে রওনা হয়েছিলাম। বিন লাদেনের মসজিদে নামায পড়লাম এবং ওমরার নিয়ত করলাম। আমাদেরকে আসর ও মাগরিবের মধ্যখানে পথ চলতে হয়েছিল।

আমরা তায়েফের সীমানা অতিক্রম করলাম। আরাফার সীমানা এখনও শুরু হয়নি। এ-সময়ে আমি অনুভব করলাম, গাড়ি খাদে পড়ে যাচ্ছে। (তায়েফ ও মক্কার মধ্যখানে রাস্তার কিনারায় কয়েক জায়গায় গভীর খাদ আছে) আমার মনে হচ্ছিল, আমরা মৃত্যু-উপত্যকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং বড় কোনো পাথর যদি পথে গাড়িটা আটকে না দেয়, তা হলে মৃত্যু অবধারিত। আমার মনে হচ্ছিল, গাড়িটা ডিগবাজি খাচ্ছে। একজায়গায় গাড়িটা হঠাৎ থেমে গেল। মুহাম্মাদ মিয়া বলল, চাচাজান, এক্ষুনি নেমে যান। আমি তাকিয়ে দেখলাম, ও গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমাকেও নেমে যেতে আহ্বান জানাচ্ছে। তার ধারণা ছিল, গাড়ি পুনরায় স্টার্ট হয়ে যাবে আর আমরা বেরুতে পারব না। আমি জানালা দিয়ে বেরুতে উদ্যত হলে চালক – যে কিনা সিটের তলে পড়ে ছিল – আমাকে উদ্দেশ করে বলল, শায়খ, আপনি কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ আমি জীবিত আছি।

আমি জানালা দিয়ে বেরিয়ে দেখতে পেলাম, গাড়িটা একদম উল্টা পড়ে আছে। ছাদটা নিচে আর চাকাগুলো উপরে। আমি আলহামদুলিল্লাহ অযুসহকারে ছিলাম এবং হাতে তাসবিহ ছিল। না আমার ইহরাম খুলেছিল, না তাসবিহটি হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল। বিস্মিত হলাম, গাড়িটা উল্টে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা সিট থেকে পড়লাম না কীভাবে এবং কী করে জানালা দিয়ে বের হতে পারলাম! সবগুলো ঘটনা একটা নাটকীয় ধারায় ঘটে গেল। যেন আমরা একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমাদের দেখে অন্যান্য গাড়িগুলো থেমে যেত আর আমাদের জিজ্ঞেস করত, তোমরা কি জীবিত আছ?

কাছেই পুলিশের একটা চৌকি ছিল। আমরা ওখানে চলে গেলাম। তায়েফেরই অযুতে মাগরিবের নামায আদায় করলাম এবং সেখান থেকে রাবেতার অফিসে টেলিফোন করলাম, আরেকটা গাড়ি পাঠিয়ে দিন। গাড়ি এসে পৌছানোর পর সেই গাড়িতে করে আমরা মক্কা এলাম। প্রথমে পুলিশের চৌকিতে রিপোর্ট লেখালাম, দুর্ঘটনায় চালকের কোনো ভুল ছিল

না। (যাতে তিনি আইনের কাছে ধরা না খান) আমার মনে হয়, গাড়ি চালাবার সময় চালকের চোখে তন্দ্রা এসে পড়েছিল। আরবের চালকরা সাধারণত রাতে ঘুমায় না। চা পান করে-করে ঘুমের ভাব দূর করে নেয়। সম্ভবত এই চালক সময়মতো চা পান করতে পারেনি।

যাহোক, মহান আল্লাহ এই দুর্ঘটনায় আমাদের অল্পের জন্য রক্ষা করলেন। আল্লাহ আমাদের বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখলেন।

মক্কা পৌঁছে জানতে পারলাম, মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নু'মানী এই অল্প আগে এসে পৌঁছেছেন (সে সময় তিনি রাবেতার সদস্য হয়ে গিয়েছিলেন) এবং পাশের কক্ষে অবস্থান করছেন। জানালা দিয়ে বের হওয়ার সময় আমি পাজরে সামান্য আঘাত পেয়েছিলাম, যার জন্য আমার হাঁটতে কষ্ট হতো। মাওলানার সঙ্গে সাক্ষাত হলে আমি বললাম, বড় একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে, আপনি হারাম শরীফে আমাদের জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করতেন। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেছেন। রাতেই শ্রদ্ধেয় ডাক্তার ওয়াহীদুযযামান হায়দারাবাদি আমাকে আয-যাহির হাসপাতালে নিয়ে গেলেন, যেখানে তিনি কাজ করতেন এবং আমাকে চেকআপ করালেন ও এক্সরে করালেন। জানা গেল, চিন্তার কোনো কারণ নেই। বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়নি এবং ভেতরে ভাঙচুরের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

মক্কার যেসব বন্ধু-বুযুর্গ এই ঘটনার কথা শুনেছেন, সবাই আমাকে দেখতে এসেছেন। তাদের মাঝে একজন ছিলেন মুফতী সাইয়িদ আমীন আল-হুসাইনি। তিনি ঘটনার বিস্তারিত শুনে বললেন, আপনি তো হযরত ইউনুস (আ.)-এর মতো মাছের উদর থেকে সহি-সালামত বেরিয়ে এসেছেন। যারা আমাদের গাড়িটার ওই অবস্থা দেখেছে, সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়েছে, এর যাত্রীরা বেঁচে থাকল কীভাবে! হযরত শায়খুল হাদীস বন্ধুদের এই ঘটনার সংবাদ দিলেন এবং দু'আর আবেদন জানালেন। 'দাওয়াত' পত্রিকায়ও এই ঘটনার রিপোর্ট ছাপা হলো। হেজাজ থেকে ফিরে আসার পরও বহুদিন যাবত শরীরের এই অংশে আমি আঘাতের ক্রিয়া অনুভব করছিলাম। শিফাউল মুল্ক হাকীম খাজা শামসুদ্দীন সাহেব[১] আমাকে কিছু ইরানি হালুয়া খেতে

---

১. শিফাউল মুল্ক হাকীম খাজা শামসুদ্দীন লাখনৌর একজন বিখ্যাত চিকিৎসক, স্বনামধন্য আলেমে দ্বীন, লাখনৌর ভাষা ও সভ্যতার প্রতীক, আরবি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষার পণ্ডিত ব্যক্তি ও ঐতিহ্যবাহী শাসকপরিবারের সদস্য ছিলেন। তাঁর পিতা খাজা

দিলেন। হযরত শাহ মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেবও মালিশের জন্য তেল পাঠালেন। কিছুদিনের মধ্যে এই ব্যথাটা কমে যেতে লাগল। আলহামদুলিল্লাহ মুহাম্মাদ মিয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ রইলেন। তার শরীরের কোথাও কোনো চোট লাগেনি।

আম্মাজান (রহ.)-এর মৃত্যু

১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে আমার জীবনের সেই ঘটনাটি ঘটে গেল, যেটি আরও পরে ঘটবার কথা ছিল।

কবির ভাষায়–

بہ گیتی گر کسے پاینده بودے
ابوالقاسم محمد زنده بودے

'জীবনের এই খেলাঘরে কেউ যদি আজীবন বেঁচে থাকত, তাহলে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করতেন না।'

আম্মাজানের বয়স ৯৩ বছর ছাড়িয়ে যাচ্ছিল এবং যেকোনো মুহূর্তে হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক ও যুক্তির অনুকূল ছিল। কিন্তু ভালবাসা আর সম্পর্ক যুক্তি-দর্শনের ধার ধারে না। যখনই সংঘটিত হোক-না কেন, সন্তানের জন্য এটি হৃদয়-আত্মাকে কাঁপিয়ে তুলবার মতো মর্মান্তিক ঘটনা। সন্তান যে-বয়সেরই হোক, মাথার ওপর থেকে পিতামাতার ছায়া উঠে যাওয়া তার কাছে এমন মনে হয়, যেন সে একটা অল্পবয়স্ক বালক এবং এই মৃত্যুতে তার জীবনে এতিমির দাগ পড়ে গেছে।

১৯৬৮ সালের ২৩ আগস্ট আম্মাজান রোগের সামান্য একটা আক্রমণের ধকল সামলে উঠেছিলেন। আমি নিবেদন জানালাম, আমাকে দিল্লি ও ভুপালের একটি সফরে যাওয়া দরকার। কিন্তু সবার আগে তো আপনার সন্তুষ্টি প্রয়োজন। আমি যেতে পারব না বলেও দিল্লিতে পত্র লিখে দিয়েছিলাম। কিন্তু আম্মাজানের স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে আবার সফর বহাল

কুতুবুদ্দীন আহমাদ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত 'নামী প্রেস' লাখনৌর একটি নামকরা ছাপাখানা। হাকীম সাহেব আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন।

করার চিন্তা করলাম। তাঁর জন্য এটি অনেক বড় সাধনা ছিল। কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ্ তোমাকে যে-কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তুমি সে-কাজের জন্য চলে যাও। কিন্তু আসবে কবে নাগাদ?' আমি বললাম, আগামি শুক্রবার যদি নাও আসতে পারি, শনিবার আর মিস হবে না। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে; যাও। রওনার সময় তিনি আমাকে যথারীতি বিদায় জানালেন এবং কুরআনের আয়াত ও দু'আয়ে মাছুরা পড়ে আমাকে দু'আ দিলেন।

২৮ আগস্ট সকালে ভুপালে স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ ছানী মরহুমের তার পেলাম, 'নানীজানের স্বাস্থ্য ভালো নয়; আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসুন।' আমি যে-অস্থিরতার মধ্য দিয়ে ওখান থেকে ফিরে এলাম, আল্লাহ্ যেন সেই অস্থিরতা আর কখনও না দেখান। সবচেয়ে বড় বাসনাটি ছিল, আম্মাজান জীবিত থাকতে-থাকতে যেন আমি বাড়ি ফিরতে পারি। ভাইজানের জানাযা-দাফনে অংশ নিতে না-পারার দাগ জীবনভর বহাল থাকবে। আল্লাহ্র মেহেরবানিতে আমি ২৯ আগস্ট বুধবার সকালবেলা রায়বেরেলিতে এসে পৌঁছলাম। জানতে পারলাম, আমার যাওয়ার এক দিন পরই রাতে আম্মাজান তাহাজ্জুদের জন্য ওঠেন এবং তঁকে পেশাব করানোর চৌকিতে বসানো হলো। অন্ধকারে ও ঘুমের ঘোরে বুঝতে না পেরে হাত ছেড়ে দেওয়া হলো। অমনি তিনি পড়ে গেলেন এবং কাঁধ ও কনুইয়ে আঘাত পেলেন। তারের মাধ্যমে তিনি আমার রওনা হওয়ার সংবাদ পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন। আমি যখন বাড়ি পৌঁছে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম, তখন তিনি বললেন, তোমার এসে পৌঁছায় আমার শরীরে অর্ধেক শক্তি ফিরে এসেছে। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি আমাকে কাছে ডেকে নিলেন এবং বললেন, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার শরীরের প্রতিটি লোমকূপ থেকে আল্লাহ্র হাম্‌দ ও ছানা বের হচ্ছে আর আমি অসাধারণ এক আনন্দ ও পুলক অনুভব করছি।' আমি বললাম, আপনার এই স্বপ্ন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আপনি অনেক ভালো স্বপ্ন দেখেছেন।

শনিবার রাতটা অস্থিরতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হলো। যোহরের নামায সচেতন অবস্থায় ও সজ্ঞানে আদায় করলেন এবং কর গণনা করে যিকির শুরু করলেন। পরক্ষণেই তাঁর আখেরাতের সফর শুরু হয়ে গেল। তিনি তাঁর তিন মরহুমা বোনের নাম উল্লেখ করে বললেন, ওরা লাখনৌ এসে পড়েছে।

তারপর এতটুকু সময় অতিবাহিত হলো, যতটুকু সময় একজন মানুষের লাখনৌ থেকে রায়বেরেলিতে আসতে লাগে। তারপরই আম্মাজানের মৃত্যুর হালত শুরু হয়ে গেল। শ্বাস থেকে আল্লাহ্ নামের আওয়াজ আসতে লাগল। পরে যেইমাত্র এই আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল, তখন আমরা বুঝতে পারলাম, তিনি আমাদের সবাইকে ছেড়ে আপন সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতির কাছে পৌঁছে গেছেন, সারাটা জীবন তিনি যাঁর নাম উচ্চারণ করতেন এবং যাঁর রহমতের দ্বারে করাঘাত করতেন।

আম্মাজানের মৃত্যুর পরের রাতটিকে বিস্ময়কর রহমত ও বরকতের রাত বলে মনে হচ্ছিল, যেন মাথার ওপর শান্তির শামিয়ানা ঝুলে আছে। কোনো প্রকার ভীতি বা অশান্তি-অস্থিরতা অনুভূত হচ্ছিল না।

পরদিন ৭ জুমাদাল আখেরাহ ১৩৮৮ হিজরি (১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬৮) ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনতা, ওলামা, তুলাবা ও তাবলীগ জামাতের বড়সড় একটি মজমা আম্মাজানের নামাযে জানাযা আদায় করেন আর তিনি দীর্ঘ ৪৭ বছরের বিরহের পর তাঁর সুযোগ্য স্বামী ও জীবনসঙ্গীর সাথে গিয়ে মিলিত হলেন এবং শাহ ইলমুল্লাহ (রহ.)-এর মুহতারামা স্ত্রীর পাশে চিরনিদ্রায় শায়িতা হন।

একজন আপাদমস্তক মমতাময়ী মায়ের বিরহ প্রতিটি সন্তানের জন্যই বেদনাদায়ক ঘটনা। কিন্তু আমার জন্য বড় একটা ক্ষতি এই ছিল যে, আব্বাজানের মৃত্যুর পর তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় অজিফা ছিল আমার জন্য দু'আ করা। তিনি বলতেন, তোমার জন্য আমি প্রত্যহ এস্তেখারার নামায পড়ি, যেন তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশনা লাভ কর, তোমার দ্বারা যেন কোনো ভুল না হয় এবং আল্লাহ তোমার মর্যাদা উঁচু করেন। আল্লাহপাক তাঁর দু'আগুলো সব কবুল করুন আমার আখেরাতের সম্বল বানান।

নদওয়াতুল ওলামার পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা, তার নামঞ্জুরি ও দারুল উলূমে স্ট্রাইক

চোখের উপর্যুপরি অপারেশনের পর থেকে আমার স্বাস্থ্যে খুব অবনতি এসে পড়েছিল, যেমনটি সাধারণত অপারেশনের পর হয়ে থাকে। এদিকে দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা গভীর অধ্যয়নকে আমার জন্য কঠিন করে তুলল, অপরদিকে দারুল উলূম সম্প্রসারণ ও উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং

তার পরিচালকবৃন্দের, বিশেষ করে মহাপরিচালকের দায়িত্ব বেড়ে চলছিল। আমার এই অনুভূতি তীব্র-থেকে-তীব্রতর হতে চলছিল যে, স্বাস্থ্য ও চোখের এই অবস্থা লেখালেখির ব্যস্ততা ও সফরের আধিক্যের সাথে নদওয়াতুল ওলামার ব্যবস্থাপনা, দায়িত্বের অনুভূতি ও কর্তব্যবোধের পরিপন্থী।

১৯৬৯ সালের ২০ আগস্ট নদওয়াতুল ওলামার পরিচালনা পরিষদের বৈঠক ছিল। আমি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম এবং আমার রিপোর্টে পুরোপুরি জোর দিয়ে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণের ইচ্ছার কথা নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যক্ত করলাম। বললাম, বর্তমানে শুধু দারুল উলূমকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই নয়, এর বিদ্যমান ব্যবস্থাপনাকে অটুট রাখার জন্যও অধিক মনোসংযোগ, সচেতনতা ও তৎপরতা আবশ্যক, যা আমি আমার স্বাস্থ্য ও বর্তমান অবস্থার সঙ্গে আঞ্জাম দিতে পারছি না। সেজন্য নদওয়ার ছাত্রদেরই মধ্য থেকে একজন যোগ্য লোক একাজের জন্য বেছে নেওয়া দরকার।

কিন্তু আমার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও বৈঠক আমার চিন্তার সঙ্গে একমত হলো না। শ্রদ্ধেয় ভাই মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দীন আহমাদ সাহেব নদভী (রহ.) আমাকে শাহ ইল্‌মুল্লাহ সাহেব (রহ.)-এর মসজিদে বসিয়ে বললেন, হযরাতুল উস্তায মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান সাহেব নদভী (রহ.)-এর জামাতে আমি সবার বড় এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত। আমি তোমাকে আদেশ করছি, এই দায়িত্বটি তুমি বহাল রাখো, নদওয়ার মহাপরিচালকের পদ থেকে তুমি ইস্তফা দিয়ো না এবং এই সম্পর্কটি ধরে রাখো। তাঁর প্রতি আমার দুর্বলতার কারণে হোক কিংবা প্রয়োজনের চেয়েও বেশি মানবতাবোধের কারণে বা কারণটা যোগ্য লোকের আকাল হোক; তাঁর সম্মানে আমি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে নিলাম এবং এই পদটি আজও আমার বহাল আছে।

এই ঘটনার আট মাস পর ১৯৭০ সালের মে মাসে দারুল উলূমে স্ট্রাইকের ঘটনা ঘটল। সংবাদটা আমি দায়েরায়ে শাহ ইল্‌মুল্লাহ রায়বেরেলিতে বসে পাই। ঘটনাচক্রে সে সময় মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদি আমার এখানে ছিলেন। এর ঘণ্টাকয়েক আগেই তিনি আমার পাঠাগারে কয়েকটি কিতাব দেখার জন্য এসেছিলেন। তিনি যে-গাড়িতে করে এসেছিলেন, সেই গাড়িতে করেই আমি তাঁর সঙ্গে নদওয়া চলে এলাম।

আমার পরিচালনার যুগে এ জাতীয় ঘটনা এটিই ছিল প্রথম। ধর্মঘট অতি অল্প সময়ের মধ্যে গুরুতর রূপ লাভ করল। ঘটনা আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারত। কিন্তু আমার স্নেহাস্পদ এডভোকেট সাইয়িদ আসাদ হুসাইন[১]-এর সহযোগিতা এবং যথাসময়ে পুলিশ এসে পড়ায় পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ছাত্রদের দাবিগুলো আমার মন-মস্তিষ্ক ও শরীর-স্বাস্থ্যকে ভেঙে চুরমার করে দিল। দাবিগুলোর মধ্যে মৌলিক দাবিটি ছিল (গরমের কারণে) পরীক্ষা স্থগিত করে দারুল উলূম ছুটি দেওয়া। অথচ পরীক্ষার পর ছুটি হয়ে যাবে বলে সিদ্ধান্ত ছিল আর পরীক্ষাও খুব কাছে ছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ছুটি এখনও শুরু হয়নি। আমি হযরত শায়খকে একপত্রে লিখলাম, 'আমি বলতে পারছি না, আম্মাজানের মৃত্যুবেদনা বেশি, না এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার দুঃখ বেশি।' পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসার এবং বেশ কিছু ব্যবস্থাপনামূলক কাজ আঞ্জাম দেওয়ার পর ব্যবস্থাপনা পরিষদের বৈঠক ডাকা হলো। এই বৈঠকে আমি ঘটনার ধরন, তার কারণ এবং এই ঘটনার আলোকে চিন্তা করার মতো বিষয় ও ভবিষ্যত পরিকল্পনাগুলোর ব্যাপারে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হলো।

পাশাপাশি সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো, যেটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পরিবর্তনের কারণে এখন দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই ধর্মঘটের ব্যাপারে দারুল মুসান্নিফীন-এর পরিচালক মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দীন শাহ নদভী ও দারুল উলূমের সাবেক মুহতামিম মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ ইমরান খান সাহেব নদভী আমাকে বিরাট নৈতিক সহযোগিতা দিয়েছেন। যে-ছাত্ররা হাঙ্গামায় (স্তরভেদে) অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে আমার স্নেহাস্পদ মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে' নদভী অত্যন্ত তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে দায়িত্বশীলদের সাহায্য করেছেন। মাওলানা ইমরান খান সাহেব আমার এই প্রতিক্রিয়া দেখে আমাকে নিজের সঙ্গে করে ভুপাল নিয়ে গেলেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে আমার মনোবল ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করলেন।

---

১. ইনি নদওয়াতুল উলামার ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য শ্রদ্ধেয় এডভোকেট সাইয়িদ আসগর হুসাইন সাহেব নিগরামির ছোট ছেলে। অত্যন্ত কর্মতৎপর ও জাতীয় কাজে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। ইসলামিয়া কলেজ লাখনৌ-এর প্রাক্তন ম্যানেজার ও আইনবিদ। আক্ষেপের বিষয় হলো, ১৪০৪ হিজরির ১৪ শা'বান (১৬ মে ১৯৮৪) দীর্ঘ রোগভোগের পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হায়দারাবাদের একটি সফর

হায়দারাবাদে মীর উছমান আলী খান-এর ওস্তাদ নবাব ফজিলত জঙ্গ মাওলানা আনওয়ারুল্লাহ খান সাহেব মরহুমের প্রতিষ্ঠিত একটি বিখ্যাত মাদরাসা আছে। পুলিশ এ্যাকশনের পর এই মাদরাসাটি এইচ.এ.ডি নেযামস চ্যারিটিবল ট্রাস্ট, হায়দারাবাদ-এ অধীনে চলে যায়, যার মহাপরিচালক ছিলেন নবাব মুফাখ্‌খাম জাহ বাহাদুর। জামেয়া নেযামিয়ার নানা বিষয় ও সমস্যাদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, প্রতিষ্ঠানটিকে আরও উপকারী ও কার্যকর বানানো এবং তাকে আরও উন্নত একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সুপারিশ ও প্রস্তাবাবলি উপস্থাপনের নিমিত্তে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে একটি কমিটি গঠন করে, যার সদস্যদের কয়েকজন হলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব আজমি,.জামেয়া বাকিয়াতুস সালিহাত-এর মুহতামিম মাওলানা সাইয়িদ সিবগাতুল্লাহ বখতিয়ারি কাসেমি, জামেয়া নেযামিয়ার শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুল হামীদ সাহেব ও ইসলামিয়া কলেজ করনোল-এর প্রিন্সিপ্যাল আফযালুল উলামা মৌলভী মুহাম্মাদ হুসাইন সাহেব এম.এ। কমিটির সভাপতি হিসেবে আমাকে নির্বাচন করা হলো।

আমি ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ হামযা হাসানি ও আলী আদম নদভী আফ্রিকিকে সঙ্গে করে হায়দারাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হই। ফেব্রুয়ারির ১ তারিখে কমিটির বৈঠক শুরু হয় এবং এই বৈঠকের ধারা এক সপ্তাহ অব্যাহত থাকে। আমি আমার অভিজ্ঞতা, নানা কাগজ, নানাজনের বক্তব্য ও পরামর্শের আলোকে সিলেবাস, ব্যবস্থাপনা ও কর্মনীতি সম্পর্কে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট উপস্থাপন করলাম। এই রিপোর্টটি আমি জামেয়া উছমানিয়ার উদ্ভিদ বিভাগের প্রধান প্রফেসর মুহাম্মাদ নাসীব সাহেবের দ্বারা লেখালাম। তাতে স্রেফ জরুরি ও তাৎক্ষণিক কিছু সংশোধনি ও সংযোজনের পরামর্শ এল, যাতে প্রস্তাবনাটি আরও বেশি সমৃদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হয়। একদিন মুফাখ্‌খাম জাহ বাহাদুর কমিটির সদস্যদের তার বাসায় দাওয়াতও করলেন। কমিটির সেক্রেটারী শ্রদ্ধেয় সাইয়িদ সাবের আলী সাহেব ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আলহাজ মুহাম্মাদ ইউনুস সালীম সাহেবও এই দাওয়াতে শরীক ছিলেন।

কমিটির সদস্যগণ পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার চমৎকার এক পরিবেশে এই খেদমতটি আঞ্জাম দিয়েছিলেন, যেটি শ্রদ্ধেয় মাওলানা আবুল

ওয়াফা আফগানি সাহেব হায়দারাবাদির জন্যও সন্তোষজনক প্রমাণিত হয়েছে, যিনি পুরনো সিলেবাসের ঘোর সমর্থক এবং যেকোনো নতুন বিষয় অবলম্বনের প্রতি চরম অনীহ ছিলেন। এমনকি এই কমিটি গঠনের ব্যাপারে নানা আশঙ্কার কথাও তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন বিস্তারিত জানতে পারলেন এবং রিপোর্টটিকে যথাযথ ও ভারসাম্যপূর্ণ পেলেন, তখন নিজের পছন্দ ও সম্মতির কথা প্রকাশ করলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, এত কিছু সত্ত্বেও জামেয়ারই কোনো-কোনো শিক্ষক ও পুরনো চিন্তার কট্টরপন্থীদের বিরোধিতার কারণে এই সুপারিশগুলো মোটেও বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আক্ষেপের বিষয় হলো, পুরনো ধাঁচের বহু মাদরাসার ব্যাপারে আমার এই একই অভিজ্ঞতা।

এই সফরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, ফেরার সময় আমি বন্ধুবর মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ ইমরান খান সাহেব নদভীকে তার দিয়েছিলাম, অমুক তারিখে আমি ভুপাল অতিক্রম করব; রাতে ওখানে থেকে সকালে গোয়ালিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হব। কিন্তু তাকদিরেরই ব্যাপার যে, গাড়ি হায়দারাবাদ থেকেই অনেক দেরিতে ছাড়ল এবং ভুপালে সন্ধ্যা আটটায় পৌঁছার পরিবর্তে মধ্যরাত ২টা কি ৩টায় পৌঁছলাম। আমার ধারণা ছিল, মাওলানা ইমরান সাহেব টেলিফোনের মাধ্যমে বিষয়টি জেনে নিয়ে থাকবেন যে, আমাদের গাড়ি স্টেশন থেকে দেরিতে রওনা হয়েছে। আর তার ওপর ভিত্তি করে তিনি স্টেশনে আসার সিদ্ধান্ত মুলতবি করে দিয়েছেন।

গাড়ি যখন ভুপাল এসে পৌঁছল, তখন আমি সতর্কতার খাতিরে উঠে বসে গেলাম এবং দেখতে লাগলাম, মাওলানার কোনো দূত তাঁর বার্তা নিয়ে এসেছে কিনা। হঠাৎ মাওলানার ছেলে রেজওয়ানের ওপর আমার চোখ পড়ল। আমি ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মাওলানা নিজে এসেছেন নাকি? ছেলে বলল, মাওলানা তো ভালো কথা, হযরত সাহেবও (হযরত শাহ মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব মুজাদ্দেদি) এসেছেন। আমি বললাম, পীর সাহেব? বলল, হ্যাঁ। যখন গাড়ি এসে পৌঁছতে বিলম্ব হয়ে গেল, লোকেরা অনেক বলল যে, আপনি চলে যান। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, যার যেতে মন চায় চলে যাও; আমি যাব না।

ঘটনাক্রমে সেদিন শীতের প্রকোপ খুব বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এভাবেই প্লাটফর্মে বসে রইলেন। ইত্যবসরে আমি দেখলাম, হযরত আসছেন। তিনি

গাড়ির জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দুজন খাদেম তাকে ভর দিয়ে রেখেছিল। আমি লজ্জায় ও অনুশোচনায় পানি-পানি হয়ে গেলাম। বললাম, আপনি কেন এতটা কষ্ট করলেন? তিনি বললেন, আজকের রাতটি আমার এত বরকতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, যেমনটি আর কোনো রাত অতিবাহিত হয়নি। ততক্ষণে অন্যরাও এসে ভিড় জমাল। হযরত আমাকে আদেশ করলেন, আমি যেন আসন ছেড়ে না নামি। বললেন, আপনি সফর করে আসছেন। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আল্লাহ্-আল্লাহ করে গাড়ি চলতে শুরু করল। আমি ওই বুযুর্গদের উন্নত চরিত্র ও বিনয়ের কথা স্মরণ করে বিস্ময়ের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। আজও যখন আমার সেই কাহিনীটি মনে পড়ে, তখনও আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই।

একটি স্মরণীয় হেজায সফর

এমনিতেই তো আলহামদুলিল্লাহ রাবেতা ও জামেয়া ইসলামিয়ার বাহানায় প্রায় প্রতি বছর এক-দুবার হেজায যাওয়া হতো।[১] এই সফরে আমার স্নেহাস্পদ মৌলভী কাজী মুঈনুল্লাহ নদভী ও 'আল-বা'ছুল ইলসামী'র সম্পাদক মৌলভী সাঈদুর রহমান নদভীও আমার সঙ্গে ছিলেন। ৮ সফর বিমানে করে দিল্লি থেকে বোম্বাই গেলাম এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করে করাচি হয়ে জিদ্দার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এই সফর দ্বারা মদীনা ও মদীনার অধিপতির (নবীজি সা.) সঙ্গে হযরত শায়খের সম্পর্কের কিছুটা অনুমান করলাম। পথে বিমানে যথারীতি বিমানের পক্ষ থেকে খাবার পরিবেশন করা হলো। আমি হযরতের পাশে বসা ছিলাম। আমি তাঁর দিকে খাবার এগিয়ে দিলাম। কিন্তু তিনি বললেন, মৌলভী সাহেব! আমি তো রোযা রেখেছি। পরে জানতে পারলাম, মদীনা তায়্যেবার এই হাজিরির কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হযরত দুমাসের রোযার নিয়ত করে রেখেছিলেন।

---

১. শুধু ১৯৬৬ সালে যাওয়া হয়নি। এ-বছর আমার পাসপোর্ট ভারত সরকারের হাতে ছিল। আর সে-কারণেই আমি সে-বছর সোমালিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য ইসলামি সম্মেলনে যোগ দিতে পারিনি, আমি যার একজন সদস্য ছিলাম। ভারত সরকার আমার পরিবর্তে তাদের আস্থাভাজন একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল, যার ব্যাপারে সংস্থার সেক্রেটারি মন্তব্য করেছেন, ইনি একজন নাখান্দা মেহমান; আমরা তো মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।

এর ধারা মদীনা তায়্যেবায় অবস্থানকালে অব্যাহত থাকল। শায়খের যেখানে বসার নিয়ম ছিল, সেখানে তিনি খেজুর ও যমযমের পানি দ্বারা ইফতার করতেন। তারপর ঈশার নামায আদায় করে মসজিদে নূর-এ চলে যেতেন। আমি সামনের আসনে তাঁর সঙ্গেই বসতাম। রাতের খাবার খেয়ে তিনি নিজের অবস্থানস্থলে (বুসতান নূর অলী বাবুত-তাম্মার) চলে আসতেন।

মদীনা তায়্যেবা থেকে শায়খেরই সঙ্গে জামেয়ার গাড়িতে করে – যেটি আমাকে মদীনায় দিয়ে গিয়েছিল – মক্কায় এলাম। পথে এবং ওখানকার অবস্থানে হযরত শায়খের মমতা, আমার বিশ্রাম ও চোখের ব্যথার কারণে বিশেষ যত্নের এমন একটি নমুনা দেখলাম, যা কিনা পিতৃ ও পৃষ্ঠপোষকসুলভ মমতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

ইংল্যান্ডের তৃতীয় সফর

মদীনা তায়্যেবা অবস্থানকালে যখন মজলিসে শূরার বৈঠক চলছিল, তখন মুফতী সাইয়্যিদ আমীন আল-হুসাইনী – যিনি মজলিসের একজন সদস্য ছিলেন – একদিন আমাকে বললেন, আপনার সঙ্গে আমি একান্তে কিছু কথা বলতে চাই। আমি বললাম, ঠিক আছে; আমি 'ফান্‌দাক আত-তাইসীর'-এ[১] চলে আসব। তিনি বললেন, না; আমি বরং আপনার ঠিকানায় আসতে চাই। আমি সময় বলে দিলাম। মুফতী সাহেব দেহরক্ষীদেরসহ (রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সেসময় তাঁর সঙ্গে দেহরক্ষী থাকত) বুসতানে চলে এলেন। তিনি আমাকে বললেন, আপনার চোখের এই অবস্থা দেখে আমাদের সকলের খুবই কষ্ট হচ্ছে। আপনাকে একবার লন্ডন সফরে যেতে হবে এবং ওখানকার বিজ্ঞ সার্জনদের পরামর্শ নিতে হবে যে, বিগত ব্যর্থ অপারেশনের কোনো প্রতিকার আছে কিনা। আমি বললাম, ইনশাআল্লাহ আমি বিষয়টি বিবেচনায় রাখব এবং কোনো এক সফরের সুযোগে এই স্বার্থটা উদ্ধারের চেষ্টা করব। তিনি বললেন, আপনার নিশ্চয় জানা আছে, আমি-আপনি চাচাত-জেঠাত ভাইয়ের গোষ্ঠী।[২] আমার সঙ্গে আপনার কোনো লৌকিকতা না থাকা উচিত।

---

১. 'ফান্‌দাক আত-তাইসীর' মসজিদে নববীর কাছাকাছি দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত মদীনার বড় একটি হোটেল। এখানে জামেয়া ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অতিথিগণ অবস্থান নিতেন।

২. একথা বলে তিনি আমার হাসানী আর নিজের হুসাইনী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

একথা বলেই তিনি ডলারের আদলে কিছু অর্থ বের করলেন। বললেন, আপাতত এটুকু নিয়ে নিন। আর যা ব্যয় হবে, সব দায়িত্ব আমার। এই অর্থ আমি আমার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দিচ্ছি। এগুলো কোনো রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় ফান্ডের অর্থ নয়। আমি ওজরখাহি করলাম। কিন্তু তিনি খুব পীড়াপীড়ি করলেন। আমি বললাম, এগুলো আপাতত আপনার নিজের কাছে থাকতে দিন। আমি চিন্তা ও পরামর্শ করে পরে আপনাকে জানাব। তিনি বললেন, না তা হবে না; এগুলো আমি ফেরত নেব না। আপনি এগুলো রেখে দিন। অগত্যা বাধ্য হয়ে আমি ডলারগুলো রেখে দিলাম।

প্রথম অবসরেই আমি বিষয়টি হযরত শায়খের কাছে – যিনি তখন মদীনায় অবস্থান করছিলেন – উপস্থাপন করলাম এবং মতামত চাইলাম। তিনি বললেন, যেহেতু এ-ব্যাপারে তোমার মনের কোনো চাহিদা ছিল না; তাই তুমি প্রস্তাবটি বরণ করে নাও। কিন্তু ইতিমধ্যে হাতে যে-পরিমাণ অর্থ এসেছে, এই অর্থ লন্ডন যাওয়া-আসা ও অপারেশনের ব্যয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু তাকদিরেরই ফয়সালা বলতে হবে, ওই সময়েই ডক্টর সাঈদ রমযানের আমন্ত্রণপত্র এসে আমার হাতে পৌঁছল যে, জুনের অমুক দিনগুলোতে ইসলামিক সেন্টার জেনেভার ব্যবস্থাপনা পরিষদের বৈঠক আছে। আপনি অবশ্যই আসবেন। টিকিটের ব্যবস্থা বাল'আমাশ সাহেব করবেন।[১]

আমি বুঝলাম, ইস্‌তিখারা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। হযরত শায়খও খুব খুশি হলেন আর আমি ইংল্যান্ড সফরের স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম এবং মৌলভী মুঈনুল্লাহ সাহেবকে সফরসাথী হিসেবে ঠিক করে নিলাম। তারপর ১৯৬৯ সালের ৬ জুন জিদ্দা থেকে জেনেভার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমার এই সফরের সিদ্ধান্তের কথা শুনে স্নেহাস্পদ মৌলভী ডক্টর আবদুল্লাহ আব্বাস নদভী (১৯৬১ সালের প্রথম লন্ডন সফরে আমি যার কাছে অবস্থান নিয়েছিলাম), জিদ্দার টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুবর ইশফাক শায়খ, আমার জামাতা হাজী আরশাদও আমার সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন এবং সঙ্গী হয়ে গেলেন। এভাবে এই সফর সব দিক থেকে একটি আন্দদায়ক ভ্রমণে পরিণত হলো।

---

১. বাল'আমাশ জিদ্দার একজন হাজরামি ব্যবসায়ী, যিনি ডক্টর সাঈদ রমযানের বন্ধু ও প্রতিনিধি।

জেনেভায় দিনকতক অবস্থান করে আমরা মধ্য জুনে লন্ডন গিয়ে পৌঁছলাম। ওখানে আমরা স্নেহাস্পদ মাসরুর আহমাদ লাখনভীর কাছে গিয়ে উঠলাম, যে কিনা কয়েক বছর যাবতই লন্ডন অবস্থান করছে এবং ওখানে মুসলিম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছে।

একটি তথ্য লেখা হয়নি যে, সেসময় ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুল জলীল সাহেব ফরীদি লন্ডন অবস্থান করছিলেন। আমি মক্কায় বসেই জানতে পেরেছিলাম, তিনি সত্বরই ভারত ফিরে যাচ্ছেন। আমি তাকে তার করে দিলাম, আপনি আমার অপেক্ষা করুন; আমি আসছি। তিনি মহব্বত ও ইখলাসের খাতিরে আমার আবেদন গ্রহণ করে নিলেন এবং প্রোগ্রাম মুলতবি করে দিলেন। লন্ডন পৌঁছে ডক্টর মাযহার আলী খানের মাধ্যমে – যিনি মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ ইমরান খান সাহেব নদভীর ফুফাত ভাই – দুজন বিশেষজ্ঞ সার্জন Mr. H.B Stsllard ও Mr. John Yintaley এর সঙ্গে সময় নির্ধারিত হলো। ডাক্তার দেখানোর জন্য ডক্টর ফরীদি সাহেব একটা নোট তৈরি করে নিলেন, যাতে রোগের পুরো বিবরণ ও ইতিহাস ছিল। তিনি আমার সঙ্গেও গেলেন। ডাক্তারগণ আমার চোখ পরীক্ষা করার পর কোনো অপারেশনের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করলেন না। ডান চোখের অপারেশন সম্ভব ছিল বটে; কিন্তু চোখটি অপারেশনের জন্য প্রস্তুত নয়। তবে তারা এমন ঔষধ নির্বাচন করলেন, যার ফলে অপারেশনকৃত চোখের ব্যথা দূর হয়ে যায় এবং তাৎক্ষণিক আরাম পাওয়া যায়। এই সফরের চিকিৎসাবিষয়ক উপকার এতটুকুই হলো।

আমার এই ইংল্যান্ড সফর এতই দীর্ঘ হলো যে, এর আগে বা পরে এত বেশি সময় ইংল্যান্ডে আর থাকা হয়নি। যে-জায়গাগুলোতে আমার যাওয়া হয়েছিল, সেগুলোর মধ্য থেকে যেকটি জায়গার নাম মনে আছে, সেগুলো হলো, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, ব্ল্যাকবার্ন, শিফেল্ড, ডেউজবরি ও লেড্‌স। প্রতিটি জায়গায় মুসলমানদের উদ্দেশে আমার বক্তৃতা করার সুযোগ হয়েছিল এবং আমি দাওয়াতি বক্তব্য প্রদান করেছি। এসব বক্তব্যে আমি ইংল্যান্ডে অবস্থানরত মুসলমানদের তাদের দাওয়াতি কর্তব্য পালনের, নিজেদেরকে মানুষের জন্য উপকারী প্রমাণের, নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও নতুন প্রজন্মের দ্বীন ও ধর্মকে সুরক্ষিত রাখার পরামর্শ দিয়েছি। এভাবে এই সফর ও অবস্থান চিকিৎসার চেয়ে বেশি দাওয়াতি ও ব্যক্তিগত সুবিধার চেয়ে বেশি দলগত হয়ে

গিয়েছিল। বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটি ও লেড্‌স ইউনিভাসিটির হলে মুসলমান ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষিত সাধারণ মুসলমানদের উদ্দেশে আমি বক্তৃতা করেছি।

কতিপয় আরব ছাত্রর পীড়াপীড়িতে – যারা আমার গ্রন্থাদি সম্পর্কে পরিচিত ও সেগুলো দ্বারা প্রভাবিত ছিল – গ্লাসগোতেও একটি সফর করতে হলো। ওখানে জুমার দিন আরবি ও উর্দুতে আমি ভাষণ দিয়েছি। এই আরব ছাত্রদেরই সঙ্গে তাদের নিয়ম অনুয়ায়ী আমি গ্লাসগোর জামে মসজিদে শবগুজারি করেছি। তাদের সঙ্গে আমার এই সম্পর্কের বেশিরভাগই ভাইসুলভ। এটি ছিল গ্লাসগো ও এডিমবারায় আমার দ্বিতীয় সফর। প্রথম সফরের আলোচনা আমি এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছি।

লন্ডন অবস্থানকালে একদিন হঠাৎ মাহের আল-কাদেরি সাহেব এসে হাজির হলেন। তিনি আফ্রিকার এক সফর থেকে ফিরে এসেছেন। এখানে আমার উপস্থিতির কথা জানতে পেরে অনেক কষ্ট স্বীকার করে ছুটে এসেছেন। ব্রিটেন প্রবাসী ভারতীয় ও পাকিস্তানি বন্ধুরা তার সম্মানে পেকাডি হোটেলে একটি সাহিত্যসভার আয়োজন করেছিল। দাওয়াতনামায় আমার নামও এসেছে। মাহের সাহেবের সঙ্গে আমার সম্পর্কের খাতিরে কষ্ট স্বীকার করে আমি চলে গেলাম এবং সেখানেও কিছু আলোচনা উপস্থাপন করলাম।[১]

মাহের সাহেব আমাকে লেক ডিস্ট্রিক্ট পরিদর্শনে যাওয়ার ব্যাপারে খুব উৎসাহ দিলেন এবং তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তার অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ও প্রশংসার ফলে আমি জায়গাটা পরিদর্শনে যাব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম এবং সঙ্গীদের নিয়ে লিড্‌স থেকে – যেখানকার ইউনিভার্সিটিতে আমার প্রোগ্রাম ছিল – জায়গাটা পরিদর্শনে চলে গেলাম। সফর বেশ দীর্ঘ আর সময় অল্প ছিল। চোখের ব্যথাও খুব বেশি ছিল। অবশ্য স্থান পরিদর্শনের যোগ্য ছিল বটে।

লাখনৌর তাবলীগি মারকায থেকে বাসা স্থানান্তর

১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই আমি লন্ডন থেকে ভারত ফিরে আসি। লাখনৌর কাচারি রোডে অবস্থিত তাবলীগি মারকাযটি আমাদের পুরাতন বাড়ি। এই বাড়িতেই আমার শৈশব ও যৌবন কেটেছে। আমার বড় ভাই ডক্টর সাইয়্যিদ আবদুল আলী সাহেব ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা এই

---

১. বিস্তারিত জানতে ‘পুরানে চেরাগ’ দ্বিতীয় খণ্ড ২০৭ থেকে ২০৮ নং পৃষ্ঠা দেখুন।

বাড়িতেই বসবাস করেছেন। প্রায় ১৫-১৬ বছর বাস করার পর ১৯৬৮ কি ১৯৬৯ সালে আমি বাসা স্থানান্তর করে লাখনৌর দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার মেহমানখানায় অবস্থান গ্রহণ করি, যাতে সার্বক্ষণিকভাবে আমি দারুল উলূমের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখতে পারি।

মারকাযের এই দীর্ঘ অবস্থানে – যেখানে আমার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ রচনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং যে-সময়টাতে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক সফরও হয়েছে – তাবলীগ জামাতের লোকজন, দ্বীনদার নাগরিকবৃন্দ ও পুরাতন বন্ধু-সুহৃদদের সঙ্গে আমার দিন-রাত যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। এই লোকগুলো অন্তত রবিবারের দরসে কুরআনে ও শুক্রবারের তাবলীগি সমাবেশে গুরুত্বের সঙ্গে যোগদান করতেন। এই অবস্থানের একটি বিশেষ উপকারিতা ছিল মুহতারাম মাওলানা মনযূর নু'মানির সাহচর্য ও সহাবস্থান। তিনি মারকাযের সঙ্গে লাগোয়া এক বাড়িতে সপরিবারে বসবাস করতেন। আমরা দুজন এক জায়গায় থাকার ফলে শহরে আগত বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম, বিশেষ করে তাবলীগ জামাত কিংবা দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাদরাসা মাযাহিরুল উলূমের সঙ্গে সম্পৃক্ত আলেমে দ্বীন ও আত্মশুদ্ধি প্রত্যাশী ব্যক্তিরা এখানে আসতেন এবং অনেক সময় এখানে থাকতেন।

মারকাযে অবস্থানকালীন সময়ে সবচেয়ে বেশি সাহচর্য ছিল সাইয়িদ মাসউদ আলী সাহেব ফতেহপুরির সঙ্গে।[১] এই সুদীর্ঘ সাহচর্যে তাঁর ভদ্রতা, ভালবাসা ও চরিত্রের ব্যাপারে আমার খুব অভিজ্ঞতা হয়েছে।

---

১. সাইয়িদ মাসউদ আলী আযাদ হাকীম সাইয়িদ মাহমুদ আলী সাহেব ফতেহপুরির ছেলে। বড় একজন কবি ও জিগার সাহেবের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। খানকা ও হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরির নামাযের ইমাম ছিলেন। হযরতের নামাযে জানাযা – যেটি হযরতের নিজবাড়ি এলাকা ডাডিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল – তিনিই পড়িয়েছিলেন। রায়পুরির খতমে খাজেগানের আমল তাঁরই তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় অনুষ্ঠিত হতো। হযরতের শেষ হজ্বসফরেও তিনি তাঁর সঙ্গী ছিলেন এবং তাঁর অনেক সেবা করেছেন। তাঁরই আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত এক দিনের জন্য ফতেহপুর গিয়েছিলেন।

আযাদ সাহেব ভালো একজন কবি ছিলেন। এই সূত্রে জিগার সাহেবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জিগার সাহেব তাঁর হজ্বসফরেও তাঁকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের ভারতবিভক্তির অব্যবহিত পর লাখনৌর সফেদ বারাদরিতে কাব্যপ্রতিযোগিতার

আযাদ সাহেবের পর আমার সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক ছিল মসজিদের সভাপতি মৌলভী মুহাম্মাদ সালীম সাহেব ও ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা আলহাজ্ব আবদুস সালাম খান সাহেবের সঙ্গে। এরা দুজন আমার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি খুব লক্ষ রাখতেন এবং সুযোগ পেলে আমার সেবাও করতেন। মারাকাযের অধিবাসীদের মধ্যে স্নেহাস্পদ আশরাফ আলী লাখনভীও আমার অনেক সেবা করেছেন।

এই অবস্থানের সময়েই ডক্টর যাইনুল আবেদীন কুদওয়াইর[১] সঙ্গে আমার পরিচয় ও সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ইনি মারকায থেকে কয়েক পা দূরে কাচারি রোড়ে থাকতেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায এই মারকায মসজিদে এসে আদায় করতেন। এই সময়েই তাঁর সুযোগ্য পুত্র ডক্টর আসিফ কুদওয়াই (এম.এ, পিএইচডি)-এর সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়। ইনি মুসলমানদের মাঝে ইংরেজি ভাষার একজন সুদক্ষ লেখক ও সফল অনুবাদক। পায়ের সমস্যার কারণে প্রায় ১৫-২০ বছর যাবত শয্যাশায়ী ছিলেন। হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরি তিনবার ('৫১, '৫২ ও '৫৩ সালে) লাখনৌ এসে এই তাবলীগি মারকাযে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং বেশিরভাগ সময় হাঁটাহাঁটি করার পর আসিফ সাহেবের কাছে চলে যেতেন। তিনি আসিফ সাহেবের যোগ্যতার খবর জানতেন। বিদ্যা ও যোগ্যতার একটি ভাণ্ডার ছিলেন তিনি। আমি ও মাওলানা মনযূর নু'মানি এই ভাণ্ডার থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি।

আসর বসেছিল, যেখানে প্রদেশের বিধানসভার প্রধান বাবু পরশুতম টন্ডন উপস্থিত ছিলেন। জিগার সাহেবও সেখানে গজল পাঠ করেছেন, আযাদ সাহেবও গজল পাঠ করেছেন। আযাদ সাহেব এই গজলপাঠে শ্রোতাদের ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ভয় ও শঙ্কার সেই পরিবেশে তাঁর সাহসিকতা ছিল কলন্দরিসুলভ।

১. ডক্টর যাইনুল আবেদীন কুদওয়াই ভারতের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ও কুদওয়াই বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ছিলেন বড় মাপের একজন জমিদার। কাব্যচর্চাও করতেন। তবে একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। হযরত রায়পুরি (রহ.)-এর মুরীদ ছিলেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে এই সম্পর্ক বহাল থাকে। ১৯৬৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং লাখনৌর প্রসিদ্ধ কবরস্তানে সমাধিস্থ হন। আল্লাহ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন। ডক্টর সাহেবের কবিতাসংকলন 'সদায়ে বাযেগাশ্‌ত' নামে ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। মাওলানা ইকবাল সুহাইল তাতে একটি ভূমিকা লিখেছেন।

আসিফ সাহেব বহু বছর যাবত 'নেদায়ে মিল্লাত'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমার ও মাওলানা মনযূর নু'মানির গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। দূরদর্শী ও ভাষাবিদরা হৃদয় খুলে তাঁর এই যোগ্যতার মূল্যায়ন করেছেন। সেই ধারা কোনো-না-কোনোভাবে এখনও চালু আছে।

ডক্টর যাইনুল আবেদীন ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র ডক্টর আসিফ কুদওয়াই ছাড়াও এডভোকেট হাজী শফীকুর রহমান সাহেবের সঙ্গেও আমার বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়। ইনি শহরের একজন সফল ও অভিজ্ঞ উকিল ছিলেন এবং কাচারি রোডে ডক্টর কুদওয়াই সাহেবের কাছাকাছি এক বাড়িতে বাস করতেন।

এদের ছাড়াও মারকাযের সহযোগী-হিতাকাঙ্ক্ষীদের মাঝে আরও একজন ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করা জরুরি, যিনি দ্বীনদারি, ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। পাড়ার ভালো মানুষদের একজন ছিলেন। সত্যিকার অর্থেই নিজের নামের যথাযথ প্রতিফলন ছিলেন। নাম তাঁর হাজী খয়রাত আলী। কিন্তু সবার কাছে হাফেয খয়রাতি বলে পরিচিত ছিলেন। গঞ্জেমুরাদাবাদের খানকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। মারকাযের বিপরীতে কাচারি রোডেই তাঁর বাড়ি ছিল, যেটি তিনি পরে নদওয়ার নামে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। আজ সেখানে কয়েক তলা সুদৃশ্য ভবন শোভা পাচ্ছে, যার ভাড়ার অর্থ নদওয়াতুল ওলামার হাতে আসে। তিনিও প্রায়ই মারকাযে আসা-যাওয়া করতেন এবং তার প্রয়োজনাদির খোঁজখবার নিতেন আর আমাদের খুব ভালবাসতেন। এদের যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, আল্লাহপাক তাঁদের ক্ষমা করুন, তাদের মর্যাদা বুলন্দ করুন আর যারা এখনও জীবিত আছেন, তাদের জীবনে বরকত দান করুন।

১৯৬৯ সালে মাওলানা মনযূর নু'মানি সাহেবও মারকায থেকে চলে গেলেন। তিনি নাযিরাবাদে একটি বাড়ি ক্রয় করেছিলেন এবং নিজে ও আল-ফুরকান-এর অফিস ও লাইব্রেরি ওখানে সরিয়ে নেন। এভাবে আমরা একের-পর-এক মারকায থেকে সরে সরে এলাম। কিন্তু আমাদের উভয়েরই কোনো-না-কোনোভাবে মারকায ও তার এজতেমাগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক-যোগাযোগ বহাল থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

আরব জাতীয়তা ও সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহী প্রেসিডেন্ট নাসেরের বিরোধিতা

১৯৬৭ সালের ৫ জুনের দুর্ঘটনা ও জীবনের একটি নতুন মোড়

১৯৬৭ সালের ৫ জুন ইসরাইলের মোকাবেলায় মিসরের পরাজয়, বাইতুল মুকাদ্দাসের ওপর ইসরাইলি দখল, জর্ডানের পশ্চিমতীরের গোটা আরব ভূখণ্ড (যার মধ্যে কুদ্স আল-খলীল ও নাবলুস প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত) ও সিনাই পর্বত মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া, আরব যুদ্ধের মুখোশ খুলে যাওয়া, আরব জাতীয়তার বেলুন ফুটো হয়ে যাওয়া এবং সেই সঙ্গে সুবিস্তৃত ইসলামি বিশ্বের অসহায়ত্ব ও লাঞ্ছনার সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটে গেল, যেটি কোনো একটি জাতির ইতিহাসে কয়েকশো বছর পর সংঘটিত হয়ে থাকে। আর মুসলিম জাতির ইতিহাসে এমন ঘটনা অতীতে দু-চারবারই ঘটেছে।

এই ঘটনাটা আমার পূর্ণ দৃষ্টি, লেখার, বলার ও মন্তব্যের শক্তি, সময়-সুযোগ ঘটনার মূল জিম্মাদার প্রেসিডেন্ট নাসেরের সমালোচনা, বিরোধিতার কাজে এতটাই নিবদ্ধ করে দিল, একে আমার মন-মস্তিষ্কের ওপর এমনভাবে চাপিয়ে দিল, আমার বক্তব্য ও রচনার এমন একটি বিষয়বস্তুতে পরিণত করে দিল যে, যারা আমার ও আমার মুরব্বী-পৃষ্ঠপোষকদের (শ্রদ্ধেয় আব্বাজান ও ভাইজান) মেজাজ ও রুচি সম্পর্কে অবগত, তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তারা জানতেন, আমাদের বংশের আসল মেজাজটাই হলো লেখালেখি, বিদ্যাচর্চা ও গবেষণার। আর দুর্বলতা বলুন আর গুণই বলুন; গোঁড়ামি, আবেগপ্রবণতা ও উত্তেজনার সঙ্গে এই বংশের সম্পর্ক খুবই কম। কারও বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা বা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া এই বংশের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই।

এমতাবস্থায় শুধু আমার থেকেই নয় – যেলোক আমার যত কাছের, যত ঘনিষ্ঠ,[১] তাদের দ্বারাও প্রেসিডেন্ট নাসের, তার নেতৃত্ব, আন্দোলন ও সেসময়কার মিসরের এত স্পষ্ট সমালোচনা ও এই ঘটনার জন্য এতটা দুঃখ পাওয়া, হৃদয়ের এমন প্রতিবাদ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল, মানুষ তার একবিন্দুও আশা করত না।

এই প্রতিক্রিয়া, এ ঘটনাটাকে এত গুরুত্ব দেওয়া এবং প্রেসিডেন্ট নাসেরের ব্যাপারে (যার সঙ্গে আমার কখনও ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি) এই অবস্থান গ্রহণের কারণ ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝে আসবে না, যতক্ষণ-না ঘটনার পুরো প্রেক্ষাপট ও পূর্বাপর সব কিছু দেখা হবে। তাছাড়া আরব বিশ্বের সঙ্গে দ্বীনি, চিন্তানৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও আবেগগত যে-সম্পর্ক ছিল এবং মাঝে ভারত উপমহাদেশের, বরং অনারব বিশ্বের বহু আলেমে দ্বীন (এসব ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও) আমার অংশীদার ছিলেন না; সেসবও জানতে হবে। সেজন্য এখানে এই বিষয়টির ওপর কিছু আলোকপাত করা আমি জরুরি মনে করছি।

মিশরের নতুন নেতৃত্ব, আরবদের মাঝে তার গ্রহণযোগ্যতা ও তার কারণসমূহ

১৯৫৪ সালে মিসরে সামরিক বিপ্লব হলো। রাজপরিবারের সর্বশেষ মুকুটধারী সম্রাট ফারুক-এর সরকারের পরিসমাপ্তি ঘটল। প্রথমে জেনারেল মুহাম্মাদ নাজীব এবং পরে কর্নেল জামাল আবদুন নাসের ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হলেন। দীর্ঘ দিন যাবত আরব বিশ্বের ওপর স্থবিরতা বিরাজ করছিল। ফিলিস্তিনের যুদ্ধে সাতটি আরব সরকারের রণাঙ্গন পরাজয় বরণ করেছিল। ইসরাইল নামক রাষ্টের অভ্যুদয় ঘটল।

পশ্চিমা শক্তিগুলোর চোখে চোখ রেখে কথা বলার এবং সাহসিকতার সঙ্গে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার যে-পিপাসা প্রকৃতিগতভাবে আরব তরুণদের মাঝে পাওয়া যাচ্ছিল এবং আরব বিশ্বে নেতৃত্বের যে-শূন্যতা দীর্ঘ দিন যাবত অনুভূত হচ্ছিল, তারই দাবির ভিত্তিতে জামাল আবদুন নাসের যখন সত্যিকার অর্থে সেই শূন্যতা পূরণ করলেন এবং তরুণদের পিপাসা নিবারণ করলেন

---

১. আমার ভাতিজা, 'আল-বা'ছুল ইসলামী'র সম্পাদক স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ মিয়া তাদের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এবং তারপর সুয়েজখালের জাতীয়তা ও ত্রিদেশীয় জোটকে (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইসরাইল) পিছু হটতে বাধ্য করার মতো কৃতিত্ব আঞ্জাম দিলেন, তখন আরব তরুণদের তিনি শতগুণে উজ্জীবিত করে তুললেন এবং তাদের ওপর তার নেতৃত্বের এমন এক জাদুময়তা ছেয়ে গেল যে, শুধু তরুণ-যুবকরাই নয় – আরব সাংবাদিক, লেখক, সাহিত্যিকরাও তার গুণ গাইতে শুরু করলেন এবং তার সমালোচনামূলক একটি কথাও কানে তোলা কঠিন হয়ে গেল। আবার এর ক্রিয়া বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের ওপরও পড়তে শুরু করল। সুয়েজ সমস্যায় তার অসাধারণ সাফল্য সত্যি-সত্যিই জাদুর ক্রিয়া রাখত। ১৯৬৭ সালের ৫ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করার পর মিসরি সাহিত্যিক-সাংবাদিকরা যেভাবে তার প্রশংসা করেছিলেন, তা ছিল কল্পনারও অতীত। তার মৃত্যুর পর মিসরের দৈনিক 'আল-জুমহুরিয়্যা' লিখেছিল–

'একালের নবী দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। জামাল আবুদুন নাসের বছরের সেই দিনটিতে মৃত্যুবরণ করলেন, যেদিন আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর ওপর মেরাজের তাজাল্লি প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁকে নিজের কাছে সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক একই আচরণ আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা জামালের সঙ্গেও করলেন। নবীজির সফরও ঠিক সেভাবে হয়েছিল, যেভাবে হয়েছে জামাল আবদুন নাসেরের। জামাল আবদুন নাসের মারা যাননি; বরং তিনি ঠিক সেভাবে আসমানি সফরে রওনা হয়েছেন, যেভাবে সফর করে থাকেন নবী-রাসূল ও পবিত্র মানুষেরা।'[১]

'ওহে জামাল আবুদন নাসের! ওহে দেশের নবী! ওহে আযাদির রাসূল! শবে মেরাজে আপনার নাম আছে এবং আপনার দেহ আকাশে পৌঁছে গেছে। পবিত্র লোকদের সঙ্গে আপনার সাক্ষাত হয়েছে। আপনি সেই কাফেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছেন, যারা পৃথিবীতে ও আকাশে জীবনের আবিষ্কর্তা।[২]

ওহে সেই ব্যক্তি, যার থেকে বড় সম্মানিত ও মর্যাদবান মানুষ দুনিয়া কখনও দেখেনি, বিপদ-বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার মতো ব্যক্তি! আপনি তো এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি যখন খুশি যেভাবে খুশি যা ইচ্ছা করতে পারেন।[৩]

---

১. আল-জুমহুরিয়্যা : ৩ অক্টোবর ১৯৭০

২. আল-জুমহুরিয়ার সম্পাদকীয় থেকে : ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

৩. প্রাগুক্ত

'অশ্রু যদি সমুদ্র হয়ে যায়, নদীর সবগুলো পানি যদি কালি হয়ে যায়, তবুও তাঁর শোকগাথা লিখে শেষ করা যাবে না। কারণ, তিনি এমন একজন মানুষ, যিনি শব্দ-বাক্যের উর্ধ্বে। বরং তিনি নিজেই শব্দ-বাক্য।'[১]

নতুন কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নাসের হাবীবুল্লাহ' আমাদের পূর্বপুরুষরা আপনার এই গান গাইতেন। তাদের জন্য আপনি একটি সুন্দর কাহিনী কিংবা স্বপ্ন ছিলেন। চার হাজার বছর যাবত তারা এই ময়দানে বেঁচে ছিলেন এই আশায় যে, আপনি আত্মপ্রকাশ করবেন। অবশেষে বিংশ শতাব্দির শেষার্ধে মিসরবাসীর এই স্বপ্ন পূরণ হলো।'[২]

আমার বিরোধিতার কারণগুলো

প্রেসিডেন্ট নাসের আরব জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে বড় পতাকাবাহী ছিলেন। কিন্তু আমার বিরোধিতার ভিত্তি শুধু এটি ছিল না। সিরিয়ার বা'ছী নেতৃবর্গ ও ইরাকের অনেক জাতীয়তাপুজারি চিন্তাবিদ এ-ক্ষেত্রে তাঁর পিছনে ছিল না। কিন্তু তাঁদের একজনও আরব বিশ্বের প্রাণ ও আরব জগতের অনাগত প্রজন্মের জন্য অতটা ভয়ংকর ছিলেন না, যতটা ছিলেন তিনি। তিনি শুধু আরব জাতীয়তার পতাকাবাহী ছিলেন না – বরং আরব বিশ্বে একটি মৌলিক, সার্বজনীন ও অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের প্রবক্তা ও পতাকাবাহী ছিলেন। বড় একটি পরীক্ষার বিষয় ছিল, সুয়েজখালের সফলতা ও আরও কিছু কারণে নতুন প্রজন্মে নেতৃত্ব ও হৃদ্যতার সেই ক্ষেত্র ও উপাদানগুলো তাঁর অর্জিত ছিল, যেগুলো এর আগে শুধু কামাল আতাতুর্ক (তুরস্কের সীমানা পর্যন্ত) অর্জন করতে পেরেছিলেন। তিনি আরব বিশ্বের গতি সেই কেন্দ্রীয় রেখা থেকে সরিয়ে পুরোপুরি বস্তুবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন, যেটি তার চিন্তা, কর্ম, উদ্দীপনা, বাসনা ও চেতনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

এই লক্ষ্য অর্জনে তিনি এমন সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক আয়োজনাদি ও পরিবর্তন সাধন করছিলেন, যেগুলোর ক্রিয়া (যদি বড় রকমের কোনো বিপ্লব ও অসাধারণ কোনো ঘটনা না ঘটে, তাহলে তা প্রজন্মের-পর-প্রজন্ম ও শতাব্দির-পর-শতাব্দি অক্ষুণ্ন থাকার মতো ছিল) দৃঢ় প্রত্যয়, সুসংহতি ও

---

১. আল-জুমহুরিয়ার সম্পাদকীয় থেকে : ১৫ অক্টোবর ১৯৭০

২. আল-জুমহুরিয়্যা : ১অক্টোবর ১৯৭০

একটি সুপরিকল্পিত স্কিমের আওতায় সেই গন্তব্যের দিকে ছুটে চলছিল, যার কাছে মাপকাঠি ও চূড়ান্ত যোগ্যতা বলতে ছিল কম্যুনিজম, তার ধারক-বাহক ও ধ্বজাধারী সম্প্রদায়।

তার সঙ্গে জাতিপূঁজায় যদি প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের পুনর্জীবনের উন্মাদনা ও বংশপূঁজার উপাদানও যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে সেই চরিত্রটা শুধু ইসলামি ভ্রাতৃত্বেরই শত্রুতে পরিণত হয় না; বরং নবুওতে মুহাম্মাদীরও শত্রুতে পরিণত হয়ে যায়।[১] এই মতবাদ যে-গতিতে উন্নতি করে, মুহাম্মাদ (সা.)-এর নেতৃত্ব ও তাঁর শেষ নবী হওয়ার বিশ্বাসের জোরও সমান গতিতে কমতে থাকে। তার প্রতিক্রিয়া ও প্রমাণাদি অনেক লেখক-সাহিত্যিকের লেখায় দৃশ্যমান হতেও শুরু করেছিল। 'তারীখুল আদাবিল আরাবী' ও ওয়াইউর রিসালাহ'র খ্যাতিমান লেখক ওস্তাদ আহমাদ হাসান যাইয়াত-এর কলমে জামেয়া আযহারের মুখপত্র 'মাজাল্লাতুল আযহার'-এ 'উম্মাতুতাওহীদ তাতাওয়াহ্হাদু' শিরোনামে জামাল আবুদন নাসের-এর জীবদ্দশায়ই একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল। তারই একটি অংশ আমি এখানে তুলে ধরছি–

'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে-ঐক্যের দাওয়াত দিয়েছিলেন, সেটি ছিল একটি সাধারণ মূলনীতি। কারণ, তার ভিত্তি ছিল বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাসের জীবন একসময় দুর্বলও হয়ে যায় আবার বদলেও যায়। আর যে-ঐক্যের দাওয়াত সালাহুদ্দীন আইউবি প্রদান

---

১. এই আশঙ্কা অনুভব করে আমি একটি নিবন্ধ; বরং বলা চলে একটি পুস্তিকা লিখেছিলাম, যার নাম 'আরব জাতীয়তা ইসলামের দৃষ্টিতে ভয়ংকর কেন?'। এই বইয়ে আমি আরব ও ইসলামের অক্ষয় সম্পর্কটি ফুটিয়ে তুলেছি এবং বলেছি, নবুওতে মুহাম্মাদী ও শরীয়তে ইসলামী এর প্রতিষ্ঠা ও আজীবন টিকিয়ে রাখার জন্য কীরূপ সুদূরপ্রসারী ও গভীর ব্যবস্থাদি রেখে গেছে। তারপর ঐতিহাসিকভাবে আমি তার পরিসংখ্যান নিয়েছি, আরবদের মাঝে জাতীয়তার অনুভূতির সূচনা কখন হয়েছিল এবং তার প্রকৃত কারণগুলো কী ছিল। আমি প্রমাণ করেছি, জাতীয়তা আন্দোলনের প্রথমদিককার নেতা ছিলেন খ্রিস্টানরা, যারা ইসলামের সঙ্গে আরবদের সম্পর্ক দুর্বল করতে এবং খেলাফতে উছমানিয়ার বিরুদ্ধে আরবদের একটি রণক্ষেত্র তৈরি করতে চাচ্ছিল। খেলাফতের কেন্দ্র স্থানান্তরের আন্দোলন তারই একটি কুফল ছিল, যার নেতৃত্ব দিয়েছিল পাশ্চাত্যের লোকেরা, যার ফলে আরবরা তুর্কিদের সঙ্গে বিদ্রোহ করেছিল। আমার এই পুস্তিকাটি 'মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম' প্রকাশ করেছিল।

করেছিলেন, সেটি ছিল একটি খণ্ডিত বিষয়। কারণ, তার ভিত্তি ছিল শক্তির ওপর। আর শক্তিতে একসময় দুর্বলতাও এসে পড়ে। আবার তা নিঃশেষও হয়ে যায়। কিন্তু যে-ঐক্যের ডাক জামাল আবদুন নাসের দিয়েছেন, সেটি চিরকাল বহাল থাকবে এবং ফলে-ফুলে সুশোভিত হবে। কারণ, তার ভিত্তি রচিত তিনটি মূলনীতির ওপর। খাদ্য ও জীবনোপকরণে সকলের অংশগ্রহণ, মতপ্রকাশে স্বাধীনতা ও শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্র। এই তিন উপাদান এই ঐক্যের আজীবন টিকে থাকার স্থায়ী জিম্মাদার।[১]

তারপর এই নেতৃত্ব আরব ও মিসরকে একটা মানসিক ও নৈতিক বিশৃঙ্খলা, ইসলামের সমুন্নতি ও নেতৃত্বের যোগ্যতার ব্যাপারে হতাশার অনুভূতি, মর্যাদা ও স্থিতিশীলতার জন্য অন্য কোনো জীবনদর্শনের ছায়ায় এবং কোনো প্রাচ্য কিংবা পশ্চিমা ব্লকের আঁচলে অনুসন্ধানের পথ সুগম করে দিল। জামাল আবদুন নাসের সব ধরনের সমালোচনা ও বিরোধিতার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন এবং প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দিলেন। দশ থেকে বারো বছরের মাথায় এই নেতৃত্ব চলাকালে আরব দেশগুলোর তরুণ-যুবক ও শিক্ষিত সমাজে এমন পরিবর্তন এল এবং নবী ইবরাহীমের উত্তরসূরীরা আযরি চরিত্র (বিশেষ নারীলোলুপতা) ও মূর্তিচর্চার এমন নমুনা প্রদর্শন করল, যা ধর্মত্যাগেরই নামান্তর। অনেক তরুণ-যুবকের মুখ থেকে স্পষ্ট ভাষায় এমন-এমন কুফরি কথাবার্তা বের হতে শুরু করল যে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, তারা দ্বীন ও দ্বীনের অনুসারীদের পছন্দ করছে না।

আমি আরও বেশি কষ্ট পেলাম, যখন দেখলাম, অনেক নিষ্ঠাবান দ্বীনি মহলেও স্তুতি-নিন্দা ও প্রশংসা-সমালোচনার মাপকাঠি ইসলাম-অ-ইসলাম বা মুসলমানের পক্ষপাতিত্ব-বিরোধিতা এসব রইল না। বরং নিরেট জাগতিক কীর্তি, বস্তুগত জয় (যদিও নাসেরের কাছে সুয়েজের জাতীয়তা ছাড়া আর কোনো কীর্তি ছিল না) ও রাজনৈতিক অপপ্রচার এসবই মাপকাঠি হয়ে গেল। আমি অনুভব করলাম, স্বয়ং আমাদের দেশের দ্বীনি অঙ্গনগুলোতেও এই দ্বীনি আত্মমর্যাদাবোধে – যেটি ছিল এই অঙ্গনগুলোর গৌরবের সবচেয়ে বড় পুঁজি

১. ওস্তাদ আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত-এর নিবন্ধ : মাজাল্লাতুল আযহার, মুহাররাম ১৩৮৩

এবং তাদের পূর্বসূরীদের প্রতীক — অতি দ্রুততার সঙ্গে অধঃপতন এসে পড়েছে। আর এটি সেই ক্ষতি, যার প্রতিকার কোনোভাবেই সম্ভব নয়।[১]

এসব কারণে আমার মনোবেদনা আরও বেড়ে গেল এবং আমার প্রতিবাদী কণ্ঠ আরও জোরালো, আরও তিক্ত হয়ে উঠল।

আরব বিশ্ব, তার ঘটনাবলি ও পরিস্থিতির সঙ্গে আমার অসাধারণ সম্পৃক্ততা

এই ঘটনায় কোনো-কোনো মহল থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, এই ঘটনায় কেবল আমারই এত প্রতিক্রিয়া কেন? আজকাল যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সহজ। পত্র-পত্রিকা আছে। রেডিও আছে। এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়া-আসার সুবিধার কারণে গোটা পৃথিবী যেন একটা বাড়ি। এমতাবস্থায় আমার জন্য যোগাযোগের এমন বিশেষ কী ব্যবস্থাটা আছে যে, অনেক তথ্য আমি জানি; অন্যরা জানে না? একটি উর্দু পত্রিকার এক নিবন্ধে বিশেষভাবে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, আমার গায়ে এমন কী পালক গজাল যে, আমি প্রেসিডেন্ট নাসের ও মিসরের বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধাচরণ করাকে আমার কর্তব্য মনে করছি? মিসর দূতাবাসও বেশ কবার প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং ভারত সরকারও একাধিকবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে, নদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশমান পত্রিকা 'আর-রাসায়েল' ও 'আর-রায়েদ' কী কারণে এই বিরোধিতার জন্য ওয়াক্‌ফ হয়ে গেল?[২]

---

১. এখানে বলে রাখা দরকার, হিন্দুস্তানের দ্বীনি অঙ্গনগুলোতে কিছু-কিছু ব্যক্তিত্ব আমার এই প্রতিক্রিয়া ও চিন্তার সঙ্গে একমত ছিলেন। হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেব (রহ.) বারবার প্রেসিডেন্ট নাসেরের ব্যাপারে কঠোর সমালোচনামূলক ভাষা ব্যবহার করেছেন। একবার রমযান মাসে তাঁর এ'তেকাফস্থলে মিয়া মুহাম্মাদ মরহুমের একটি নিবন্ধ — যেটি প্রেসিডেন্ট নাসের ও আরব জাতীয়তাবাদের সমালোচনায় লিখিত ছিল — পাঠ করিয়ে শোনেন। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর অবস্থানও এ বিষয়ে সমালোচনামূলক ছিল। তাদের প্রচার বিভাগও প্রেসিডেন্ট নাসেরের বিরুদ্ধাচারণ ও সমালোচনা করত।

২. এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, 'আল-বা'ছুল ইসলামী'র সম্পাদক স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ আল-হাসানীকে দিল্লি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তলব করেছিল এবং তাকে অবহিত করেছিল, মিসর দূতাবাস আপনার পত্রিকার অবস্থান ও তার নিবন্ধগুলোর বিরুদ্ধে কয়েকবার প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও আপনি এই অবস্থান কেন পরিবর্তন করছেন না?

উর্দু পত্রিকাটির (যার সম্পাদক একজন চিন্তাবিদ মুসলমান ছিলেন) এই নিবন্ধ আমার মাঝে কিছু লেখার তীব্র প্রেরণা সৃষ্টি করে দিল। আমি 'নেদায়ে মিল্লাত'-এর জন্য একটি নিবন্ধ লেখালাম। তাতে আমি পুরোপুরি অকৃত্রিমতার সঙ্গে স্পষ্ট করে দিলাম এ-বিষয়টির সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততার কারণগুলো কী। এই নিবন্ধটি অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও আবেগতাড়িত হয়েই লেখা হয়েছিল। এমন আবেগ, যার প্রতিক্রিয়ায় কোনো-কোনো ব্যক্তিত্বশীল পুণ্যাত্মা জিহাদের ময়দানে কবিতা আবৃত্তি করেছেন। উক্ত নিবন্ধের অংশবিশেষ আমি এখানে তুলে ধরলাম। আমি লিখেছি—

'আরব দুনিয়ার সঙ্গে আমি সম্পর্কহীন মানুষ নই। আমার জানাশোনাও সেকেন্ডহ্যান্ড নয়। আরব নেতৃবৃন্দের সমালোচনার কাজ, আরবদের জীবনের পরিসংখ্যান গ্রহণের দায়িত্ব, তাদের বিপদাপদ ও ব্যর্থতার কারণগুলো নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার ধারা শুধু আরব-ইসরাইলের এই যুদ্ধের সময়ই শুরু করেছি এমনও নয়। এমনও নয় যে, আমি হঠাৎ ও অসময়ে এই ময়দানে এসেছি। আমি নিজেকে (একজন মুসলমান হওয়ার সুবাদেও এবং আরবি সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণেও) এই বিস্তৃত ও বিরাট আরব বংশের – যারা মারাকেশ থেকে শুরু করে বাগদাদ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে – একজন সদস্য মনে করি। আমি তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার। আমার ভাগ্য তাদের ভাগ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাদের সম্মান আমার সম্মান। তাদের অপমান আমার অপমান। আমার কল্পনার জগত, আমার কামনা-বাসনার কেন্দ্র আমার উড়ন্ত আত্মার প্রকৃত বিচরণক্ষেত্র আরবের প্রিয়তম মাটি, তার ভাষা, সাহিত্য,

---

কিন্তু তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, এই অবস্থান পরিবর্তন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমরা যা করছি, বুঝে-শুনেই করছি। আমরা একাধিক নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে জানতে পেরেছি, প্রেসিডেন্ট নাসেরকে যে-কটি পত্রিকার কাটিং উপস্থাপন করা হতো, সেগুলোর মধ্যে 'আল-বা'ছ'-এর কাটিংও থাকত।

একবার আমাকেও দিল্লিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করা হয়েছিল এবং মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী আজীম হুসাইন আমাকে এ-ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। আলোচনায় ভারত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন অফিসারবৃন্দ ও মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞরাও উপস্থিত ছিলেন। আমি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছি, এই অবস্থান আমরা জেনে-বুঝেই গ্রহণ করেছি এবং আমরা এর উপর অটল থাকব। এর ফলে যদি আমাকে ভারতের বাইরে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিতও করা হয়, তবু আমরা এই অবস্থান পরিত্যাগ করব না। (সে সময় আমার পাসপোর্ট ভারত সরকারের হাতে ছিল)

সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আরব দুনিয়ার এই গোটা সম্পদ ও পুঁজিতে (যার সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য আরব জাতীয়তার স্লোগান উচ্চকিত হচ্ছে) আমার অধিকার একজন ত্বাহা হুসাইন, একজন আক্কাদ, একজন আহমাদ আমীন কিংবা একজন কুর্‌দ আলীর চেয়ে কম নয়। আমার সৃষ্টিগত উপাদান ও পানি-বায়ুর সম্পর্ক ভারতের সঙ্গে। একথাটি আমি অকপটে স্বীকারও করছি, এর জন্য গর্বও করছি। কিন্তু মতামত ও চিন্তাধারার প্রকাশের জন্য আমি উর্দুর চেয়ে আরবিকে বড় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছি।

এই বেদনাদায়ক ঘটনার পরই আমি আরবদের অপমানজনক পরাজয়ের কারণ ও তাদের মৌলিক দুর্বলতাগুলোর অবাধ পরিসংখ্যান নিয়েছি এবং তাদের অবহিত করেছি কী-কী পরিবর্তন সাধন করে তোমাদের পক্ষে এই কালিমা দূর করা সম্ভব হতে পারে। 'কারিছাতুল আলামিল আরাবী ওয়া আসবাবুহাল হাকীকিয়্যাহ' শিরোনামে আমার লেখা নিবন্ধটি আরবের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার পক্ষ থেকে হাজার-হাজার কপি প্রচার হয়েছে। তার পরপরই আমি আরবের রাষ্ট্রপ্রধান ও কলামিস্টদের নামে আমি একটি পত্র লিখেছিলাম, যেটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাদের নামে পাঠানো হয়েছিল। তাতেও আমি এই ঘটনার প্রকৃত কারণগুলো বর্ণনা করেছি এবং এ-ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। সেসময়ই আমি فاستخف قومه فاطاعوه নামে একটি ব্যঙ্গাত্মক নিবন্ধ লিখে প্রচার করেছিলাম।[১]

হেজায ও কুয়েতের ভাষণসমূহ

সরকার পাসপোর্ট জব্দ করার কারণে ১৯৬৬ সালে আমি ভারত থেকে বের হতে পারিনি। ১৯৬৭ সালের অক্টোবর থেকে আমার বিদেশসফরের ধারা শুরু হলো। মিসরের পরাজয়ের পর সবে চার মাস অতিবাহিত হলো এবং এখনও জখম শুকায়নি। এমন সময় মক্কায় ১৩৮৭ হিজরির শা'বানের (অক্টোবর ১৯৮৭) অবস্থানকালে 'নাদিল ওয়াহ্‌দাতির রিয়াজি'তে ভাষণদানের ফরমায়েশ করা হলো। এই ফরমায়েশে রাবেতা আলমে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল শায়খ মুহাম্মাদ সুরুর আস-সাব্বান-এর সমর্থন-পীড়াপীড়িরও যোগ ছিল।

---

১. এটি মিসরের ফেরাউন সম্পর্কিত একটি আয়াত, যার অর্থ হলো, 'সে তার জাতির ইজ্জত মাটি করে দিল এবং তারা তাকে মেনে নিল।'(সূরা যুখরুফ : আয়াত ৫৪)

১৯৬৭ সালের নভেম্বরের ৬ তারিখে আমি 'সুদ ও লোকসান' শিরোনামে নাদিতে বক্তৃতা করি। সভায় মক্কার প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষাবিদ ও তরুণ শিক্ষিত সমাজের বিপুলসংখ্যক লোকের সমাগম হয়েছিল। সেখানে আমি সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠি নিয়ে আলোচনা করি, প্রেসিডেন্ট নাসেরের নেতৃত্বকে পুরোপুরি ব্যর্থ বলে প্রমাণিত করি এবং অবহিত করি, আমরা কী পেয়েছি আর কী হারিয়েছি। আমি বলেছি, হৃত মর্যাদাকে কীভাবে পদদলিত করা হয়েছে, আমাদের ইতিহাসের গায়ে কী-কী দাগ পড়েছে, আমাদের চেহারায় কী-কী কালিমা পড়েছে, এমন পরিস্থিতিতে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতিগুলোর প্রতীক কী হয়, তারা কীভাবে তাদের শাসক ও নেতৃবর্গের কর্মকাণ্ডের পরিসংখ্যান নেয় এবং পরাজয় ও লাঞ্ছনার দায় থেকে কীভাবে নিজেদের মুক্ত রাখে ইত্যাদি।

আমি বলেছি, আপনাদের ও সমস্ত আরব ও মুসলমানদের রমি জামারাতের মাধ্যমে শত্রুর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন ও তাদের লাঞ্ছিত করার এই শিক্ষা-ই প্রদান করা হয়েছে। তারপর বলেছি এখন তার প্রতিকারের পন্থা কী। পন্থাটি আমি এই বলেছি যে, ইসলামের প্রতি ফিরে আসা ব্যতীত আর কোনো পথ নেই। আরব নেতৃবৃন্দের কাছে আমার এটিই আবেদন যে, আপনারা আমাদের জন্য আদর্শ হোন এবং সামনে এসে দাঁড়ান।

পরবর্তী বছরই ১৩৮৮ হিজরির (নভেম্বর ১৯৬৮) শা'বান মাসে মাদরাসা ছানুবিয়্যা তায়্যেবা মদীনা মুনাওয়ারার সুপরিসর হলে এ বিষয়েরই ওপর দ্বিতীয় ভাষণটি দিলাম। এখানে জামেয়া ইসলামিয়া, মাদরাসা-কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ, আলেমসমাজ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বিশাল একটি সমাগম ছিল। এই ভাষণের শিরোনাম ছিল 'জয়-পরাজয়ের দুটি খোদায়ী ব্যবস্থা'। কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি বলেছি, এই উপকরণ-জগতে এক তো হলো বস্তুগত শক্তি, প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় উপকরণ অবলম্বনের ব্যবস্থা। বারবারই এই ব্যবস্থা সফল হয়েছে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠী তার সাহায্যে সুদৃঢ় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছে, নিজেদের শত্রুদের পরাস্ত করেছে এবং পরিস্থিতি পাল্টে দিয়েছে। এই রীতিটি হলো বস্তুগত, যেটি হাজার-হাজার বছর যাবত পৃথিবীতে চালু আছে। দ্বিতীয়টি হলো ঈমান, বিশ্বাস, কল্যাণকর লক্ষ্য ও সাধু জীবনের ব্যবস্থা, যার সফলতার দায়িত্ব আল্লাহ নিজের হাতে

তুলে নিয়েছেন এবং মুসলমানরা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে পৃথিবীতে বিজয় অর্জন করেছে। মিসরের বর্তমান নেতৃত্ব এই উভয় ব্যবস্থার সঙ্গেই বিদ্রোহ করেছে এবং তার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। যুদ্ধের সময় মিসরের নৈতিক অবস্থা কেমন ছিল, সে আমি আপনাদের বলেছি। তারপর অবহিত করেছি, এই পরাজয় কোনো বিস্ময়কর ঘটনা নয়।

আরব জাতীয়তাবাদে অনারবদের কোনো আকর্ষণ নেই। তাদের আকর্ষণ শুধু ঈমান, ভালো কাজ, ইসলামের বার্তা ও দাওয়াতে।

এই সভায় আমাদের ওস্তাদ ডক্টর শায়খ তাকিউদ্দীন হেলালিও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও তাঁর প্রতিক্রিয়া ও সন্তোষের কথা ব্যক্ত করেছেন।

সে-বছরই (১৭ নভেম্বর ১৯৬৮) ২৪ শা'বান হেজায থেকে ফেরার পথে কুয়েতে এক-দুদিন থাকতে হলো। সেখানেও জমিয়াতুল ইসলাহিল ইজতিমায়ীর হলে এই বিষয়েরই ওপর আমাকে ভাষণ দিতে হলো, যার শিরোনাম ও প্রাণ ছিল 'আরব বিশ্বের আসল শঙ্কা ইসরাইলের ব্যাপারে নয় — সেই হৃদয়ের ব্যাপারে, যে নিজের কাজ ছেড়ে দিয়েছে।' এই ভাষণে আমি বলেছি, প্রমাণিত বাস্তবতা থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া, জাতীয় হৃদয়গুলোর অকার্যকর হয়ে যাওয়া, আপন নেতৃবৃন্দের হিসাব না নেওয়া, ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা না নেওয়া হলো আসল ভয়ের বিষয়। আর বর্তমান আরববিশ্ব এই শঙ্কার শিকার।

পরবর্তী বছর ১৩৮৯ হিজরির (নভেম্বর ১৯৬৯) শা'বান মাসে মদীনা মুনাওয়ারায় মাদরাসা ছানুবিয়্যা তায়্যেবার হলে এই বিষয়ের ওপরই আমার মতামত উপস্থাপন করতে হলো। এই সভায় রাবেতা আলমে ইসলামীর বেশ কজন ক্ষমতাসম্পন্ন সদস্য, জামেয়া ইসলামিয়ার শিক্ষক-ছাত্রবৃন্দ ও শহরের শিক্ষিত সমাজের লোকেরা উপস্থিত ছিলেন। হলটি লোকে লোকারণ্য ছিল।

এই ভাষণের বিষয়বস্তু ও সারমর্ম ছিল 'ফিলিস্তিনের দুর্যোগ থেকে তিনটি শিক্ষা'। তাতে পরিষ্কার ভাষায় পবিত্র কুরআনের আয়াত إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ এর আলোকে বলেছি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিপক্ষ ও তাঁর সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জকারীদের পরিণতি সব সময় ব্যর্থতা আর তাদের ধারাবাহিকতার বিচ্ছিন্নতা। 'আবতার' শুধু বংশধারা বিচ্ছিন্নতা-ই নয়। এর মর্ম আরও ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। বিফলতা, লাঞ্ছনা, ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাওয়া এসবও এর অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মহীন ও নাস্তিক নেতৃত্ব অতীতেও সব সময় ব্যর্থ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও ব্যর্থ হবে। এদের সম্পর্কে সব সময় সাবধান থাকতে হবে। স্বার্থপর নেতাদের চিনে রাখতে হবে।

কবি ইকবাল যে-কথাটি এভাবে বুঝিয়েছেন–

آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے
شمشیر و سناں اول طاؤس و رباب آخر

'আসো; বলি তোমাকে জাতিগুলোর ভাগ্যলিপি কী। তীর-তরবারি আগে আর বাদ্যযন্ত্র পরে।'

একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতকার

এই আলোচনার কোনো-কোনো দিক এবং এর কিছু তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া সেই সাক্ষাতকারটিতে সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, যেটি আমার থেকে ১৮৬৭ সালের অক্টোবর মাসে আমার মক্কা পৌঁছার পরপর সৌদি আরবের সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা 'আন-নাদ্‌ওয়া' গ্রহণ করেছিল এবং ১৭ অক্টোবরের সংখ্যায় প্রকাশ করেছিল।[১] তার অংশবিশেষ আমি এখানে তুলে ধরলাম–

প্রশ্ন : আরব বিশ্বের সর্বসাম্প্রতিক দুর্ঘটনা মানুষের উপন নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া ফেলেছে। একটি প্রতিক্রিয়া হলো সেই হতবিহ্বলতা, যেটি হঠাৎ কোনো বিষ্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হয়। এই ঘটনা মানুষের মনে বিরাট একটা তোলপাড় সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং মানুষের চিন্তা ও বিবেককে স্থবির করে তুলেছে। তাদের মনে হচ্ছে, যেন তারা ভয়ংকর কোনো স্বপ্ন দেখেছে। মনে হচ্ছে, এটি দিনের আলোতে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়াটি হলো বিশ্বাসে সংশয় ও ফাটল সৃষ্টি হওয়া; সেই বিশ্বাস, যাকে মুসলমানরা লালন করে থাকে। তৃতীয় প্রতিক্রিয়াটি হলো, হতাশা ও ভবিষ্যতে অন্ধকারের অনুভূতি। এ-ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী? আশা করি, বিষয়টি খুলে বলবেন।

দুর্ঘটনা স্বয়ং আমার জন্য সে-রকমেরই একটি ঘটনা, যেমনটি একজন মুসলমানের জন্য, বরং একজন আরবের জন্য হতে পারে। এ-ব্যাপারে চিন্তা-

---

১. এই সাক্ষাতকারের উর্দু অনুবাদ 'নেদায়ে মিল্লাত' ২৭ অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশ করেছিল।

গবেষণা করার আগ্রহও আমার আছে। আপনার চাহিদা অনুসারে আমি বিস্তারিতভাবেই উত্তর দেব। খোলাসা করে স্পষ্ট ভাষায় বলাই তো আমার অভ্যাস। তাছাড়া বিষয়টি-ই এমন যে, এখানে রাখঢাকের কোনো সুযোগ নেই। কারণ, বিপদের আলোচনায় কৃত্রিমতা চলে না। আরবদের একটি প্রবাদ আছে اَلرَّائِدُ لَا يَكْذِبُ اَهْلَهٗ মানে কাফেলার জন্য ছাউনি অনুসন্ধানকারী মিথ্যা বলে না। আর আমি আরও একটু বাড়িয়ে বলি, কৃত্রিমতাও দেখায় না এবং মুখ দেখে কথা বলে না।

আমার ওপর এই ঘটনার বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, যেমনটি সাধারণ কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনার বেলায় হয়ে থাকে। একদিন-না-একদিন এই দুর্ঘটনাটা ঘটবে এমন আলামত স্পষ্টভাবেই বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ্ যাদের বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, ঈমানি জ্ঞান ও কুরআন বুঝবার যোগ্যতা দান করেছেন, তারা এর ভবিষ্যদ্বাণীও করছিলেন ঠিক তেমন, যেন তারা স্বচক্ষে ঘটনাটা দেখতে পাচ্ছেন। নবুওত, ইল্হাম বা কারামতের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। বিষয়টা ঠিক এমন ছিল, যেন একব্যক্তির সামনে একটা বেলুন এসে পড়ল। সে তাতে হাত লাগিয়ে দেখল এবং ভবিষ্যদ্বাণী করল, কেউ যদি এর গায়ে সুঁইয়ের আগা দ্বারা খোঁচা দেয় কিংবা এতে কাঁটা গেঁথে যায়, তাহলে এটি ফুটো হয়ে যাবে।

এই যুদ্ধে আরব নেতৃত্বের দৃষ্টান্তও ঠিক এ-রকম ছিল। তারা শত্রুর সামরিক প্রস্তুতি ও শক্তিমত্তার মোকাবেলা মৌখিক জমা-খরচ দ্বারা করছিলেন। মিডিয়ার লম্ফঝম্ফ আর রেডিওর তর্জন-গর্জনই ছিল তাদের সাকুল্য পুঁজি। তাদের সারিবদ্ধতা শত্রুর বিরুদ্ধে তো একেবারেই কম ছিল। তাদের প্রস্তুতি মূলত ছিল সেই লোকগুলোর বিরুদ্ধে, যারা বিশ্বাসেও তাদের ভাই ছিল, রক্তে-বংশেও তাদের ভাই ছিল।

কুরআন মুসলমানদের পরিচয় বর্ণনা করেছে এভাবে–

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

মানে মুসলমানের পরিচয় হলো, তারা মুমিনের বেলায় নরম আর কাফেরের বেলায় গরম। কিন্তু আরবের নেতারা পরিচয়টি উল্টে দিলেন। তারা মুমিনের বেলায় গরম আর কাফেরের বেলায় নরম হওয়ার নীতি অবলম্বন করলেন।

মোটকথা, শত্রুর মোকাবেলায় তাদের সমুদয় পুঁজি ছিল গলাবাজি, আমাকে কেউ খুঁজে পাবে না ধরনের এবং নাটকীয়। যেমন– স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা আলীবাবা ও চল্লিশ চোরের নাটক মঞ্চস্থ করে। ফল এই দাঁড়াল যে, যখন বাস্তবতা সামনে এসে পড়ল এবং সত্যিসত্যিই শত্রুবাহিনীর মুখোমুখী হতে হলো, তখন রণাঙ্গনে তারা শত্রুর করুণার মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না। আর এটিই হলো প্রকৃতি ও আকৃতির মোকাবেলার আজীবনের পরিণতি। আমি এ-বিষয়টিকে এভাবেই বুঝেছি এবং অসংখ্য দৃষ্টান্তের সঙ্গে এর ওপর সুদীর্ঘ বক্তব্যও দিয়েছি।

প্রশ্ন : আপনার আগমন এই ঘটনার পরে হয়েছে। আপনি কি এখানকার মানুষের মাঝে এর গভীর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখতে পেয়েছেন?

উত্তর : আপনি আমার জখম তাজা করে দিলেন। আমার ব্যথাভরা অনুভূতিকে উস্কে দিলেন। এখন যা-কিছু বলব, সেসব বলানোর দায় আপনাকেই বহন করতে হবে। সেজন্য আশা করি, আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না।

শুনুন, এই ঘটনার বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া আমি এ-দেশের জীবনযাত্রায় দেখিনি। এখানকার জীবনধারা ঠিক সেভাবে চলছে, যেভাবে এই ঘটনার আগে চলত। যেন কোনো ঘটনা-ই ঘটেনি। যেন আমাদের ইজ্জতের ওপর কোনো আঘাতই আসেনি। যেন পবিত্র কোনো বস্তু আমাদের থেকে ছিনতাই হয়নি। যেন আমাদের আব্রু ও মূল্যবান কোনো সম্পদ আমাদের হাতছাড়া হয়নি। যেন আমাদের মাথার ওপর কোনো আপদ নেমে আসেনি। যেন কেউ আমাদের আত্মমর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ করেনি। অথচ, বাস্তবতা হলো, কিছু একটা ঘটেছে এবং তার সামনে আমাদের জন্য বিরাট শঙ্কা বিরাজ করছে। প্রয়োজন তো ছিল, তাদের চোখের ঘুম হারিয়ে যাবে। জীবনের সুখ-শান্তি সব ম্লান হয়ে যাবে। তারা নিজেকে পর্যন্ত ভুলে যাবে।

প্রশ্ন : আমার শেষ প্রশ্নটি হলো, এই পরাজয়ের ফলাফল থেকে উত্তরণের পথ কী?

উত্তর : একমাত্র পথ ইসলাম। আমাদেরকে নতুন করে ইসলামের পথে ফিরে আসতে হবে। আমি ভাসাভাসা সেসব মূল্যায়নে মোটেও আশ্বস্ত নই, যেগুলো আজ অনেক কলামিস্ট ও চিন্তাবিদগণ উপস্থাপন করছেন। সেই রাজনৈতিক কনফারেন্স আর ডিপ্লোমেটিক সভা-সমিতিগুলোর ওপরও আমার

একদম আস্থা নেই, যেগুলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালা আমি শেষ করেছি। ফিলিস্তিন-বাইতুল মুকাদ্দাসকে বাহানা বানানোর মাঝেও কোনো উপকারিতা আছে বলে আমি মনে করি না, যেটি এখন প্রতিজন বক্তা ও লেখক-কলামিস্টের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। প্রয়োজন যে-জিনিসটির এবং যার দ্বারা কাজ হবে, সেটি হলো, একটি নতুন ঈমানদার প্রজন্ম, যারা না অপমান সহ্য করবে, না উদাসীনতা দ্বারা মন ভোলানোর চেষ্টা করবে। এমন একটি প্রজন্ম, যাদের জীবন হবে পরিপাটি ও বীরত্বের গুণ ও বিশ্বাস দ্বারা সাজানো। যারা ইসলামের আকৃতির নয় – প্রকৃতির ধারক-বাহক হবে। যারা বিজয় ও নুসরতের দায় বহন করবে এবং মর্যাদা ও সমুন্নতি যাদের ভাগ্যের লিখন হবে।

এখন আমাদের সাহিত্য, সাংবাদিকতা, রেডিও, শিক্ষাব্যবস্থা ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই প্রজন্মটির তৈরির কাজে অংশগ্রহণ করবেন। আমদের মাঝে যেটুকু দ্বীন, চরিত্র, ভদ্রতা ও সাহসিকতার প্রতিভা অবশিষ্ট আছে, তাকে পুরোপুরি সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে কোনো খেলুড়ে তাকে নিয়ে আর খেলবার সুযোগ না পায়। এটুকুও যদি বিদায় নিয়ে যায়, তাহলে আর ফিরে আসবে না। এটি সেই নবুওতের উত্তরাধিকার, যার ধারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। এটি হলো মুসলিহীন ও মুরশিদীনের অবশিষ্ট সদগুণ। আর এটি এ-দেশের মূল্যবান সম্পদ।

ভবিষ্যত আরবদেরই জন্য

এই সমালোচনামূলক বক্তব্য ও নিবন্ধের পর আমার মনে হলো, পাছে পাঠক-শ্রোতাদের মাথায় এর কেবল নেতিবাচক প্রভাবটা-ই না পড়ে এবং তাদের মাঝে আপন ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোনো প্রকার হতাশা তৈরি না হয়। আমি এমন একটি নিবন্ধ রচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম, যার ফলে তাদের অন্তরে নতুন আস্থা জন্মায় এবং বিশ্বাস তৈরি হয় যে, ইহুদিরা যতই সফলতা অর্জন করুক-না কেন, আধা পৃথিবীর ওপর তাদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক-না কেন; তাদের কোনোই ভবিষ্যত নেই। আল্লাহর চিরন্তন বিধানে যার দ্বারা উপকার যত বেশি হয়, তার টেকসইও বেশি হওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন–

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

'যা আবর্জনা, তা ফেলে দেওয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে রয়ে যায়।'

আল্লাহ্ হলেন সমস্ত সৃষ্টিজগতের রব। তিনি শুধু বনী ইসরাইলেরই রব নন। তাঁর সঙ্গে কারও আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। দুনিয়াতে তিনি কল্যাণ, সুবিচার, সমতা ও মানবতার মর্যাদার জয়জয়কার দেখতে চান। বিশেষ কোনো বংশের ক্ষমতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, মানুষকে মানুষের গোলাম বানানো এসব তিনি চান না। ইহুদিদের কাছে মানবতার জন্য বিশেষ কোনো বার্তা বা মর্যাদা নেই। নানা রকম দুর্বলতা সত্ত্বেও এসব বৈশিষ্ট্য আরবদের অর্জিত আছে। এখনও তাদের কাছে সেই দ্বীন, সেই কিতাব, সেই শরীয়ত বিদ্যমান আছে, যা কিনা এসব বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক। তাদের কাছে আরও আছে সেই ইতিহাস, যে কিনা মানবতার সম্মান, আদম সন্তানদের ঐক্য ও মানবীয় সমতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছে। এজন্য ভবিষ্যত আরবদেরই। যদি তারা ইসলামি দাওয়াতের ধারক ও সত্য দ্বীনের পতাকাবাহী হতে পারে, তাহলে বিজয় তাদের অবধারিত।

এই নিবন্ধটি আমি الفتح للعرب المسلمين শিরোনামে লিখেছি[১] এবং একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তিকাটি যখন আমীন আল-হুসাইনীর কাছে গিয়ে পৌঁছয়, তখন তিনি তাঁর اللجنه العليا لفلسطين নামক কমিটির পক্ষ থেকে এটি العاقبة للمتقين নামে বৈরুত থেকে প্রকাশ করেন।

আমার এই বক্তৃতা ও নিবন্ধগুলোর সংকলিত আকারে المسلمون وقضية فلسطين নামে বেশ কবার বৈরুত ও দামেশ্ক থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। প্রকাশের আগে আমি তার জন্য একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখে দিয়েছি, যাতে জয়-পরাজয় ও সম্মান-লাঞ্ছনার কারণগুলো কুরআন-হাদীছ ও স্বভাবরীতির আলোকে পর্যালোচনা করেছি। তাতে আমি ইতিহাসের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে উদাসীনতা, বিলাসিতা, ফিরিয়ে নেওয়ার ফলে জাতি, সমাজ ও নেতৃত্বে কীরূপ পরিণতি ঘটে, তার চারিত্রিক ব্যাধি ও বাস্তবতা থেকে মুখ

---

১. 'আলমে আরবী কা আলামিয়া' শিরোনামের সংকলনটিতে এর অনুবাদ 'ইসলাম কে হালকাবগোশ আরবুঁ কো কুরআন কী নাবীদ ফাতাহ' নামে স্থান পেয়েছে।

বিবরণ দিয়েছি। আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি, আরব বিশ্বে এই দুর্বলতাগুলো কীভাবে প্রতিপালিত হতে শুরু করেছিল এবং তার প্রকৃত কারণগুলো কী ছিল। ওখানকার সংশয়বাদী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সাহিত্য[১] ও সাংবাদিকতা আরবদের বোধ-বিশ্বাসকে দীর্ঘদিন যাবতই টলটলায়মান করতে শুরু করে দিয়েছিল এবং এভাবেই এসব দুর্ঘটনার জন্য মাটি সমতল করছিল। সেজন্য বলতে হয়, এই দুর্ঘটনা সেই চিন্তাধারা ও কর্মরীতির উন্নতিরেখা ছিল – সূচনারেখা নয়।

উর্দুতে এই বইটি عالم عربی کا المیہ নামে 'মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম'-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এ-যাবত তার দুটি এডিশন বের হয়ে গেছে। ভারতেরও রুচিশীল ও বাস্তববাদী মহলে এই বইটি বেশ সমাদৃত হয়েছে। কোনো-কোনো চিন্তাবিদ এই বইটিকে লেখকের রচনাবলির মাঝে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

---

১. লেখকদের মাঝে কাসেম আমীন, আহমাদ লুতফী, সাইয়্যিদ বাশা, তাহা ইয়াসীন, মূসা সালামা এবং পত্রিকার মধ্যে 'মাজাল্লা আল-আরাবী' কুয়েত ও 'আল-মুসাব্বির' কায়রো প্রভৃতি তার পতাকাবাহী ছিল।

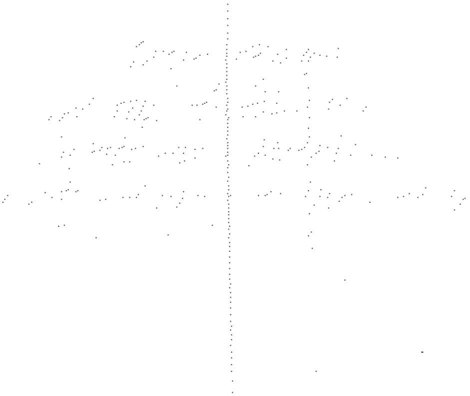

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলির সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও মাঠ পর্যায়ে তৎপরতা

একটি পারস্পরিক বিরোধ ও তার সমাধান

লেখালেখির এই আগ্রহ – যেটি আমার বংশে তিন সিঁড়ি যাবত চলে আসছিল – এর দাবি ছিল, আমি জীবনের অবশিষ্ট অংশটুকু এবং আল্লাহপ্রদত্ত ভালো-মন্দ যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ্য লেখালেখির কাজে কিংবা শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের মাঠে বা যিকির ও ফিকিরের হালকায় (এই সবগুলো কাজের জন্য নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশের প্রয়োজন ছিল) ব্যয় করব। এই সাহিত্যরুচি আমার বংশানুক্রমে প্রাপ্ত। আমার বংশের দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই পৈত্রিক ও মেজাজগত বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে যদি দূরদর্শী কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, তাহলে একথাই বলতেন যে, আমি একজন লেখক কিংবা একজন ছাত্র নতুবা একজন তালেবে সুলুক হিসেবে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব এবং দেশ-জাতির ভালো-মন্দ বিষয়ে এবং আশেপাশে যেসব ঘটনা ঘটছে, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আবর বিশ্বের সঙ্গে আমার আত্মিক ও মানসিক সম্পৃক্ততা এবং সেই সুবাদে আরবি ভাষাকে মত প্রকাশের মাধ্যম বানানো, সর্বোপরি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার দায়িত্ব সব কিছু এই বাস্তবতারই প্রমাণ বহন করছিল।

কিন্তু মানুষ হঠাৎ দেখল, আমি 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম মজলিসে মুশাওরাত'-এর একজন প্রচারক, বরং এর অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতারূপে মাঠে নেমে এলাম। দেশ ও জাতির সমস্যাবলির সঙ্গে আমি সম্পৃক্ত হতে শুরু করলাম। মজলিসে মুশাওরাতের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আমি বিহার, উড়িষ্যা, গুজরাট ও মহিশুরে দীর্ঘ সফর করেছি এবং স্থানে-স্থানে ভাষণও দিয়েছি। 'নেদায়ে

মিল্লাত'-এ আমার সেই নিবন্ধগুলো প্রকাশিত হতে শুরু করল, যেগুলোতে আমি দেশের বর্তমান গতির ওপর তীব্র সমালোচনা করেছি, ইসলামি জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও আশঙ্কাগুলো চিহ্নিত করেছি এবং মুসলমানদের এদেশে সসম্মানে থাকার বরং নৈতিক ও মৌলিক নেতৃত্বের জন্য তাদের পরামর্শ দিয়েছি।

এ ছিল পরস্পরবিরোধী একটি অবস্থান। কিংবা বলা চলে, এটি ছিল একটি ধাঁধা, যার সমাধান আমার সেই বন্ধুদের জন্য সহজ ছিল না, যারা আমার বংশগত মেজাজ, ঐতিহ্য ও আমার শৈশব থেকে এই সময় পর্যন্তকার অবস্থাদি ও ঝোঁক সম্পর্কে অবহিত। অনেক বন্ধু নিজেদের মতো করে এর ব্যাখ্যা করে নিয়েছেন। কেউ একে সাময়িক জোশ ও প্রতিক্রিয়া বলে মন্তব্য করেছেন। কেউ বৈদেশিক প্রতিক্রিয়া ও কাছের লোকদের প্রভাব বলেছেন। কেউবা একে আমার খামখেয়ালি ও অনভিজ্ঞতার ফল আখ্যায়িত করেছেন।

মাওলানা রুমির ভাষায়—

ہر کسے از ظن خود شد یار من
واز درون من نہ جست اسرار من

'সবাই মনে করে তারা আমার বন্ধু হয়ে গেছে। কিন্তু আমার ভেতরের রহস্যটা কেউ অনুসন্ধান করে দেখেনি।'

এর আসল উত্তর হলো, আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যখন দেশের সরকারগুলোর কর্মপরিধি কর উসুল, রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরক্ষা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। তারা এখন জীবনের প্রতিটি বিভাগে হস্তক্ষেপ করতে পারছে। প্রতিটি বিভাগের জন্য নতুন-নতুন আইন তৈরি করতে পারছে। গোটা দেশের জন্য যৌথ পারিবারিক আইন (uniform civil code) তৈরি করতে পারছে। নতুন প্রজন্মের বিশেষ মানসিকতা ও চরিত্র সৃষ্টির জন্য নিত্যনতুন ব্যবস্থা ও শিক্ষা সিলেবাস প্রণয়ন করতে পারছে, যেটি নতুন প্রজন্মের বোধ ও বিশ্বাসের ওপর মারাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করতে এবং নিজেদের অতীত ইতিহাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। এমনকি তারা ভাষা ও হস্তলিপিতেও পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

এই সরকারগুলো সাধারণ ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতার মসনদে আসীন হয়। আবার নেমে যায়। এ-ই যখন অবস্থা যে, সরকারগুলোর পরিধি এত

ব্যাপক ও মানুষের গোটা জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। আর এটি এমন একটি যুগ, যেখানে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ, রাজনৈতিক প্রভাব ও বিচক্ষণতা ছাড়া নিজের সুরক্ষার আর কোনো পথ নেই। এমন একটি জাতি-গোষ্ঠী কী করে দেশের রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারে, যার ধর্মের পরিধি ও চিন্তা-চেতনা গোটা জীবনকে ব্যাপৃত করে? অন্যান্য ধর্মগুলোর তুলনায় তার ধর্ম বেশি স্পর্শকাতর ও প্রতিক্রিয়াশীল? এমতাবস্থায় যারা রাজনীতিকে 'নিষিদ্ধ বৃক্ষ'ই নয় শুধু – 'কুরআনে অভিশপ্ত বৃক্ষ' বলে পাঠ শেখান, তার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলার পরামর্শ দেন কিংবা এই শিক্ষা প্রদান করেন যে, তোমরা ফারসি ও মাড়োয়াড়িদের মতো শুধু সেবামূলক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাও কিংবা কেবল নিজেদের অর্থনৈতিক পজিশনকে মজবুত করা বা শিক্ষার মান উন্নত করার প্রতি পুরোপুরি নিবিষ্ট থাকো, এরা মূলত মুসলমানদের সামাজিক ও জাতীয়ভাবে আত্মহত্যারই পরামর্শ প্রদান করছেন। কারণ, মুসলমান এভাবে না নিজেদের ঐতিহ্য-অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারবে, না তারা আপন কর্তব্য ও দ্বীনি পরিচয় ও পারিবারিক আইনের সাথে টিকে থাকতে সক্ষম হবে, না নিজেদের বোধ-বিশ্বাসে ধারা বহাল রাখতে পারবে। নেতৃত্ব ও দাওয়াতের বিষয়টির কথা নাহয় এখানে বললামই না। (যেটি এই জাতির মৌলিক কাজ) এমনটা হলে এদেশে নিজেদের স্বাধীন সত্তা নিয়ে জীবনযাপন করা আমাদের সম্ভব হবে না।

বিদ্যাচর্চা ও চিন্তা-চেতনার যে-পরিবেশে আমার প্রতিপালন হয়েছিল, জীবনের প্রকৃতি ও বাইরের জীবনের সঙ্গে বরাবরই যার সম্পর্ক বিরাজ করছিল, সেই পরিবেশ আমাকে কখনও এই চিন্তাধারা অবলম্বনের অনুমতি দেয়নি। আর বিশেষ একটি যুগ ও দেশে অবস্থান করে মুসলমানদের জাতীয় সমস্যাদির গুরুত্ব এবং তার জন্য কাজ করার প্রয়োজনীয়তা থেকেও আমি কখনও চোখ ফিরিয়ে রাখতে পারিনি। এই শিক্ষা-দীক্ষারই ক্রিয়া ছিল যে, আমি আমার আসল আমলি ও দ্বীনি ঝোঁক এবং শিক্ষকতা ও লেখালেখির ব্যস্ততা সত্ত্বেও এই সমস্যাগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করলাম এবং অন্ততপক্ষে যারা এই ময়দানে কাজ করছিলেন, আমার অন্তরে তাদের জন্য শ্রদ্ধাবোধ ও তাদের কাজের মূল্য-মর্যাদা সৃষ্টি হলো। আর পরে যখন সুযোগ এল, তখন আমি নিজের পরিধির মধ্যে অবস্থান করেই তাদের সঙ্গ দিতে ত্রুটি করিনি।

একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার

ঘটনাক্রমে হঠাৎ একদিন 'নেদায়ে মিল্লাত' ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সংখ্যাটির ওপর আমার চোখ পড়ল। পত্রিকাটির এক প্রতিনিধি[১] এ বিষয়ে আমার থেকে একটি সাক্ষাতকার নিয়েছিল এবং এই বিরুদ্ধপূর্ণ সিদ্ধান্তের একটি সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিল। এই প্রশ্নোত্তরে এই বৈপরীত্বের শুধু সমাধানই হয়নি; বরং বর্তমানকার পরিবেশ-পরিস্থিতির ব্যাপারেও ভালো একটি আলোকপাত হয়েছে। সেই আলোচনাটির উল্লেখ ছাড়া আমার এই আত্মজীবনী সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই এখানে সংক্ষেপে তার অতি প্রয়োজনীয় একটি অংশ তুলে ধরলাম।

প্রশ্ন : এই সম্প্রতিই আপনার তরতাজা রচনা 'হায়াতে আবদুল হাই' প্রকাশিত হয়েছে। বইটি পড়ে জানা গেল, আপনার পিতা মাওলানা হাকীম সাইয়্যিদ আবদুল হাই সাহেব (রহ.), আপনার দাদা ও পরদাদা সবাই নীরব ইল্‌মি ও দ্বীনি মেজাজের বুযুর্গ ছিলেন, যাঁদের আসল রুচি, আগ্রহ ও পছন্দনীয় ব্যস্ততা ছিল লেখালেখি, তাসাওউফ ও সুলূক। ১৯৬৪ সালের আগে আমরা আপনাকেও কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে দেখিনি। বিদ্যাচর্চা, অধ্যয়ন ও লেখালেখির সঙ্গে রাজনীতির সহাবস্থান সব সময়ই দুষ্কর প্রমাণিত হয়েছে এবং একে সিসা-লোহা আর আগুন-পানির সহাবস্থানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আপনার জন্য রাজনীতির মাঠে পদার্পণের বিশেষ কোনো কারণ সৃষ্টি হয়েছে এবং আপনার মেজাজে বাস্তবিকই কোনো পরিবর্তন এসেছে, নাকি এই অবস্থান স্রেফ একটা প্রচারণা আর অপবাদের বেশি কিছু নয়? ব্যাপারটা আসলে কী?

উত্তর : আপনার এই বিস্ময় অসঙ্গত নয়। বাস্তবিকই যারা আমার বংশের বুযুর্গদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত, এর মধ্যে তারা একধরনের বৈপিরীত্য অনুভব করবেনই।

কিন্তু আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন, আমার বংশের বুযুর্গরা বিভিন্ন যুগে ইসলামের পুনরুত্থান ও দ্বীনের সমুন্নতির জন্য ময়দানে আসতে থাকেন এবং এর জন্য তাঁরা বারবারই নির্জনবাস ও নিজেদের প্রিয় ব্যস্ততাগুলোকে বিদায়

---

১. এই প্রতিনিধি ছিল আমার স্নেহাস্পদ মৌলভী নাযরুল হাফীয নদভী, যে কিনা দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা ও জামে' আযহার থেকে শিক্ষাসমাপণের পর বর্তমানে দারুল উলূমে শিক্ষকতা করছে।

জানিয়েছেন। তাঁদের মাঝে ত্রয়োদশ হিজরি শতকের মহান মুজাহিদ সাইয়িদ আহমাদ শহীদের নাম ও কীর্তি সবচেয়ে উজ্জ্বল। আপনার নিশ্চয় একথাটিও মনে থাকবে যে, আমি আমার যৌবনের শুরুতেই তাঁর জীবনী লিখি, যেটি 'সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ' নামে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক সমাদর লাভ করে। এই গ্রন্থটিরই সূত্র ধরে স্বভাবতই তার দাওয়াত ও আযিমতের দিকটিকে সবচেয়ে বেশি ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে। একজন লেখক হিসেবেও এবং বংশগত সম্পর্ক ও আস্থা-ভক্তির ভিত্তিতেও এই তরুণ বয়সে আমার মন-মস্তিষ্কের ওপর তাঁর প্রভাব তৈরি হওয়া এবং একেবারে বদ্ধমূল হয়ে যাওয়া একটি কুদরতি বিষয় ছিল। তাতেই আমার হৃদয়পাতে এই নকশাটি স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল যে, ইকবালের ভাষায় 'মাটির কোলে তাসবীহ ও মুনাজাত এবং বিশাল আকাশে অনবরত তাকবীরধ্বনি' আজীবন প্রাধান্য পেতে থাকবে।

কিন্তু এই বিশ্বাস ও আগ্রহের ওপর ধীরে-ধীরে আমার বিদ্যাচর্চা ও লেখালেখির ব্যস্ততা প্রাধান্য পেতে থাকে এবং এই ব্যস্ততা আমাকে পুনরায় অধ্যয়ন ও লেখালেখির আরাম কোণে পৌঁছিয়ে দেয়। কিন্তু হৃদয়ের এই খটকা বরাবরই অব্যাহত থাকল যে, যখন গোটা পরিবেশে অধঃপতন ছড়িয়ে পড়ল এবং আমরা সবাই যে-নৌকাটায় সাওয়ার আছি, আমাদের সমুদয় মানবীয় ও জাতীয় সম্পদ বোঝাই করা, সেটিতে ফুটো হয়ে গেছে, তখন সেই ব্যস্ততা আর সেই চেষ্টা-সাধনা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা কতখানি যুক্তিসঙ্গত হতে পারে, যার উপকারিতা গুটিকতক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং যার ফলাফল প্রকাশ পেতে বছরের-পর-বছর সময় লেগে যায়?

আমার এই চিন্তারই প্রথম ফলাফল সেই সফর ছিল, যেটি আমি ১৯৬৪ সালে কলিকাতা, জমশেদপুর ও রাওয়ারকেলাতে করেছিলাম এবং তারই ফলে 'মুসলিম মজলিসে মুশাওয়ারাত' গঠনে আমি না শুধু অংশীদারই ছিলাম; বরং তার আহ্বায়ক ও দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় তার অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে তার মূল মেজবান হওয়ার দায়িত্বও আমাকে বরণ করতে হয়েছিল।

সে সময় ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে ঐক্য ও আস্থা তৈরি করা, শত্রুতা ও বিদ্বেষ দূর করা, মানবতা ও একই দেশের নাগরিক হওয়ার মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো, যাতে শান্তিময় পরিবেশ ও

স্থিতিশীল অবস্থার মধ্যে সব ধরনের শিক্ষাগত, গঠনমূলক, সংশোধনিমূলক ও গবেষণামূলক কাজ করা যায় এবং মিল্লাতে ইসলামী না শুধু নিজেদের ধারাবাহিকতা-ই বজায় রাখতে সক্ষম হবে; বরং এই দেশ ও দেশের মানুষকে সঠিক পথ ও আলোর দিশা দিতে পারবে। অনুরূপভাবে 'শ্রেষ্ঠ জাতি'র কর্তব্যও আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে। অপর দিকে মুসলমানদের মাঝে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি ও পরিস্থিতির মোকাবেলা করার সাহস, শক্তি ও নিজেদের সমস্যাদির সমাধানের যোগ্যতা তৈরি করার জন্য তাদের এক মঞ্চে তুলে আনার ও তাদের বিভিন্ন দলকে (বিলুপ্ত করা বা এক দলে রূপান্তরিত করার পরিবর্তে) একটি জোট তৈরি করার চিন্তা জাগল, যেটি একক লক্ষ্যের ওপর একমত হয়ে কাজ করবে এবং নিজেদের বিশেষ কাজগুলোতে যথারীতি তৎপর থাকবে।

এটি ছিল সেই পটভূমি, যার ওপর ভিত্তি করে ১৫ ও ১৬ আগস্ট ১৯৬৪ সালে লাখনৌতে 'মুসলিম মজলিসে মুশাওয়ারাত' প্রতিষ্ঠিত হয় আর আমি তার প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বিহার, উড়িষ্যা ও গুজরাট সফর করি। এই সফরে আমি গঠনমূলক, সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করি। মানুষের সামনে সত্যিকার দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, মানুষের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত-সম্ভ্রমের মূল্য সম্পর্কে অত্যন্ত জোরালো অনুভূতি প্রদান করা হয়। দেশের প্রকৃত সমস্যা ও শঙ্কা চিহ্নিত করা হয়। তাতে একদিকে ভিন্ন চিন্তার মুসলমানদের এবং অন্যদিকে দূরে-দূরে অবস্থানকারী লোকদের ও হিন্দু-মুসলমানদের বারবার একসঙ্গে বসার ও কাছে থেকে দেখার সুযোগ ঘটেছে।

প্রশ্ন : মাফ করবেন; আপনি দেশের রাজনীতি ও নির্বাচনে মুসলমানদের কর্মপদ্ধতি ঠিক করার বিষয়টি কেন মাথায় নিলেন? আপনার মেজাজ তো সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এবং জীবন আপনার নিরেট দ্বীনি ও বিদ্যাচর্চার মধ্য দিয়েই অতিক্রান্ত হয়েছে?

উত্তর : ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় আমার মস্তিষ্কে এই বিষয়টিই প্রবল ছিল যে, এদেশে মুসলমানরা তাদের রাজনৈতিক ওজন প্রমাণিত করার জন্য এবং তারা যে একটি নিয়ামক শক্তির মর্যাদা রাখে এ-বিষয়টি সপ্রমাণিত করার জন্য তাদের কোনো রাজনৈতিক দলের অনুগামী না থাকা উচিত এবং স্বাধীনভাবে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা আবশ্যক। এটি সেই সময় ছিল, যখন মনে করা হতো, মুসলমানদের ভবিষ্যত ও ভাগ্য

স্থায়ীভাবেই কংগ্রেসের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে এবং মুসলমানদের ভোট তার পকেটে পড়ে আছে। আমি চাচ্ছিলাম, এ-বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাক যে, মুসলমানরা কোনো দলের কাছে দাসখত লিখে দেয়নি। আমার চিন্তাধারা তখনও এমন ছিল, এখনও এমনই আছে যে, কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের প্রমাণিত করা দরকার, যেভাবে তাদের মাঝে উপকার করার যোগ্যতা আছে, তেমনি চাইলে তারা ক্ষতিও করতে পারে (ভদ্রতার খাতিরে সেটি তারা কখনও করবে না, সে ভিন্ন কথা)। যাতে কোনো দল তাদের একমাত্র উপকারের মাধ্যম মনে করে তাদের অধিকার ও সমস্যাদিকে একের-পর-এক উপেক্ষা করে চলতে না পারে। সে সময় আমি প্রায়ই ইকবালের এই দুটি চরণ আবৃত্তি করতাম–

تمیز خار وگل سے آشکارا نسیم صبح کی روشن ضمیری
حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوئے حریری

'ফুল ও কাঁটার পার্থক্য যতটা না সুস্পষ্ট, তার চেয়ে বেশি উজ্জ্বল ভোরের মৃদুমন্দ বায়ুর ফুরফুরে মন। ফুলের সুরক্ষা সম্ভব হয় না যদি কাঁটার মাঝে থাকে রেশমের স্বভাব।'

মহিশুর রাজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সফর

প্রথম খণ্ডে বিহার, উড়িষ্যা ও গুজরাটের সেই সফরগুলোর আলোচনা করেছি, যেগুলো 'মুসলিম মজলিসে মুশাওরাত'-এর প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আঞ্জাম দেওয়া হয়েছিল। এই ধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘ সফরটির আলোচনা – যেটি ১৯৬৬ সালের ১১ থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত মহিশুর রাজ্যে করা হয়েছিল – এই দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল। কারণ, এর সূচনা হয়েছিল ১৯৬৫ সালের পর থেকে। সাড়ে চার হাজার মাইলের দীর্ঘ সফর, যেটি 'মুসলিম মজলিসে মুশাওয়ারাত'-এর প্রতিনিধিদল সম্পন্ন করেছিলেন। সফরে মজলিসের প্রায় সব কজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও শরীক দলগুলোর দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। বলা চলে, এটি এমন এক দীর্ঘ, ব্যাপক ও প্রভাবশালী সফর ছিল, যেমনটি ভারতের সুসংগঠিত দলও নিকট অতীতে আঞ্জাম দিতে পারেনি। এই ঐতিহাসিক সফরের ইতিবৃত্ত খোদ লেখক সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যেটি প্রথমে 'নেদায়ে মিল্লাত'-এর[১] কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরে 'মহিশুর রাজ্যে

১. 'নেদায়ে মিল্লাত' লাখনৌ : ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

বারো দিন' শিরোনামে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। আমি এই নিবন্ধগুলোর সূচনা গোলাম হামদানি মাসহাফির এই সারগর্ভ পঙ্ক্তিটি দ্বারা করেছিলাম–

چلی بھی جا جرس غنچہ کی صدا نسیم کہیں تو قافلہ نو بہار ٹھہرے گا

এর দ্বারা 'মুসলিম মজলিসে মুশাওয়ারাত'-এর সুউচ্চ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আড়ম্বরপূর্ণ সূচনা, অস্পষ্ট ভবিষ্যত ও অজানা গন্তব্যের ব্যাপারে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আলোকপাত ঘটেছিল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রফেসর রশীদ আহমাদ সিদ্দীকি একপত্রে এই পঙক্তিটির চয়নে আমার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

মোটের ওপর এই প্রতিনিধিদল যে-দূরত্ব অতিক্রম করেছিল, তার পরিমাণ প্রায় সাড়ে চার হাজার মাইল। তার প্রায় দেড় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেছি বাসে করে। কাফেলা মাদ্রাজ থেকে বাসযোগে এই সফর শুরু করে গুলবরগা গিয়ে শেষ করেছিল। কাফেলা ৩৬টি পয়েন্ট হয়ে অতিক্রম করল, যার মধ্যে ১৫টি পয়েন্ট হলো বড়-বড় শহর ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, যেখানে বিরাট-বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সেগুলোতে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেছিলেন। ২১টি ছোট-ছোট পয়েন্টে বিশাল-বিশাল সমাবেশ কাফেলার সদস্যদের স্বাগত জানায়। শরীক দলগুলো তাদের ফুলেল সুভেচ্ছা জানায়। তাঁদের সম্মানে এলাকাবাসী কিংবা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানরা – যাদের বেশিরভাগই ছিল অমুসলিম – তাঁদের সংবর্ধনা জানান। শ্রদ্ধেয় সভাপতি ডক্টর সাইয়্যিদ মাহমুদ সাহেব কিংবা প্রতিনিধিদলের কোনো-না-কোনো সদস্য তাদের সংবর্ধনার উত্তর দেন এবং তাদের কাছে মজলিসের বার্তা পৌঁছিয়ে দেন।

প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানানো এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা

যারা কাফেলাকে স্বাগত জানিয়েছিল, তাদের নিষ্ঠা, আনন্দ ও উদ্দীপনা ছিল দেখার মতো। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এমন দৃশ্য তাহরীকে খেলাফতের (খেলাফত আন্দোলন) পর আর দেখা যায়নি। মনে হচ্ছিল, দক্ষিণ ভারতের এই ভূখণ্ড দেশের গোটা জনপদকে প্রেম-ঐক্য আর মিল্লাতে ইসলামিয়াকে আস্থা-সাহসিকতার বার্তাবাহকদের স্বাগত জানাতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

এ-সফর দ্বারা অনুমিত হলো দেশবাসীর অন্তরে ভালবাসার কীরূপ অঙ্গার, সত্যকে মেনে নেওয়ার কতখানি যোগ্যতা ও সুস্থ চিন্তার প্রতিভা লুকায়িত

আছে। যদি আল্লাহভীরু, নিস্বার্থ কেউ রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে এ দেশের সরল-সোজা মানুষগুলোর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক তৈরি করে এবং মস্তিষ্কের চেয়ে বেশি হৃদয়কে উদ্দেশ করে কথা বলে, তাহলে তারা পতঙ্গের মতো ছুটে আসবে।

এই ভূখণ্ড – যেটি কেবল দক্ষিণ ভারতের নয় – গোটা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে – ভাববাচ্যে ডেকে-ডেকে বলছিল এবং পাহাড়-বন থেকে এই প্রতিধ্বনি কানে আসছিল–

همہ آہوان صحرا سر خود نہادہ بر کف
بہ امید آنکہ روزے بہ شکار خواہی آمد

'বনের হরিণরা সবাই হাতে মাথা রেখে বসে আছে। এই আশায় যে, একদিন কোনো-না-কোনো শিকার এসে তাদের কাছে ধরা দেবে।'

শহীদ টিপু সুলতানের সমাধিতে

এ-সফরে এ-ই প্রথমবারের মতো আমি ১৪ নভেম্বর শহীদ টিপু সুলতানের সমাধিতে গিয়ে হাজির হলাম। জীবনের শুরুতে যখন আমার বুঝ-বুদ্ধির চোখ ফোটে এবং মন-মস্তিষ্ক কাজ করতে শুরু করে, তখন থেকেই টিপু সুলতানের ভক্তি-ভালবাসা আমার দেহে-প্রাণে বদ্ধমূল হয়ে যায়। আমার একান্ত কাছের বন্ধু-সুহৃদদের সঙ্গে আমার যতখানি হৃদ্যতা, তার চেয়ে বেশি আত্মিক সম্পর্ক আমার টিপু সুলতানের সঙ্গে গড়ে ওঠে। যেমনটি আপনারা এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে জানতে পেরেছেন।

আমাদের বংশগত ঐতিহ্য ও কোনো-কোনো ঐতিহাসিক কাগজ-পত্র দ্বারা জানা যাচ্ছে, সাইয়িদ শহীদ (রহ.)-এর বংশের সঙ্গে সুলতান টিপুর বংশের আত্মিক যোগ আছে। সুলতানের মাজার থেকে বের হয়ে এসে আমাদের সফরসঙ্গী ইবরাহীম সুলায়মান শেঠ মাওলানা জাফর আলী খানের দুটি চরণ পাঠ করলেন, যেটি ঘটনার সত্যিকার চিত্র ছিল। শুনে শ্রোতারা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন।

চরণদুটি হলো–

اس کے اٹھتے ہی مسلمان کا گھر بیٹھ گیا
تھا قیامت کا قیام اور قیامت کا قعود

জনকোলাহলের মাঝে নির্জনতা

এই সফরে মীর জাফর আলী বাঙ্গালোরি আমার সঙ্গে অনেক সময় ব্যয় করেছেন। ইনি আলীগড়ের গ্রাজুয়েট এবং উর্দু, ফারসি ও ইংরেজিতে বেশ দক্ষ ছিলেন।[১] তিনি 'কুল্লিয়াতে ইকবাল' নিয়ে আমার কাছে এলেন এবং বলতে শুরু করলেন, শুনেছি, ইকবাল সাহিত্যের সঙ্গে আপনার বেশ সম্পর্ক আছে। যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি আপনাকে কিছু শোনাতে চাই। আমার ইঙ্গিত পেয়ে তিনি সুর ধরে অত্যন্ত জোশের সঙ্গে ইকবালের এই চরণটি পাঠ করলেন—

گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر

'মাথার উজ্জ্বল চুলগুলোকে আরও উজ্জ্বল বানাও।'

তখন থেকেই নিয়ম হয়ে গেল, আমি আমার মামুলাত থেকে অবসর হলাম আর তিনি চলন্ত বাসে সুরেলা কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন বা ইকবালের যে-কবিতাগুলো আমার বিশেষ পছন্দ বলে জানা আছে, সেগুলো পাঠ করতে আরম্ভ করে দিলেন। এভাবে পথ বেশ ভালোভাবেই কেটে যেত এবং বাসের শোরগোলের মধ্যে 'জনকোলাহলের মাঝে নির্জনতা'র স্বাদ পেতাম। এই আসর আমার সম্মানিত সফরসঙ্গীদের নীরবতা ও নির্জনতায় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করত না। এই সফরে ইল্‌মি ও দ্বীনি সম্পর্কের সুবাদে আমার বেশিরভাগ সময় কাটত মাওলানা মুফতী আতীকুর রহমান উছমানী সাহেব ও জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা আবুল লাইছ সাহেবের সঙ্গে।

শাসনের পরিবর্তন ও মর্যাদা-প্রভাপের ক্ষয়িষ্ণুতা

এই সফরে আমি বালগাম, বেজাপুর ও তালকোটের (যেটি দক্ষিণ ভারতের পানিপত ছিল) ঐতিহাসিক শহরটিও দেখেছি এবং মারকার ও

---

১. পরে তিনি 'পয়ামে ইনসানিয়াত'-এর একজন জোরালো দাঈ ও বক্তা হয়ে গিয়েছিলেন। উর্দু ও ইংরেজিতে সমান যোগ্যতার সঙ্গে বক্তৃতা করতেন। 'পছেমানদাহ তাবাকাত কে আন্‌জুমান' (dalit)-এর নেতৃবৃন্দের সাথেও তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তাদের খুব ভক্ত ছিলেন। আল-আমীন কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৮২ সালের ৮ নভেম্বর মঙ্গলবার হঠাৎ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পয়ামে ইনসানিয়াত-এর দাওয়াতি কার্যক্রম ও দক্ষিণ ভারতের বিদ্যা ও সাহিত্যের জগতে বিরাট একটা শূন্যতা রেখে তিনি আখেরাতের সফরে চলে গেছেন। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন।

শামুগার মনোরম জায়গাগুলোও পরিদর্শন করেছি। এই ইহজগতের ক্ষয়িষ্ণুতা, ক্ষমতা-প্রতাপের বেঈমানি ও কালের বিবর্তনের নকশা দেখে মনটা আমার শীতল হয়ে গেল। মুখে আমার এই কবিতাটি জারি হয়ে গেল–

سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے
حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری

'শাসন তো সাজে কেবল সেই সত্তার জন্য, যাঁর কোনো সমকক্ষ নেই। শাসক একমাত্র তিনি। বাকিরা সব অথর্ব।'

এই সফরের প্রোগ্রামগুলো – যার পরিকল্পনা মৌলভী সিরাজুল হাসান সাহেব ও ডক্টর জামাল আহমাদ সাহেব আমীনাবাদি বেশ চমৎকারভাবে তৈরি করেছিলেন – নভেম্বরের ২২ তারিখে গুলবারগার ঐতিহাসিক ও মনোরম মাটিতে গিয়ে সমাপ্ত হলো, যে-মাটি চিশতিয়া ধারার প্রাণপুরুষ ও দক্ষিণ ভারতের মহান মুরশিদ হযরত সাইয়িদ মাহমুদ গেসুদরায (রহ.)-এর বসতভিটা ও সমাধি হওয়ার মর্যাদা পেয়েছে। আমরা দরগার মেহমানখানায় অবস্থান গ্রহণ করলাম। রাতে আজিমুশ্বান জলসা হলো। মনে হচ্ছিল, নগরীর সমস্ত মুসলিম বসতি – যাদের মাহফিলে আসা সম্ভব ছিল – সবাই এসে পড়েছে। লেখকের এখানকার ভাষণই ছিল এই সফরের সর্বশেষ ভাষণ।

গুলবারগার ভাষণ, স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যতের গ্যারান্টি ও জনগণের আত্মপর্যালোচনা না করা ক্ষমতার জন্য ক্ষতিকর

গুলবারগার পরিবেশ, নগরবাসীর নিষ্ঠা-ভালবাসা, সফরের সমাপ্তির অনুভূতি এসবের সুবাদে আমি মন খুলে বক্তৃতা করলাম। প্রথমে মুসলমানদের পদমর্যাদা ও তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করলাম। বললাম, সমস্ত সুফিয়ায়ে কেরাম – যাঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কড়া সেই মহান বুযুর্গ, যিনি এখানকার মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন – এদেশে একটি পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল দাওয়াত ও খেদমত। তাদের দৃষ্টি নেওয়ার চেয়ে দেওয়ার ওপর, উপকার গ্রহণের চেয়ে উপকার পৌঁছানোর ওপর এবং চাওয়ার চেয়ে বিতরণের ওপর বেশি ছিল। আর সেজন্যই তারা সবার প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সবাই তাঁদের সেবা করতেন।

কবির ভাষায়–

عدیل ہمت ساقیست فطرت عرفی
کہ حاتم دگراں وگدائے خویشتن است

তারপর দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করেছি এবং বলেছি, কোনো শাসক দল যদি মনে করে, আমরা অপরিবর্তনীয় কিংবা যদি মনে করে, দেশের এই শাসনক্ষমতা আমাদের নামে লিখে দেওয়া হয়েছে, তাহলে এই চিন্তা-চেতনা তাদের সেই দলটির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়। তাছাড় এই মানসিকতা দেশের জন্যও খুব ঝুঁকিপূর্ণ। আপনাদের চারপাশে যেসব ব্যক্তিগত সাম্রাজ্যগুলো ছড়িয়ে আছে – যেমন গুলবারগার বাহমানি সাম্রাজ্য, বায়দারের বুরীদশাহী, বেজাপুরের আদেশশাহী, গুলকন্ডার কুতুবশাহী, আহমাদ নগরের নেযামশাহী ও বারারের ইমাদশাহী – এগুলো তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই বংশগুলোতে ভালো-ভালো শাসক জন্মলাভ করেছিলেন। এই রাজাগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চিনতেন। এদের অনেকে দ্বীনেরও ভালো জ্ঞান রাখতেন। অনেকে খুব নেককার-পরহেযগার মানুষ ছিলেন। কিন্তু যখন তারা ভাবতে শুরু করলেন, আমাদের কেউ সরাতে পারবে না, রাজত্ব আমাদের বংশ থেকে বিদায় নিয়ে অন্য কোথাও যাবে না, এই রাজত্ব আমাদের নামে রেজিস্ট্রি করে দেওয়া হয়েছে, তখন থেকেই তাঁরা অন্যায় ও অপরাধ শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁদের দ্বারা অনেক বাড়াবাড়ি হয়েছে। তাঁরা নির্ভীক ও বেপরোয়া হয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা শুরু করেছিলেন। মানুষের একটা স্বভাবজাত দুর্বলতা আছে, যখন তার মনে শক্তি ও সম্পদের অনুভূতি জাগে এবং ক্ষমতার নেশা তার ওপর সাওয়ার হয়ে যায়, তখন সে অবাধ্য ও লাগামহীন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এই বাস্তবতাটিই এভাবে বর্ণনা করেছেন–

كَلَّآ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰٓ ۝ أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنَىٰٓ ۝

'কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষ সীমালঙ্ঘন করে, যখন সে দেখে, সে সম্পদশালী হয়ে গেছে।'[১]

যদি গণতান্ত্রিক সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর মনে এই অনুভূতি জেগে যায় যে, আমাদের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না, জনগণ আমাদের

---

১ সূরা আলাক : ৬,৭

কর্মকাণ্ডের হিসাব নিতে পারবে না, আমরা ভুল করলে বা বাড়াবাড়ি করলেও কেউ আমাদের নাগাল পাবে না, তাহলে তাদের আর ব্যক্তি শাসকদের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না। আমাদের গণতন্ত্রে এই নজির স্থাপনের সুযোগ দেওয়া আমাদের উচিত হবে না। আমাদের শাসক ও জনপ্রতিধিদের এমনটা বুঝতে দেওয়া ঠিক হবে না যে, তাদের ক্ষমতায় কোনো পরিবর্তন আসবে না এবং আজীবনই তারা ক্ষমতার এই মসনদে আসীন থাকবে। সেজন্য যখনই সুযোগ হাতে আসবে, ভোটাধিকারি প্রয়োগ করে ক্ষমতার হাতবদলের এবং খারাপ লোকদের পরিবর্তে ভালো লোকদের জনপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা চেষ্টা করা দরকার। তাহলে ক্ষমতাসীনরা সব সময় চৌকান্না ও সচেতন থাকতে বাধ্য হবে এবং কর্তব্যপালনে সচেতন ও সক্রিয় হবে।

মুসলমানদের যে-বিষয়টি বেশি প্রয়োজন, তাহলো, সংবিধান ও দেশের আনুগত্য। কোনো দল বা সরকারের আনুগত্য জরুরি নয়। তা-ই যদি হতো, তাহলে সরকারে কখনও পরিবর্তন আসত না, সরকার বদলানো যেত না। গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব, দেশের সুরক্ষা ও উন্নতির জন্য এটি খুবই জরুরি বিষয়।

তারপর আমি মুসলমানদের কাছে আবেদন জানিয়েছি, আপনারা বস্তুগত জীবনের আরাম-আয়েশ ও সাধারণ নাগরিক সুযোগ-সুবিধাগুলো পেয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন না। সরকারের কাছে অত্যন্ত জোরালোভাবে দাবি জানাবেন এবং আন্দোলন-সংগ্রাম করবেন, যেন আপনারা আপনাদের জাতীয় বৈশিষ্ট-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও পুরোপুরি ধর্মীয় স্বাধীনতার সঙ্গে এদেশে বসবাস করতে পারেন। আমাদেরকে কোনো অবস্থাতেই সেই কুকুরদের নীচু অবস্থানে নেমে আসা যাবে না, যাদের রোজকার খাবারের ব্যবস্থা করে দিলেই তারা নিশ্চিন্ত ও তুষ্ট হয়ে যায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি

ঠিক এ-সময়ে মজলিসে মুশাওয়ারাতের ইতিহাসে এমন কিছু পরিস্থিতি তৈরি হলো এবং দেশে এমন কিছু ঘটনা ঘটল, যার মাঝে মজলিসকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে মুসলমানদের সঠিক দিকনির্দেশনার প্রয়োজন ছিল। সাধারণ নির্বাচন সামনে ছিল এবং মুসলমানদের তাতে একটি সম্মানিত জাতির মতো তাদের কর্মনীতি ও ভূমিকা ঠিক করা আবশ্যক ছিল। সে-সময়ে আমি ডক্টর সাইয়িদ মাহমুদ

সাহেবকে দীর্ঘ একখানা পত্র লিখি, যাতে আমি আমার শঙ্কা ও পরামর্শ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছি। সেই পত্রে আমার দেশের রাজনৈতিক অধ্যয়ন ও জাতীয় অনুভূতি উছলে সামনে এসে পড়েছিল। সেজন্য উক্ত পত্রটি এখানে হুবহু উদ্ধৃত করা আমি অসঙ্গত মনে করি না।

১৯৬৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরে লেখা সেই পত্রটির ভাষ্য নিম্নরূপ–

'শ্রদ্ধেয় জনাব ডক্টর সাহেব যীদা মাজদুহূ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি, আল্লাহ আপনাকে ভালোই রেখেছেন। আমিও ভালো আছি এবং আলহামদুলিল্লাহ রোযাও রাখতে পারছি। গত রমযান পুরোটাই হাসপাতালে কাটিয়েছিলাম এবং একটি রোযাও রাখতে পারিনি। আমার কষ্ট শীতের সময়ই শুরু হয়েছিল। সেজন্য বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। শরীরটাকে, বিশেষ করে চোখদুটোকে কাচের মতো সামলে-সামলে রাখতে হচ্ছে। আল্লাহ করুন, রমযানের পুরোটা মাস যেন রোযা রাখতে পারি এবং আরামের সঙ্গে কাটাতে পারি।

আমার প্রতি আপনার স্নেহ, করুণা ও বিশেষ সম্পর্কের যে-গৌরব আছে, তার ওপর ভিত্তি করে আগেও বেশ বড়-বড় দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছি এবং লম্বা-লম্বা চিঠি দিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ আপনি তাকে সব সময় শুধু ভালো চোখে দেখেছেন এবং অনুমতি প্রদান করেছেন তা-ই নয়; বরং আমার তুচ্ছ আবেদনগুলোকে অনেক গুরুত্বও প্রদান করেছেন এবং সেই অনুপাতে সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছেন।

মজলিসে মুশাওয়ারাত ভারতের ইসলামি জনশক্তির মান-অপমান ও সফলতা-বিফলতার একটি প্রতীক ও পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে। আমি অধমও এর তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত আছি। সেজন্য এর মর্যাদা আমার জন্য প্রায়ই এমন, যেমন কারও একটি চোখের জ্যোতি বিনষ্ট হয়ে গেলে অপর চোখটি ভালো রাখার প্রশ্ন দেখা দেয়।

সাধারণ দু'আগুলো ছাড়াও আমি আজ কয়েক মাস যাবত বিশেষ কোনো অপারগতার শিকার না হলে কোনো একটি দিন এমন অতিবাহিত হয় না যে, আমি এই সংগঠনটির জন্য এস্তেখারার নামায পড়ি না। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি, যেন তিনি আমাদের সবকজন দায়িত্বশীলকে সঠিক পথের দিশা দেন এবং আমাদের সঠিক বুঝ দান করেন। মহান আল্লাহ এই সংগঠনটিকে কল্পনা ও আশার বিপরীতে অসাধারণ যে-গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা দান করেছেন, এটি তার কর্মকর্তাদের যোগ্যতা কিংবা তাদের তৎপরতার ফল নয়। এটি মহান আল্লাহর গায়েবি মদদ ও তাঁর করুণার প্রতিফল, যেটি তিনি হিন্দুস্তানের এই ভূখণ্ডের ইসলামি জনতার ওপর নাযিল করেছেন। কিংবা এটি আপনার বুযুর্গদের ইখলাস ও ঈছারের (নিজের ওপর অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা) ফলাফল এবং আল্লাহপাকের বিশেষ করুণা যে, তিনি আপনার মাধ্যমে এর দাওয়াত ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আপনার চারপাশে মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত ও বিরোধপূর্ণ উপাদানগুলোকে একত্রিত করে দিয়েছেন।

কবির ভাষায়–

ایں سعادت بزور بازو نیست
تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

'এই সৌভাগ্য বাহুবলে অর্জিত হয় না। আল্লাহ না দিলে এই সৌভাগ্যের নাগাল কেউ পায় না।'

এখন মজলিস আবারও একটা নাজুক স্তরে পৌঁছে গেছে। এ-ক্ষেত্রেও আপনারই দৃঢ়তা, ঈছার, কুরবানি ও সাংগঠনিক যোগ্যতার প্রয়োজন।

বিগত দাঙ্গাগুলোতে মুসলামানদের মনে অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে যে, এ-দেশে তাদের জীবন-সম্পদ ও ইজ্জত-সম্ভ্রম একটি মূল্যহীন ও অসার বস্তু। অপরদিকে তাদের মৌলিক সমস্যাবলির (শিক্ষা, ভাষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো) ব্যাপারে

সরকার যে-ধরনের অবহেলা প্রদর্শন করেছে, তাতে তাদের ওজনহীন ও প্রভাবহীন হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। এটিও ভালোভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এদেশে মুসলমানদেরকে তাদের ওজনের প্রমাণ দিতে হবে। তার কারণ হলো, যেমনটি আমি আপনার উপস্থিতিতেও আমার বিভিন্ন ভাষণে বলেছি, আমাদেরকে নিজেদের মর্যাদা অটুট রাখতে, সর্বোপরি এই সমস্যাগুলোর – যেগুলো আমাদের জন্য ধমনির মর্যাদা রাখে – সমাধানের জন্য বাধ্য হয়েই আমাদেরকে লাভ-লসের ভাষা ব্যবহার করতে হবে। কারণ, এ-যুগে লাভ-লসের ভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষা গ্রহণযোগ্য নয়। এরই ওপর ভিত্তি করে আমরা (যাদের মাঝে আমি পুরোপুরি অংশীদার ছিলাম) ১৯৬৬ সালের ২২ জুলাইয়ের সভায় জোরালোভাবে দাবি উপস্থাপন করেছিলাম যে, ঘোষণাপত্রে এ-কথাটি (যেটি সৌভাগ্যক্রমে আপনারই মুখ থেকে বের হয়েছিল) অন্তর্ভুক্ত করা হোক যে, 'হিন্দুস্তানের মুসলমানরা বিশেষ কোনো দলের নামে দাসখত লিখে দেয়নি'।

এ-ক্ষেত্রে আমি আপনাকে অনেক আশান্বিত করেছিলাম এবং আপনার কাছে জিদ ধরেছিলাম। আপনি একজন স্নেহশীল মুরুব্বীর মতো, প্রিয় সন্তানের মতো আমার জিদ পূরণ করে দিয়েছিলেন। আমি পূর্ণ আস্থার সঙ্গে আপনাকে অবহিত করছি, এই বাক্যটি একদিকে মুসলমানদের মাঝে জীবনের একটি নতুন ঢেউ সৃষ্টি করে দিয়েছে, যার বহিঃপ্রকাশ আমরা মহিশুরের সফরে প্রত্যক্ষ করেছি। মুসলমানরা যেরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনা, যেরূপ নিষ্ঠা ও জোশের সঙ্গে আমাদের বরণ করেছিল এবং যেভাবে আমাদের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছিল, তার পেছনে এই উচ্ছ্বাস ও আস্থাই কাজ করছিল যে, আমাদের নেতৃবৃন্দ আত্মসচেতন ও আত্মপ্রত্যয়ী। তাঁরা জাতির সঠিক অবস্থান চেনেন এবং তাঁরা কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড় নয়।

অপর দিকে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোতে, এমনকি খোদ সরকারি দলের মধ্যেও এই অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে যে,

মুসলমানদের সম্মিলিত নেতৃত্ব – যেটি সময়ের একটি অলৌকিক বিষয় – একটি উঁচু জায়গা থেকে কথা বলে এবং তার সঙ্গে ইসলামি জনগোষ্ঠীর বেঁচা-কেনার কোনো সম্পর্ক তৈরি করা সম্ভব নয়। মজলিসের সভা-সমাবেশ ও কনফারেন্সগুলোর আদলে সারা দেশে স্বাগতম-স্বাগতম স্লোগান চলছে এবং হঠাৎ করে মুসলমানদের ওজন বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। সর্বোপরি জনমনে এই অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে যে, মুসলমানরা এদেশে একটি স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে সক্ষম এবং নির্বাচনের পাল্লায় নিজের ওজন করে কাউকে উপকার বা অপকার করার শক্তি রাখে। ইতিমধ্যেই আশার সঞ্চার হয়েছে যে, এই সংগঠনের প্রভাবে মুসলমানদের সমস্যাবলির ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাবে।

কিন্তু ন্যাশনালিস্ট মুসলমানরা এবং বিশেষ করে কংগ্রেসের টিকেটে দাঁড়ানো প্রার্থীরা এর মাঝে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে এবং সরকার পুনরায় ভুল পথে হাঁটতে শুরু করেছে যে, মুসলমানদের জনমত ও তাদের আসল চেতনার পরিবর্তে একটি এজেন্সির কথা অনুযায়ী কাজ করছে। আপনার নিশ্চয় জানা আছে, আমি ব্যক্তিগতভাবে (আপনাকে বাদ দিয়ে বলছি) আমার বন্ধু-সহকর্মীদের মাঝে সব চেয়ে বেশি মুসলমানদের সেবক ও শ্রেষ্ঠ জাতির অংশ হওয়ার অবস্থানটিকে ফুটিয়ে তুলতে আগ্রহী। আমি কয়েক বছর হিন্দুস্তানের সমাবেশগুলোতে – যেগুলোতে ৮-১০ হাজার করে লোকের সমাগম হয়েছে – কুরআনি পয়গাম ও ইসলামের নৈতিক ও মানবিক দাওয়াত উপস্থাপন করেছি। তার দুটি সংকলন 'পয়ামে ইনসানিয়াত' ও মাকামে ইনসানিয়াত' প্রকাশিত হয়েছে। এখনও আমার আসল মেজাজ, মূল চিন্তা এটিই। কিন্তু ছয় কোটি মানুষের এই জাতিটির সেই সমস্যাগুলোকে – যেগুলোর ওপর জাতি হিসেবে তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল – ঝুলিয়ে রাখা যায় না। তার ফলাফল তো এই হবে যে, যতক্ষণে আমাদের আহ্বান শোনার জন্য মানুষ প্রস্তুত হবে, ততক্ষণে এই জাতি তাদের জাতীয় অস্তিত্ব থেকে বঞ্চিত এবং

চিন্তা-চেতনা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি ধর্মহীনতার শিকারে পরিণত হয়ে যাবে। এর জন্য এ-দেশের পৈত্রিক গোঁড়ামি ও অহমিকা মারাত্মকভাবে দায়ী। তা ছাড়া পাকিস্তানের উপস্থিতিও এর মধ্যে আরও সংকট তৈরি করে দিয়েছে।

এই অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার সারমর্ম হলো, আমি আমার সমস্ত চিন্তা-চেতনা ও বংশগত ঐতিহ্যের বিপক্ষে নির্বাচনে মুসলমানদের প্রভাবক ও নিয়ামক প্রমাণিত করার পক্ষে এবং এই নির্বাচন দ্বারা – যার পরে পাঁচটি বছর অপেক্ষা করতে হবে – অবশ্যই শক্তিশালী পার্টি ও সরকারকে বোঝাতে চাই, মুসলমানরা এদেশে অশান্তি ও অস্থিরতার মধ্যে আছে। তাদের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং দেশের রাজনীতির ওপর তারা প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম। কাজেই তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করা ব্যতীত কোনো দলই একনাগাড়ে সরকারে থাকতে পারবে না। তাই ক্ষমতাশীল দলকে বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে এবং তাদেরকে আশান্বিত করতে হবে। দেশের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার দাবিও এটিই যে, সরকারকে এই পাঠ শেখাতে হবে। কোনো দলই যেন মনে করতে না পারে, দেশের মালিকানা তার নামে লিখে দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় তার মাঝে সনাতন ব্যক্তিসাম্রাজ্য ও বংশগুলোর সেসব দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেগুলোর কারণে সেই সরকারগুলোর ইতিহাস কালিমালিপ্ত ও মানবতার কপাল কলঙ্কিত হয়ে আছে।

আমি আমার বালগাম ও গুলবারগার ভাষণে এই বিষয়বস্তুটি অতন্ত স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছি এবং বলেছি, ওই ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজ্যগুলোতে, যেগুলো বিশেষ করে এই অঞ্চলে শতাব্দির-পর-শতাব্দি যাবত টিকে ছিল, সেসবের শাসকরা অত্যন্ত ভালো ও ফেরেশতা-চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তাদের বেশিরভাগই ধর্মানুরাগী ও ধর্মীয় বিধিবিধানের অনুসারী ছিলেন। অনেকে দ্বীন ও শরীয়তের বড় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু যখন তারা নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন যে, আমাদের কেউ

কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং এই দেশ আমাদের নামে লিখে দেওয়া হয়েছে, তখনই তারা মনমতো চলা শুরু করে দিয়েছিলেন এবং তাদের দ্বারা বড়-বড় অন্যায়-অবিচারের কাজ সংঘটিত হয়েছিল।

কংগ্রেস পার্টি তো এমন কোনো নৈতিক প্রশিক্ষণও পায়নি, যেমনটি তারা পেয়েছিল। সেজন্য এই যে মনে করা হচ্ছে, আমাদের কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আমরা অক্ষয় এবং এ-দেশের, বিশেষ করে মুসলমানদের ভাগ্য আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত; এজাতীয় চিন্তা-ভাবনা খুবই মারাত্মক মানসিকতা তৈরি করে দেবে এবং দেশটাকে ধ্বংস করে ফেলবে। এজন্য নির্বাচনের রাজনৈতিক দলগুলোর এই শিক্ষা পাওয়া আবশ্যক যে, পরিস্থিতি সব সময় একরকম থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের মতো কর্তব্য হলো, তারা সাংবিধানিক সীমানার মধ্যে অবস্থান করে তাদের এই অশান্তির কথা জানান দেবে এবং শাসক দলকে তার অবহেলার শাস্তি দেবে। সেজন্যই দীর্ঘকাল যাবত আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, যখন ছোট-ছোট সমস্যা ও ব্যক্তিগত অসুবিধা ও অবিচারের অজুহাতে রাজাজি এবং সর্বশেষে কৃষ্ণা মেননের মতো মানুষ কংগ্রেস ত্যাগ করে বসেছে, সেখানে আপনি, যিনি বর্তমানে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় নেতা; এই অজুহাতে ইস্তফা দিয়ে দিন যে, আমি কংগ্রেসের পলিসিতে আশ্বস্ত নই এবং এই দলটি মুসলমানদের সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই এখন আর আমি এর সঙ্গে নেই।

১৩ ডিসেম্বর মজলিসের সভায় যে-রেজুলেশনটি পাস হয়েছিল, আমার মতে তাতে যদি স্পষ্টভাবে এই অনুভূতিগুলোও অন্তর্ভুক্ত হতো, যেগুলো এই নিবেদনপত্রে আমি উপস্থাপন করেছি, তাহলে খুবই ভালো হতো। কিন্তু আমি সেই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলাম না। আপনারা সবাই চুলচেরা আলোচনার পর তাকে মঞ্জুর করে নিয়েছেন। সেই

রেজুলেশনটি এই অর্থে একটি মূল্যবান সম্পদ ছিল যে, তাতে নির্বাচনের ব্যাপারে কিছু নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল এবং নেতিবাচকের পরিবর্তে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছিল। কিন্তু আমার ধারণা ছিল এবং এখনও আছে, সাধারণ মুসলমানদের আবেগ এর দ্বারা শান্ত হয় না।

এখন এক্ষেত্রে মাঝামাঝি পথ এটি হতে পারে, যেমনটি আগেও এই মূলনীতি মেনে নেওয়া হয়েছিল যে, প্রদেশগুলোকে আপন-আপন পরিস্থিতি অনুসারে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে এবং এই অনুমতি দেওয়া হবে যে, শাখাগুলো ঘোষণাপত্রের নির্দেশনামূলক নীতিমালা অনুসারে কাজ করবে। বিশেষভাবে ইউ.পি। কারণ, এই প্রদেশটি হলো মুসলিম নিপীড়নের সবচেয়ে বড় পয়েন্ট এবং এখানে উক্ত ছয় মাসে (পরতাবগড়ের বৈঠকের পর) অনেক কাজ করা হয়েছে। কেননা, এখানকার পরিস্থিতির বিশেষ একটি ধরন আছে।

আমার খুব আফসোস লাগছে, ডক্টর ফরীদি সাহেবের প্রেস কনফারেন্সের কারণে আপনি খুব কষ্ট পেয়েছেন। আমি তার থেকে ওয়াদা নিয়েছি, এখন আর তিনি কোনো প্রেস কনফারেন্স করবেন না এবং এমন কোনো কাজও করবেন না, যার দ্বারা মজলিসের বিগত রেজুলেশন বা ঘোষণাপত্রের সঙ্গে বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন, এখন আপনিও তাকে ক্ষমা করে দিন। আর এখন না কেন্দ্র থেকে এমন কোনো কথা বলা হবে, না কোনো প্রদেশ থেকে, যার ফলে মুসলমানদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং কর্ম ও চিন্তার বিরোধ প্রকাশ পায়। এমন কোনো কথাও বলা যাবে না, যার ফলে মুসলমানদের মাঝে হতাশা বা কুধারণা তৈরির সুযোগ ঘটে যে, নেতারা তাদের প্রকৃত চেতনা অনুমান করতে ব্যর্থ হচ্ছেন এবং তাদের সমস্যাবলির ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতির মাঝেই মজলিস টিকে থাকতে এবং মুসলমানদের খেদমত আঞ্জাম দিতে পারে। সংগঠন যদি তাদের বৈধ দাবি ও চেতনাগুলোর

বৈধ ও সম্ভাবনার সীমানা পর্যন্ত প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাতে তারা আশ্বস্ত হয়, তবেই সংগঠন সাফল্যের সঙ্গে টিকে থাকবে।

এই নিবেদনপত্রটি আমি অনেক তাড়াহুড়ার মধ্যে লিখছি। লেখার পর দ্বিতীয়বার আর চোখ বোলানোর সুযোগ হয়নি। যদি কোথাও সীমালঙ্ঘন হয়ে থাকে, তাহলে মুরুব্বিসুলভ মমতায় ক্ষমা করে দেবেন।

ওয়াস সালাম

বিনীত

আবুল হাসান আলী

১৫ রমযানুল মুবারক, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৬৬

তাকিয়া কেলা, রায়বেরেলি।

মজলিসে মুশাওয়ারাতের বিশৃঙ্খলা ও মতানৈক্যের কাল

কিন্তু ১৯৬৭ সালের নির্বাচন সরাসরি মজলিসের জন্য এবং পরোক্ষভাবে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য খুবই অকল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে। মজলিস এ-যাবত অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যেই পথ চলছিল। নির্বাচনের নির্দয় ও কঠিন ভাষা – যা কিনা জ্যামিতির মতো দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নয়; বরং বাস্তব সিদ্ধান্তের ওপর, অস্পষ্টতা নয়; বরং সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের ওপর বিশ্বাস রাখে – মজলিসের ঐক্যকে তছনছ করে দিল। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনযুদ্ধ যখন মাথার ওপর চলে এল, তখন একটি পক্ষ – যার মাঝে আমাদের বন্ধু ডক্টর ফরীদি সবার সামনে ছিলেন এবং অনেক সহকর্মীও মোটামোটি তার সমর্থক ছিলেন – দাবি করছিলেন, মজলিসকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হোক এবং খোদ ডক্টর সাহেবের ভাষায় 'একটিবারের জন্য প্রমাণিত করে দিন, মুসলমানরা কংগ্রেসের জন্য দাসখত লিখে দেয়নি'। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও টানা-হেঁচড়ার পর এই প্রস্তাব মঞ্জুর হলো। কিন্তু সিদ্ধান্তের ভাষ্য অত্যন্ত দক্ষতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে প্রস্তুত করা হলো, যাতে আমাদের বন্ধু ও 'দাওয়াত'-এর সম্পাদক মৌলভী মুহাম্মাদ মুসলিম সাহেবের সাংবাদিকতার যোগ্যতা ও ভারসাম্যপূর্ণ মস্তিষ্কের বেশ দখল ছিল এবং যার বর্ণ ও আবেদন রাজনীতির চেয়ে বেশি নৈতিক ও নীতিনির্ধারক ছিল। ডক্টর সাহেব যথারীতি

আমাদের মানবতার খাতিরে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই ঘোষণাপত্রটি বরণ করে নিলেন।

মজলিসের সদস্যরা ইউ.পিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করল এবং কংগ্রেসি প্রার্থীদের বিরুদ্ধাচরণ করল। কোনো-কোনো সদস্য নিজ প্রদেশে কংগ্রেসি প্রার্থীদের সমর্থন ও সহযোগিতা করল। আর সেই সমস্ত ঘটনা ঘটল, যেগুলো থেকে নির্বাচনের ডামাডোলের মধ্যে রক্ষা পাওয়া যায় না। এই বিরোধপূর্ণ কর্মনীতি মজলিসের ঐক্যে বিরাট ফাটল ধরিয়ে দিল এবং মজলিসের শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে বলে দেখা যেতে শুরু করল। বিশেষ করে ডক্টর সাহেব এই পরিস্থিতি দ্বারা খুবই প্রভাবিত ছিলেন। এই মানসিক দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতার মাঝে ২ ও ৩ এপ্রিল ১৯৬৭ দিল্লিতে মজলিসের সভা অনুষ্ঠিত হলো। ডক্টর সাহেব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবেন বলে জিদ ধরলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টার মাধ্যমে তাকে এর থেকে বিরত রাখা হলো। পরে এই ভাঙন ঠেকানোর জন্য অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো, ডক্টর আবদুল জলীল ফরীদি সাহেব ও তার সহকর্মীদের অনুমতি দেওয়া হবে, তারা ইউ.পিতে একটি রাজনৈতিক ও নির্বাচনি দল গঠন করে নেবেন এবং ভবিষ্যতে তারা ওই নামে নির্বাচনে অংশ নেবেন। ওই সংগঠন মজলিসের ঠিক সেভাবে সদস্য হিসেবে থাকবে, যেমনটি আছে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো।

আমার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হলো, যেন আমি ডক্টর ফরীদি সাহেবকে এই প্রস্তাবে সম্মত করাই, যেন তিনি একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে নেন। সিদ্ধান্ত হলো, ইউ.পিতে মজলিসের শাখা যথারীতি বহাল থাকবে এবং নির্বাচনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এই সিদ্ধান্তই কার্যকর হলো এবং ১৯৬৭ সালের সভায় মুসলিম মজলিস ইউ.পি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ডক্টর সাহেব যথারীতি মজলিসে মুশাওয়ারাতের কেন্দ্রীয় সদস্য বহাল থাকলেন এবং ডক্টর সাইয়িদ মাহমুদ সাহেব তার উদারতা ও বুযুর্গসুলভ মমতা দ্বারা বিগত ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করে দুজন আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে গেলেন।

কিন্তু এখন আর দুজনের মাঝে পূর্বেকার ঘনিষ্ঠতা অবশিষ্ট রইল না। এতে তাদের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতিরও বেশ দখল ছিল। অবশেষে এক সভায় তিনি আমাদের বিনীত অনুনয়ের পরও মজলিসের সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি

নিয়ে নিলেন। ডক্টর সাহেব আমার কাছে (আমাদের পূর্বেকার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতেও এবং সংগঠনের কল্যাণের স্বার্থেও) খুব পীড়াপীড়ি করলেন, যেন আমি মজলিসের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে নিই। কিন্তু আমার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, কোনো অবস্থাতেই আমি এই দায়িত্ব মাথায় নেব না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল এবং এখনও আছে, আমি এই পদের একদম যোগ্য নই। অবশেষে আমাদের সর্বসম্মত প্রস্তাবে মাওলানা মুফতী আতীকুর রহমান সাহেব উছমানি সভাপতি নির্বাচিত হলেন। আর ডক্টর সাহেব যথারীতি সদস্য থাকলেন বটে; কিন্তু বিক্ষিপ্ত ও ভাঙা মন নিয়ে।[১]

এমনকি ১৯৭১ সালের ২৮ ডিসেম্বর এই নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করে তিনি মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেলেন।

এই পরিস্থিতি এখনও পর্যন্ত অব্যাহত আছে। মজলিসে মুশাওয়ারাতের কাঠামো আজও বহাল আছে। কিন্তু ১৯৬৭ সালের পর থেকে তার মাঝে সেই আত্মা, উদ্দীপনা ও কর্মতৎপরতা অবশিষ্ট রইল না, যার প্রকাশ সংগঠনের ইতিহাসনির্মাতা যুগে এবং মুসলমানদের তাকে বরণ করে নেওয়ার আগ্রহের মাধ্যমে ঘটেছিল। কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা আজও অবশিষ্ট আছে। কিন্তু সর্বজনমান্য ভালো কোনো নেতৃত্ব আর জন্ম নেয়নি।[২]

ডক্টর সাইয়িদ মাহমুদ সাহেব মরহুমের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল আত্মিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর এই সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আমি 'পুরানে চেরাগ'-এর প্রথম খণ্ড ৪২৫-৪২৮ পৃষ্ঠায় ডক্টর সাহেবের আলোচনায় এ-বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছি।

---

১. পুরানে চেরাগ : পৃষ্ঠা ৪২০-৪২৩

২. আক্ষেপের বিষয় হলো, ১৪০৪ হিজরির ১০ শা'বান মোতাবেক ১৯৮৪ সালের ১২ মে মজলিসের সভাপতি মাওলানা মুফতী আতীকুর রহমান সাহেব গুরুতর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং দীর্ঘ দুই বছর রোগ ভোগার পর ইনতেকাল করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

তাহরীকে পয়ামে ইনসানিয়াত অনুপ্রেরণা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

আন্দোলনের চিন্তাগত ও বাস্তবগত প্রেক্ষাপট

এ-যাবত হিন্দুস্তানের যেসব দল ও আন্দোলনে আমার অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেসব রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় সমস্যার সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক এবং (নিজের যোগ্যতা ও শক্তি অনুসারে) তাদের সহযোগিতা ও কাজে অংশগ্রহণের কথা আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর পুরোধা হওয়া, নেতৃত্ব ও মনে চিন্তা জাগানোর মর্যাদা আমার অর্জিত ছিল না। ঘটনাপ্রবাহ, বাস্তবতার অধ্যয়ন ও প্রয়োজনের অনুভূতি এই কর্মযজ্ঞে অংশীদার হতে আমাকে শুধু পরামর্শই দেয়নি, বরং একটি আবশ্যকীয় কাজ বলে সাব্যস্ত করেছে। আমি সেগুলোতে আমার যোগ্যতা, যৌক্তিকতা, রুচি ও সময়-সুযোগ অনুপাতে অংশগ্রহণ করেছি।

কিন্তু 'পয়ামে ইনসানিাত' আন্দোলনের বিষয়টি এর থেকে খানিক আলাদা। এর চিন্তা খোদ হৃদয়ের গভীরতা থেকে উৎসারিত হয়েছে এবং এটি আমার চিন্তাশক্তি ও স্নায়ুর ওপর জেঁকে বসেছিল এবং আমাকে এর (নিজের মান-মানসিকতা ও মেজাজ অনুপাতে) প্রচারক ও ভাষ্যকার বানিয়ে দিয়েছিল। এর জন্য সেই মানসিক পটভূমি, পরিবেশ ও তার অনুপ্রেরণাগুলো জানা আবশ্যক, যেগুলো একটি আন্দোলন ও দাওয়াতের রূপ ধারণ করেছিল।

এখানে আমি এই বিষয়টির সেই অংশটি উদ্ধৃত করা সঙ্গত মনে করি, যেটি আমি এক স্নেহাস্পদের কতগুলো প্রশ্নের উত্তরে একস্থানে বলেছিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এ-কাজের আপনার মনে কীভাবে চিন্তা জাগল এবং সর্বপ্রথম এ-কাজ আপনি কবে শুরু করেছিলেন?

আমি বললাম, এটি বিলকুলই একটি স্বভাবজাত ও কুদরতি ব্যাপার যে, মানুষ তার সেই ঘরটির ধ্বংস দেখতে চায় না, যেখানে তারা বাস করে,

যেখানে তাদের প্রিয় সম্পদ ও জীবনের পুঁজি এবং যাকে তৈরি করতে ও সাজাতে তার ও তার পূর্বপুরুষদের শ্রেষ্ঠতম যোগ্যতা ও অনেক শক্তি-সামর্থ্য ব্যয়িত হয়েছে। যেকোনো সুস্থস্বভাব মানুষের বৈশিষ্ট হলো, যে-নৌকাটির নিজে আরোহী, তাতে কাউকে ফুটো করার অনুমতি দেয় না। অন্য শব্দে একথাও বলা যায়, যে-ডালে যার বাসা, হুঁশ-জ্ঞান ঠিক থাকতে সেই ডালের গায়ে সে নিজেও করাত চালাতে পারে না, অন্য কাউকেও করাত চালাবার অনুমতি দিতে পারে না।

নিত্যই দেখে আসছিলাম, এই দেশ দ্রুতগতিতে চারিত্রিক অবক্ষয়, বরং জাতীয় ও সামাজিক আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চারিত্রিক মর্যাদাকে অত্যন্ত নির্মমতার সঙ্গে পদদলিত করা হচ্ছে। স্বার্থপরতা; বরং আত্মপুঁজার উন্মাদনা (তাদের কথা আলাদা, যাদের ওপর কোনো কারণে ধর্ম ও চরিত্রের প্রভাব অত্যন্ত শক্ত কিংবা যারা জীবনের ময়দান থেকে আলাদা একধারে অবস্থান করছেন) সবারই ওপর চেপে বসেছে। মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর মর্যাদা দ্রুতগতিতে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। তুচ্ছ ব্যক্তিস্বার্থের জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে অতি অনায়াসে কুরবান করা হচ্ছে। কাজচুরি, দায়িত্বজ্ঞানের অভাব, ঘুষখোরি, চোরাকারবার, মজুদদারি ও বিশৃঙ্খলা এসব সেই বৃক্ষেরই ফল। এসব চরিত্র গোটা জীবনটাকে আযাবে পরিণত করে দিয়েছে এবং এসবের কারণে দেশ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও তাতে বেঁচে থাকা এবং স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এসব অন্যায়-অপরাধ ইংরেজদের আমলেও ছিল। বরং বলা চলে, এসব অন্যায়-অপরাধ সৃষ্টিতে কিংবা এগুলোর বৃদ্ধিতে তাদের শাসনামল ও শিক্ষাব্যবস্থার বিরাট হাত আছে। কিন্তু একটি বিদেশি হানাদার শক্তি, চৌকস শাসনব্যবস্থা ও বাধ্যবাধকতা এর অনেক কিছুই চাপা দিয়ে রেখেছিল। পরে পাতিলের ওপর থেকে সেই ঢাকনাটা সরে যাওয়ার পর এই অন্যায়-অপরাধগুলো উথলে উঠল এবং বাষ্পের মতো বেরিয়ে এল। স্বাধীনতার লড়াই, বিদেশি উকুনগুলো তুলে ফেলার ব্যস্ততা, জাতিগঠন ও চরিত্র তৈরির কোনো সুযোগই দেয়নি। দেশ তো স্বাধীন হয়ে গেল; কিন্তু মনটা ভেতর থেকে গোলামই রয়ে গেল। এত বড় দেশটির শৃঙ্খলাবিধান ও রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার গদির সংরক্ষণ এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ দেয়নি। আর (অল্প কজন বাদে) আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মনে এর সামান্যতম গুরুত্বও ছিল না যে, তারা জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে তাদের মন-মানসিকতাকে সজাগ করার চেষ্টা করবেন, তাদের

নৈতিক অনুভূতিকে ধারালো ও কার্যকর করবেন এবং যে-বিষয়গুলো দেশের জন্য প্রকৃত অর্থেই শঙ্কায় পরিণত হয়েছে, সেদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর নিজের অসহায়ত্ব, নিঃসঙ্গতা ও প্রভাবহীনতার পুরোপুরি জ্ঞান ও অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও আমি ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার এবং ধর্ম-মত নির্বিশেষে এদেশের প্রতিজন নাগরিকের হৃদয়ের দুয়ারে করাঘাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। যখন কোনো মহল্লা বা গ্রামে আগুন লাগে, তখন কেউই নিজের দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের কথা মনে রাখে না। তখন বোবাও চিৎকার দিতে শুরু করে এবং খোঁড়াও দৌড়াতে আরম্ভ করে।

তারপর কোনো দেশ ও যুগে শিক্ষা ও গঠনমূলক কাজের জন্য (চাই সেটি যতই পবিত্র , জরুরি ও উপকারী হোক) শর্ত হলো, ওই দেশে স্থিতিশীল ও সমতল পরিবেশ থাকতে হবে। যে-দেশে বারবার আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হয়, কদিন পর-পরই সাইক্লোন আসে, জলোচ্ছ্বাস শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেদেশে শিক্ষার উন্নয়ন ও গঠনমূলক কাজের জন্য মস্তিষ্কের প্রশান্তি ও প্রবল আগ্রহ কোথা থেকে জন্ম নেবে? এগুলো তো অনিচ্ছাকৃত বিষয়; এসবের ওপর কারও কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু যে-দেশে গোষ্ঠীগত দাঙ্গা, মানবতাবিধ্বংসী উন্মাদনার ঢেউ জাগে এবং লেখাপড়া জানা ভালো-ভালো মানুষের ওপরও কদিন পরপর হিস্ট্রিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, যেখানে সম্পদ ও শক্তি ছাড়া কোনো বাস্তবতাকে জীবন্ত ও মানবীয় জ্ঞান করা হয় না, সে-দেশে শিক্ষার উন্নয়ন ও দেশ গড়ার চিন্তা করারইবা সুযোগ কোথায়। এই তো একটু আগেই আমি সেভানের ভাষণে বলেছিলাম—

'১৯৭৭ সালের ১৪ জুলাই আমি যখন আমেরিকায় ছিলাম, সে সময় নিউইয়র্কের পাওয়ার হাউজের ওপর বজ্রপাত ঘটল এবং সবাই শুধু তাকিয়েই থাকল। কোনো লোকসমাগমের ওপর যদি ছাদ কিংবা দেওয়াল ভেঙে পড়ে, কোনো হাতি কিংবা কোনো ষাড় মাতাল হয়ে মানুষের জীবন কেড়ে নেয়, তাহলে এর কোনো প্রতিকার থাকে না। কারণ, এরা সবাই বিবেকহীন বস্তু। কিন্তু আমার বুঝে আসছে না, একজন লেখাপড়া জানা মানুষ কী করে মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে! যেমনটি জমশেদপুর, রাওয়াড়কেলা ও রাঁচিতে হয়েছে। কলেজের এক শিক্ষক একই কলেজের আরেক শিক্ষকের রক্তে হাত রঞ্জিত করল! এক ছাত্র আরেক ছাত্রকে হত্যা করল কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলের এক কর্মী আরেক কর্মীর গলা কাটল!'

আর এর কুফল যেকোনো সময় সমাজের ওপরও পড়তে পারে এবং মানুষ সামান্য কারণে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে। এমন দেশে কোনোভাবেই শিক্ষার উন্নতি, গঠনমূলক কাজ বা কোনো প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্বের গ্যারান্টি দেওয়া যায় না এবং এরকম অনিশ্চিত ও দ্বন্দ্বমুখর পরিবেশে কোনো রচনামূলক বা গবেষণামূলক কাজও আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হয় না। কবির ভাষায়–

یوں زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے؟

'জীবন যদি এমন হয় সাহস আসবে কোত্থেকে!'

আমি তো মনে করি, এই পরিবেশে সাহিত্যচর্চা, কাব্যচর্চা, জ্ঞানের সূক্ষ্ম বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা এবং ইকবাল (রহ.)-এর ভাষায় 'সচ্চরিত্রতার স্বাদ ও শঙ্কার সাহসিকতার'ও সুযোগ নেই।

এগুলো আন্তঃদেশীয় সমস্যা, যার কবলে সমাজ এতটাই আক্রান্ত হয়ে যাবে যে, ঘুষ না দিয়ে কেউ নিজের অধিকার আদায় করতে পারবে না। কোনো নাগরিক আরামের সাথে রেলে ভ্রমণ করতে পারবে না। কোনো ছাত্র লেখাপড়ার প্রতি মনোনিবেশ করতে পারবে না। শিক্ষকরা মনোযোগ দিয়ে পড়াতে পারবে না। প্রশাসনের সমস্ত কাজ স্থবির হয়ে যাবে। গোটা দেশে সময়ের কোনো মূল্য থাকবে না। রাস্তায় চলাচল অনিরাপদ হয়ে যাবে। বাসাবাড়িতে নিরাপদে থাকা যাবে না। এমতাবস্থায় এই বিকৃত সমাজে নাগরিকদের পক্ষে নিজেদের রীতি-নীতির ওপর অটল থাকা কতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে?

এ কারণেই আমি এমনটি ভাবা সঙ্গত মনে করি যে, চরিত্র শোধরানোর এই অভিযান ও 'পয়ামে ইনসানিয়াত'-এর আন্দোলন দেশের সমস্ত দ্বীনি, তা'লীমি ও ইল্মি প্রচেষ্টা ও আন্দোলনসমূহের জন্য একটি দুর্গের মর্যাদা রাখে, যার মধ্যে অবস্থান করে প্রতিটি প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। আপন-আপন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পূর্ণতাসাধনে এই সংগঠন একটি শান্তিময় ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে চায়। সেজন্যই এই আন্দোলনকে আমি প্রতিটি আন্দোলনের সেবক ও সহযোগী, বরং প্রহরী মনে করি। আমি মনে করি, প্রতিটি দাওয়াত ও আন্দোলনের একে স্বাগত জানানো উচিত। এর মর্যাদা অন্তত এতটুকু তো অবশ্যই, যতটুকু মর্যাদা থাকে একটি ডেকোরেশন প্রতিষ্ঠানের। ডেকোরেটর ডেকোরেশন করে দিয়ে যায়। তারপর সেখানে যেকোনো ধরনের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে পারে।

আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মুসলমান এদেশে সংখ্যালঘু। তারা হাজারো সমস্যায় জর্জরিত, যেগুলোর সমাধান একান্ত প্রয়োজন। এমতাবস্থায় এগুলোর সমাধানের দায়িত্ব আপনি নিজের কাঁধে তুলে নিলেন কেন? ইসলামেরইবা এসব সমস্যার সাথে সম্পর্ক কী? উত্তরে আমি বললাম, আপনার প্রশ্ন পুরোপুরি যথার্থ। কিন্তু আপনি একজন আলেমে দ্বীন। আপনার কুরআন, হাদীছ ও সীরাতে রাসূলের জ্ঞান আছে। আপনি জানেন, স্রেফ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও একজন মুসলমানের কর্তব্য হলো, সে যখন যেখানে থাকবে, নিজের আশপাশের চিন্তা করবে। উটপাখির মতো বালিতে মুখ লুকিয়ে বিপদাপদ থেকে চোখ বন্ধ করে থাকবে না এবং 'সব কিছু ভালো আছে'র পাঠ মুখস্থ করতে থাকবে। মুসলমানের সব জায়গায় ভালো কাজের আদেশ দেওয়ার, মন্দ কাজে বাধা দেওয়ার এবং সমাজের সংশোধন ও অন্যায়-অবিচার রোধ করার কাজে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করার অধিকার আছে।[১]

প্রত্যেক মানুষকে এই কথাটা বোঝা দরকার যে, আমি যে-নৌকায় সাওয়ার আছি, যদি সেটি ডুবে যায়, তাহলে আমাকেসহই ডুববে। আল্লাহর রাসূল একথাটি বোঝানোর জন্য যে-উপমাটি দিয়েছেন, তার চেয়ে ভালো উপমা আমি অন্তত ধর্মীয় ও নৈতিক গ্রন্থাদিতে পাইনি। তিনি বলেছেন, 'একটা নৌকায় কিছুলোক ওপর তলায় আরোহণ করেছে। কিছু লোক বসেছে ডেকে। পানযোগ্য মিষ্টি পানির ব্যবস্থা ওপর তলায়। ফলে নিচ তলার যাত্রীরা

---

১. এই চেতনারই অধীনে আল্লাহর রাসূল (সা.) হিজরতের আগে, এমনকি নবুওতেরও আগে মক্কার সংশোধনমূলক সংগঠন 'হিলফুল ফুজূল'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এই সংগঠনটি আরবদের (জাহিলি যুগে) সমাজসংশোধনের একটি অঙ্গীকার ছিল। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর নামে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল, তারা জালেমের মোকাবেলায় মজলুমের পক্ষে একহাত হয়ে কাজ করবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে, যতক্ষণ-না জালেম মজলুমের পাওনা চুকিয়ে দেয়।
সীরাতের কিতাবগুলোতে এসেছে, নবীজি (সা.) এই অঙ্গীকারে সন্তুষ্ট ছিলেন। নবুওতপ্রাপ্তির পরও তিনি এই সংগঠনের প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে জাদ'আনের ঘরে এক অঙ্গীকারে শরীক ছিলাম। সেই চুক্তি বাস্তবায়নে ইসলামের পরও যদি এখন আমাকে আহ্বান করা হয়, তাহলে আমি প্রস্তুত আছি। তারা অঙ্গীকার করেছিল, তারা পাওনাদারকে আপন-আপন পাওনা পাইয়ে দেবে এবং কোনো জালেম যেন মজলুমকে কোণঠাসা করে রাখতে না পারে। বিস্তারিত জানতে সীরাতে ইবনে কাছীর প্রথম খণ্ড ২৫৮ নং পৃষ্ঠা দেখুন।

উপরে গিয়ে পানি আনতে বাধ্য হচ্ছে। এতে ওপর তলার যাত্রীদের নানা রকম সমস্যা হচ্ছে। তারা একাজে বাধা দিল। বলল, না; তোমরা উপরে এসে এভাবে পানি নিতে পারবে না। নিচের লোকেরা বলল, পানি ছাড়া আমরা চলব কী করে? আর পানি তো আপনাদের এখানে। যদি আপনারা আমাদের পানি নিতে না দেন, তাহলে আমরা নৌকার তলা ফুটো করে নিয়ে ওখানে বসে-বসেই নদী থেকে পানি সংগ্রহ করব।

নবীজি বলেছেন, ওপর তলার লোকদের যদি এতটুকুও বুঝ থাকে, তাহলে নিচের লোকদের এমনটি করতে বারণ করবে এবং ওপর থেকেই পানি নেওয়ার অনুমতি দিয়ে দেবে। যদি তা না করে আর তারা নৌকার তলা ফুটো করে পানির ব্যবস্থা করতে যায়, তাহলে না ওপরওয়ালারা রক্ষা পাবে, না নিচেওয়ালারা রক্ষা পাবে।' ব্যস, আমরা সবাই সেই নৌকারই আরোহী। এটি হলো আমাদের দেশের নৌকা। আল্লাহ্ না করুন, যদি এই নৌকা ডুবে যায়, তাহলে না আমাদের প্রতিষ্ঠান বাঁচবে, না কুতুবখানা বাঁচবে, না দ্বীনদার ও আল্লাহর অলীরা বাঁচবেন। তখন আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মুসলমানরা দলীয়ভাবেও কি এই দাওয়াত ও আন্দোলন দ্বারা উপকৃত হবে? উত্তরে আমি বলেছিলাম, আমার মতে মুসলমানরা দলীয়ভাবে এর দ্বারা কোনো উপকার পাবে না। এর দ্বারা উপকৃত হবে রাষ্ট্র। কিন্তু তারপরও একাজ তাদের করা দরকার। দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে তারা এর জন্য আদিষ্ট। রাষ্ট্র উপকৃত হলে তার সুফল তারা ভোগ করবে। কিন্তু আমি মনে করি, এদেশে সম্মানের সঙ্গে থাকতে হলে মুসলমানকে তাদের উপকারিতার প্রমাণ দিতে হবে। আর দেশের নেতৃত্বে নৈতিক ও আদর্শিক যে-শূন্যতা আছে, সেটি মুসলমানদেরই পূরণ করতে হবে। কোনো দেশে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজেদের দেশের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর প্রমাণিত করা ব্যতীত শান্তি ও মর্যাদার সঙ্গে টিকতে পারে না। ইকবাল (রহ.)-এর ভাষায়—

زندگی جہد است استحقاق نیست

'জীবন হলো সাধনা – অধিকার নয়।'

আন্দোলনের সূচনা ও উন্নতি

ভারত বিভক্তি ও স্বাধীনতার পর থেকেই আমি আমার এসব অভিমত, দেশের নৈতিক অধঃপতন ও অবনতিশীল পরিস্থিতির ব্যাপারে বিভিন্ন নিবন্ধে

ও বই-পুস্তকে আমার উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করা শুরু করে দিয়েছিলাম। এরই ধারাবাহিকতায় সে সময় 'ভারতীয় সমাজের দ্রুত কল্যাণ করুন' শিরোনামে আমার একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, যার হিন্দি ও ইংরেজি অনুবাদ আমি সে সময়কার দেশের শীর্ষস্থানীয় সকল রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রীদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। আমার এই প্রচেষ্টা ১৯৫৪ সালে শুরু হয়েছিল। এই ধারাবাহিকতার প্রথম ভাষণটি – যার মাধ্যমে আমার এই মিশনের সূচনা হয়েছিল – ১৯৫৪ সালের ৯ জানুয়ারি লাখনৌর গঙ্গাপ্রসাদ মেমোরিয়াল হলে এমন একটি সমাবেশে উপস্থাপন করেছিলাম, যাতে শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও অমুসলিম শিক্ষিত সমাজের বিপুলসংখ্যক লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। সে-সময়েই তাবলীগি সফরের সঙ্গে আমি এই উপসঙ্গটিকেও যুক্ত করে নিয়েছিলাম। ফলে তার পরপরই আমি পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে সফর করি। এই সফরে জৌনপুর, গাজীপুর, মিউ ও গুর্খাপুরে বিশাল-বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সফরের ভাষণগুলো সংকলিত হয়ে বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সেই বইটিরই নাম 'পয়ামে ইনসানিয়াত'। এই সিরিজের দ্বিতীয় বইটি 'মাকামে ইনসানিয়াত' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু কিছুদিন যেতেই মনে হলো, একে তাবলীগি সফরের সঙ্গে মেশানোয় ভুল বোঝাবুঝি জন্ম দিতে পারে। তাছাড়া অনুভব করতে শুরু করলাম, এ-ধরনের ভাষণ-বক্তৃতার জন্য যে-রকম সাবধানতার প্রয়োজন, সেগুলো অবলম্বন করার সাধ্য যে-কারও নেই। সেজন্য এসব বক্তৃতার বোঝা আমি অধম ও মাওলানা মনযুর নু'মানির ওপর বর্তাল। আর যেখানে আমরা উপস্থিত না থাকতাম, সেখানে এ-ধরনের সমাবেশের আয়োজন হতো না।

ওদিকে আমার বৈদেশিক সফরের প্রয়োজন দেখা দিতে লাগল। কিছু দিন পরই আমার কাছে দামেশ্‌ক ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ এল এবং কয়েকটি মাস আমি দেশের বাইরে কাটালাম। সেখান থেকে ফিরে আসার পর নিজের লেখালেখি ও ইল্‌মি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়লাম। বাস্তবতা হলো, জীবনভর আমার মনে আক্ষেপ থাকবে, কেন আমি এই ধারাটি অব্যাহত রাখলাম না। একে আমি আমার একটি নৈতিক ত্রুটি মনে করি এবং মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করি, এর জন্য তিনি আমাকে পাকড়াও না করেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যদি এই ধারাটি চালু থাকত, তাহলে অনেক সাথী-সঙ্গী তৈরি হয়ে যেত এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ওপর অবশ্যই এর ভালো একটি প্রভাব পড়ত। এই দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৭৪ সালে

ইলাহাবাদ থেকে পুনরায় এই তৎপরতা শুরু হলো। তারপর কোনো-না-কোনো প্রকারে এই ধারা এখনও অব্যাহত আছে।

এই ধারাবাহিকতায় বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও ইউ.পিতে সফর করি। এসব অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বিশাল-বিশাল সফল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশগুলোতে অমুসলিম ও শিক্ষিত সমাজের বিপুলসংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করতেন। তারা সবাই বেশ মনোযোগসহকারে আমার ভাষণ শুনতেন এবং গভীর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন। ১৯৭৫ সালে গঙ্গাপ্রসাদ মেমোরিয়াল হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মুসলিম-অমুসলিম শিক্ষিত সমাজ ও বিশিষ্ট-সাধারণ নির্বিশেষে বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। আমার এখানকার ভাষণটি 'সেই ঘরে আগুন লেগেছে ঘরেরই বাতি থেকে' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। এই ভাষণে আমি গোলামির কারণসমূহ, বৈদেশিক ও দেশীয় শাসনের পার্থক্য বর্ণনা করার পর সেই অধঃপতনের চিত্র এঁকেছি, দেশ যার শিকার। সেখানে বলা হয়েছিল, আসল রোগ হলো, সামাজিক পতন থেকে ব্যক্তিগত গঠনের ঝোঁক তৈরি হয়ে গেছে। আরও বলেছি, আজকের এই যে পরিস্থিতি, এটি একেবারেই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক। এর মাঝে টিকে থাকার যোগ্যতা নেই। এটি দেশের মানুষের দুর্বলতা যে, তারা এই পরিস্থিতিকে সহ্য করে নিচ্ছে। আমি বিদ্রোহের স্লোগান তুলছি না। আমি বিপ্লবেরও আওয়াজ দিচ্ছি না। আমি সংশোধনের কথা বলছি। আমি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আবেদন জানাচ্ছি। একজন ভারতীয় হওয়ার সুবাদে আমি এই নিবেদন পেশ করছি।

আমার যদি উঁচুমাপের সেইসব ব্যক্তিত্ব ও আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকত, যাঁরা সর্বপ্রথম এদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং স্বাধীনতার যুদ্ধে আগ বাড়িয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাহলে এত স্পষ্ট কথা আমি বলতে পারতাম না। আমি এতটাই নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বলছি যে, এর জন্য আমি যেকোনো সমালোচনার খড়গ বরণ করে নিতে প্রস্তুত আছি। আমার পূর্বসূরীদের রেকর্ড শুধু পাক-পবিত্রই ছিল না; বরং ছিল দিবালোকের মতো উজ্জ্বল।

আমি বলেছি, কোনো দেশ বা জাতির সুরক্ষা ও অস্তিত্বের জন্য এবং দেশের লোকগুলোকে ব্যক্তিস্বার্থপরতা, অবিচার, বেঈমানি ও দুর্নীতি থেকে রক্ষা করার আসল শক্তিটি হলো আল্লাহর ওপর আস্থা, বিশ্বাস ও ভয়। একজন মানুষের মনে যখন এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, আমার মাথার

ওপর এমন একটি সত্তা আছেন, যিনি আলোতে-অন্ধকারে সমানভাবে আমাকে দেখেন, আমার তত্ত্বাবধান করেন এবং তাঁর কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে, তাহলে সে কোনো অন্যায় করতে পারে না। সংশোধনের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো ব্যবস্থাপত্র আর নেই। এ হলো আসল শক্তি। এই শক্তি চোরদের প্রহরীতে পরিণত করে। এরপর কোনো এক স্তরে যে-বিষয়টি তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে, সেটি হলো সত্যিকার দেশপ্রেম।

দেশপ্রেম মানে এই অনুভূতি যে, এটি আমার দেশ, এটি আমার নগরী। আল্লাহ না করুন, যদি কোনো দেশে এই দুটি চেতনা-ই নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে জগতের কোনো শক্তি তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। বর্তমান ইউরোপ দেশপ্রেমের বদৌলতে টিকে আছে। সে দুটি বিশ্বযুদ্ধের ধকল সহ্য করেছে। ইউরোপ দুবার রক্তের নদীতে গোসল করেছে। আমাদের গায়ে তো শুধু রক্তের ছিটা এসেছিল। ইউরোপ প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রক্তের সাগরে ডুবে উঠে এসেছে। বিশ্বযুদ্ধে অনেকগুলো বড়-বড় শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওখানকার মানুষগুলোর সত্যিকার দেশপ্রেম ছিল। এই দেশপ্রেমই পৃথিবীর মানচিত্রে তাদের পুনরায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ধ্বংসাবশেষ ও গুড়িয়ে যাওয়া কংক্রিটের ওপর একটি নতুন দেশ, নতুন শহর অস্তিত্ব লাভ করেছে। ইউরোপে হাজারো অপরাধ, নাস্তিকতা, আল্লাহদ্রোহিতা ও ভোগ-বিলাসিতার জয়জয়কার। কিন্তু প্রকৃত দেশপ্রেম, সুবিচারপ্রিয়তা, দায়িত্বসচেতনতা, নাগরিক অধিকারের গুরুত্ব ও মানুষের জীবন ও সম্পদের মূল্যের অনুভূতি তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কোনো দেশ কিংবা জাতির মাঝে যদি আল্লাহভীতি ও দেশপ্রেমের কোনোটিই না থাকে, তাহলে গঠনমূলক কোনো পরিকল্পনা ও বস্তুগত উন্নতি তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।

শেষে মুসলমানদের উদ্দেশ করে বললাম, এ-ক্ষেত্রে আপনাদের দায়িত্ব দ্বিগুণ। একটি দায়িত্ব হলো, আপনাদের ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআন আর আপনাদের নবীর শিক্ষা (যেটি আল্লাহর মেহেরবানিতে নিরাপদ ও অক্ষত আছে এবং নিজের মধ্যে এখনও শক্তি আছে) তাদেরকে এই ধস, ছড়িয়ে পড়া আগুন আর সম্পদের লোভের প্রবহমান নোংরা পানি থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলার পরামর্শ দিচ্ছে। বরং আপনাদের ওপর এসব প্রতিহত করারও দায়িত্ব

অর্পণ করছে। আপনাদের নবী আপনাদের স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, যদি কোনো নৌকার যাত্রীদের এমন আচরণ থেকে বিরত রাখা না হয়, যার ফলে নৌকাটা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যেতে পারে এবং তাতে নৌকাটা ডুবে যায়, তাহলে একজন যাত্রীও এই নিমজ্জন থেকে রক্ষা পাবে না। এই নৌকা দোষী-নির্দোষ, ঘুমন্ত-জাগ্রত নির্বিশেষ সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে মারবে। সে সময় কোনো পুণ্য, কোনো বুদ্ধিমত্তা কাজে আসবে না।

দ্বিতীয় দায়িত্বটি হলো, আপনারা এই দেশে মানবতার মর্যাদা, সুবিচার ও সাম্যের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন এবং অনেক নাজুক পরিস্থিতিতে এ-দেশকে সাহায্য করেছিলেন। আপনাদের ধর্মীয় শিক্ষামালায় এই বার্তা এখনও পুরোপুরি সংরক্ষিত আছে। আপনারা যদি এ-দেশের সমাজকে এই নিমজ্জমান নৌকাটা রক্ষা করার সম্ভাব্য সব ধরনের প্রচেষ্টা না চালান, তাহলে আল্লাহর সম্মুখে আপনারা অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবেন এবং ইতিহাসেও আপনারা কর্তব্য-অসচেতন, নিমকহারাম ও অপরাধী বলে গণ্য হবেন।

১৯৭৮ সালের ১৬ এপ্রিল সেভানে কুঠি নাশাত আফযার বিশাল মাঠে রাতে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ইতিহাসবেত্তা ডক্টর বি.বি মেসরা (প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর পাটনা ইউনিভার্সিটি) উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় আমি যে-ভাষণটি দিয়েছিলাম, তার শিরোনাম ছিল 'যখন লেখাপড়া জানা মানুষ হিস্ট্রিয়ায় আক্রান্ত হয়'। এই ভাষণে আমি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলেছিলাম, আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি খারাপ নয়। খারাপ আমাদের উপরের জিনিসগুলো। শিক্ষা, রাজনীতি, সাংবাদিকতা, ক্ষমতার মোহ, দলের অন্ধ প্রেম এসব একজন শিক্ষিত মানুষকে খারাপ বানিয়ে দেয়। একটি ভুল স্লোগান তাকে পাগল বানিয়ে দিতে যথেষ্ট। শিক্ষা সব কিছুই করে – কিন্তু মানুষকে মানুষ বানায় না। মানুষ ভেতর থেকে গড়ে – বাইরে থেকে নয়। আমরা ভেতরটাকে ভুলিয়ে দিয়েছি। ভেতরে মানুষটিকে আমরা জাগিয়ে তুলিনি। আমাদের এই মানুষটির মধ্যে আর একজন মানুষ লুকিয়ে আছে। সে হলো ভেতরের মানুষ। সে হলো হৃদয়ওয়ালা মানুষ। সে আল্লাহকে ভয়কারী মানুষ। সেই মানুষটি যখন জেগে যায়, তখন কী হয়? তখন বড়-বড় রাজ্য ও রাজত্বগুলো তার হাতে থাকে; কিন্তু তার অবস্থা কী হয়? সে জাতির অর্থকে, দেশের সম্পদকে আল্লাহর সম্পদ মনে করে। সে বিশ্বাস করে, গোটা জাতি মালিক আর একা আমি খাদেম।

এই ভাষণে আমি ইসলামের ইতিহাস ও খেলাফতে রাশেদার কয়েকটি ক্রিয়াশীল ঘটনা শুনিয়েছি। তার একটি ঘটনা হলো হযরত আবুবকর (রা.)-এর। সন্তানদের মুখে কিছু মিষ্টান্ন তুলে দেওয়ার আশায় তাঁর স্ত্রী রোজকার খরচের অর্থ থেকে কিছু পয়সা তুলে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি সেই অর্থগুলো রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দিয়ে বলেছিলেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, এই অর্থগুলোর আমার প্রয়োজন পড়ে না। কাজেই এখন থেকে এ-পরিমাণ ভাতা আমাকে কম দেবেন। অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রা.)-এর ব্যক্তিগত কাজের সময় সরকারি বাতি নিভিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এতক্ষণ আমি খেলাফতের কাজ করছিলাম। কিন্তু এখন যেহেতু ব্যক্তিগত আলাপ শুরু হচ্ছে, তাই এই বাতি আর জ্বালিয়ে রাখা যাবে না। ব্যক্তিগত আলাপে আমি দেশের জনগণের সম্পদ ব্যয় করা সঠিক মনে করি না।

অবশেষে আমি বললাম, মানবতাকে আমি ঘুমন্ত মনে করি – মৃত মনে করি না। মানবতা শতবার ঘুমিয়েছিল, শতবার তাকে জাগানো হয়েছে। কাজেই আসুন, আমরা সবাই মিলে ঘুমন্ত মানবতাকে জাগিয়ে তুলি। আগে নিজেরা জাগি; তারপর অন্যদের জাগাই। ঘুমন্ত মানুষ ঘুমন্ত মানুষকে জাগাতে পারে না। তারপর আমি বললাম, এই যে আমরা যা-কিছু জৌলুস দেখতে পাচ্ছি; এগুলো শান্তি ও নিরাপত্তার সুফল। এগুলো স্বাভাবিক অবস্থার সুফল। অবস্থা যদি স্বাভাবিক না হতো, যদি বর্ষার মওসুম হতো, আকাশে বিজলি চমকাত, দু-একটা বজ্রপাত হতো, তাহলে এই সমাবেশ তছনছ হয়ে যেত। দেশের-অবস্থা যদি স্বাভাবিক থাকে, তাহলে একে আপনি যত খুশি উঁচু বানাতে পারেন। যতটা খুশি সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারেন। মন খুলে বিদ্যাচর্চা করতে পারেন।[১]

সে-বছর ডিসেম্বরের শেষের দিকে মুরাদাবাদের টাউন হলে ইনসাফ কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হলটি লোকে কানায়-কানায় ভরে গিয়েছিল এবং তাতে সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিল। সেই দিনগুলোতেই আলীগড়ে একের-পর-এক দাঙ্গা চলছিল

১. যে-প্রদেশে (বিহার) আমি এই ভাষণটি দিয়েছিলাম, সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিত্যদিনকার রুটিনে পরিণত হয়েছিল এবং কথায়-কথায় বা সামান্য ব্যাপারে যেকোনো সময় দাঙ্গা বেঁধে যাওয়া একটা সাধারণ বিষয় ছিল।

এবং এখানে-ওখানে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ছিল। আমি এখানে যে-ভাষণটি প্রদান করেছিলাম, তাতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এই যে-মানুষগুলো দুনিয়াতে আগমন করছে; এরা বাগানের কাঁটা, না ফুল? উত্তরে বলা হয়েছিল, আল্লাহ তো এখনও মানববংশ থেকে নিরাশ হননি। এতে তিনি যথারীতি বৃদ্ধিই করে চলছেন এবং প্রতিদিনই নতুন-নতুন অতিথি পাঠাচ্ছেন। কিন্তু আমরা নিরাশ হয়ে পড়েছি। আমরা প্রমাণ করছি, মানুষের চেয়ে বড় ঘৃণ্য আর কোনো সৃষ্টি নেই। তারপর বলা হয়েছিল, আমাদের সমাজ আজ অস্থিতিশীল ও নড়বড়ে। যত তাড়াতাড়ি এর সংবাদ নেওয়া দরকার। আজ যেকোনো মানুষ বলছে, আমরা আজ জীবনের হাতেই মরতে চলেছি। আমাদের বোঝা দরকার—

ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں
ناؤ کاغذ کی سدا چلتی نہیں

'নিপীড়নের ডাল কখনো ছড়ায় না। কাগজের নৌকা বেশি দূর চলে না।'

তারপর সেই পথচারীর চিত্র আঁকা হলো, যে বিদেশ থেকে অর্থ উপার্জন করে কিছু অর্থ বাঁচিয়ে মনে বড় আশা নিয়ে নিজদেশে এসেছিল যে, অনেক বছর পর বাড়ি যাব; আমাকে পেয়ে আমার বৃদ্ধ বাবা-মা খুশি হবেন, স্ত্রী খুশি হবে। ছেলেমেয়েরা দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরবে। আমি তাদের জন্য নানা রকম ফল-মূল নিয়ে যাব এবং সেগুলো তাদের সামনে রাখব। তারাও সবাই আনন্দিত হবে আর আমার কাছেও বেশ ভালো লাগবে। এসব ভাবনা ও কামনা মাথায় নিয়ে লোকটি পথ চলছিল। কিন্তু এক জালেম অন্য সম্প্রদায়ের লোক ভেবে তাকে হত্যা করে ফেলল। বলুন, আল্লাহ কি এ-ধরনের আচরণে খুশি হবেন? এ-ধরনের ঘটনায় একটি দেশের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। যে-দেশে এমন ঘটনা ঘটে, সে-দেশে আল্লাহর রহমত ও বরকতের ধারা বন্ধ হয়ে যায়।

উদ্ধৃতিগুলো এজন্য উপস্থাপন করলাম যে, এর দ্বারা এই আন্দোলনের মেজাজ, তার আত্মা ও আহ্বানে বুঝবার ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া যাবে এবং কমপক্ষে এই উদ্ধৃতিগুলো ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত হয়ে যাবে।

এই ধারাবাহিকতার সবচেয়ে সফল ও বিস্ময়কর সফরটি (১২-১৩ মার্চ ১৯৭৮) ছিল হরিয়ানা ও পাঞ্জাব রাজ্যের, যেখানকার মাটি দেশ বিভক্তির

সময় মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল এবং এই ভূখণ্ডে মুসলিম বসতি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তদুপরি সময়টা ছিল হোলির, যা কিনা খোদ আমাদের প্রদেশে এমন আতঙ্ক তৈরি করে যে, মুসলমানদের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া-ই কঠিন হয়ে পড়ে।

এই সফরে আমার যমুনা নগর, খিজিরাবাদ, বুড়িয়া, জগাধরি, পিলি মাযরাআ, সারহিন্দ, মালির কোটলা ও চন্ডিগড় যাওয়া হয়েছিল। সফর রেলেও হয়েছিল; কিন্তু পয়ামে ইনসানিয়াতের এই কাফেলার জন্য কোথাও কোনো অপ্রীতিকর বা বিব্রতকর কোনো ঘটনা ঘটেনি।

সবচেয়ে বড় সভাটি হয়েছিল চন্ডিগড়ে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট ডিভিশনের কমিশনার, ধর্মপরিচয়ে যিনি হিন্দু ছিলেন। পুরোটা মাঠ এমনভাবে ভরে গিয়েছিল যে, কোথায় তিলধারণের ঠাঁই ছিল না। উপস্থিত জনতার মাঝে মুসলানের হার ছিল আটার মধ্যে লবণের মতো। দুবার বিদ্যুৎ এবং একবার মাইক ফেল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একজন মানুষও জায়গা থেকে নড়েনি। সভাপতি তার বক্তব্যে বলেছেন, আমি বুঝতে পারলাম না, সে কোন শক্তিটি ছিল, যে বিদ্যুৎ-মাইক ফেল হওয়া সত্ত্বেও লোকগুলোকে উঠতে দিল না এবং সভায় কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে দিল না। প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকে বলেছেন, কোনো মুসলমান যদি মজমা থেকে উঠবার চেষ্টা করত, তাহলে পাশে বসা শিখ কিংবা হিন্দু লোকটি তাকে বসিয়ে দিত এবং বলত, শোনো-না কেমন ভালো-ভালো কথা হচ্ছে। এসব কিছুর ফলে অনুমিত হয়েছিল, আমাদের এই কাজটির কতখানি সুযোগ, কী পরিমাণ আবশ্যকতা রয়েছে এবং মানুষের মাঝে এর গ্রহণযোগ্যতার কতখানি যোগ্যতা আছে।

নভেম্বরের শেষ এবং ডিসেম্বরের শুরুর দিনগুলোতে আমাদের মধ্য প্রদেশের সফর হলো। এটিও পাঞ্জাবেরই মতো সফল হলো। এই সফরে ভুপাল, অন্দ্র, আজিন, দিহার, দেপালপুর ও মহুতে বিশাল-বিশাল সমাবেশ হয়েছিল এবং প্রতিটি জায়গায় আমাদের এই আহ্বানকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। অন্দ্র প্রদেশে টেগুর হল ও বার এসোসিয়েশনেও বক্তৃতা হয়েছিল, যেখানে অধিকাংশ শ্রোতা বসবার জায়গা পায়নি। একটি ভাষণ শুনে আর.এস.এস-এর নেতৃবর্গের একটি প্রতিনিধিদল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তারা তাদের গভীর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল এবং বলল,

গতকালের আলোচনা দ্বারা আমরা জানতে পারলাম, এই দেশটার জন্য আমাদের চেয়ে আপনার বেশি চিন্তা আছে।[1]

এই ধারাবাহিকতা কোনো-না-কোনোভাবে এখনও পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে। ১৯৮০ সালের ২৭ ও ২৮ অক্টোবরে লাখনৌর কয়সরবাগের সফেদ বারাদরিতে 'পয়ামে ইনসানিয়াত' কনফারেন্সও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই কনফারেন্সে দেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত মুসলিম ও অমুসলিম পণ্ডিতবর্গ অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং চমৎকার এক পরিবেশে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এই আন্দোলন ও সফরমালা যেকজন মুখপাত্র ও এই বিষয়ের সুযোগ্য বক্তা তৈরি করেছিল, তাদের মাঝে তা'মীরে হায়াতের সম্পাদক মৌলভী ইসহাক জালীস নদভী সবার অগ্রগণ্য ছিলেন। তার কলম ও জবান এর বেশ ক্রিয়াশীল মুখপাত্র হয়ে গিয়েছিল। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তার বক্তব্যের পর আমি আর বক্তৃতা করার প্রয়োজন মনে করতাম না। শুধু আমি বক্তৃতা করব বলে ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল বিধায় বাধ্য হয়ে বক্তৃতা করেছি। এই আন্দোলন তার সহজাত প্রতিভা ও মানসিক গঠনের একদম অনুকূল ছিল। আর যেন তিনি প্রকৃত অর্থেই এ-কাজের জন্য জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি দেশের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং অমুসলিম শিক্ষিত যুবসমাজ ও রাজনৈতিক কর্মীদের কাছাকাছি অবস্থান করতেন। তাছাড়া যথাস্থানে হিন্দী শব্দ ও বাক্য ব্যবহারের যথেষ্ট যোগ্যতা তার ছিল (যা কিনা অমুসলিম শ্রোতাদের মনস্তত্ত্বের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করত। তাছাড়া ইংরেজি ভাষায়ও তার ভালো দখল ছিল। সেজন্য তার ভাষণ মুসলিম-অমুসলিম উভয় শ্রেণীর জন্য আর্কষণীয় ও সহজবোধ্য হতো।

মৌলভী ইসহাক সাহেবের পর এই আন্দোলনের সঙ্গে পুরোপুরি মিল ছিল আমারই ভাতিজা স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ মিয়া মরহুমের। আর মৌলভী ইসহাক জালীস একজন অপরজনের সমমনা ছিল। তারা দুজন মিলে সেই অঙ্গীকারণামাটি প্রস্তুত করেছিল, যেটি প্রতিটি শ্রেণীর মানুষের জন্য সমভাবে

---

১. এই সফরের বিস্তারিত রিপোর্ট ও বক্তৃতামালা সেই স্মৃতিচারণে পড়া যেতে পারে, যেটি মৌলভী ইসহাক জালীস-এর কলমে 'তা'মীরে হায়াতে' প্রকাশিত হয়েছিল এবং সম্প্রতি রায়বেরেলির পক্ষ থেকে 'তুহফায়ে ইনসানিয়াত' নামে গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রযোজ্য ও সার্বজনীন ছিল। আন্দোলনের পরিচয়করণেও দুজনের কলম সমানভাবে গতিশীল ছিল।

আন্দোলন কোনো-না-কোনোভাবে চালু আছে। কিন্তু তার যতটুকু মনোযোগ, যতখানি সময় ও যে-সংখ্যক মুখপাত্র ও প্রচারকের দরকার, আজও পর্যন্ত তার ব্যবস্থা হয়নি। আন্দোলনের কার্যক্রম বেশিরভাগ সেসব পুস্তিকা ও লিটারেচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে, যেগুলো উরদু, হিন্দি ও ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে। আর যতটুকু আছে, তাহলো আমার সফর। কিন্তু যোগ্য লোকের এই আকাল, উপকরণহীনতা ও মানুষের এখনও পর্যন্ত একাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা না বোঝা সত্ত্বেও আমি আজও এর গুরুত্ব অতটুকু অনুধাবন করি, যতটুকু প্রথম দিন ছিল। বরং দেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি এর প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি আরও তীব্রভাবে জাগিয়ে তুলেছে।

এদিকে এমনটি মনে হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের আজও এপথে দেশের নেতৃত্বদানের এবং এই পথটিকে রক্ষা করে দেশবাসীর ভালবাসা, সম্মান ও আস্থা অর্জন করার সুযোগ দিচ্ছেন যে, এখনও পর্যন্ত এত বড় একটি দেশের কোনো একটা কোণ থেকেও গঠনমূলকভাবে এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে কোনো আওয়াজ ওঠেনি এবং অসংখ্য সংগঠনের উপস্থিতি সত্ত্বেও 'পয়ামে ইনসানিয়াত' ও 'এসলাহে মু'আশারা'র আন্দোলনই একমাত্র আন্দোলন, যার কোনো পতাকাবাহী ও প্রচারক নেই। যেন মহান আল্লাহর হেকমত মুসলমানদের ইঙ্গিত করছে, ময়দান এখন খালি আছে এবং তোমাদের চেষ্টা-সাধনার অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ।

আর হিন্দুসমাজের অবস্থা হলো, আমি তাদের করুণার পাত্র মনে করছি। তাদের মাঝে কেউ যদি উঠে দাঁড়ায়ও তিনি শুধু মুসলমানদেরকে নিজেদের সংশোধনের পরামর্শ দেন কিংবা তাদের জাতীয় ধারার সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে বলেন। আপন ধর্মের সমালোচনা করে, আপন সমাজের সংশোধনের পরামর্শ দিয়ে তাদের অসন্তুষ্টির ঝুঁকি বরণ করে নিতে কেউই প্রস্তুত নয়। পিত্রালয় থেকে চাহিদা অনুসারে যৌতুক না আনার কারণে সদ্য বিবাহিতা বধূদের আগুনে পুড়িয়ে মারা কিংবা বিষ খাইয়ে হত্যা করা মহামারীর রূপ ধারণ করছে। একটি জাতীয় পত্রিকার সর্বসাম্প্রতিক রিপোর্টে জানা গেছে, শুধু দিল্লিতে এক মাসে এ-ধরনের ২৩২টি ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এই অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে হিন্দু সোসাইটিতে যে-রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার

দরকার ছিল, তার কিছুই এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি। আর এটিই দাওয়াতে মোক্ষম সুযোগ।

যখন কোনো জাতি কিংবা দাওয়াতি মিশন এমন কোনো মানবতাবিধ্বংসী, হিংস্রতা ও বর্বরতার বিরুদ্ধে আল্লাহর ভয়, মানবতার প্রেম ও সুরক্ষার চেতনা নিয়ে সংশোধন ও সেবার জন্য মাঠে নামে এবং নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে সেই সমস্যাগুলো দূর করে দেয়, তখন সেই মিশন সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়। সমাজে তারা মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয় এবং মানুষ তাদের আস্থার সঙ্গে বরণ করে নেয়। এই সম্প্রতি আমি এক ভাষণে বলেছি, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে বলেছেন−

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ

'আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে বিদ্যমান আছেন।'

আমরা সেই রাসূলের উম্মত হয়ে একটি দেশে বিদ্যমান আছি, যাঁকে বিশ্বজগতের জন্য করুণা আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং যার অস্তিত্ব আল্লাহর শাস্তির পথে প্রতিবন্ধক। আর সংখ্যায় আমরা ৮-১০ কোটি। অথচ এখানে দিন-রাত এমনসব ঘটনা ঘটছে, যেগুলো এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তাকে রুষ্ট করছে। এ-বিষয়গুলো মুসলমানদের সেই দায়িত্বের সঙ্গে মিল খায় না, যেটি তাদের দ্বীন, তাদের পূর্বসূরীগণ ও তাদের ইতিহাস তাদের ওপর অর্পণ করেছে। আমরা সেই নবীর উম্মত, যিনি আরবদের কন্যাসন্তান হত্যার প্রবণতাকে এমনভাবে মুছে দিয়েছেন যে, যদি সীরাত ও ইতিহাস না থাকত, তাহলে আজ মানুষ জানতেই পারত না, আরবদের সমাজে কোনো এককালে এই নির্মম প্রথাটি ছিল। এ-ক্ষেত্রে কি মুসলমানদের ওপর ইকবালের এই কবিতাটি খাপ খায় না, যেটি তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন−

نالم از کسے می نالم از خویش
کہ ما شایان شان تو بنودیم

'আমি কারও কোনো অনুযোগ করছি না কিংবা কারও কাছে কোনো নিবেদনও জানাচ্ছি না। আমি আমার নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি এবং নিজেরই কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছি যে, সত্য হলো, আমি আপনার উপযুক্ত ছিলাম না।'

ষষ্ঠ অধ্যায়

তিন বছরের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

পাক-ভারত যুদ্ধ

১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেল। এই যুদ্ধ প্রায় দুই সপ্তাহ অব্যাহত থাকল, যা কিনা যুদ্ধের ইতিহাসে দীর্ঘ কোনো সময় নয়। এক-একটি যুদ্ধ তো বছরের-পর-বছর অব্যাহত থাকে এবং ব্যাপক ধ্বংস সাধন করেই তবে ক্ষান্ত হয়। কিন্তু তারপরও ভারতের একজন মুসলিম নাগরিক ও দেশপ্রেমিক হিসেবে আমার কাছে এ যুদ্ধের ধরন, মনস্তত্ত্ব ও নৈতিক ফলাফল এতটাই সঙ্গিন মনে হচ্ছিল, এক-একটা দিন যেন এক-একটা বছরের সমান। এই দিনগুলো ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে নাজুক সময়। এই কটা দিন আমাকে অনেক ধৈর্যের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়েছে।

ভারতের কোনো মুসলমানকে এই আহ্বান জানানো যে, এর দ্বারা তুমি প্রভাবিত হয়ো না; একটা অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক বিষয় ছিল। শুধু ভারতেরই নয় – পাকিস্তানেরও বাস্তববাদী ও গঠনমূলক মানসিকতার অধিকারী নাগরিকদের কামনা ছিল, দুটি দেশই শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশে উন্নতি লাভ করুক এবং মানবতা, মহৎ লক্ষ্য ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে আত্মনিয়োগ করে যুদ্ধের ঝুঁকি দূর করার কাজে নিজেদের সবটুকু প্রচেষ্টা ব্যয় করুক এবং একে অপরের সহযোগিত করুক।

পাকিস্তানের আন্দোলনের ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতির কথা আমি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আলোচনা করেছি। খোদ মাওলানা আযাদের (যিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিভক্তির বিপক্ষে ছিলেন এবং যিনি গান্ধীজি ও পণ্ডিত নেহেরুর বিভক্তির পক্ষ গ্রহণের জন্য বিস্ময় প্রকাশ করেছেন) এই উক্তিটি উল্লেখ করেছি 'এখন যখন পাকিস্তান হয়েই গেল, এখন একে টিকিয়ে রাখা ও উন্নতির দিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার।' কিন্তু কোনো-কোনো সময় একটি

দেশের নেতারা তাদের দেশের প্রকৃত সমস্যাগুলো থেকে নাগরিকদের দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতে আপন দেশকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেয়।

সে যা-ই হোক, উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট যা-ই থাকুক, দুই দেশের মধ্যে এই অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধটা বেঁধে গেল এবং ভারত সরকার ভারতের প্রতিজন মুসলমান নাগরিককে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করল। এদিকে পাকিস্তানের শাসন ও নেতৃত্ব যাদের[১] হাতে ছিল, তারা তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ব্যক্তিগত চরিত্র ও বিগত ইতিহাসের বিচারেও একটি ইসলামি রাষ্ট্রের নেতা ও মুসলমানদের সঠিক প্রতিনিধি ছিলেন না এবং তাদের নিয়তের ওপর কোনোভাবেই আস্থা রাখা যেত না। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ৩ তারিখে শুরুহওয়া এই যুদ্ধ ১৭ তারিখে শেষ হলো। কিন্তু এই যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে এমন কিছু লজ্জাকর অভিজ্ঞতা যোগ করে গেল, যা মুসলিম ইতিহাসের জন্য ছিল একটি নতুন ও অপমানজনক। তারপর এর ফলে পাকিস্তানের পূর্ব বাহু (পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমানের যার নাম বাংলাদেশ) যার জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়েও বেশি ছিল এবং দেশটির আয়ের বড় একটি উৎস ছিল তার থেকে আলাদা ও স্বাধীন হয়ে গেল।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা তার বিচ্ছিন্নতাই পছন্দ করতেন, যাতে তারা পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে নিশ্চিন্তে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর শাসন চালাতে পারে এবং পূর্ব পাকিস্তানের ভোট তাদের পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে না পারে।

দু-সপ্তাহের এই যুদ্ধে পরিবেশ এতটাই ঘোলাটে হয়ে গেল এবং অশিক্ষিত ও পশ্চাদপদ শ্রেণীটির দৃষ্টিও এতটাই বদলে গেল যে, কোনো-কোনো অনুভূতিপ্রবণ ও আত্মমর্যাদাশীল লোকেরা সকালের পায়চারি ও অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণও ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই যুদ্ধ যদি দীর্ঘতা লাভ করত, তাহলে জানি না, হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ওপর দিয়ে কেমন ঝড় বয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহপাকের শোকর যে, খুব তাড়াতাড়ি তার সমাপ্তি ঘটেছে।

পূর্ব পাকিস্তানে ভাষাগত ও আদর্শগত বাড়াবাড়ির ঝড়

পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার সময় এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, যে-ঘটনা শুধু চিন্তাশীল মুসলমান, দীনের দাঈও ইসলামের প্রাণকেই নয় – ইসলামের

---

১. সে সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ইয়াহয়া খান আর প্রধানমন্ত্রী মিস্টার জুলফিকার আলী ভুট্টো।

প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিতজনদেরও কাঁপিয়ে তুলেছে এবং মুসলমানদের মাথা লজ্জায় ঝুঁকে গেছে। এই ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে, কোনো মুসলমান জাতি, দেশের বাহ্যিক কর্মকাণ্ড, দ্বীনি প্রতীক ও ধর্মীয় উদ্দীপনার বহিঃপ্রকাশের ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত আস্থা রাখা যায় না, যতক্ষণ-না তার অনুভূতি পোক্ত, তার ইসলামের বুঝ গভীর, তার মস্তিষ্ক 'জাহেলিয়াত'-এর প্রভাব থেকে পবিত্র এবং ইসলামের সম্পর্ক ও ধর্মীয় মর্যাদাবোধকে দেশ, জাতি, বংশ, ভাষা ও সংস্কৃতির যেকোনো সম্পর্কের ওপর প্রাধান্য দেবে। তাকে ভাষা, জাতীয়তা ও ক্ষমতার স্লোগানে এমন আত্মহারা হওয়া যাবে না যে, এর জন্য তাকে শুধু ইসলামিই নয় – ইনসানি তথা মানবীয় সীমানাকেও অতিক্রম করে ফেলতে হবে এবং উন্মাদনার এমন একটা ঢেউ জেগে উঠবে, যা অন্য ভাষাভাষী কিংবা অপর কোনো দেশ থেকে আসা সমধর্মীয় লোকদের সাপ-বিচ্ছুর মতো মেরে ফেলতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যাবে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকমণ্ডলি, সেনা-অফিসার, এমনকি সেনাবাহিনীর সৈনিক ও জ্ঞানী-গুণীরা ইসলামের মৌলিক শিক্ষামালা, ইসলামি সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মূলনীতি ও পবিত্র কুরআনের এই বিজ্ঞোচিত শিক্ষার ওপর আমল করেনি যে, আল্লাহপাক বলছেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ

'হে মুমিনগণ! কোনো সম্প্রদায় যেন কোনো সম্প্রদায়কে উপহাস না করে। হতে পারে, ওরা এদের চেয়ে ভালো হবে। আর নারীরা যেন নারীদের উপহাস না করে। কারণ, হতে পারে ওরা এদের চেয়ে ভালো হবে। আর তোমরা নিজেদের দোষারোপ করো না এবং কেউ কাউকে মন্দ নামে ডেকো না।'[১]

তাছাড়া তারা হাদীছের শিক্ষা 'কোনো মুসলিম যেন কোনো মুসলিমকে তুচ্ছ না করে'-এর ওপরও আমল করেনি। তাদের মাঝে বড়ত্বের অনুভূতি, বরং ক্ষমতার দম্ভ ও অহমিকা ছিল। তাদের কর্মকাণ্ড মুসলিম শাসক, সৈনিক ও দায়িত্বশীলদের মতো ছিল না। '৭১ সালের যুদ্ধে তাদের থেকে এমনসব আচরণ প্রকাশ পেয়েছিল, যেটি ইসলামের গায়ে কলঙ্ক লেপন করেছে এবং

---

১. সূরা হুজুরাত : আয়াত ১০

মানবীয় চরিত্র ও সভ্যতার পরিপন্থী ছিল। তারা বাংলা শিখতে এবং তাকে পুরোপুরি অধিকার দেওয়ার চেষ্টা করেনি। অথচ এটি ছিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভাষা। তাছাড়া এটি একটি উন্নত মিষ্টি ভাষাও বটে, যা কিনা সাহিত্য ও কাব্যে সমৃদ্ধ। তারা পূর্ব পাকিস্তানের যে সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গ আইন ও গণতন্ত্রের মাধ্যমে পার্লামেন্টে এসেছিলেন, তাদের সঙ্গে সুবিচারমূলক আচরণ করেননি।

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে, এই ভাষা ও সংস্কৃতিক সংঘাত ও ইসলামের পরিভাষায় 'জাহেলিয়াত'-এর কোনো বৈধতা ছিল না, যেটি এর সূত্র ধরে কিংবা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের পথ ধরে সামনে এসেছিল।

এখানে আমি আমার সেই ভাষণটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করব, যেটি আমি উক্ত ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে ১৯৭২ সালের ২৩ মে কলিকাতার এক সভায় উপস্থাপন করেছিলাম। এই সভা যাকারিয়া স্ট্রিটে অবস্থিত আমজাদিয়া হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরে এই ভাষণটি 'ভাষা ও সংস্কৃতিগত সংঘাত ও তার থেকে শিক্ষা' শিরোনামে উরদু, ইংরেজি, আরবি ও বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল। আমার বুকটা সে সময় উক্ত ঘটনায় দাগদাগ ছিল এবং অন্তরটা জখমে ক্ষতবিক্ষত ছিল। ভাববাচ্য বলছিল–

رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف
آج کچھ درد میرے دل میں سوار ہوتا ہے

'এই তিক্ততার মাঝে আমাকে ক্ষমার চোখে দেখো গালিব! আমার হৃদয়ে আজ কিছু ব্যথা চেপে আছে।'

এই ঘটনার পর আমি অপেক্ষায় ছিলাম, যেখানে এই ঘটনা ঘটেছে, তার অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি কোনো জায়গায় যেন এ-ব্যাপারে আমার মনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়ে যাই। ঘটনাক্রমে আমি কলিকাতা থেকে আমন্ত্রণ পেলাম এবং আমি একে গনিমত মনে করে এখানে আমার মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করলাম। এখানে আমি আমার সেই ভাষণের কয়েকটি অংশ তুলে ধরলাম।

'এই তো অল্প কদিন আগের ঘটনা। একটি প্রাচীন ইসলামি রাষ্ট্র ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে ভাষা ও সংস্কৃতির উন্মাদনার একটা তীব্র ঢেউ জেগে ওঠে। এই ভূখণ্ডটি ওলামা-মাশায়েখ ও মাদরাসা-খানকার দেশ ছিল, যার অলিতে-গুলিতে অসংখ্য মসজিদ ও আল্লাহর ঘর ছিল। যার জন্য শত-

শত বছর ধরে আল্লাহর অলীগণ চোখের পানি আর কলিজার রক্ত প্রবাহিত করেছেন। যার মাটি তাঁদের অশ্রুতে ভেজা ছিল, যার আবহাওয়া তাঁদের রাতের কান্নায় উত্তপ্ত ছিল। কিন্তু দেখতে-না-দেখতেই শত-শত বছরের এই শ্রম ও মেহনতের ওপর পানি ছিটিয়ে গেল। মুসলমান অবলীলায় মুসলমানের গলা কাটল। নিরপরাধ মানুষগুলোকে এমন নির্দয়ভাবে হত্যা করা হলো, যেভাবে সাপ-বিচ্ছু মারা হয়। যারা এই দেশটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, তাদের জন্য এখানকার কোথাও আশ্রয় থাকল না। না কারো অন্তরে তাদের জন্য দয়া ছিল, না কারও চোখে তাদের জন্য অশ্রু ছিল। বনে যেভাবে পশু-পাখি শিকার করা হয়, পুকুরে যেভাবে মাছ শিকার করা হয়, তাদের নিয়ে ঠিক সেভাবেই শিকার খেলা হলো।[১] না ভদ্র মহিলাদের সম্ভ্রম নিরাপদ থেকেছে, না বৃদ্ধদের বার্ধক্যের তোয়াক্কা করা হয়েছে। না নিষ্পাপ শিশুদের আর্তনাদে কর্ণপাত করা হয়েছে। পানাহার থেকে বঞ্চিত রাখার শাস্তি, পাষাণতা ও নির্মমতার এমন কোনো প্রকার ছিল না, যেগুলো আপন ভাইদের ওপর প্রয়োগ করা হয়নি। ভাষাপূজা তাওহীদের বিশ্বাসের ওপর, জাতিপূজা ও বংশপূজা ইসলামি ঐক্যের ওপর এবং জাহেলিয়াত ও সাম্প্রদায়িকতা ইসলামি ভ্রাতৃত্বের ওপর এমনভাবে জেঁকে বসেছিল যে, ইসলামের সূচনাকাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি কোনো ভূখণ্ডে এমনভাবে জেঁকে বসেনি। ইসলাম ও মুসলমান একে অপরের হাতে কখনও এভাবে অপদস্থ হয়নি, যেমনটা এ-সময় হয়েছিল।'

সামনে অগ্রসর হয়ে আমি আরও লিখেছি—

সেই ঘটনাবলির সবচেয়ে লজ্জাজনক দিক হলো, এর মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের হাতে ইসলামের ব্যর্থতার একটি দলিল এসে পড়ল। এর থেকে তারা ফলাফল বের করল, ইসলামে সুসম্পর্ক তৈরি করার এবং ভিন্ন-ভিন্ন জাতি ও প্রজন্মকে (যাদের ভাষা, বর্ণ বংশ ভিন্ন) ঐক্যবদ্ধ করার

---

১. এসব ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছে। কোটর থেকে চোখ তুলে ফেলা হলো। ঘাস কাটার মতো করে মানুষের মাথা কাটা হলো। মসজিদের নামাযীদের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হলো। কোনো-কোনো বন্ধু আমাকে বলেছে, মানুষকে জীবন্ত দাফনও করা হয়েছে। কিন্তু এটিও বাস্তবতা যে, গোটা বসতি এই উন্মাদনার শিকার হয়নি। উম্মতের সচেতন ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মুসলমানরা এর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এই পরিস্থিতির জন্য রক্তের অশ্রু ঝরিয়েছেন।

যোগ্যতা নেই। আরও একটা ক্ষতি হয়েছে, ইসলামি বোধ-বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে কোনো সমাজ বা কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং যদি হয়ও অটুট থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই। এটি সেই অভ্যন্তরীণ ক্ষতি যে, অন্য কোনো ক্ষতিকে এর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এর দ্বারা ইসলামের সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। আর আপনারা জানেন, ব্যবসায় আসল বিষয় হলো সুনাম ও আস্থা।'

আরও সামনে অগ্রসর হয়ে এই দুর্ঘটার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আমি বলেছি–

'আমার মতে এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো, এই সম্প্রদায়টির মাঝে সঠিক দ্বীনি অনুভূতি ছিল না। অন্তরের পাশাপাশি মস্তিষ্কেরও ঈমানদার হওয়া জরুরি। স্রেফ ইসলামের মহব্বতই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে ইসলামপরিপন্থী দর্শন-মতবাদের প্রতি ঘৃণা থাকাও অপরিহার্য। বরং কুরআন মজীদে বিভিন্ন জায়গায় তাগুত, শয়তান ও জাহেলিয়াতের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ও তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশের কথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– আল্লাহপাক বলেন–

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى

'যেলোক তাগুতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল, সে শক্ত হাতল ধারণ করল।'[১]

তারপর আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে জাহেলি সাম্প্রদায়িকতার কী পরিমাণ নিন্দাবাদ করেছেন, আমি তার বিবরণ দিলাম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যত বড় শত্রুরই হোক কারও সঙ্গে অকোমল ভাষা ব্যবহার করা পছন্দ করতেন না। কিন্তু তিনি কেউ যদি জাহেলিয়াতের স্লোগান উচ্চকিত করে, জাহেলিয়াতের কোনো মতবাদের প্রতি আহ্বান করে, তার জন্য কঠোর-থেকে-কঠোরতর ভাষা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেছেন। এখানে কোনো প্রকার ছাড় দিতে তিনি বারণ করে দিয়েছেন।

আমি বলেছি, ভাষা আল্লাহপাকের রহমত – অভিশাপ নয়। জিহ্বার সৃষ্টিই এজন্য যে, এটি ভাঙা মনে জোড়া লাগাবে। এর থেকে বেরহওয়া শব্দমালা নিষ্প্রাণ দেহে প্রাণ সঞ্চার করবে, প্রেমের ফুল ছিটাবে, পরকে আপন

---

১. বাকারা : ২৫৬

বানাবে, দূরকে কাছে টানবে, শত্রুকে বন্ধু বানাবে। ঘৃণার বিষ ছড়ানো, আগুন জ্বালানো, ভাইকে ভাই থেকে দূরে সরানো এর কাজ নয়। যদি জিহ্বা দ্বারা এসব কাজ নেওয়া শুরু হয়, তাহলে এর চেয়ে বোবা হয়ে যাওয়া হাজার গুণ ভালো।

তারপর আমি সাহাবা কিরামের আদর্শের নমুনা শোনালাম। তাঁরা কীভাবে মানুষ তৈরি করতেন তারও বিবরণ দিলাম। সেই আদর্শের কারণেই তাঁরা কোনো চতুর ও কুমতলব মানুষের প্রতারণার জালে আটকাতেন না এবং কোনো জাহেলি স্লোগান তাদের ক্ষেপাতে পারত না। আমি আরও বলেছি, কোনো সৃষ্টির এমন আনুগত্য বৈধ নয়, যেটি করতে গেলে স্রষ্টাকে অমান্য করতে হয়। তারপর আমি এই বাস্তবতাও বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, কোনো ভাষার ইসলামি প্রাণ থেকে বঞ্চিত থাকা এবং জাহেলি চিন্তা-চেতনা ও বোধ-বিশ্বাসের গোলাম হওয়া বড় একটা ঝুঁকি। বাংলাদেশের ভাইদের কর্তব্য হলো, তারা যেন এই ঝুঁকিপূর্ণ পথটা বন্ধ করে দেয় এবং তাদের ভাষা ও সাহিত্যকে শুধু ইসলামি চিন্তা-চেতনা দ্বারা সমৃদ্ধ করে। বরং তার প্রাণ ও আত্মাকে মুসলমান বানিয়ে নেয় এবং সেই লোকগুলোর প্রভাব ও মানসিক গোলামি দূর করার চেষ্টা করবে, যারা এই ভাষাটিকে ইসলাম থেকে দূরে এবং নাস্তিকতার কাছে নিয়ে যেতে চায়। এভাবে একটি নতুন যুগের সূচনা হতে পারে। এমনটি করতে পারলে সেদিন মুমিনদেরই মুখে হাসি ফুটবে আল্লাহর সাহায্যে।

আমি স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, আপনাদের পূর্বসূরীরা নিকট অতীতে ত্রয়োদশ হিজরিতে মুজাহিদে আজম হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর সঙ্গে যোগ দিয়ে সেই জীবনবাজি ও জীবন উৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন, যাঁরা ডক্টর হেনরির মতো সমালোচকদেরও দাঁতে আঙুল চেপে বসে থাকতে বাধ্য করেছেন।[১]

---

১. বিস্তারিত জানতে আমার 'হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান' নামক বইটি পড়ুন। এখানে একথাটিও উল্লেখযোগ্য যে, লেখন সম্প্রতি (৯-১৯ মার্চ ১৯৮৪) বাংলাদেশ সফরে গিয়ে অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন এবং ইসলামি নবজাগরণ প্রত্যক্ষ করেছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ লেখকের বক্তৃতা সংকলন 'তোহফায়ে মাশরেক'-এ দেখা যেতে পারে।

মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড প্রতিষ্ঠা

ভারতে ইসলামি জনগোষ্ঠীর আপন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে থাকা, বরং আপন ধর্মের বৃত্তের মাঝে অবস্থান করে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করার ক্ষেত্রে আরও একটি শঙ্কা সামনে এসে দাঁড়াল। আর সেটি হলো, সরকার চাচ্ছিল; এমনকি খোদ মুসলমানদের আধুনিকতাপ্রিয় ও স্বাধীনচেতা শ্রেণীটির দাবি ছিল, ভারতের সবগুলো গোষ্ঠীর জন্য একটি একক পারিবারিক আইন (uniform civil code) থাকা দরকার। কারণ, এছাড়া জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে না। এই শঙ্কা ধারণার চেয়েও বেশি গুরুতর রূপ ধারণ করে নানা ঘটনার আকারে সামনে আসতে শুরু করল। সরকারের কিছু-কিছু সতর্ক; অথচ অর্থপূর্ণ বক্তব্য সময়ে-সময়ে এই আশঙ্কাকে শক্তি জোগাতে থাকল। তারপর আবদুল হামীদ দেলওয়াই সাহেবের নেতৃত্বে একটা শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল, যারা সুযোগমতো এই দাবিটি উত্থাপন করতে লাগল এবং একে একটি মিশন ও আন্দোলনের মতো পরিচালনা করতে শুরু করল। এটি মুসলমানদের ধর্মচ্যুতি ও ইসলামি শরীয়তের সঙ্গে বিদ্রোহ ও তার বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়ার সূচনা বলে প্রতীয়মান হলো এবং মুসলমানদের 'যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসন করে না, তারাই কাফের' পবিত্র কুরআনের এই হুশিয়ারির প্রয়োগক্ষেত্র বানানোর আশঙ্কা দেখা দিল।

যে-কজন লোকের মনে এই আশঙ্কার অনুভূতি জাগল, তাঁদের মাঝে মাওলানা সাইয়িদ মিন্নাতুল্লাহ রহমানি সাহেব আমীরে শরীয়ত বাহারু উড়িষ্যা অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর এই পদমর্যাদা, এই কর্মব্যস্ততা ও বিদ্যাগত অভিজ্ঞতা এ-ক্ষেত্রে যথাসময়ে জাতিকে পথের দিশা দিল এবং মহান আল্লাহ এর বিরুদ্ধে মাঠ প্রস্তুত করার সৌভাগ্য (অন্যসব সৌভাগ্যের পাশাপাশি) তাঁর নামে বরাদ্দ দিলেন। তিনি এর বিরুদ্ধে একটি সুসংগঠিত মিশন ও আন্দোলন পরিচালনা এবং একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মুসলিম মজলিসে মুশাওয়ারাত, জামায়াতে ইসলামী, দারুল উলূম দেওবন্দ, মাযাহিরুল উলূম ও নদওয়াতুল উলামার সঙ্গে সম্পৃক্ত আলেমগণ তাঁকে পুরোপুরি সমর্থন দিলেন এবং সিদ্ধান্ত হলো, ১৯৭২ সালের ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে মুসলিম পার্সোনাল ল' কনভেনশন আহ্বান করা হবে, যেখানে মুসলমানদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় গোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব ও সহযোগিতায় এই ফেতনার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ময়দান তৈরি করা হবে।

আমি ও মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর নু'মানী সাহেব সে-বছর রাবেতার সভায় অংশগ্রহণের জন্য – যেটি প্রতি বছর যিলকদ মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে – পবিত্র হেজায গিয়েছিলাম এবং হজ্ব সমাপনান্তে ফিরে আসবার প্রোগ্রাম ছিল। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব (জামায়াতে ইসলামী) ও অন্য কজন বন্ধু-সুহৃদের তারবার্তা এসে পৌঁছল, এই মৌলিক সভায় এবং প্রথম কনভেনশনে আপনাদের দুজনের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতি জরুরি। আমরাও মনে করলাম, এ-বিষয়টি মুসলমানদের জন্য প্রাণশিরার মর্যাদা রাখে। চিন্তা করলাম, এর আগেও কয়েকবার আল্লাহপাক আমাদের হজ্ব করার তাওফীক দান করেছেন এবং আগামীতেও ইনশাআল্লাহ নসিব হবে। হজ্বের মাত্র দুই কি তিন সপ্তাহ বাকি ছিল। আমরা বৈরুত হয়ে বোম্বাই এসে পড়লাম এবং কনভেনশনে যোগ দিলাম।

ভারতীয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর এমন পরিপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব এর আগে আমি কমই দেখতে পেয়েছি। বেরেলবি চিন্তাধারার আলেম ও নেতা মাওলানা বুরহানুল হক জাবালপুরী, এছনাআশারী ফেরকার প্রতিনিধি ও জিম্মাদার ডক্টর নাজমুদ্দীন, আহলে হাদীছের একাধিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেছেন। রাতে মদনপুরার ওয়াই.এম.সির মাঠে আড়ম্বড়পূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিতির সংখ্যা প্রায় এক লাখ ছিল। নানাজন জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন। বোম্বাই, বরং মহারাষ্ট্রের মুসলমানরা অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সহযোগিতার ডালি নিয়ে এগিয়ে এল এবং অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে মেহমানদের আপ্যায়নের দায়িত্ব পালন করল। এই সভায় 'অল ইন্ডিয়া বোর্ড' গঠিত হলো এবং সর্বসম্মতিক্রমে দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তায়্যেব সাহেব সভাপতি এবং মাওলানা সাইয়িদ মিন্নাতুল্লাহ রহমানি সাহেব সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। এভাবে এই বরকতময় মিশনের সূচনা হলো, যেটি মুসলমানদের জন্য (দ্বীনি ও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে) জীবন-মৃত্যুর বিষয় ছিল। আর এই তৎপরতা এখনও পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

সেদিন কনভেনশন চলাকালে আবদুল হামীদ দেলওয়াই সাহেবের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র একটি দল শোডাউনের জন্য বের হলো। জনতা তাদের জুতা-স্যান্ডেল দ্বারা স্বাগত জানাল। পুলিশ যদি দ্রুত তাকে নিরাপত্তা না দিত, তাহলে এর চেয়েও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, পরদিন

টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়ার বোম্বাই এডিশনে এক কোণে পার্সোনাল ল' কনভেনশনের জনসভার সংবাদ ছাপা হলো, যার দ্বারা কনভেশনের ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা অনুমান করা সম্ভব ছিল না। তার বিপরীতে দেলওয়াই সাহেবের শোডাউনকে এমন হাইলাইট করে দেখানো হলো, যার দ্বারা যেকোনো মানুষ বুঝতে বাধ্য ছিল, এর মাঝে মুসলমানদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব ও তাদের চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ছিল।

এ হলো ভারতের দায়িত্বহীন ইংরেজি ও হিন্দি সাংবাদিকতার একটা নমুনা। এদের কাজই হলো সরকার ও জনগণকে বাস্তব ও সঠিক ঘটনা থেকে আড়াল করে রাখা। বরং তিলকে তাল আর তালকে তিল বানিয়ে সরকার ও জনগণকে বিভ্রান্ত করা এদের মিশন। এরা দেশ ও দশের সেবা করার পরিবর্তে ক্ষতি করে, সমাজে আলো ছড়ানোর বদলে অন্ধকার ছড়ায়।

অল ইন্ডিয়া আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি কনভেনশন দিল্লির সূচনা

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলে এসেছি, আমি মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়ের – যাকে আমি এমন একটি জাতীয় সম্পদ মনে করি, যার পেছনে স্বচ্ছল ও প্রভাবশালী ভারতীয় মুসলমানদের শ্রেষ্ঠতম মানসিক যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় হয়েছে – সংখ্যালঘুদের মর্যাদার সুরক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করাকে আমি শুরুতে একটি জাতীয় সেবা মনে করেছি এবং তার প্রতিষ্ঠাতার কোনো-কোনো চিন্তার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করা সত্ত্বেও (আমি আমার গ্রন্থ 'মুসলিম মামালেক মে ইসলামিয়াত ওয়া মাগরেবিয়াত কী কাশমকাশ'-এ যার বিস্তারিত আলোচনা করেছি)[1]

তাঁর যেসব আত্মমর্যাদাশীল পুরাতন ছাত্র ও ভক্ত লাখনৌতে কর্মতৎপর, তাদের সহযোগিতা করতে কখনও বিলম্ব করিনি। ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে যেসব আশঙ্কার কথা শুরুতে ব্যক্ত করা হয়েছিল, সেগুলো এখন বেশি স্পষ্টরূপে সামনে আসতে শুরু করেছে। ১৯৬৫ সালে ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট-এর সংশোধনীর মাধ্যমে এডমিনিস্টারিশন একটি নতুন একজেক্টিভ কাউন্সিলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, যার সদস্যসংখ্যা ছিল ৯ জন। এটি সরকারের পক্ষ থেকে গঠন করা হয়েছিল। কোর্ট একাডেমিক কাউন্সিল ও পুরাতন

---

১. দেখুন পৃষ্ঠা ৯৫-১০৪

একজেক্টিভ কাউন্সিল বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল এবং পূর্ণ ক্ষমতা এই নতুন একজেক্টিভ কাউন্সিল প্রদান করা হয়েছিল, যারা কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে বলে সিদ্ধান্ত ছিল।

তারপর ১৯৭২ সালে লোকসভায় মুসলিম ইউনিভার্সিটি সংশোধনী এ্যাক্ট অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে পাশ করা হলো। এই এ্যাক্ট-এর কারণে যে-মুসলিম ইউনিভার্সিটি কোর্ট একজেক্টিভ কাউন্সিল এবং যে-একাডেমিক কাউন্সিল তৈরি হবে এবং এগুলোর সদস্য নির্বাচনের অধিকার ও যোগ্যতা যেসব দল ও ব্যক্তিকে প্রদান করা হলো, তাতে স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, এটি নিছক কেন্দ্রীয় সরকার ও তার এডুকেশন মিনিস্টারির মনোবাসনা পূরণকারী কতগুলো আজ্ঞাবহ দল হবে। তাদের মধ্যে মুসলমানদের স্বাধীন প্রতিনিধিত্বের বাহ্যত কোনো সম্ভাবনা ছিল না এবং তার ফলে মুসলিম ইউনিভার্সিটি কোর্ট নিছক একটি পরামর্শ প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এসব কারণে ইউনিভার্সিটির হিতাকাঙ্ক্ষীরা দেখতে শুরু করলেন, এই সংশাধনী এ্যাক্ট কম্যুনিস্টদের ইচ্ছাপূরণ ও সরকারের মাধ্যমে ইউনিভার্সিটির ওপর তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টিই বহন করে শুধু।

শিক্ষানিয়ন্ত্রণের ভয়ানক ঝোঁক

এই অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে ইউনিভার্সিটির হিতাকাঙ্ক্ষীগণ – যাদের মাঝে আমাদের লাখনৌর বন্ধুরা অগ্রগামী ছিলেন – রাজধানী দিল্লিতে (যেটি কিনা আলীগড়ের কাছাকাছিও) এই বিষয়ের ওপর একটি অল ইন্ডিয়া কনভেনশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারা আমার দ্বারা এই কনভেনশনের উদ্বোধন করানোর এবং সেই সুবাদে আমি আমার চিন্তাধারা ব্যক্ত করব বলে আব্দার জানিয়েছেন। আমি দীর্ঘদিন যাবতই সরকারের শিক্ষানিয়ন্ত্রণের ঝোঁক অনুভব করে আসছিলাম এবং একে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে (যেগুলোর মধ্যে আরবি মাদরাসাগুলো ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও অল্প কদিন পরেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে) খুবই ক্ষতিকর ছিল। এই অনুভূতি আমাকে বাধ্য করল, মাদরাসার লোক হওয়া সত্ত্বেও এই দায়িত্বটি আমি বরণ করে নেব। আমি তার জন্য উদ্বোধনী ভাষণ প্রস্তুত করলাম, যাতে সম্ভবত এ-ই প্রথম আমি এই শিক্ষানিয়ন্ত্রণের ঝোঁক ও কম্যুনিস্ট সরকারগুলোর রীতি অনুসারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের ব্যবস্থাপনায় নিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছি।

কয়েকজন অমুসলিম বুদ্ধিজীবী ও প্রফেসর বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, একজন মৌলভীর দুর্বল ও রুগ্ন চোখ এই শঙ্কাটা এত দূর থেকে দেখল কীভাবে!

ভাষণে আমি বলেছি–

'আধুনিক ইতিহাসের সম্ভবত সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা এবং মানবতার ক্ষেত্রে রাজনীতির সবচেয়ে বড় বাড়াবাড়িটা হলো, মানস ও চরিত্রের উৎস, ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের কারখানা এবং জীবনের দিশাদানকারী কেন্দ্রগুলোকে নির্দয়-হৃদয়হীন রাজনৈতিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নির্বাচনি স্বার্থের অনুগামী এবং তাদের জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারে সিদ্ধান্তকারী হয়ে যাবে। একথা ঠিক যে, জাতীয় সরকার বৈদেশিক সরকারের মোকাবেলায় জাতীয় জীবন ও শিক্ষা-দীক্ষার ময়দানে দিকনির্দেশনা করার সবচেয়ে বেশি যোগ্য ও অধিক আস্থাভাজন। আর এটিও সত্য যে, সরকারগুলোর ক্ষমতার পরিধি আজ কর আদায়, জীবন-সম্পদের সুরক্ষা ও দেশের প্রতিরক্ষা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। এই মূলনীতিটি মেনে নেওয়ার পর আমি একথা বলার সাহস করব যে, শিক্ষার কেন্দ্রগুলোকে শিল্পকারখানার ওপর অনুমান করা এবং সেগুলোকে একেবারে নিজেদের নিয়ম ও ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে নেওয়া, সেই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া, যারা সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং নিজেদের রক্তে-ঘামে সেগুলোকে তিলে-তিলে গড়ে তুলেছে এটি একটি গুরুতর পদক্ষেপ, যার ফলাফল খুবই সুদূরপ্রসারী ও গভীর। কোনো দেশে একই ধরনের মন-মস্তিষ্ক তৈরি করার, একই ধরনের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করার এবং একই ধরনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য লালনকারী দল তৈরি করার প্রচেষ্টা দেশ ও সমাজকে বড় এক বিপদের মুখোমুখি দাঁড় করানোর নামান্তর। এই দৃষ্টিভঙ্গি কোনো সুগার ফ্যাক্টরি বা রাইফেল-বন্দুক ফ্যাক্টরির জন্য মানানসই। কিন্তু শিক্ষা ও মানস তৈরির কেন্দ্রগুলোর জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গি একদমই বেমানান।

ধর্ম ও শিক্ষা এগুলোই এমন দুটি কেন্দ্র, যারা আজীবন রুগ্ন জাতিগুলোর হাত ধরে গন্তব্যে নিয়ে গেছে, প্রাণ দান করেছে এবং তাদেরই মধ্য থেকে সমাজসংস্কারক, রিফর্মার ও বিপ্লবী বেরিয়ে এসেছেন, যাঁরা দেশ ও সমাজে জীবনের একটি নতুন আত্মা জাগিয়ে তুলেছেন এবং তাদের জীবনতরিকে আজীবনের জন্য নিমজ্জনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। গ্রীক, রোমান, প্রাচ্য

ও খোদ পাশ্চাত্যের পুরো ইতিহাস এর স্বাক্ষী। এই নাজুক পরিস্থিতি পূর্ণ রাজনৈতিক জাগরণ, প্রতিরক্ষাশক্তি ও শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে প্রতিটি দেশ ও জাতির ওপর আসতে পারে। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যদি পুরোপুরি সরকারের অধীন ও নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, ওখানে যদি একই ধরনের দর্শন পড়ানো শুরু হয়, একই ধরনের মডেল তৈরি হয়, একই রাজনৈতিক পার্টি ও তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ধারক-বাহক বানানো হয়, ওখানকার শিক্ষকমণ্ডলি ও প্রশাসন যদি সরকারের চোখের ইশারায় চলতে শুরু করেন, তাহলে সেই দেশটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না।'

এই সমাবেশ ১৯৭৩ সালের ১০ ও ১১ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশ থেকে আলীগড়ের পুরাতন ছাত্রবৃন্দ, স্কলার, মুসলমানদের বিভিন্ন দল ও সংগঠনের প্রতিনিধি, কুল হিন্দ মজলিসে মুশাওয়ারাত ও মুসলিম মজলিসের দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব (রহ.)-এর মাজার ও মসজিদসংলগ্ন একটি কক্ষে আমার ও কয়েকজন সহকর্মীর থাকার ব্যবস্থা হলো। আমি উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ করলাম, যার অংশবিশেষ উপরে উল্লেখ করেছি। আল্লাহর শোকর যে, ইউনিভার্সিটির অবয়ব ও আত্মার পরিবর্তনের যে-কাজ দ্রুতগতিতে শুরু হয়েছিল, (শুধু এই কনভেনশনের কারণে কিনা জানি না) তাতে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়ে গেল এবং একটা পর্যায়ে এসে ইউনিভার্সিটি সেই তাৎক্ষণিক শঙ্কা থেকে বেরিয়ে গেল, যেটি তার মাথার ওপর আপতিত হওয়ার উপক্রম ছিল এবং একটি দীর্ঘ শান্তিময় আইনি ও নৈতিক প্রচেষ্টা শুরু করার পথ তৈরি হয়ে গেল, যেটি একটি জাতি, জনগোষ্ঠী ও জীবন্ত প্রতিষ্ঠানের জীবনে অপরিহার্য এবং যাকে সব সময় চৌকান্না ও সজাগ থাকা প্রয়োজন।

কবির ভাষায়–

یک لحظہ غافل بودم وصد سال راہم دور شد

'এক মুহূর্ত উদাসীন থাকলে আমাদেরকে একশো বছর পিছিয়ে যেতে হবে।'

সপ্তম অধ্যায়

মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি মুসলিম দেশ ভ্রমণ ও আরব উপসাগর সফর

ভ্রমণের জন্য দেশনির্বাচন

রাবেতা আলমে ইসলামী – সে সময় যার সেক্রেটারী ছিলেন শায়খ সালেহ আল-কাযযায, যিনি রাবেতার প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী শায়খ মুহাম্মাদ সুরুর আস-সাব্বান (প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী সৌদি আরব)-এর মৃত্যুর পর সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন – বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিদল পাঠানোর প্রোগ্রাম প্রস্তুত করলেন। এই প্রোগ্রামে পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের অবস্থা-পরিস্থিতি, তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতিগত প্রতিষ্ঠানগুলো ও তাদের প্রয়োজনাদি সম্পর্কে অবগতি লাভ করা এবং ওখানকার অধিবাসীদের রাবেতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা।

শায়খ কাযযায-এর সাথে আমার সম্পর্ক রাবেতার প্রতিষ্ঠা ও অস্তিত্ব লাভের আগে থেকেই ছিল। সেই পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল নিষ্ঠা ও দ্বীনি আগ্রহের ওপর ভিত্তি করে। সে-কারণেই তিনি রাবেতার সম্মানিত সদস্যদের মধ্যে – যাঁদের সবাই ছিলেন দেশের বাছাবাছা ব্যক্তিত্ব – আমার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ও সুধারণা পোষণ করতেন। তিনি আমার সামনে বিভিন্ন দেশের তালিকা রাখলেন, যেসব দেশে প্রতিনিধিদলের ভ্রমণের পরিকল্পনা আছে। তার মধ্যে আমেরিকা-ইউরোপের পশ্চিমা দেশগুলোও ছিল। ছিল জাপান ও ইন্দোনেশিয়ার প্রাচ্য দেশগুলোও। আমি আমার পুরাতন শিক্ষা, চিন্তাধারা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সূত্রে সেই দলটিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম, যার আফগানিস্তান, ইরান, লেবানন, পূর্ব জর্ডান, সিরিয়া ও ইরাক ভ্রমণে যাওয়ার কথা।

শায়খ সালেহ্ কাযযায আমাকে সেই প্রতিনিধিদলের নেতা বানিয়ে দিলেন। আমি ছাড়া এই প্রতিনিধিদলে রাবেতার আরও দুজন বিজ্ঞ সদস্যেরও অংশগ্রহণের কথা ছিল। তাদের একজন হলেন শ্রীলঙ্কার হানীফা মুহাম্মাদ হানীফা (প্রাক্তন ও বর্তমান মন্ত্রী শ্রীলঙ্কা সরকার) অপরজন শায়খ সা'দী ইয়াসীন, যিনি লেবাননের খ্যাতিমান আলেম ও রাবেতার সদস্য ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, এঁরা দুজন কিছু আইনগত জটিলতা কিংবা ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেননি। তাদের স্থলে হেজাযের ইসলামি লেখক, প্রখ্যাত কলামিস্ট ও চিন্তাবিদ জামেয়া আল-মালিক আবদুল আযীয-এর শিক্ষক আহমাদ মুহাম্মাদ জামাল নির্বাচিত হলেন। আর সৌভাগ্যবশত কিংবা আমার বিশেষ খাতিরেই কিনা, প্রতিনিধিদলের সেক্রেটারী হিসেবে আমার স্নেহাস্পদ মৌলভী আবদুল্লাহ্ আব্বাস নির্বাচিত হলেন, যিনি সে-সময়ে রাবেতার তানযীমাতে ইসলামী শাখার সেক্রেটারী ছিলেন। আমার বাড়তি সুবিধার জন্য রাবেতা তাকে ভারত পাঠিয়ে দিল, যাতে সে আমার সফরের আইনি ও ব্যবস্থাপনাবিষয়ক ধাপগুলো আঞ্জাম দেওয়ার কাজে আমাকে সাহায্য করে এবং ভারত থেকেই আমার সঙ্গে যোগ দেয়।

আফগানিস্তান ও ইরানের সঙ্গে হৃদ্যতা

সে-সময়ে আমি গ্রন্থিব্যথায় ভুগছিলাম, যার ধারা ১৯৬০ সাল থেকে শুরু হয়েছিল। এটা আমার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রোগ, যা কিনা আমার আব্বাজানেরও ছিল। কয়েক পা হাঁটতেও তখন আমার খুব কষ্ট হতো। কিন্তু কর্তব্যের অনুভূতি রোগের অনুভূতির ওপর জয়ী হয়ে গেল। আমার কতগুলো দেশ ভ্রমণের খুব আগ্রহ ছিল, যার মধ্যে আফগানিস্তান ও ইরান ছিল আমার জন্য নতুন এবং ওখানকার ইতিহাস, ভাষা ও সভ্যতা হিন্দুস্তানের ইতিহাস, ভাষা ও সভ্যতায় এমনকি আমার মস্তিষ্ক ও স্মৃতিতে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, তাকে আলাদা করা কঠিন ছিল। আর এই নকশাটি নিজের জ্ঞাতসারেই হৃদয় ও মস্তিষ্কে এমনভাবে জেঁকে গিয়েছিল যে, যেন এটি আমারই আশপাশের বস্তু এবং একই বংশের ব্যাপার। আমার শৈশব থেকেই আফগানিদের এখান আসা-যাওয়া ছিল, যাদের 'আগা' বলা হতো। তারা আমাদের গাঁ-গ্রাম পর্যন্ত চলে আসত, যাদের 'বেলায়েতী'ও বলা হতো।

হিন্দুস্তানি আলেমগণের ওস্তাদগণের মধ্যে সব সময় আফগান বংশোদ্ভুতদের একটি সংখ্যাও থাকত। আমার হাদীছের ওস্তাদ ও মমতাশীল শিক্ষক ও মুরুব্বী মাওলানা হায়দার হাসান খান সাহেব টুংকি (রহ.) শুধু আফগান বংশোদ্ভুতই ছিলেন না. বরং ওখানকার বৈশিষ্ট্যাবলি ও ঐতিহ্যেরও প্রতিনিধি ও নমুনা ছিলেন। তারপর ফারসি ভাষা – যেটি আমাদের শিক্ষার অংশ ছিল – ইরানের সঙ্গে আমাদের চিন্তাগত ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছিল। সা'দী-হাফিয তো বিশেষভাবে ওই মাটির রং ও স্বাদের প্রতি আগ্রহী ও আন্তরিক বানিয়ে দিয়েছিল। আর এ সকল বৈশিষ্ট্য এই সফরকে আমার এই দুর্বল স্বাস্থ্য ও ব্যস্ত জীবনে শুধু সহনশীলই নয়; বরং লোভনীয় ও আনন্দদায়ক বানিয়ে দিয়েছিল। তারই ওপর ভিত্তি করে আমি আমার ভ্রমণকাহিনী 'মিন নাহ্রি কাবুল ইলা নাহ্রিল ইয়ারমুক'-এ লিখেছি, যখন আফগান বিমানের এলাউন্সার ঘোষণা দিল, আমাদের বিমান এখন কাবুলের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে, তখন আমার অন্তরে আনন্দের একটি ঢেউ খেলে উঠল এবং কানদুটোও তার নামের মিষ্টতা ও মধুর সুর অনুভব করল।

'দরিয়ায়ে কাবুল ছে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক'

এ সফর ১৯৭৩ সালের ৪ জুন থেকে ২০ আগস্টের মধ্যে হয়েছিল। সফরের সূচনা হয়েছিল আফগানিস্তান দ্বারা আর সমাপ্ত হয়েছিল পূর্ব জর্ডানে। আর সেজন্যই আমি আরবিতে এই সফরের নামকরণ করেছি 'মিন নাহ্রি কাবুল ইলা নাহ্রিল ইয়ারমুক' আর উরদুতে 'দরিয়ায়ে কাবুল ছে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক'।

লেখকের গ্রন্থগুলোর মধ্যে এই সফরনামা একারণে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে যে, যেসব দেশের সঙ্গে ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘ সম্পর্ক রয়েছে, লেখক একজন বাস্তববাদী মুসলমান, ইতিহাসের সঠিক বিদ্যার অনুসন্ধানী, ইসলামি জীবনের অনুসারী ও ইসলামের উন্নতির আশাবাদী; অথচ বাস্তবতা ও ঘটনাবলিকে সঠিকভাবে মূল্যায়নকারী ও আশঙ্কাগুলোর ব্যাপারে সঠিকভাবে অবহিত পর্যটক হিসেবে দেখেছিলেন। এর মধ্যে পাঠক একজন দরদী মুসলমানের অনুভূতিরও সন্ধান পাবেন আবার একজন চিন্তাশীল বিজ্ঞজনের শঙ্কা ও ভবিষ্যদ্বাণীও। এতে না আছে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আশাবাদ, না আছে মাত্রাতিরিক্ত হতাশা। এই বইটিতে এমন কিছু

ইঙ্গিতও পাওয়া যাবে, যেগুলো একটি সীমাবদ্ধ দ্বীনি পরিবেশে অবস্থানকারী হিন্দুস্তানি মুসলমানের স্তর থেকে ঊর্ধ্বে এবং যারা লেখককে ব্যক্তিগতভাবে জানেন, তাদের জন্য অপ্রত্যাশিত ও অযৌক্তিক।

তারপর সেটি সফরের আনন্দ, দৃশ্যাবলির বৈচিত্র্য ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলিতেও ভরপুর। বোধহয় এরই ওপর ভিত্তি করে প্রফেসর রশীদ আহমাদ সিদ্দীকির মতো উরদু সাহিত্যিক ও সমালোচকের আমার এই গ্রন্থটি সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে। একাধিক পত্রে তিনি এই বই সম্পর্কে তার গভীর প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন। ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারিতে লেখা এক পত্রে তিনি লিখেছেন–

> 'ইসলামি দেশগুলো ও তাদের সমস্যাবলি সম্পর্কে সচেতন হতে এই বইটি খুবই নির্ভযোগ্য মাধ্যম। এই বইটি অধ্যয়নে যতখানি মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমস্যা আমাদের সামনে আসছে এবং সেসব থেকে উত্তরণের যে-সাহস তৈরি হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে, আপনি যদি অনবরত এরূপ সফর করতে থাকেন, তাহলে মুসলিম জাতির বিরাট উপকার হবে।'

যারা আমার কাছে আসা-যাওয়া করেন, তাদের মাঝে বিশেষ করে তাঁরই ভাতিজা ডক্টর ফসীহ – যিনি মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করছেন – আমাকে বলেছেন, আমার কাছে যারা আসা-যাওয়া করে, আমি তাদের এই বইটি পড়ার পরামর্শ দেই এবং বলি, রুটিন করে নিয়ে অল্প-অল্প করে এই বইটি পড়া দরকার।

পরিবর্তনের আগে

এটিও তাকদিরের ব্যাপার-স্যাপার ছিল যে, এই দেশগুলোর ভ্রমণ এবং স্বাধীনতার সঙ্গে নির্ভয়ে দেখার ও বোঝার সুযোগ সেসব পরিবর্তনের আগেই পেয়ে গিয়েছিলাম, যারা এই দেশগুলোর কায়াই পাল্টে দিয়েছে এবং তার পরে সেই দেশগুলোতে স্বাধীনভাবে হাঁটাচলা, মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করা এবং বাস্তবতা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার চারটি দেশ আফগানিস্তান, ইরান, লেবানন ও আংশিকভাবে ইরাক পরিবর্তনের আওতায় এসে পড়েছে। বেশ ভালোই হলো, এই দেশগুলো আমি সে সময় দেখে নিয়েছি, যখনও সেগুলোর সম্পর্ক তাদের পুরাতন

ইতিহাস ও সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং এমন কৃত্রিম পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, যাতে গালিবের ভাষায়–

ہیں ستارے کچھ نظر آتے ہیں کچھ
دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا

'কিছু তারকা আছে; দেখতে ওদের তারকা বলে মনে হয়। কিন্তু ওগুলো তারকা নয় – জাদুকরের মতো ওরা মানুষকে ধোঁকা দেয়।'

আফগানিস্তানের অতীত ও বর্তমান

বলা যেতে পারে, এই পুরো সফরে আমার সবচেয়ে বেশি মন বসেছে আফগানিস্তানে। বোধহয় তার কারণটা হলো, ইসলাম প্রবেশের পর আফগানিস্তানে যে-যুগের সূচনা হয়েছিল, এটি তার বিদায়ের ক্ষণ ছিল।[১] ওখানকার বক্তব্যগুলো – যার কিছু নমুনা সামনে আসবে – হৃদয়ের সঠিক অভিব্যক্তি ছিল। বক্তার জিহ্বা আর লেখকের কলম দুটোই তার আলোচনায় পূর্ণ জোশের মধ্যে আছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তার সঙ্গে সেই দেশটিতে তার দ্বীনি অটলতা ও সনাতন আফগানি ঐতিহ্যে যেসব পরিবর্তন এসেছিল এবং আরও যেসব পরিবর্তনের লক্ষণ দিগন্তে আত্মপ্রকাশ করেছিল, লেখক সেগুলোও দেখেছেন এবং নিজের সফরনামায় অন্যদের দেখানোর চেষ্টা করেছেন। একজায়গায় লিখেছেন–

'আমি এই অনুভূতি গ্রহণ না করে পারলাম না যে, দেশটিতে পশ্চিমা সভ্যতা অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং তার ফলাফলও প্রকাশ পাচ্ছে। ১৯২৮ (যখন আমির আমানুল্লাহ খানকে কিছু সনাতন ইসলামি ঐতিহ্যের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে ক্ষমতা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল – আর ১৯৭৩ সালের মাঝে বিস্তৃত সাগরের প্রতিবন্ধক তৈরি হয়েছে। আফগান জাতি তাদের অতীত থেকে অনেক দূরে গিয়ে ছিটকে পড়েছে। এই দূরত্ব মাস-বছরের হিসাবে তো অনেক কম – মানে মাত্র ৪৫ বছর। কিন্তু চিন্তা-চেতনা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির হিসাবে এই দূরত্ব অনেক দীর্ঘ। সাধারণত এক-একটি জাতির এই দূরত্ব অতিক্রম করতে শত-শত বছর লেগে যায়।[২] দ্বীনের

---

১. লেখকের সেখান থেকে ফিরে আসার পাঁচ সপ্তাহ পরই সেখানে সেই বিপ্লবটা ঘটে গেল, যার সমাপ্তি ও শেষ বৃত্ত কম্যুনিস্ট শাসন ও রাশিয়ার কর্তৃত্ব।

২. দরিয়ায়ে কাবুল ছে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক : পৃষ্ঠা ৩১

প্রতিনিধিত্বকারী আলেমগণ এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীটির মাঝে সৃষ্ট এই সাগরের দূরত্ব অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে, যা কমানো সহজ নয়।'

এই সংক্ষিপ্ত অবস্থানে (যেটি আট দিনের বেশি ছিল না) আমি অনুভব করেছি, এর একটি বড় কারণ জাতির [illegible] আলেমদের প্রভাবের অভাব, যার পরিমাণ দিন-দিনই হ্রাস পাচ্ছে। অথচ অতীতে এই সমাজের ওপর তাঁদের এতই প্রভাব ছিল, যেমনটি হয়ত কোনো ইসলামি দেশে ছিল না। আলেমদের জিহাদের স্লোগানের – যাকে তারা 'গাযা' বলত – প্রতিধ্বনিতে শহর-নগর ও পাড়া-পল্লী গর্জে উঠত এবং আম-খাস নির্বিশেষে দেশের সব মানুষের মন ও মস্তিষ্ক জিহাদের নেশায় মাতাল হয়ে যেত।[1]

সম্ভবত আল্লামা ইকবালের বর্ণিত ইবলিসের সেই বিজ্ঞোচিত উপদেশের ওপর আমল করা হয়েছে, যেখানে সে বলেছিল–

افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج
ملا کو اس کے کوہ ودمن سے نکال دو

'আফগানিদের ইসলামি চেতনার প্রতিকার হলো, মোল্লাদেরকে ওদের ঠিকানা থেকে বের করে দাও।'

নেতৃত্ব আলেমদের হাত থেকে বের হয়ে রাজনীতিকদের হাতে চলে গেল, যারা প্রতিটি বিষয়কে অর্থনীতি ও রাজনীতির চোখে দেখেন এবং পরিস্থিতির সামনে মাথাটা নুইয়ে দেওয়াকেই বাস্তববাদিতা ও বিচক্ষণতার দাবি বলে মনে করেন।

এই সফরনামায় – যেটি পরিবর্তনের আগে লেখা হয়েছে – সরদার মুহাম্মাদ দাউদ খানের ব্যাপারে আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছিল এবং তার উন্নয়নপ্রিয়তা ও স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর তিনিই পরে এই পরিবর্তনের হিরো প্রমাণিত হয়েছেন, যিনি রুশ অনুপ্রবেশের জন্য পথ পরিষ্কার করেছেন আর এই বিপ্লবী ও আত্মমর্যাদাশীল দেশটি – যে কিনা প্রতিটি যুগে ভারতবর্ষে ইসলামকে শক্তি জুগিয়ে আসছিল – কম্যুনিজম ও নাস্তিকতার কোলে গিয়ে আপতিত হলো। এই সফরনামায় আমি সাফাইর সাথে লিখেছি, কম্যুনিজম কিংবা নাস্তিকতার কোলে আশ্রয় নেওয়া, পশ্চিমা

১. তারই ক্রিয়া ছিল যে, ইংরেজ বাহিনী কখনও আফগানিস্তানের উপর চড়াও হতে পারেনি এবং ১৮৩৯ সালের অভিযানে তারা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

সভ্যতার অনুসরণে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং পশ্চিমা জাতিগুলোর তালে তাল মেলানোর দায় শুধু আফগানিস্তানের ওপরই বর্তায় না; বরং আফগানিস্তানের পাশাপাশি গোটা মুসলিম বিশ্বও এর থেকে দায়মুক্ত নয়। বিশেষ করে সেই বিত্তশালী দেশগুলো, যারা তাকে সহযোগিতা ও উন্নতিদানে কার্পণ্য করেনি। অপরদিকে সোভিয়েত রাশিয়া ও লাল চীন এই পরিস্থিতি থেকে স্বার্থ উদ্ধার করেছে এবং কম্যুনিজমের পরিকল্পনাগুলোর পূর্ণতাদানে ব্যাপক সহায়তা দিয়েছে এবং তা ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

আমি এই অভিমতও ব্যক্ত করেছি যে, হিন্দুস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের শিক্ষাগত সম্পর্ক (মধ্যখানে পাকিস্তান প্রতিবন্ধক হয়ে যাওয়ার কারণে) দীর্ঘদিন যাবত বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, যার ফলে তাকে নিজেদেরও সনাতন বিদ্যাগত উত্তরাধিকারে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে এবং আধুনিক শিক্ষা, দ্বীনি তৎপরতা ও উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হতে পারেনি। যদি মিশর ও তার জামেয়া আযহার[১] না থাকত, তাহলে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আন্দোলনগুলোর সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্ক একেবারেই বিচ্ছিন্ন থাকত।

কাবুল অবস্থানকালীন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ছিল দুটি। একটি কাবুল ইউনিভার্সিটির হলে ১৯৭৩ সালে ছাত্র-শিক্ষক ও সুধী সমাজের বিশাল সমাবেশে প্রদত্ত।[২] অপরটি সেই ভাষণ, যেটি সৌদি দূতাবাসের পক্ষ থেকে দেওয়া সংবর্ধনায় প্রদান করেছিলাম।

সাক্ষাত ও পরিদর্শন

আফগানিস্তানে আট দিন ছিলাম। এ-সময়ে শুধু কাবুল আর গজনিতেই থাকতে হয়েছে। আর এই দিনগুলোতে আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আতিথেয়তায় ও তাদের দিকনির্দেশনায় ছিলাম। এ-সময়ে আমরা দেশটির শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করেছি। মহিলাদের একটি

---

১. আফগান জিহাদের পুরোধা আবদুর রাসূল সায়্যাফ, কাবুল ইউনিভার্সিটির কুল্লিয়াতুশ শারীয়াহর প্রিন্সিপ্যাল গোলাম মুহাম্মাদ সাহেব নিয়াযি, প্রফেসর বুরহানুদ্দীন রাব্বানি ও ডক্টর মুহাম্মাদ মূসা তাওয়ানা প্রমুখ মিসরেরই শিক্ষাপ্রাপ্ত, যাঁরা ওখানে অবস্থানকালে নতুন ঈমানজাগানিয়া লিটারেচর ও ইসলামি আন্দোলনগুলোকে বেশ ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছেন।

২. এই বক্তব্যটি দরিয়ায়ে কাবুল ছে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক' বইয়ের ৫৯-৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

শিক্ষিত মজমায় ভাষণও দিয়েছি। আবার কাবুলের আলেমগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করেছি। তাঁদের সামনে ইসলামি জাগরণ সৃষ্টি করেছি, জাতির নেতৃত্ব হাতে তুলে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছি এবং এসব ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতার কথা তাদের কানে দিয়েছি। একাধিক মন্ত্রী ও অপরাপর দায়িত্বশীলের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হয়েছে। মুজাদ্দেদী পরিবারের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি, যাদের কেন্দ্র ছিল কেল্লা জাওয়াদ।[১] আমরা জামে মসজিদেও ভাষণ দিয়েছি এবং পুরাতন স্মৃতিমালা ও বাগ-বাগিচা পরিদর্শন করেছি।

সুলতান মাহমুদ গজনবির রাজধানীতে

সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হলাম গজনি পৌঁছে, যেটি সুলতান মাহমুদ গজনবির রাজধানী ও এককালে ইসলামি বিশ্বের দ্বিতীয় নগরী ছিল। আমরা সুলতান মাহমুদ গজনবির মাজারে গেলাম। হাকীম সানাইর মাজারেও হাজির হলাম। মাহমুদ গজনবির মাজারের কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর পর আমার কলম থেকে অলক্ষ্যে এই লাইনগুলো বেরিয়ে এল–

'আমরা শাহী মাজারে বিস্ময়ের প্রতিমা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এখানে সেই সিংহ শুয়ে আছেন, যাঁর ভয়ে ও প্রভাবে আফগানিস্তান ও হিন্দুস্তানের রাজা-বাদশাহ ও সেনাপতিদের ঘুম উড়ে গিয়েছিল। আর আজ তিনি নিজেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাঁর দরবারি কবি ফাররুখি তাঁর মৃত্যুতে হৃদয়বিদারক যে-শোকগাথাটি বলেছিলেন, তার কয়েকটি পঙ্ক্তির তরজমা নিম্নরূপ–

'ওহে বাদশাহ! উঠে এসো। রাজা-বাদশাহদের দূতরা এসেছে। তারা তোমার জন্য নানা ধরনের উপঢৌকন নিয়ে এসেছে। কিন্তু কার সাধ্য আছে, এই ঘুম থেকে তোমাকে জাগাতে পারবে? তুমি এমন ঘুমই ঘুমিয়েছ যে, এই ঘুম থেকে আর তুমি জাগবে না। ওহে আমার মনিব! দীর্ঘ সময় ঘুমানো তো তোমার অভ্যাস ছিল না! কেউ তো তোমাকে এভাবে ঘুমাতে দেখেনি!

রাজা-বাদশাহদের প্রতাপ-প্রতিপত্তির এই হাল থেকে আমার মনে হচ্ছিল, এসবই শিশুদের খেলা আর মঞ্চের অভিনয়। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন, 'এই দিনগুলোকে আমি মানুষের মাঝে আবর্তন করাই।'

---

১. আক্ষেপের বিষয় হলো, এই প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা হয় শহীদ কিংবা দেশান্তর হয়েছেন।

ইরানে

এবার ইরানের পালা, যাকে উরদু সফরনামায় 'রূপ ও সুখের দেশ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইরানে প্রতিনিধিদল দশ দিন (১১-২০ জুন) কাটায়। এ-সময় আমরা তেহরান, কুম, তাওস, ইস্পাহান ও সিরাজ ভ্রমণ করেছি এবং সরকারের মন্ত্রীবর্গ ও আলেমদের সঙ্গে সাক্ষাত ও মতবিনিময় করেছি। আমরা দ্বীনি ও ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শন করেছি, আলোচনা ও সংবর্ধনা সভায় অংশগ্রহণ করেছি। ইমাম গাযযালি, শায়খ সা'দী, হাফেয সিরাজী, হযরত আলী রেজা, সাইয়িদা মা'সুমা ও খলীফা হারুন রশীদ-এর মাজার ও কবরগুলো যিয়ারত করেছি। তাওসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব জন্মদানকারী মাটি, ইস্পাহান ও মাশহাদের ইতিহাস সৃষ্টিকারী শহর ও সিরাজের স্মৃতিধন্য ভূখণ্ডও আমরা ভ্রমণ করেছি। তখতে জমশেদও দেখেছি, যেখানে দু-বছর আগে ইরান সরকার আল্‌ফ লায়লার ধারায় আড়াই হাজারসালা উৎসব পালন করেছিল। আমরা তখতে তাউসও দেখেছি।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, নিজস্ব ধারায় অক্ষরে-অক্ষরে রিডিং পাঠ করার এই আগ্রহ সত্ত্বেও – যার কথা আফগান সফরে ব্যক্ত করেছি – আমি নিকট ভবিষ্যতে (যার ওপর বড়জোর ৮ থেকে ৯ বছরের সময়ই মাত্র অতিবাহিত হয়ে থাকবে) সেই জবরদস্ত আন্দোলনের কোনো লক্ষণই চোখে পড়েনি, যে কিনা ইরানে এমন দৃঢ়তর পাহলবি সালতানাতকে উৎখাত করে 'বেলায়াতুল ফকীহ' কিংবা অদৃশ্য ইমামের নায়েব হিসেবে আয়াতুল্লাহ রূহুল্লাহ খোমেনি সাহেবের সেই রূহানি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল, যিনি একদিকে নিজের রহস্যময় সংগঠনে 'মৃত্যুদুর্গে'র অদৃশ্য রাজত্ব করেছেন, অপরদিকে (সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থায়) নিজের প্রতিপক্ষদের নিঃশেষ করার কাজে এবং নিজ আমিরের আদেশে বয়স ও বছর নির্বিশেষে খুশি-খুশি জীবনদানে প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরির খারেজিদের স্মরণ তাজা করে দিয়েছেন। গোটা দেশ সভ্যতা, উন্নয়ন, নেতৃত্ব, জনসেবা ও সুখ-আনন্দে ডুবে ছিল। কোথাও একজন অসহায় বা অস্থিরচিত্ত মানুষের আমরা দেখা পাইনি। আমরা তো আলেম, সাহিত্যিক, যুবক, বৃদ্ধ সব মানুষের সঙ্গে মিশেছি। কিন্তু কেউই কোনো অস্থিরতা বা অসন্তোষ ব্যক্ত করেনি। এটি হয়ত সেই প্রাচীরের ফলাফল, যেটি বহিরাগত লোকদের চারপাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় কিংবা আন্দোলনের গোপন সংগঠন ও তার রহস্যময়তার কারিশমা যে, আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠনের কোনো সন্ধানই পাইনি।

যাতে নববী ও সীরাতে নববীর সাথে সম্পর্ক দ্বিতীয় পর্যায়ে

আমার প্রতিপালন যেহেতু লাখনৌতে হয়েছিল, সে-কারণে ইরান এসে শিয়া মতাদর্শের বিশ্বাস, ইছনাআশারী (বারো ইমামে বিশ্বাসে শিয়া সম্প্রদায়) লোকদের মনস্তত্ত্ব-মানসিকতা, নবীজির ব্যক্তিসত্তার মোকাবেলায় নবীপরিবারের সঙ্গে হৃদ্যতা, মসজিদের চেয়ে বেশি দর্শনীয় স্থানগুলোর আবাদকরণ ও আড়ম্বড়ের ব্যাপারে এমন কোনো নতুন তথ্য অবগত হইনি, যাকে আবিষ্কার বলা যেতে পারে। অবশ্য সায়্যিদিনা হযরত আলী (রা.) ও নবীপরিবারের ইমামগণের প্রতিকৃতি ব্যাপাকহারে ঘরে-ঘরে ও মসজিদে-মসজিদে দেখতে পেয়েছি। এমনকি খোদ নবীজির ছবিও স্থানে-স্থানে ঝুলতে দেখিছি। এ-বিষয়টি হিন্দুস্তানের শিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেখিনি।

সফরনামায় এ-ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে একজায়গায় আমি লিখেছি—

'নবীপরিবারের ইমামগণের সঙ্গে শিয়াদের এমন অস্বাভাবিক আবেগময় সম্পর্ক ও নবীপরিবারের ভালবাসায় সীমাতিরিক্ত আসক্তি বিবেক ও চেতনার ওপর জয়ী হয়ে গেছে। আমার প্রতিক্রিয়া হলো, এই হৃদ্যতা ও আসক্তি সেই সম্পর্ক ও ভালবাসাকে একটি পর্যায় পর্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ ও দুর্বল করে দিয়েছে, যেটুকু নবুওতে মুহাম্মাদী ও যাতে মুহাম্মাদীর সঙ্গে প্রতিজন মুসলমানের থাকার কথা, যাঁর উসিলায় নবীপরিবার মর্যাদা, সম্মান, আমাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার অধিকারী হয়েছেন। তাদের বিশ্বাস ও আচরণে মনে হচ্ছে, নবীজির পরিবার আগে আর নবীজি নিজে পরে। বরং আশঙ্কা হচ্ছে, তাদের এই চিন্তা-চেতনা ইমামতকে নবুওতের সমমর্যাদা এবং তার অনেকগুলো গুণ ও বৈশিষ্ট্যে অংশীদার বানিয়ে না দেয়।'[১]

এটি নিছক আশঙ্কা বা অনুমান নয়। ইছনাআশারী গোষ্ঠীর সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'আল-কাফী' প্রভৃতিতে এর বাস্তবতার প্রমাণ মিলে। ইমাম খোমেনীর সর্বসাম্প্রতিক গ্রন্থ 'আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়্যা'য় স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে, 'আমাদের ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান হলো, আমাদের ইমামগণের সেই মর্যাদা অর্জিত আছে, যে পর্যন্ত কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা বা প্রেরিত কোনো নবীও পৌঁছতে পারে না। আর একথাটিও বলা বাহুল্য যে, তাদের

---

১. বিস্তারিত জানতে পড়ুন 'দরিয়ায়ে কাবুল ছে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক' পৃষ্ঠা ১০৪-১০৬

সেই খেলাফতে তাকবিনী অর্জিত আছে, এই বিশ্বজগতের প্রতিটি অণু যার অনুগত ও ক্ষমতাধীন।[১]

এ ছিল আমার হৃদয় থেকে উঠে আসা প্রতিক্রিয়া। আয়াতুল্লাহ্ আজমী ও মিরযা মুহাম্মাদ খলীল কামরাই-এর তেহরানস্থ বাড়িতে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে আমি আমার এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছি। সেখানে আমি বলেছি– 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওত একটি নতুন যুগের সূচনা ছিল। আদমসন্তানদের যে-ই সৌভাগ্য ও কল্যাণের কিছু অংশ লাভ করেছে – চাই হোন তিনি আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)-এর মর্যাদার কোনো ব্যক্তি – সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেই লাভ করেছে।

দাওয়াত ও তাবলীগের পথে সবচেয়ে বড় বাধা

ইছনাআশারী গোষ্ঠী মহান সাহাবাগণের ব্যাপারে যে-বিশ্বাস লালন করে, তাকে সামনে রেখে আমি লিখেছি–

'মানুষের এই প্রশ্ন করার অধিকার আছে, ইসলামি দাওয়াত যখন তার সবচেয়ে বড় দাঈর হাতে তার উত্থানযুগে কোনো দীর্ঘমেয়াদী ও গভীর চিত্র অংকন করতে পারেনি এবং যখন এই দাওয়াতে ঈমান আনয়নকারী লোকেরা তাদের নবীর চোখদুটো বন্ধ হওয়ার পর আর ইসলামের অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকতে পারেনি এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা কেরামকে যে-সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর রেখে গেছেন, তাদের মাঝে হাতেগোনা কজন[২] মাত্র এর ওপর অটল থাকতে পেরেছেন, তখন আমরা কী করে মেনে নিতে পারি, তার মাঝে আত্মশুদ্ধির যোগ্যতা আছে এবং সে মানুষকে পশুত্বের অধস্থ থেকে বের করে মানবতার সুউচ্চ চূড়ায় পৌঁছিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং কোন আশায় পৃথিবীর নানা জাতি ও অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত দিতে পারি'?[৩]

---

১. আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়্যাহ : পৃষ্ঠা ৫২

২. শিয়া আলেম ও লেখকরা (আল্লাহ মাফ করুন) এই ধর্মত্যাগ থেকে বড়জোর চার-পাঁচজন সাহাবাকে বাদ রেখেছেন। তাঁরা হলেন সালমান ফারসি, আম্মার ইবনে ইয়াসির, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ও আবুযর গিফারি (রা.)। আরও হয়ত দু-একটি নাম বাদ যেতে পারে।

৩. আমি আমার লাখনৌর এক ভাষণে একবার বলেছি, মনে করুন, ইসলামের একটি প্রতিনিধিদল লন্ডনের হাইড পার্কে কিংবা আমেরিকার কোনো একটি হলে ইসলামের সত্যতার উপর ক্রিয়াশীল বক্তব্য উপস্থাপন করছে এবং অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ইসলামের দাওয়াত

ইরানের এই অবস্থানকালে আমি সেখানকার কয়েকজন চিন্তাবিদের কাছে – যাদের মধ্যে ওই দেশের শিক্ষামন্ত্রী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য – একটি প্রশ্ন করেছিলাম, যার সম্পর্ক ইতিহাস ও ইতিহাসের দর্শনের সঙ্গে এবং ইকবাল যার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন এভাবে–

نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے
وہی آب و گل ایراں وہی تبریز ہے ساقی

'অনারবের ফুলবাগানগুলো থেকে আর কোনো রুমী উঠে আসেননি। ইরানের সেই গুলবাগিচায় পানিসিঞ্চনের জন্য এখনও আছেন সেই তাবরিযই।'

আমি বলেছি, যারা ইরানের ইসলামি ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তাদের মাঝে-মধ্যে মনে হয়, যেন ইরানে মেধাবী ও বিচক্ষণ মানুষ ছাড়া আর কেউ জন্মায়ই না আর 'লঙ্কায় প্রতিজন মানুষই ৫২ গজ লম্বা হয়'। কিন্তু এখন চিন্তা-চেতনা ও বিদ্যাগত অধঃপতন ও যোগ্য মানুষের আকালের বিশ্লেষণ কী হবে যে, কয়েকটা শতাব্দি চলে যাচ্ছে; কিন্তু এখন মধ্যম স্তরের ঊর্ধ্বের এবং আন্তর্জাতিক খ্যতিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিত্বের নামই তো শোনা যাচ্ছে না! আমার এই প্রশ্নের সন্তোষজনক কোনো উত্তর কেউ দিতে পারেনি।

এখানে প্রশ্ন জাগে, ইরানের এই স্থবিরতা ও অধঃপতনের কারণ কি এটা যে, চিন্তার উঁচুতা, সাহসিকতা, বস্তুবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বাস্তববাদিতা ও আত্মার ঝরনাধারগুলোকে সচল রাখার কাজে যে-তাসাওউফ কেন্দ্রীয় ও মৌলিক দায়িত্ব পালন করেছিল, তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে? নাকি এই অধঃপতন ও স্থবিরতার কারণ এই যে, ধর্মীয় বিদ্যা ও ধর্মাদর্শের ব্যাপারে ইরানে দীর্ঘদিন যাবত একটা সীমাবদ্ধতা আরোপ করে রাখা হয়েছে, যার বাইরে কাউকে যেতে দেওয়া হয়নি? এভাবে ইরান সূফীযুগের পর থেকে একটি

পেশ করছে। শিয়া আকিদা সম্পর্কে অবগত এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন ছুড়ল এবং বলল, আগে নিজের ঘরের খোঁজ নিন; তারপর আমাদের বলুন। আপনার নবীর ২৩সালা হাড়ভাঙা খাটুনির ফসল মাত্র ৪-৫ জন লোক এমন আছেন, যারা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পথের উপর অটল ছিলেন। অবশিষ্ট হাজার-হাজার, বরং লাখ-দুলাখ মানুষ – যারা তাঁর ভালবাসা ও আনুগত্যের দাবি করতেন – ধর্মত্যাগের পথ অবলম্বন করেছিলেন। এমতাবস্থায় আপনি কোন মুখে অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন? বলুন, আপনি কি এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারবেন?

(ধর্মীয় ও চিন্তাগত) খোলসের মধ্যে জীবন অতিক্রম করছে এবং বহিঃজগতের কোনো ঝাপটা – যে তার বিদ্যা ও চিন্তাগত শক্তিতে স্পন্দন তৈরি করবে এবং তার বিদ্যা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে সমৃদ্ধি আনয়ন করবে – লাগতে পারেনি।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন লেবাননে

১২ জুন বৈরুতে অবস্থান করে আমাদের প্রতিনিধিদল ইরান থেকে পবিত্র মক্কা এসে পড়ল। কারণ, দলের সেক্রেটারি মৌলভী আবদুল্লাহ আব্বাস নদভীর বিশেষ কয়েকটি প্রয়োজনে মক্কায় অবস্থান করার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল। ফলে তাঁর স্থলে রাবেতা অপর এক সেক্রেটারি শায়খ আবদুল্লাহকে প্রতিনিধিদলের রাহবর নিযুক্ত করল এবং আমার ব্যক্তিগত সহযোগী হিসেবে আমারই ভাতিজা মৌলভী সাইয়িদ মুহাম্মাদ রাবে' হাসান নদভীকে প্রতিনিধিদলে যুক্ত করে দিল। তাঁর ভারত থেকে মক্কা পৌঁছতে বেশ দেরি হয়ে গেল। আর সেকারণে আমাকে হারামাইন শরীফাইনে পাঁচ সপ্তাহ অবস্থান করতে হলো। এ সুযোগে আমি আফগানিস্তান ও ইরান সফরের কাহিনী আরবিতে লিখে ফেললাম, যাতে যথাসময়ে তা রাবেতার সামনে উপস্থাপন করতে পারি।

১৯৭৩ সালের ২৯ জুলাই আমরা পুনরায় সফর শুরু করলাম, যার প্রথম গন্তব্য ছিল বৈরুত। বৈরুতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন দেখার সুযোগ ঘটল। আমি বেশ কটি স্বাগত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলাম। ত্বারাবলিস, সিয়ার, সায়দাও যাওয়ার সুযোগ হলো। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, রাষ্ট্রনেতা, মুসলমান মন্ত্রীবর্গ ও বিশিষ্ট আলেমগণের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হতে থাকল। লেবাননের দারুল ইফতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হলো। লেবাননের মুফতী শায়খ হাসান খালেদ এই সভার আয়োজক ছিলেন। তাতে লেবাননের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উসদায তাকিউদ্দীন আস-সুল্হ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শায়খ সায়েব সালাম, মুফতী আমীন আল-হুসাইনি এবং আরও কয়েকজন মন্ত্রী, পার্লামেন্ট সদস্য, শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি, আলেম, বিচারপতি, সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ উপস্থিত ছিলেন। আমি সভ্যতাগুলোর সম্মিলন ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে 'মুসলিম জাতির চরিত্র' শিরোনামে বক্তৃতা করি এবং এ-ক্ষেত্রে আলেমসমাজ ও বিজ্ঞ মুফতীদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিই।

নানা আশঙ্কা ও বিপদের ভয়

লেবানন অবস্থানকালে এমন কিছু বাস্তবতা ও লক্ষণাদি আমার চোখে পড়ল এবং বিবেক এমন কিছু শঙ্কা অনুভব করল, এই সফরনামায় যার আলোচনা খানিক সময়ের আগে বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু ১৯৮৩ সালের লেবাননের দুর্ঘটনাগুলো সেসবের সত্যায়ন করে দিল।

দামেশ্‌কে দুদিন

৫ রজব ১৩৯৩ হিজরি মোতাবেক ৩ আগস্ট ১৯৭৩ আমরা দামেশ্‌কের উদ্দেশ্যে রওনা হই। দিনটি ছিল শুক্রবার। এটি ছিল আমার চতুর্থ সিরিয়া সফর।[১] আর যেমনটি এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে বলে এসেছি, হারামাইন শরীফাইনের পর লেখকের কাছে আর কোনো নগরী যদি সবচেয়ে বেশি পরিচিত থেকে থাকে, সেটি হলো দামেশ্‌ক। যেমনটি আমি সফরনামায় লিখেছি–

'এই চতুর্থ সফর আট বছরের বিরতির পর সামনে এল। এই বিরতি মাস ও বছরের হিসাবে দীর্ঘ ছিল না। কিন্তু সময়টা ছিল নানা ঘটনা-দুর্ঘটনায় পরিপূর্ণ ও অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এই বিরতির সময়টাতে দেশটি একাধিক পরিবর্তনে জর্জরিত হয়েছে। অনেকগুলো পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এই অল্প কটা দিনে। বেশ কটি সরকার এল আর গেল। এই বিরতির সময়টাতেই ৫ জুন ১৯৬৫ সালের হৃদয়বিদারক ঘটনাটা ঘটল এবং আরব দেশগুলোর মানচিত্রে – যার সীমানা ইসরাইলের সঙ্গে লাগোয়া এবং আরব-ইসরাইল সমস্যায় জর্জরিত – অত্যন্ত গুরুতর ও বিরাট পরিবর্তন এল। যেন এই বিরতির সময়টি মুসলিম আরব জাতির ইতিহাসে একটি সিদ্ধান্তমূলক বিরতি ছিল, যার শিকড় ছিল খুব গভীরে এবং যার ফলাফল ও প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

---

১. মনে রাখতে হবে, এই সময়টি ছিল বা'ছ পার্টির শাসন, হাফেয আল-আসাদের প্রেসিডেন্টির কাল ও সামরিক শাসনের যুগ, যেটি আমার এই লেখাটি তৈরি করার সময় পর্যন্ত এখনও বহাল আছে। হাফেয আল-আসাদ ও তার বেশিরভাগ সহযোগী নাসীরি গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত, যাদের আলাবি বলা হয় এবং তাদের মুসলমান বলে বিশ্বাস করা, মুসলমান বলা দুষ্কর। এমনকি তাদের নিজেদেরও এর জন্য কোনো চাপাচাপি নেই।

স্বপ্ন, নাকি বাস্তব?

আমরা শুধু শুক্র ও শনিবার (৩ ও ৪ আগস্ট) দামেশ্‌কে কাটালাম। ওখানে বন্ধু-বান্ধব ও বুযুর্গদের বিরাট সমাগম ছিল। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের ইচ্ছা ছিল। হেম্‌স, হামাত ও হালবেরও প্রোগ্রাম ছিল। সৌদি দূতাবাস রবিবার (৫ আগস্ট) প্রতিনিধিদলের সম্মানে সভা ও নিমন্ত্রণের প্রোগ্রাম তৈরি করল এবং বেশ কজন মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত ও বিশিষ্ট নাগরিকের কাছে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু শনি ও রবিবারের মধ্যকার রাতে (৪ ও ৫ আগস্ট) নাটকীয়ভাবে আমাদের প্রতিনিধিদলটিকে সিরিয়ার সীমানা থেকে বের করে লেবাননের সীমানায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো। আর ঘটনাটা এমনভাবে ঘটল, যেন আমরা কোনো স্বপ্ন দেখছিলাম। আমি এ-প্রসঙ্গে লিখেছি, পবিত্র কুরআন হযরত মূসা (আ.)কে সিনাই থেকে মিসর আগমনের আলোচনা এভাবে করেছে—

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا

'মূসা নগরবাসীর অজান্তে নগরীতে প্রবেশ করল।'[১]

কিন্তু আমাদের সঙ্গে আচরণটা এমনভাবে করা হলো যে, তার চিত্রটা আরবিতে বলতে গেলে বলতে হয়—

وَخَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا

'নগরবাসীর অজান্তে সে নগরী থেকে বেরিয়ে গেল।'

সকালে সাক্ষাতপর্ব ধার্য ছিল। যেসব বন্ধু-সুহৃদ ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, সকালে তাদের কাছে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর সব কিছুই স্বপ্ন ও কল্পনা রয়ে গেল যে, হঠাৎ মধ্যরাতে গোয়েন্দা বিভাগের একদল লোক সেই কক্ষটিতে এসে ঢুকল, আমরা যেখানে শুয়ে ছিলাম। এসেই তারা আমাদের আদেশ করল, মালামাল বাঁধুন এবং রওনা হয়ে পড়ুন। প্রথমে আমরা মনে করেছিলাম, আমাদেরকে পুলিশ স্টেশন কিংবা কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে। ওখানে ভদ্র লোকদের যে-দশা হয় এবং যে-আচরণ করা হয়, তার কাহিনী আমরা শুনেছি ও পড়েছি। কিন্তু গাড়ি আমাদের নিয়ে রওনা হওয়ার পর জানতে পারলাম, ওরা আমাদের সিরিয়া-লেবানন সীমান্তে নিয়ে যাচ্ছে।

---

১. কাসাস : ১৫

বৈরুতের 'আল-হায়াত' পত্রিকা এই ঘটনার সংবাদ ১৩৯৩ হিজরির ৮ রজব মোতাবেক ১৯৭৩ সালের ৬ আগস্ট মঙ্গলবার প্রকাশ করে এবং এর মাধ্যমে বৈরুতে আমাদের বন্ধুরা ঘটনাটা জানতে পারে। সেদিনই বিবিসি লন্ডন ও ইসরাইল রেডিও সংবাদটা প্রচার করে। বৈরুত ও অন্যান্য আরব দেশের বিভিন্ন পত্রিকা এই ঘটনার বিশ্লেষণ প্রচার করে এবং কাজটা অন্যায় হয়েছে বলে মন্তব্য করে। বৈরুতে বন্ধুরা এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করেছে এবং ঘটনার বৃত্তান্ত জানতে চেয়েছে। শুনে তারা বিস্মিত হয়েছে এবং গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে।

হারুন রশীদের সিংহাসন বাগদাদে

৭ আগস্ট বুধবার আমাদের প্রতিনিধিদল বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয় এবং দজলার সম্মুখস্থ আবুনাওয়াস সড়কের আড়ম্বরপূর্ণ হোটেল 'এম্বাসেডর'-এর ইরাক সরকারের অতিথি হিসেবে অবস্থান নেয়। কিছুক্ষণ পরই আমরা বুঝতে পারলাম, আমরা প্রতিটি মুহূর্তে ও প্রতিটি স্থানে সরকারি নজরদারিতে আছি। বাগদাদে আমরা এমনসব খ্যাতিমান ইসলামি ব্যক্তিদের কবর যিয়ারত করলাম, যাদের সমপর্যায়ের ব্যক্তিত্ব অন্য কোনো মুসলিম দেশে চিরনিদ্রায় শায়িত আছে বলে জানা নেই।

এই ঐতিহাসিক নগরীতে আমরা বাগদাদ ইউনিভার্সিটি 'আল-মাজমাউল ইলমী আল-ইরাকী' 'আল-মাজমাউল কুরদী' ও ইরাকি মিউজিয়ামও পরিদর্শন করেছি। সায়্যিদিনা আবদুল কাদের জিলানি (রহ.)-এর কবর 'আল-হাজরাতুল কীলানিয়্যাহ' ও ইমাম আজম (রহ.)-এর মাজার 'আল-আ'জামিয়্যাহ' যিয়ারত করেছি। এটি ছিল আমার বাগদাদের দ্বিতীয় সফর। প্রথমটি হয়েছিল (যেমনটি প্রথম খণ্ডে বর্ণনা করেছি) ১৯৫৬ সালে। স্পষ্টই অনুমিত হচ্ছিল, আবদুল করীম কাসেম-এর বিপ্লবের পর আগে দেশটি বেশি স্বচ্ছল ও সুদৃঢ় ছিল।

ইতিহাসের একজন ছাত্র ও একজন পর্যটকের এই প্রশ্ন করার অধিকার আছে যে, এই ভয়াবহ বিপ্লব থেকে পাচ্য দেশগুলো কী পেল, যেটি পরিস্থিতি শোধরানো, জাতিকে অবিচার ও নিপীড়নের লৌহপাঞ্জা থেকে মুক্ত করতে এবং দেশটির স্বভাবজাত স্বাধীনতাকে পুনর্বহাল করার লক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল?

কুরআনের সমাধান

সরকার জুমার নামায আদায়ে আমাদের জন্য 'জামেউশ শুহাদা' মসজিদটি নির্বাচন করে, যার অবস্থান বাগদাদ থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে। তীব্র গরমের মওসুম ছিল। আয়োজকদের ধারণা ছিল, দুপুরের সময় ওখানে মানুষের গিয়ে পৌঁছানো খুবই দুষ্কর হবে। তাছাড়া আমাদের আগমনের সংবাদও ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়নি। সাধারণ মানুষের জানার কথা ছিল না, আমরা ওখানে জুমার নামায আদায় করব। কিন্তু জানি না, কীভাবে যেন সংবাদটা ছড়িয়ে গেল এবং মসজিদ নামাযীদের দ্বারা ভরে গেল। উপস্থিত জনতা দাবি জানাল, আমি যেন নামাযের পর বক্তব্য দিই। কিন্তু এই পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বক্তৃতা করা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর ছিল। আমি সাধ্যপরিমাণ অক্ষমতা প্রকাশ করলাম।

কিন্তু আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ গেল। আওকাফ মন্ত্রণালয়-এর (যেটি আমাদের মেজবান ছিল) ভারপ্রাপ্ত প্রধান ওস্তাদ আবদুর রায্যাক ফায়্যাজ যখন জনতার আগ্রহ ও পীড়াপীড়ি প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তিনি মঞ্জুরি দিয়ে দিলেন। আমার জন্য সমস্যা ছিল, অবস্থা অনুপাতে মিহরাব, মিম্বার (যেগুলো কিনা সত্য-সঠিক কথা বলার সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা) ও নিজের বিবেকের দায়বদ্ধতা কীভাবে বজায় রাখব?

কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও কুরআন আমাকে সমাধান দিয়ে দিল, যেমনটি সব সময় দিয়ে থাকে। খোদ ওস্তাদ আবদুর রায্যাক ফায়্যাজ উচ্চৈঃস্বরে সূরা আম্বিয়া তেলাওয়াত করলেন। আমি এই সূরাটিরই একটি আয়াতকে আলোচনার বিষয়বস্তু বানিয়ে নিলাম।

আয়াতটি হলো–

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

'তোমাদের প্রতি আমি এমন একটি কিতাব নাযিল করেছি, যার মধ্যে তোমাদের আলোচনা রয়েছে। তোমরা চিন্তা করে বুঝছ না কেন?'

আমি সৎ ও অসৎ ব্যক্তি, ভালো ও মন্দ গোষ্ঠী, আল্লাহভীরু ও আল্লাহদ্রোহী সরকারগুলোর সেই অবয়ব উপস্থাপন করলাম, যার বিবরণ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এসেছে এবং তাদের পরিণতির ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে। পরে বললাম, আপনাদের সম্মুখে আমি

কুরআনের আয়না রেখে দিলাম। এবার এতে সবাই যার-যার চেহারা দেখে নিতে পারেন এবং নিজেদের সংশোধন করতে পারেন।

এভাবে আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছু না বলে কুরআনের ভাষায় সবকিছু বলে দিলাম এবং هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ (এ হলো আমার কিতাব, যে তোমাদের সামনে সত্য কথা বলে)-এর ব্যাখ্যা তুলে ধরলাম। কারও কিছু বলবার সুযোগ ছিল না।

বক্তব্য শেষ হওয়ার পর জনতা আমার সঙ্গে মুসাফাহা-মু'আনাকা করতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। একজন আমার কানে-কানে বলল, 'লোকসমাগম এর দশগুণ হতো এবং গোটা বাগদাদ হুমড়ি খেয়ে পড়ত যদি পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকত আর মানুষগুলো স্বাধীন হতো।'

শহীদদের মাটি জর্ডানে

আমাদের এই সফরের শেষ গন্তব্য ছিল পূর্ব জর্ডান। আমরা ১৯৭৩ সালের ১২ আগস্ট ওমানের উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথে এক ঘণ্টা সময়ের জন্য বসরা বিমানবন্দরেও অবতরণ করি, যাকে একনজর দেখার আমার খুব আগ্রহ ছিল। কুয়েত হয়ে আমরা ১৩ আগস্ট ওমান গিয়ে পৌঁছি। সেখানেও আমরা আওকাফ মন্ত্রণালয়ের আতিথেয়তায় ছিলাম। জর্ডানের এটি আমার তৃতীয় সফর ছিল। এখানে আমার পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম এবং নামকরা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করলাম। ১৪ আগস্ট শাহ হুসাইনের সঙ্গে আমার দেখা হলো। ২২ বছর আগে তাঁর খ্যাতিমান দাদা শাহ আবদুল্লাহ ইবনে শরীফ হুসাইনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। খুবসম্ভব শাহ হুসাইনের এই ঘটনাটি জানা ছিল।

তিনি তাঁর পারিবারিক ভদ্রতা কিংবা বিগত সাক্ষাত ও সম্পর্কের সম্মানে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করলেন। নিজে এগিয়ে এসে দরজা খুললেন এবং এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন যে, যে-পোশাকে ছিলাম, সেই পোশাকেই আপনাদের সামনে এসে হাজির হলাম। পরে আবার বিদায়ের সময় তিনি আমাদের অনেকখানি পথ এগিয়ে দিলেন।[১]

আমরা ফিলিস্তিনি শরণার্থীদেরও পরিদর্শন করলাম, যারা অত্যন্ত দারিদ্র্য ও শোচনীয় অবস্থার শিকার ছিল। জার্মান মিশনারি তাদের সাহায্য দিচ্ছিল

---

১. এই সাক্ষাত ও আলোচনার বিস্তারিত 'সফরনামা' ২২১-২২৪ পৃষ্ঠায় দেখা যেতে পারে।

এবং তাদের মাঝে কাজ করছিল। মারকাযে ইসলামীর একটি সংবর্ধনাসভায় আমি আমার সমস্ত প্রতিক্রিয়া, আশঙ্কা ও সীমান্তের এই প্রহরী সম্প্রদায়টির সঙ্গে কতখানি আশা-ভরসা জড়িয়ে রয়েছে, আমি স্পষ্ট ভাষায় তা ব্যক্ত করলাম।[১]

আমি বলেছি, আপনারা ইসলামের একটি স্পর্শকাতর রণাঙ্গন ও মুসলমানদের সর্বশেষ দুর্গ ও সর্বশেষ প্রতিরক্ষা পয়েন্টের ওপর অবস্থান করছেন। বান নগরীর পাঁচিল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বান যদি এই পাঁচিল অতিক্রম করে যায়, তাহলে কোনো বাঁধ তাকে প্রতিহত করতে পারবে না। আপনারা সেই নিষ্পাপ আত্মাগুলোর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন, যারা এখনও দেহজগতে পা রাখেনি। আপনারা যদি তাদের পবিত্র সম্পদগুলো সংরক্ষণ করেন এবং তাদের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত দান করে যান, তাহলে তারা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। আর যদি এই পবিত্র মাটিগুলো হারিয়ে ফেলেন এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনার তর্কা রেখে যান, তাহলে এর জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে তারা মামলা দায়ের করবে।

জর্ডানে আমি বিভিন্ন জায়গা ও বিভিন্ন শহরে ভাষণ দিয়েছি, যেগুলোর মধ্যে সালাত ও আরবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরবাদের সন্নিকটস্থ উম্মুল কায়েস নামক পল্লীর পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আমরা ইয়ারমুক নদীটি দেখেছি, যেখানে খেলাফতে ফারুকিতে মুসলমান ও রোমান বাহিনীর মাঝে সিদ্ধান্তমূলক ঐতিহাসিক যুদ্ধটি সংগঠিত হয়েছিল। ওখান থেকে আমরা গোলান পর্বতমালাও দেখেছি, যার ওপর ইসরাইলের কব্জা প্রতিষ্ঠিত এবং যার ফলে গোটা সিরিয়া অঞ্চল ইসরাইলের তোপের মুখে রয়েছে এবং তার করুণার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছে। পাহাড়ের উঁচু থেকে ইসরাইলের তাবরিয়া নগরীর ওপর দৃষ্টি বুলিয়েছি। ওমানের সন্নিকটস্থ সেই গুহাটিও দেখেছি, যার ব্যাপারে আমাদের সফরসঙ্গী প্রত্নতত্ত্ববিদ ওফাদজানির গবেষণা হলো, এটিই আসহাবে কাহ্ফের গুহা। পবিত্র কুরআন আসহাবে কাহ্ফের যে-গুহার কথা বলেছে, এটিই সেটি।[২] আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করলাম, যার শিরোনাম ছিল 'তরুণদের অস্থিরতা ও তার প্রতিকার'।[৩]

---

১. এই ভাষণটি বিস্তারিত জানতে পড়ুন 'সফরনামা' ২২৮-২৩৮

২. বিস্তারিত ও দলিলের জন্য জানতে পড়ুন 'ইক্তিশাফুন লিকাহফি আহলিল কাহ্ফি'

৩. পুরো ভাষণটি 'সফরনামা'য় আলোচিত হয়েছে। পড়ুন পৃষ্ঠা ২৫১-২৬৫, ২৬৭-২৭২

জীবনের একটি ক্রিয়াশীল দৃশ্য

আমার জীবনের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও মনের ওপর গভীর ক্রিয়াশীল দৃশ্য ছিল সেটি, যেটি ১৯৭৩ সালের ১৯ আগস্ট সংঘটিত হয়েছিল। আমাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, আমরা সেই সৌদি সেনাক্যাম্পটি পরিদর্শন করব, যেটি সীমান্ত সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত এবং আমি সেখানকার সৈনিকদের উদ্দেশে ভাষণ দেব। এই সশস্ত্র জওয়ানরা যখন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল এবং ইসলামি পদ্ধতিতে আমাকে সালাম জানাল, তখন শরীরে প্রত্যয়, ঈমান, আনন্দ ও উন্মাদনার একটি ঢেউ খেলে গেল এবং খুশির এমন একটি অবস্থা আচ্ছন্ন করে ফেলল, যা এর আগে কখনও অনুভূত হয়নি। আমার চোখে অশ্রু নেমে এল। আমি মুখের ভাষার পরিবর্তে হৃদয়ের ভাষায় কথা বললাম।

তারপর আমরা কিছু সময় মুতার শহীদদের কবরস্তানে কাটালাম। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানেন, এখানে ৮ হিজরি সনে সেই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল, যাতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার আর রোমান ও খ্রিস্টানদের সংখ্যা প্রায় দুলাখ। হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.)-এর শাহাদাতের পর – যিনি মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন – নবীজির চাচাত ভাই হযরত জা'ফর তায়্যার (রা.) পতাকা হাতে নিলেন। শত্রুর আঘাতে তাঁর ডান হাতটি কেটে পড়ে গেলে তিনি পতাকাটি বাঁ হাতে নিয়ে নিলেন। সেটিও কেটে গেলে এবার উভয় বাহু দ্বারা পতাকা আঁকড়ে ধরলেন এবং যথারীতি লড়াই করতে থাকলেন। এভাবে তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। এ-সময়েই তিনি জা'ফর তায়্যার (উড়ন্ত জা'ফর) ও যুলজানাহাইন (দু-বাহুর অধিকারী) উপাধিতে ভূষিত হন।

তাঁর শাহাদাতের পর হযরত আবুদল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা হাতে নিলেন এবং যুদ্ধ করতে থাকলেন। তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন এবং হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) নেতৃত্ব বুঝে নিলেন। তিনি নিজের কৌশল প্রয়োগ করে শত্রুবাহিনীকে পেছনে সরিয়ে দিলেন এবং ইসলামি বাহিনীকে রক্ষা করে নিলেন।

আমরা এই শহীদদের বিশ্রামাগারে নীরবে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম এবং এই জানবাজদের মহত্ত্ব ও দুঃসাহসী কৃতিত্বের স্বীকৃতি প্রদান করলাম।

মুতা থেকে আমরা বাতরা অভিমুখে রওনা হলাম। বাতরা একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরী, যার ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরনো। এই নগরীটিও হুজ্‌র ও মাদায়েনে সালেহ-এর মতো পাহাড় খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছিল এবং আরব নাবতিরা একে আবাদ করেছিল। এটি তৎকালে ব্যবসা ও মূর্তিপুজার কেন্দ্র ছিল। কোনো-কোনো ঐতিহাসিকের ধারণা ছিল, হেজাযের বিখ্যাত প্রতিমা 'লাত' এখান থেকেই আনা হয়েছিল।

১৯৭৩ সালের ২০ আগস্ট আমাদের এই সফরের পরিসমাপ্তি ঘটল আর আমরা হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এবং কুয়েতে এক দিন অবস্থান করে নিরাপদে বোম্বাই ফিরে এলাম।

উপসাগরীয় এলাকার একটি সফর

১৩৯৪ হিজরির মুহাররামে (জানুয়ারি ১৯৭৪) পবিত্র মক্কা থেকে ফেরার পথে – যেখানে রাবেতার এক বৈঠকে যোগদানের জন্য আমাকে যেতে হয়েছিল – শারেকার প্রশাসক শায়খ সুলতান মুহাম্মাদ বিন আল-কাসেমীর আমন্ত্রণে আবুধাবীর শারেকায় একটি সংক্ষিপ্ত সফর হয়েছিল। এই সফরে স্নেহাস্পদ মৌলভী সাঈদুর রহমান ও মুহাম্মাদ ওয়াজেহ হাসানি নদভি আমার সঙ্গে ছিল। শারেকায় মুহাররামের ৫ তারিখে (২৭ জানুয়ারি ১৯৭৪) মসজিদের আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)-এ আমাকে একটি ভাষণ দিতে হলো, যার শিরোনাম ছিল 'খালিজুন বাইনাল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন' (ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যকার দূরত্ব) এই ভাষণে আমি বলেছি, যেভাবে আরব ও ইরানের মাঝে এই উপসাগর একটা ব্যবধান এবং এর কারণে জমিনের দুটি টুকরা একটি অপরটি থেকে আলাদা হয়ে গেছে, তেমনি এটাও একটা বেদনাদায়ক বাস্তবতা যে, ইসলাম ও মুসমানদের মাঝে একটা ব্যবধান তৈরি হয়ে গেছে। ইসলামি শিক্ষামালা বলছে এক কথা, ইসলামের বোধ-বিশ্বাস একরকম, ইসলামি দায়িত্ব-কর্তব্য এক ধরনের আর মুসলমানদের নীতি-নৈতিকতা, কর্মনীতি ও বিশ্বমঞ্চে তাদের চরিত্র আরেক রকম। এই দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতাকে – যেটি একদম কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক – বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি এবং মুসলমানদের তাদের আসল চরিত্রের দিকে ফিরে আসবার আহ্বান জানাই এবং এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে খোদ মুসলমানদের ও বিশ্বের কী ক্ষতি হচ্ছে, তারও বিবরণ প্রদান করি।

এই সফরে দুবাই পাবলিক লাইব্রেরিতে ২৮ জানুয়ারি অপর একটি ভাষণ প্রদান করি। এই সভায় বিপুলসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও আলেমে দীন অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভাষণের শিরোনাম ছিল 'কাইফা দাখালাল আরাবু আত-তারীখা'। আরবরা কীভাবে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অর্জন করল, কীভাবে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি তাদের দিকে ফেরাল এবং ঐতিহাসিকদের কলমগুলোকে নিজেদের কীর্তিমালা লেখার কাজে প্রবৃত্ত করল? তার প্রকৃত কারণগুলো কী ছিল এবং এই কেন্দ্রবিন্দুতা ও আন্তরিকতার রহস্য কী ছিল?

১৯৭৬ সালে পুনরায় উপসাগরীয় অঞ্চল সফরে গেলাম। তখনও পূর্বোক্ত দুজনই আমার সঙ্গী ছিল। আবুধাবীর (যেটি আরব আমিরাতের রাজধানী) প্রেসিডেন্ট ভবনে ২৩ ডিসেম্বর আমি একটি ভাষণ দিলাম, যার শিরোনাম ছিল 'নাযরাতু মু'মিনিন ওয়াইন ইলাল মাদানিয়্যাতিল মু'আসিরির রায়ি" (একজন সচেতন মুসলমান বর্তমান সভ্যতাকে কোন চোখে দেখছে?)

অষ্টম অধ্যায়

নদওয়াতুল উলামার ৮৫সোলা সমাবর্তন অনুষ্ঠান

নদওয়াতুল উলামার একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের চিন্তা

যারা নদওয়াতুল উলামার ইতিহাস সম্পর্কে অবগত আছেন,[1] তারা জানেন, তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিয়ম চলে আসছে, হিন্দুস্তানের কোনো একটি কেন্দ্রীয় স্থানে তার বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হতো। এই সভা তার ব্যবস্থাপনা, পারিপাট্য, উপকারিতা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে একটি উপমাহীন সভা হতো, যার নজির এযুগে কোনো আন্দোলন বা দলের সভা-সমাবেশে কমই দৃষ্টিগোচর হয়। এই সভাগুলোতে বিশিষ্ট আলেমে দীন, উচ্চশিক্ষিত নাগরিক ও খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ সমবেত হতেন এবং উঁচুমানের ভাষণ-বক্তৃতা হতো। সভার ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রমের প্রতিটি বিষয় থেকে সুরুচি, ভদ্রতা ও পারিপাট্য প্রকাশ পেত এবং বেশ কিছু দিনের জন্য এই সভা কতগুলো সুদর্শন স্মৃতি ও উজ্জ্বল নকশা রেখে যেত এবং নদওয়াতুল উলামার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রচার-প্রসার ছাড়াও দ্বীনি জীবন ও বিদ্যার উন্নতিতে একটি আলোড়ন তৈরি করে দিত।[2]

আক্ষেপের বিষয় হলো, ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর তোড়জোড় ও ঝড়ের মধ্যে (যার মধ্যে কোনো নির্ভেজাল ও গঠনমূলক বিষয় শোনার মুসলমানদের রুচি নষ্ট হয়ে গেছে) এই বাৎসরিক সভাগুলোর ধারা ১৯২৭ সালের অমৃতসরের সভার পর বন্ধ হয়ে গেছে এবং নদওয়াতুল উলামার

---

১. আলহামদুলিল্লাহ 'নদওয়াতুল উলামার ইতিহাস' দুখণ্ডে সংকলিত হয়ে ১৯৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বিশাল একটি সভায় – যেটি নদওয়াতুল উলামার কুতুবখানায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল – উপস্থাপিত হয়েছে।

২. হায়াতে আবদুল হাই : পৃষ্ঠা ১৯৫

আন্দোলন একটিমাত্র শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম ও তার কর্মতৎপরতার মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। রাজনৈতিক তৎপরতা যখন শেষ হয়ে গেল, তখন সভা-সমাবেশের প্রচলন একটি পুরনো উপাখ্যানে পরিণত হয়ে গেল। তারপর না পরিবেশ অনুকূল থাকল, না কোনো শহর ও দলের পক্ষ থেকে কোনো দাওয়াত ও উত্তাল আন্দোলনের সুযোগ সামনে এল।

এদিকে আরব বিশ্বে নদওয়াতুল উলামার ছাত্রদের দাওয়াতি সফর, তাদের রচনাবলির ব্যাপক প্রসার, আরবি পত্রিকা 'আল-বা'ছুল ইসলামী' ও 'আর-রায়েদ'-এর প্রকাশনা এবং মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে হিন্দুস্তানের অতিসাম্প্রতিক রাজনৈতিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাওয়ার ফলে আর বেশি প্রয়োজন অনুভূত হতে লাগল যে, ইসলামি দেশগুলোর শিক্ষাবিদ ও আরব দেশগুলোর ইসলামি স্কলারদের পুনর্জাগরণে প্রচেষ্টারত আন্দোলনসমূহ ও দলগুলোর নেতৃবৃন্দ একদিকে সেই সংশোধন ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবগতি লাভ করবেন, যেগুলো হিন্দুস্তানের মাটিতে পরিচালিত হচ্ছে।

অপরদিকে তাঁরা ভারতীয় আলেমগণের সেই কীর্তিমালা সম্পর্কে অবহিত হবেন, যেটি তাঁরা একটি নতুন দেশে – যার একটি নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শন ছিল – নিজেদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের সুরক্ষা, ইসলামের প্রচার-প্রসার, সর্বোপরি ইসলামি জ্ঞানের ভাণ্ডারে সংযোজন ও ইসলামি চিন্তাধারার সংস্কার ও পুনর্জীবনের ময়দানে আঞ্জাম দিয়েছেন। আরেক দিকে নদওয়াতুল উলামার ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষাগত চিন্তাধারা এবং পুরাতন ও নতুনের সম্মিলনের প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবগতি লাভ করবেন (যাকে লেখক-চিন্তাবিদগণ 'সৎ-সুস্থ্য পুরাতন ও উপকারী নতুনের সম্মিলন' বলে মূল্যায়ন করেছেন)। এর জন্যও একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রয়োজন ছিল, যাতে মুসলিম বিশ্ব, বিশেষ করে আরব বিশ্বের ইসলামি চিন্তাবিদগণকে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

১৯৪৬ সালের নভেম্বরে শায়খুল জামেয়া ডক্টর যাকের হুসাইন খান-এর (যিনি পরে ভারতের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন) আমন্ত্রণে দিল্লিতে জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ার সিলভার জুবিলি পালন করা হয়, যার ধারা ১৫ থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই সম্মেলনের মঞ্চে দীর্ঘদিন পর মানুষ এত বিপুল সংখ্যায়, এমন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও শিক্ষা-সাহিত্যবিষয়ক ব্যক্তিত্ব ও এমন পরস্পরবিরোধী লোকদের পাশাপাশি উপবিষ্ট দেখেছে।

ডক্টর সাহেবের আমন্ত্রণে আমিও এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং তাতে 'আহ্‌দে নববী কা নেযামে তা'লীম' (নবীযুগের শিক্ষাব্যবস্থা) নিবন্ধটি পাঠ করেছিলাম। এই সম্মেলনে আমার মাঝে আকাঙ্ক্ষা জাগল, ভারতের দ্বীনি শিক্ষার কর্ণধারদের পক্ষ থেকেও এমন একটি কার্যকর প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান করা দরকার, যাতে দ্বীনি ইল্‌মের উন্নতি ও তার পরিকল্পনা প্রণয়ণে চিন্তা করা হবে, অতীতের পরিসংখ্যান নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতের নকশা প্রস্তুত করা হবে।

এর জন্য স্বভাবত আমার সামনে নদওয়াতুল উলামারই মারকায ও স্টেজ ছিল, যাকে সাজানো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। এ-ধরনের কাজের জন্য এই মঞ্চকে এর আগেও সাজানো হতো।

এই দুটি অনুপ্রেরণা ছাড়াও এর আরও একটি উপকারিতা ছিল, ভারত সরকার (যে কিনা ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বহন করে) এবং এখানকার বৃহৎ জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ দেখবে, মুসলমান একটি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, যারা বিশেষ কোনো দেশে সীমাবদ্ধ নয়। তারা অতীতে ও বর্তমানে সেই দেশগুলো থেকে – যাদের ভাষা আরবি এবং যাদের ইতিহাস শত-শত বছর যাবত দ্বীনি ইল্‌মের খেদমত ও উন্নতির ইতিহাস – শুধু নেওয়ার কাজই করেনি, দেওয়ার কাজও করেছে এবং ইসলামি চিন্তা-চেতনাকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত বানাতে অনেক সময় নেতৃত্বের ভূমিকাও পালন করেছে। এখানকার ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো, তাদের ছাত্র ও কর্মকর্তাবৃন্দকে সেই ইসলামি দেশগুলোতে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয় এবং ইল্‌মি মজলিসগুলোতে তাদের শেষ সারিতে নয় – প্রথম সারিতে ও শীর্ষ আসনে স্থান দেওয়া হয়।

এসব জানার প্রয়োজন এজন্যও যে, এই বাস্তবতাগুলো সামনে আসার পর দেশের দায়িত্বশীলগণ দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আচরণ করতে তাদের গুরুত্বের ওজন ও সম্পর্কের কথা মনে রাখবেন, যেটি উক্ত দেশগুলোর সঙ্গে তাদের রয়েছে (যার সঙ্গে হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক ও অনেক সময় অর্থনৈতিক স্বার্থেরও সম্পৃক্ততা থাকে) এবং যাদের এক ডাকে ইসলামি ও আরব দেশগুলোর এতসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি, সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্মানিত প্রতিনিধিগণ সমবেত হয়ে যান, যারা অনেক সময় সরকারের আমন্ত্রণেও (যার সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান) একত্র হন না।

এসব লক্ষ্য ও উপকারিতার কারণে এই সম্মেলন শুধু একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্বার্থেই ছিল না; বরং ভারতের গোটা ইসলামি জনগোষ্ঠীর স্বার্থে ছিল। আর এর ফলে নিজেদের মাঝে আত্মপরিচয় ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হওয়ারও আশা ছিল, দেশ বিভক্তির পর যার বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল।

আন্দোলনের সূচনা

এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের চাহিদা তো নদওয়াতুল উলামার কর্তৃপক্ষের মন-মস্তিষ্কে কয়েক বছর যাবতই ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং ১৯৬৩ সাল থেকে বিষয়টি মুখে ও কলমে আলোচিত হতে লাগল। কিন্তু ব্যাপারটি এর সামনে আর অগ্রসর হয়নি। মূলত এর সিদ্ধান্ত নদওয়াতুল উলামার ব্যবস্থাপনা পরিষদের এক বৈঠকে – যেটি ১৯৭৪ সালের ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছিল – গৃহীত হয়, যেটি মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদির সভাপতিত্বে লাখনৌর গোলাগঞ্জের খাতুন মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত হয়। এটিই সেই ভবন, যেখানে দারুল উলূমের অস্তিত্ব বাস্তবতা লাভ করেছিল এবং এখানেই তার বিশিষ্ট ছাত্রবৃন্দ (যেমন মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী প্রমুখ) শিক্ষা অর্জন করেছেন। এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এই ৮৫সোলা সমাবর্তন অনুষ্ঠান ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। সেই সঙ্গে আমার আন্দোলনের ফলে এই সিদ্ধান্তও পাস করা হলো যে, সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ ইমরান সাহেব নদভীর ওপর অর্পণ করা হবে, যিনি নদওয়ার ছাত্রদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা, কর্মতৎপরতা ও বিচক্ষণতার কারণে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। সেই সঙ্গে দারুল উলূমের ভবনে তার জন্য একটি অফিস খুলে দেওয়া হলো।

একটা সমস্যা ছিল সভাপতিত্বের। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন, নদওয়াতুল উলামার মতো জায়গা, হিন্দুস্তানি মুসলমানদের, বিশেষ করে আলেমদের মেজাজ, মান ও দেশের স্পর্শকাতরা এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব চোখে পড়ছিল না। কারও মাঝে ইল্‌মের উঁচুতা পাওয়া যাচ্ছিল, (যেমনটি এ-ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের জন্য জরুরি) কিন্তু বেশ-ভুষা ইসলামি না থাকার কারণে (যেমনটি দেখতে হিন্দুস্তানি মুসলমান, বিশেষ করে এখানকার দ্বীনদার শ্রেণী অভ্যস্ত) তাকে

নির্বাচন করা যাচ্ছিল না। মুসলিম দেশগুলোর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের ওপর চোখ বোলানো হলো। কারও-কারও মধ্যে সবগুলো শর্ত পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক ইতিহাসের সম্পৃক্ততা ছিল, যেটি তাদের হিন্দুস্তান আগমনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারত।

হঠাৎ হজ্বের সময় রাবেতা আলমে ইসলামীর মিনার ভবনে জামেয়া আযহারের শায়খুল উসতায ডক্টর আবদুল হালীম মাহমুদ-এর ওপর চোখ পড়ল এবং তাঁর সঙ্গে বারবার সাক্ষাত হতে থাকল। মাওলানা মনযুর নু'মানী – যিনি সে সময় ওখানে ছিলেন – আমাকে ইঙ্গিত করলেন, সভাপতিত্ব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছেঃ শায়খুল আযহার সর্বদিক থেকে এই সভার সভাপতি হওয়ার যোগ্য।

বাহ্যিক বিচারে তিনি হিন্দুস্তানের নেতৃস্থানীয় আলেমগণের কাতারে বসবার উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব, আদর্শে-চরিত্রে সৎ ও আমলদার আলেম এবং ইসলামি জ্ঞানে শুধু মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামেয়া আযহারের শায়খই নন – বরং আন্তর্জাতিক মানের একজন লেখক ও গবেষক আলেমও বটে। আমি শুবরা হোটেলে বসে তাকে এই প্রস্তাব পেশ করলাম। তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করে নিলেন এবং পরামর্শ দিলেন, এ ব্যাপারে যেন তাঁর দেশের (মিশর) সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করি।

১৯৭৪ সালেই নদওয়াতুল উলামার নাযেম এই সম্মেলনের আমন্ত্রণ শুরু করে দিলেন। তিনি সর্বপ্রথম রাবেতা আলমে ইসলামীর মহাসচিব শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ কাযযায-এর খেদমতে পেশ করলেন, যাঁর বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি বাইতুল্লাহ ও মসজিদে নববীর নির্মাণ ও সম্প্রসারণের সুমহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন, আমাদের এই সম্মেলনে তিনি রাবেতার একটি প্রতিনিধিদল পাঠাবেন। তাঁর সঙ্গে এই আলোচনায় আমার সঙ্গে স্নেহাস্পদ ডক্টর আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভী ও মুহাম্মাদ আল-হাসানীও উপস্থিত ছিলেন। আর আলোচনাটি হয়েছিল হারাম শরীফের সন্নিকটস্থ দফতরে তা'মীরাতে, যেখান থেকে তাওয়াফ ও সাঈর শব্দ শোনা যাচ্ছিল এবং হারাম শরীফের মনকাড়া ও ঈমান-আলোকিত দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল।

এ বছরই রাবেতার বৈঠকে ইরাকের খ্যাতনামা দাঈ ও মুজাহিদ শায়খ মুহাম্মাদ মাহমুদ আস-সাওয়াফ অত্যন্ত জোরালোভাবে আমাদের এই

সম্মেলনের পক্ষে কথা বলেন এবং বৈঠকের অপরাপর সদস্যবৃন্দ তাঁরই কাছ থেকে এই সম্মেলন সম্পর্কে জ্ঞাত হন।

৮৫সালা শিক্ষা সমাবর্তন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল ৩১ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর ১৯৭৫। যে-সময় এই তারিখ ঠিক করা হয়েছিল, তখন আমাদের জানা ছিল না, দেশে জরুরি অবস্থা জারি হতে যাচ্ছে এবং পরিস্থিতি একদম পাল্টে যাবে। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে হঠাৎ দেশে জরুরি অবস্থা জারি হলো। কিন্তু ততক্ষণে সম্মেলনের এতটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল এবং মানুষের মনে এত আগ্রহ তৈরি হয়েছিল যে, সম্মেলন মুলতবি করা সঙ্গত মনে হচ্ছিল না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে আরব দেশগুলোর বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল ও লেখক-চিন্তাবিদগণকে ইতিমধ্যেই আমন্ত্রণ জানানো এবং আরব বিশ্বের সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।

কয়েকটি পরীক্ষামূলক ধাপ

১. বিদেশ থেকে মেহমান আসতে হলে ভারতীয় দূতাবাস থেকে ভিসা সংগ্রহ করা আবশ্যক। আর এই আশঙ্কার যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান ছিল যে, দেশের জরুরি অবস্থা এবং তার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারত সরকার এত সংখ্যক নামি-দামি অতিথির আগমনের অনুমতি দিতে অনীহা প্রকাশ করবে, যাঁদের আগমনের পর মত প্রকাশ ও ফিরে যাওয়ার পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে বাধা দানের সাধ্য কারও নেই। আমাদের এই আশঙ্কা তখন আরও জোরালো হলো, যখন আমরা দেখলাম, আমন্ত্রণ পৌঁছানোর দীর্ঘদিন পরও আমন্ত্রণ গ্রহণ ও সম্মেলনে অংশগ্রহণের আগ্রহের কোনো সংবাদ এল না। সে-সময়েই দিল্লির এমন একটি প্রতিষ্ঠানের একজন দায়িত্বশীল দারুল উলূম এলেন, যিনি এ-ধরনের সভা-সম্মেলন ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছিলেন। তিনি দারুল উলূমের কয়েকজন দায়িত্বশীলকে বললেন, আপনারা আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত আছেন। আমি আরব দেশগুলোর দূতাবাসে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, নদওয়াতুল উলামার সম্মেলনে যোগদানের জন্য আপনাদের দেশের কোনো প্রতিনিধি আসছেন কী? উত্তরে তাঁরা অজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন, না; আমাদের দেশ থেকে এমন কোনো তথ্য আমরা পাইনি। তাঁরা আরও বললেন, হতে পারে, এ দেশে যাঁরা আসতে চাচ্ছেন,

তাদেরকে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে (জরুরি অবস্থার কারণে) লাল পতাকা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভিসা দেওয়া যাবে না। তাদের এই ধারণা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হলো।

আমরা খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম, যদি বিদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অতিথি না আসেন, তাহলে সম্মেলন গ্রহণযোগ্যতা পাবে না এবং অনুষ্ঠান একদম পানসা হয়ে যাবে। এই পেরেশানির মধ্যেই আমি ডক্টর মৌলভী আবদুল্লাহ আব্বাস নদভীকে – যিনি সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার কাজে এসেছিলেন – গোপনে দিল্লি পাঠিয়ে দিলাম এবং বলে দিলাম, আপনি পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের কোনো একজন দায়িত্বশীলের সঙ্গে সাক্ষাত করে খোঁজ নিন এ-ধরনের কোনো নির্দেশনা ভারতীয় দূতাবাসগুলোকে পাঠানো হয়েছে কিনা। আমি তাকে জোর দিয়ে বলে দিলাম, গিয়ে তথ্য যা পাবেন, টেলিফোনে আমাকে জানাবেন। যদি এ-জাতীয় কোনো ব্যাপার না থাকে, তাহলে বলবেন, রোগীর অবস্থা ভালো। অন্যথায় বলবেন, রোগীর অবস্থা ভালো নয়। তাঁর যাওয়ার পর আমি অস্থির মনে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আসরের পর তাঁর টেলিফোন এল। তিনি বললেন, রোগীর অবস্থা ভালো। আমি আল্লাহর শোকর আদায় করলাম এবং এ-ব্যাপারে খানিক আশ্বস্ত হলাম।

২. দ্বিতীয় পরীক্ষামূলক ধাপ ছিল, দারুল উলূমের এই সম্মেলনটি ছিল একটি আন্তর্জাতিক সমাবেশ। এখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের বাণী পাঠ করে শোনানো হবে, তাঁদের যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করবেন, তাঁরাও এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন, অনেকগুলো মুসলিম ও আরব রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি-মন্ত্রীও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। স্বদেশ ও বিদেশের অনেক প্রচারমাধ্যম সম্মেলনের কার্যক্রম ও সম্মেলনে ঘোষিত চিন্তা-চেতনার প্রচার-প্রসারে অংশ নিবে। দেশের প্রেসিডেন্টকে (যিনি ঘটনাক্রমে সে সময় মুসলমান ও সম্মানিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন)[১] সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না জানানো একটি বাস্তবতা ও প্রয়োজনকে অস্বীকার করার নামান্তর

---

১. সে সময় জনাব ফখরুদ্দীন আলী আহমাদ সাহেব দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, ভারতের দ্বীনি মহলের সঙ্গে যাঁর ভালো একটি সম্পর্ক ছিল এবং আলেমদের তিনি বেশ শ্রদ্ধা করতেন। স্বয়ং নদওয়াতুল উলামার পরিচালকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় ছিল।

ছিল এবং এর ফলে সম্মেলন ও সম্মেলনের আয়োজক-ব্যবস্থাপকদের ব্যাপারে সন্দেহ তৈরি হতে পারত, যেটি বিশেষভাবে এই জরুরি অবস্থার মধ্যে একটি গভীর ও সুদূরপ্রসারী কুফল বয়ে আনতে পারত।

অপরদিকে আরও একটা সমস্যা ছিল যে, দেশের প্রেসিডেন্ট এলে সেসব রীতি-নীতি পালন করতে হতো, যেগুলো প্রেসিডেন্টের আমগন উপলক্ষ্যে পালন করা আবশ্যক। আর তখন ভারতের জাতীয় সঙ্গীতও গাইতে হতো, যার জন্য হারাম শরীফের প্রতিনিধি, আরবের আলেমে দ্বীন ও সেসব লোকদের দাঁড়িয়ে যেতে হতো, যাঁরা মিলাদ মাহফিলেও দাঁড়ানোর পক্ষপাতী নন। এসব কারণে আমরা প্রেসিডেন্টের সম্মান ও দেশপ্রেম অক্ষুণ্ন রেখে এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে শুরু করলাম। আল্লাপাকের মেহেরবানীতে সম্মেলনের তারিখ কাছাকাছি হওয়ায় এবং প্রেসিডেন্টের উদারতা আমাদের জন্য সাহায্যের দুয়ার খুলে দিল। প্রেসিডেন্টের কোথাও যেতে হলে কয়েক সপ্তাহ, এমনকি কয়েক মাস আগে প্রোগ্রাম তৈরি করতে হয় এবং এর জন্য সরকারের বিশেষ আয়োজন করতে হয়। প্রেসিডেন্ট আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন ঠিক; কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি আসবেন না – লিখিত বক্তব্য পাঠিয়ে দেবেন, যেটি রেল প্রতিমন্ত্রী জনাব ইউনুস সালীম সাহেব সম্মেলনে পাঠ করে শুনিয়েছেন। এভাবে অত্যন্ত চমৎকারভাবে আমাদের এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

৩. সম্মেলনের ব্যবস্থাপকদের জন্য তৃতীয় পরীক্ষাটি ছিল, নদওয়াতুল উলামার দায়িত্বশীলগণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন, এই সম্মেলনের ওপর যেন কোনো প্রকার সরকারি ছাপ পড়তে না পারে এবং জনসাধারণ যাতে এই কুধারণা পোষণ করার সুযোগ না পায় যে, এতে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের কোনো সহযোগিতা আছে এবং এই সম্মেলন অনুষ্ঠানে তাদের বিশেষ কোনো হাত বা আন্তরিকতা আছে।

এ-কাজে আরও একটি স্পর্শকাতরতা ও সমস্যা তৈরি গিয়েছিল। তা হলো, সে সময় উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন হিমতি নন্দন ভগ্নাজি। তিনি তাঁর চরিত্র ও উদারতার মাধ্যমে নদওয়াতুল উলামার কর্মকর্তাদের, বিশেষভাবে মহাপরিচালকের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করে নিয়েছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কয়েকবারই দারুল উলূম এসেছিলেন এবং তারই প্রচেষ্টায় দারুল উলূম সেই জমিটি (উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে) হস্তগত করতে

সক্ষম হলো, যেটি পাওয়ার জন্য দারুল উলূম বছরের-পর-বছর চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছিল।[১] এক বছর তিনি প্রদেশের বাজেটে দারুল উলূমের জন্য এক লাখ রুপি অনুদানেরও ঘোষণা দিয়েছিলেন। অবশ্য দারুল উলূম একটি ব্যক্তিগত পত্রের মাধ্যমে এই অনুদান গ্রহণে অপারগতার কথা জানিয়ে দিয়েছিল। তিনি ইউপি সরকারের পক্ষ থেকে এই সম্মেলনকে সব ধরনের সহযোগতিা প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং সরকারের নিয়ম অনুযায়ী বিদেশি মেহমানগণ, বিশেষ করে মন্ত্রীবর্গ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ যাতে ভারত সরকারের অতিথি হন সে ব্যাপারে আমাদের রাজি করাতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু আমরা শুধু নদওয়াতুল উলামাগামী রাস্তাটির মেরামত ও পানির ব্যবস্থাপনা ছাড়া (যেগুলো সরকারেরই কাজ) আর কোনো সহযোগিতা নিতে অপারগতা প্রকাশ করেছি। ঘটনাচক্রে সে সময় ইউপির চিফ সেক্রেটারীও মুসলমান ছিলেন।[২] প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে বেশিরভাগ তথ্য আদান-প্রদান তারই মাধ্যমে হতো। অবশেষে মি.ভগ্না চাপ সৃষ্টি করলেন, আমরা যেন অন্তত মেহমানদের আনা-নেওয়ার জন্য তাদের কাছ থেকে পরিবহন সুবিধাটা গ্রহণ করি। যেন অনুমতি দেই, মেহমানগণ সরকারি গাড়িতে করে বিমানবন্দর থেকে হোটেলে এবং হোটেল থেকে সম্মেলনে আসবেন। তিনি আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন, একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এত বড় কাজ আঞ্জাম দেওয়া অনেক কঠিন ব্যাপার; কাজেই আপনারা আমার থেকে অন্তত সরকারি এই সাহায্যটুকু গ্রহণ করুন। তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দিলেন, একাজে সরকার যে-গাড়িগুলো দেবে, সেগুলোতে সরকারি পতাকা থাকবে না।

কিন্তু আমাদেরকে এখানেও অপারগতা প্রকাশ করতে হলো যে, বেশ কটি ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি ও বহুসংখ্যক ব্যক্তি আবেদন জানিয়েছেন, যাতে একাজে আমরা তাদের সেবা গ্রহণ করি। এমতাবস্থায় যদি আমরা সরকারের সাহায্য গ্রহণ করি, তা হলে এটি তাদের এখলাস ও সেবার মানসিকতার অবমূল্যায়ন বলে বিবেচিত হবে। আর এমনটি করা আমরা সঙ্গত মনে করি না। বুদ্ধিমান

---

১. এটিই সেই জমি, যার উপর এখন রাওয়াকে আতহারের তিনতলা ভবন ও ছাত্র হোস্টেল অবস্থিত।

২. মাহমুদ বাট সাহেব সে সময় উত্তর প্রদেশের সেক্রেটারী ছিলেন।

ও বিচক্ষণ মন্ত্রী এই উত্তর শুনে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। কিন্তু রাস্তা মেরামত, পরিচ্ছন্নতা, আলোর ব্যবস্থা ও পানি সরবরাহের কাজে তিনি কোনো ক্রটি করেননি। তিনি কেবিনেটের কয়েকজন সদস্যকে সঙ্গে করে বেশ কবার পরিদর্শনে এসেছিলেন এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্যও সবার আগে এসে হাজির হয়েছেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপারটি হলো, তিনি নিজের পক্ষ থেকে সমস্ত মেহমানের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছেন এবং রাতের খাবারে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

৪. আরও একটি পরীক্ষামূলক ধাপ আমাদেরকে অতিক্রম করতে হয়েছে। আর তা হলো, সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে শায়খুল আযহারের নাম সমগ্র ভারতে প্রচার হয়ে গিয়েছিল। সবার নিশ্চিত ধারণা ছিল, তিনিই এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁর কিংবা মিশর সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর আগমনের সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য আসেনি, যার দ্বারা আমরা জানতে পারব, তিনি কোন দিন এবং কোন সময় এসে পৌঁছাবেন। আমি সীমাহীন দ্বিধা ও অস্থিরতার মধ্যে পড়ে গেলাম যে, আমিই তো তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং আমারই মাধ্যমে এর প্রচার হয়েছিল। সম্মেলনের মাত্র এক সপ্তাহ বাকি ছিল। দিনটি ছিল শুক্রবার। আমি আলাদা এক কোণে বসে সম্মেলনের জন্য কিছু লেখাপড়ার কাজ করছিলাম। আমি আব্দুর রাযযাক সাহেব বেরেলবিকে – যিনি আমার সঙ্গে থাকতেন – বললাম, আমি অমুক সময় আসব এবং টিলার মসজিদে যাব। আপনি রিকশা ঠিক করে রাখবেন। আমার নিয়ম ছিল, সেই দিনগুলোতে আমি প্রায়ই টিলার মসজিদে চলে যেতাম, যেখানে নির্জনতা ও নীরবতা ছিল।

ওখানে আমি সম্মেলনের সফলতার জন্য সালাতুল হাজাত পড়তাম ও দু'আ করতাম। আমি নির্দিষ্ট সময়ে বাইরে বেরিয়ে এলে স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ রাবে' আমাকে জানাল, শায়খুল আযহারের তারবার্তা এসেছে, তিনি আগামী বৃহস্পতিবার সকালের ফ্লাইটে লাখনৌ এসে পৌঁছছেন। আমার সঙ্গে-সঙ্গে মনে চিন্তা এল, তাহলে তো টিলার মসজিদে যাওয়া মুলতবি করে দেওয়া যায় যে, উদ্দেশ্য তো আমার হাসিল হয়ে গেছে। কিন্তু পরক্ষণেই এর জন্য লজ্জিত হলাম। বললাম, রিকশা আসতে বলো; আমি টিলার মসজিদে যাব এবং দু'আ করব। আমার মনে ভাবনা জাগল, উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাওয়ার পর এই যে আমি নামায ও দু'আ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম না; এর জন্য আল্লাহ নারাজ হতে পারেন।

৫. আমার জন্য একটি ব্যক্তিগত পরীক্ষা এই ছিল যে, আমার দৃষ্টিশক্তি এত দুর্বল ছিল যে, একেবারে কাছের বস্তুও আমি দেখতাম না। নানা পদমর্যাদার অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানো, যার-যার মর্যাদা অনুপাতে তাদের সঙ্গে কথা বলা, বিমানবন্দরে গিয়ে তাদের স্বাগত জানানো, সম্মেলন পর্যন্ত নিয়ে আসা এবং নিজের চোখে দেখে পরিস্থিতি অনুধাবন করা এসব কিছুই আমার জন্য কষ্টকর মনে হচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহপাকের কারসাজি দেখুন যে, সবগুলো ধাপই আমার জন্য সহজ হয়ে গেল। বন্ধুরা এই কাজগুলোতে আমাকে পুরোপুরি সহযোগিতা করেছেন এবং লজ্জা পাওয়ার মতো অসঙ্গত কোনো ঘটনাই ঘটেনি।

আসল প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা

সম্মেলনের সব ধরনের প্রস্তুতির কাজ এগিয়ে চলছিল। নগরবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। দারুল উলূমের সুবিশাল এরিয়া ও ভবনগুলোর পরিচ্ছন্নতা-সাজগোজ, প্যান্ডেল ও স্টেজ তৈরি ইত্যাদি এসব কাজ বেশ তৎপরতার সঙ্গে আঞ্জাম পাচ্ছিল। এসব কাজের জন্য মৌলভী শাব্বীর নদভী সুলতানপুরী – যাঁর এসব কাজের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা ছিল – জামেয়া মিল্লিয়া থেকে এসেছিলেন। মাওলানা ইমরান খান সাহেব নদভীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি টিম ভুপাল থেকে এসেছিলেন। এরা সবাই দিনরাত সমানতালে কাজ করছিলেন।

বিদেশি মেহমানদের থাকার জন্য ক্লার্ক হোটেলে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যেটি উন্নতমানের থ্রি স্টার হোটেল হওয়ার পাশাপাশি দারুল উলূমের একেবারে কাছাকাছি। মুখ্যমন্ত্রীর এই সম্মেলনের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ও আন্তরিকতা আছে এই তথ্য জানতে পেরে হোটেল মালিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেশ তৎপর হয়ে ওঠে এবং আমাদের খুব সহযোগিতা করে। আমার সুহৃদ একতেদার আলী খান সাহেব ইঞ্জিনিয়ার ও শ্রদ্ধেয় সাইয়িদ আতহার হুসাইন সাহেব আই.এ.এসও বিশেষভাবে এদিকে খেয়াল রাখেন। গুলমার্গ আমিনাবাদের গভর্মেন্ট গেস্ট হাউজ ও দারুল উলূমের উচ্চমাধ্যমিক শাখার বিভিন্ন তলায় মেহমানদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। নতুন হস্তগত জমির ওপরও পুরাতন ছাত্রদের জন্য শামিয়ানা টাঙানো হয়।

কিন্তু আসল প্রস্তুতি ছিল দু'আ ও ইতিকাফকারীদের একটি দল নির্বাচন করা, যারা সম্মেলনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সম্মেলনের সফলতার জন্য দু'আ-

যিকিরে রত থাকবেন। তাবলীগ জামাতের আমীর মাওলানা এনামুল হাসান সাহেবের পরামর্শ ও শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেবের ইঙ্গিতে এই আয়োজনটি করা হয়েছিল। কারণ, সাহায্য একমাত্র আল্লাহরই পক্ষ থেকে আসে। এর জন্য লাখনৌ ও রায়বেরেলির সেই বন্ধুদের নির্বাচন করা হলো, যাদের সাধুতা ও ইবাদাতের স্পৃহা জানাশোনা বিষয় ছিল। সম্মেলনের সবগুলো দিনে গোটা পরিবেশের ওপর যে-প্রশান্তি বিরাজ করছিল বলে মনে হচ্ছিল এবং যার অনুভূতি কমবেশি সকলেরই ছিল, সেটি খুবসম্ভব এই দু'আ-যিকিরেরই সুফল ছিল।

মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব আমাকে বললেন, 'শুনে আমি খুব আনন্দিত হলাম যে, আমার বলা ছাড়াই আমার ঘরের মেয়েরা সম্মেলনের কামিয়াবির জন্য কুরআন খতমের আয়োজন করেছে।' আমার ঘরেও কুরআন খতম ও দু'আ-যিকিরের আমল চলছিল। এসব বাদেও হযরত শায়খুল হাদীছ কায়মনে এই সম্মেলনের সফলতা ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য দু'আর প্রতি মনোযোগী ছিলেন। লাখনৌ থেকে কেউ গেলেই সবার আগে সম্মেলনের খবরাখবর জিজ্ঞেস করতেন। বেশ কবার ঘুমের মধ্যেও তাঁকে সম্মেলনের কথা বলতে এবং নির্দেশনা দিতে শোনা গেছে। আর তারই সুফল ছিল যে, যদিও সাধারণত সম্মেলন পরিচালনা আরবিতে হতো এবং আরবিতে দীর্ঘ বক্তৃতা চলত; কিন্তু মানুষের অবস্থা ছিল এমন, যেন তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবরাবাদি – যিনি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন – মন্তব্য করেছেন, মানুষ এই আরবি বক্তৃতাগুলো এমন একাগ্রতা ও মনোযোগসহকারে শুনছিল, যেন তারা জুমার খুতবা শুনছে।

সম্মেলন থেকে ফিরে গিয়ে রাবেতা আলমে ইসলামীর সাংবাদিকতা বিভাগের পরিচালক ওস্তাদ মুহাম্মাদ আল-হাফিয সম্মেলন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, শ্রোতারা চেয়ারে এমনভাবে বসে আছে বলে দেখা যাচ্ছিল, যেন তাদেরকে পেরেক দ্বারা আটকে দেওয়া হয়েছে। অনেক নামি-দামি লোককে দেখা গেছে, যখন তাদের ধূমপান বা অন্য কোনো বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, তারা এমনভাবে প্যান্ডেল থেকে উঠে গেছে, যেন মসজিদ থেকে বের হচ্ছে। কেউ তাদের এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তর দিয়েছিল, এমন সম্মেলনে সিগারেট টানা বে-আদবি।

মেহমানদের আগমন

বিশিষ্ট মেহমানদের প্রথম কাফেলাটি ৩০ অক্টোবর বুধবার সকালে শায়খুল আযহার আল-উসতাযুল আকবার ডক্টর আবদুল হালীম মাহমুদ-এর নেতৃত্বে এসে পৌঁছান। এই কাফেলায় মিশরের আওকাফ মন্ত্রী, আল-মাজমাউল বুহূছিল ইসলামিয়্যার সেক্রেটারি জেনারেল, রাবেতার পুরো প্রতিনিধিদল, বেশ কজন প্রখ্যাত মিশরি আলেম ও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় মেহমান ছিলেন। তার আগে বাহরাইনের প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার ও আলজেরিয়া ও উগান্ডার প্রতিনিধিদল বুধবার এসে পৌঁছান। লাখনৌতে সেদিন ঈদের আনন্দ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এমন আনন্দ আমার বয়সে আমি এই শহরে এর আগে কখনও দেখিনি। ত্রিশটি বাসের দীর্ঘ সারি নগরীর নানা অঞ্চল থেকে লাখনৌর মুসলমানদের নিয়ে বিমানবন্দর গিয়ে পৌঁছয়। প্রাইভেট গাড়ি, কার, মোটর ও ট্রাক ছিল এই হিসাবের বাইরে। মেহমানদের অভ্যর্থনা জানাতে আসা জনতা পুলিশের বেষ্টনি ভেদ করে সামনে চলে যায়। আল্লাহু আকবার স্লোগানে পরিবেশ মুখরিত হয়ে ওঠে। শুক্রবার সকালে আরও কয়েকটি দল এসে পৌঁছয়। অতিথিদের প্রত্যাশিত সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হয়ে যায়। নগরবাসী স্থানে-স্থানে তোরণ স্থাপন করেছিল। দারুল উলূমগামী সড়কে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি, মুজাদ্দিদে আলফে ছানি ও মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নদভীর নামে গেট সাজানো হয়েছিল।

সম্মেলন

সম্মেলনে ১০ হাজার চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মঞ্চেও গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের জন্য বিপুলসংখ্যক চেয়ার রাখা ছিল। সংবাদকর্মীদের বসার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মেহমানদের প্রবেশের জন্য প্রথম যে-গেটটি ছিল, সেটি ইত্তেহাদে ইসলামীর আহ্বায়ক মালিক ফয়সাল শহীদ-এর নামে নামকরণ করা হয়েছিল।[1]

সম্মেলনের চিত্র 'রোয়েদাদে চেমন'-এর লেখক এভাবে অঙ্কন করেছেন—

'এই উপমহাদেশের ইতিহাসে এটিই বোধহয় প্রথম ঘটনা, যেখানে ইসলামি জ্ঞান ও আদর্শ, সৌন্দর্য ও যোগ্যতার এই দৃশ্যটি চোখে পড়েছে।

---

১. মালিক মরহুম সম্মেলনের ছয় মাস আগে ১৩৯৫ হিজরির রবিউল আউয়াল মোতাবেক এপ্রিল ১৯৭৫ সালে শাহাদাতবরণ করেছিলেন, যেটি মুসলিম বিশ্বের জন্য বিরাট এক দুর্ঘটনা ছিল।

কেবল বিভিন্ন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ ও সেগুলোর দায়িত্বশীলগণ আজ যেভাবে কাঁধে-কাঁধে, কাতারে-কাতারে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল এবং মনকাড়া দৃশ্য উপস্থাপন করছিলেন, সেটি ইতিহাসের এমন একটি আমানত, যাকে কোনো ইতিহাসবিদ ও কাহিনীকারই উপেক্ষা করতে পারেন না। মনে হচ্ছিল, এটি কোনো মঞ্চ নয় – এটি ইসলামি বিশ্বের সুন্দর ও সুদৃশ্য একটি বাগান, যেখানে তার সুবিশাল জগত থেকে প্রতিটি বর্ণের ফুল একত্রিত করে অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে সাজানো হয়েছে।'[১]

এই সম্মেলনে আরব দেশগুলোর সম্মানিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল ৫৬, যাঁদেরকে এর আগে কোনো সরকারি বা বেসরকারি অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি। (এই তালিকা থেকে সেই নামগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে, যাঁরা মূলত ভারতীয় বংশোদ্ভূত) আরব বিশ্ব ছাড়াও উগান্ডা, রাশিয়া, ইরান, থাইল্যান্ড, নেপাল, পূর্ব আফ্রিকা ও বাংলাদেশের প্রতিনিধি ও সেসব দেশ থেকে আগত মেহমানগণ ছিলেন। অতিথিগণ যতটা না ছিলেন সংখ্যায় অধিক, তার চেয়ে বেশি ছিলেন সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন। তাদের মাঝে বেশ কজন আরবি আলেম ও ইসলামি বিশ্বের নির্বাচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন।[২]

ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, নেতৃস্থানীয় আলেমে দ্বীন, চিন্তাবিদ, খ্যাতিমান দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীলগণ ছিলেন এই হিসাবের বাইরে।[৩]

স্বাগত ভাষণ

এই সম্মেলনের স্বাগত ভাষণ লেখক নিজে মূলত আরবি ভাষায় প্রস্তুত করেছিলেন (যেটি এই সম্মেলনের সরকারি ভাষার স্বীকৃতি লাভ করেছিল)। তার অনুবাদ 'রোয়েদাদে চেমন'-এর লেখক মুহাম্মাদ মিয়া এমন সাবলীল ও মার্জিত ভাষায় করেছেন যে, তার কোথাও অনুবাদের ছাপ পরিলক্ষিত হয় না। স্বাগত ভাষণের গতানুগতিক রীতি থেকে সরে এসে এই ভাষণ ঐতিহাসিক অধ্যয়ন এবং ভারতবর্ষের ইসলামি আমলের ইতিহাসের দর্শনের আলোকে একটি বিদ্যাগত পরিসংখ্যান এবং চিন্তা ও কর্মের দাওয়াতের মর্যাদা রাখত। তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য (যেটি ছিল স্রেফ আল্লাহপাকের

---

১. 'রোয়েদাদে চেমন' পৃষ্ঠা ৭৯-৮০

২. বিস্তারিত জানতে 'রোয়েদাদে চেমন' পৃষ্ঠা ৮৩-৮৮

৩. 'রোয়েদাদে চেমন' পৃষ্ঠা ৮৮-৯২

তাওফীকের সুফল) ছিল, তাতে সম্মানিত আরব মেহমান ও মুসলিম বিশ্বের চিন্তাবিদগণকে এমন একজন দাঈর সুউচ্চ আসন থেকে সম্বোধন করা হয়েছিল, যিনি তাদের ব্যাপক আর্থিক সঙ্গতিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলছিলেন এবং তাদের দ্বারা উপকৃত হওয়া ও নির্দেশনা লাভের চেয়ে অধিক তাদের সেবা করা, তাদের ইসলামি চেতনা ও জাতীয় মর্যাদাবোধকে জাগিয়ে তুলতে, তাদেরকে ভারতীয় মুসলমানদের অভিজ্ঞতা, দ্বীনি মর্যাদাবোধ, এই জাতির সংশোধক-সংস্কারকদের দূরদর্শিতা ও লিল্লাহিয়্যাত দ্বারা উপকার পৌঁছানো এবং তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করার প্রত্যাশী। তার প্রমাণের জন্য উক্ত ভাষণের অংশবিশেষ আমি এখানে তুলে ধরলাম–

'অনুমতি পেলে আমি পরম আদবের সঙ্গে একটি কথা বলতে চাই। কথাটি হলো, ভারতীয় মুসলমানরা আল্লাহর ফজলে দ্বীনের ব্যাপারে অনেকাংশেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। তারা ইসলামের মূল ও প্রকৃত উৎস, তথা কুরআন-সুন্নাহ, ইসলামের শুরুর সময়কার পতাকাবাহীদের আদর্শ-চরিত্র, তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা, তাঁদের মহত্ত্ব ও সাহসিকতার জ্বালানো বাতি থেকে আলো লাভ করছে। তারা তাদের ঈমান ও জীবনাচারকে ইসলামের আলোকোজ্জ্বল সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত করে রেখেছে। মুসলিম জাতি কিংবা আরব দেশগুলোর নিমজ্জমান তারকা বা নিভু-নিভু বাতি থেকে নয়। তারা চোখ বন্ধ করে তাদের কারও আঙুল ধরে চলার মতো মানুষ নয়। না তারা তাদের কারও ইসলামের অনুসরণকে নিজেদের ইসলাম অনুসরণের শর্ত জুড়ে রেখেছে। আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে, ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষামালাকে তারা বুকের সঙ্গে লাগিয়ে রাখবে। চাই জগতের অন্যান্য জাতিগুলো (আরব বা অনারব) তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করুক বা মুখ ফিরিয়ে নিক। যদি আরব কিংবা অন্য কোনো দেশের মুসলমান তাদের সনাতন সভ্যতা ও পুরাতন দর্শনের জাদুতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং তার অনুসরণে আত্মনিয়োগ করে, তবুও আমরা ইনশাআল্লাহ ইসলামি ঐক্য বজায় রাখব এবং ইসলামের অনুসরণে নিজেদের উৎসর্গ করে দেব। ইসলামের মূলনীতি ও ইসলামি জীবনধারার প্রশ্নে আমরা কোনো প্রকার সওদা করতে প্রস্তুত নই।

'আমরা ভালো করেই বুঝি, দেশে ও দেশের বাইরে আমাদেরকে এই মূলনীতিপ্রিয়তা ও ইসলামের যথাযথ আনুগত্যের মূল্য পরিশোধ করতে

হবে। আমাদেরকে এমন অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে চোখ বন্ধ করে নিতে হবে, যেগুলো বাতাসের গতির তালে চলা জাতি-গোষ্ঠীদেরই কেবল অর্জিত হয়। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ যদি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকেন, আমরা যদি নিষ্ঠা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিজেদের মূলনীতির ওপর অটল থাকি, তাহলে আল্লাহ্ আমাদের জন্য কোনো সংকট, আমাদের ভাগ্যে বঞ্চনা লিখবেন না। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি, এই বিশ্বজগত মহান আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছার অনুগত এবং তার আদেশ ছাড়া জগতে কিছুই হয় না।

সুধিমণ্ডলি! এসব কারণেই বোধহয় অপরাপর ইসলামি রাষ্ট্রের তুলনায় এই ভূখণ্ডের বেশি অধিকার আছে যে, তার এমনসব বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন, ইসলামি চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সংস্কারকগণের আতিথেয়তার মর্যাদা অর্জিত হবে এবং তাঁরা এখানে এসে নিজচোখে সেই প্রচেষ্টাগুলোর ফলাফল প্রত্যক্ষ করবেন, যেগুলো একটি উপায় ও উপকরণহীন একটি জাতি তাদের দ্বীনের খেদমত ও ইসলামি জ্ঞানের উন্নতি ও প্রসারের জন্য করেছে। আর তারা দেখবেন, এখনও এই জাতির আরও কী পরিমাণ পথ পাড়ি দিতে হবে এবং এই সফরে তাঁরা তার কী নির্দেশনা দিতে পারেন।'[১]

সম্মেলনের সূচনা এভাবে হলো যে, শুরুতে কারী ওয়াদুদুল হাই সাহেব নদভী সূরা ফাতিরের সেই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেন, যেগুলোতে মহান আল্লাহ্ দ্বীনের ধারক-বাহক ও নায়েবে রাসূলগণের জন্য দিকনির্দেশনা ঘোষণা করেছেন। আবার তাতে নানা সুসংবাদও আছে। আছে সাবধানতা ও সতর্কবাণী। যার শুরু এরকম–

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۝ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ۝

(সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, অন্ধকার ও আলো।)

আর সমাপ্তি এরকম–

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۝

(তারপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে, যাদের আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি

---

১. 'রোয়েদাদে চেমন' ১১৭-১১৮

অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। এটাই মহা অনুগ্রহ।)

কারী ওয়াদুদুল হাই সাহেব নদভীর এই মনমাতানো তেলাওয়াতের পর – যার দ্বারা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের বিরাট একটি উপাদান আমাদের সম্মুখে এসে পড়ল এবং শ্রোতাদের চোখগুলো অশ্রুসজল হয়ে উঠল – মৌলভী সাইয়িদ মুহাম্মাদ ছানীর রচিত তারানায়ে নদওয়া পড়ে শোনানো হলো, যার দুটি চরণ এরকম–

ہم نازش ملک وملت ہیں ہم سے ہے درخشاں صبح وطن
ہم تابش دین ہم نور یقین ہم حسن عمل ہم خلق حسن

'আমরা দেশ ও জাতির গৌরব। আমাদের মাতৃভূমির সকাল আলোকিত হয় আমাদেই দ্বারা। আমরা দ্বীনের আলো। আমরা বিশ্বাসের চমক। আমরা কাজের সৌন্দর্য। আমরা সুন্দর চরিত্র।'

এই তারানাও সম্মেলনে একটি ভাব সৃষ্টি করে দিল এবং নদওয়া থেকে ফারেগ হওয়া আলেম ও ভক্তবৃন্দের মাঝে কৃতজ্ঞতা, আনন্দ, আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাসের একটি ঢেউ খেলে গেল। তারানার পর গণপ্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রেসিডেন্ট ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠানো লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনানো হলো। তারপর স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো। (যার আরবি রিডিং আমার দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণে মৌলভী সাইয়িদ ওয়াজেহ নদভী আর উর্দু রিডিং সম্মেলনের ব্যবস্থাপক মাওলানা হাফেয হাফেয মুহাম্মাদ ইমরান খান সাহেব নদভী পাঠ করেন) স্বাগত ভাষণের পর শায়খুল আযহার সভাপতির ভাষণ দান করেন।

সম্মেলনের কার্যক্রম এতটুকু অগ্রসর হওয়ার পর জুমার নামাযের সময় হয়ে গেল। ততক্ষণে সম্মেলনের উপস্থিতির সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজারে পৌছে গিয়েছিল। শায়খুল আযহার জুমার নামাযের ইমামত করেন এবং অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ও প্রাণবন্ত খুতবা দান করেন। বিকালে সম্মেলনের ইল্‌মি ও তা'লিমী প্রদর্শনী শুরু হয়। মিশরের আওকাফ মন্ত্রী ডক্টর মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী এই অধিবেশন উদ্বোধন করেন। মাগরিবের নামাযের পর শুরু হলো তৃতীয় অধিবেশন। এই অধিবেশনে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষাসচিব মাওলানা আবদুস সালাম কুদওয়ায়ী নদওয়াতুল উলামার

পঁচাশিসালা রিপোর্ট ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। সাধারণত এরকম বড় সম্মেলনে দীর্ঘ রিপোর্ট অমনোযোগিতার সঙ্গে শোনা হয়।

কিন্তু নদওয়াতুল উলামার এই রিপোর্টটি শ্রোতারা পূর্ণ মনোযোগ ও আন্তরিকতার সঙ্গে শ্রবণ করেন। তারপর কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি বক্তব্য প্রদান করেন, যাঁদের মধ্যে মিশরের আওকাফ মন্ত্রী ডক্টর যাহাবি, কুয়েতের আওকাফ মন্ত্রী ডক্টর শায়খ আবদুর রহমান আল-ফারেস ও আবুধাবির প্রধান বিচারপতি শায়খ আহমাদ আবদুল আযীয আলে মুবারক অন্যতম। সে-রাতেই উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মিস্টার হিমতি নন্দন ভগ্নার পক্ষ থেকে এসব বিশিষ্ট মেহমানদের সম্মানে একটি আড়ম্বরপূর্ণ নৈশভোজের আয়োজন করা হয়।[১]

চার দিনব্যাপী এই সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর মধ্যে 'মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম'-এর পরিচিতিসভা, শিক্ষাবিষয়ে বেশ কটি ভাষণ ও নিবন্ধ, রুশ প্রতিনিধি মীর শরীফুদ্দীন মুহাম্মদভ-এর উর্দুতে ভাষণদান, নদওয়ার ছাত্রদের সংগঠন 'জমিয়াতুল ইসলাম'-এর অভ্যর্থনা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা প্রদর্শনী, দ্বীনি তা'লীমি কাউন্সিলের নৈশভোজের আয়োজন, নগরবাসীর পক্ষ থেকে ক্লার্ক হোটেলে আড়ম্বরপূর্ণ অভ্যর্থনা ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর গুলমার্গ হোটেলে অভ্যর্থনা ও নৈশভোজের আয়োজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ও বরকতময় অনুষ্ঠানটি ছিল ৩ নভেম্বর সকালে নদওয়াতুল উলামার কুতুবখানার প্রস্তাবিত নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর রাখার সময়কার অনুষ্ঠান, যেটি আবুধাবির প্রধান বিচারপতি শায়খ আহমাদ আবদুল আযীয আলে মুবারকের হাতে আঞ্জাম পেয়েছিল। ভিত্তিপ্রস্তার স্থাপনের পর শায়খ আহমাদ এমন একটি মনগলানো দু'আ করেন যে, সে সময় যারা ওখানে উপস্থিত ছিলেন, দীর্ঘদিন যাবত তার স্মৃতি তাঁদের মনে থাকবে। শায়খ আহমাদ নিজেও অঝোরে কেঁদেছেন এবং অন্যরাও অশ্রুসিক্ত হলেন।

আলহামদুলিল্লাহ কুতুবখানার এই ভবনটি নির্মিত হয়ে গেছে। তবে বিশেষ কারণে সেটি ওখান থেকে সরিয়ে তার থেকে খানিক দূরে স্থাপিত হয়েছে। ১৯৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে তার উদ্বোধন হয়। নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মঙ্গেরির

---

১. বিস্তারিত জানতে 'রোয়েদাদে চেমন' পড়ুন

সুযোগ্য পুত্র মাওলানা সাইয়িদ মিন্নাতুল্লাহ এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এবং এই অনুষ্ঠানেই দুখণ্ডে রচিত 'তারীখে নদওয়াতুল উলামা'র মোড়ক উন্মোচন করা হয়। বারাকাতুল আস্‌র ও রায়হানাতুশ শাম শায়খ হাসান হাব্বানকার ক্রিয়াশীল দু'আর মাধ্যমে সেদিনকার সেই সভার শুভ সমাপ্তি ঘটেছিল।

কোনো জমশেদের পানপাত্র নই আমি

সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল সেই আরব দেশগুলোর বিপুলসংখ্যক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ, যাঁদের প্রাকৃতিক উপকরণ ও সম্পদের কাহিনী বিশ্ববাসীর সবার মুখে-মুখে এবং যাঁরা এত বিপুল সংখ্যায় এর আগে হিন্দুস্তানের কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেননি। সেজন্য স্বভাবত মানুষের ধারণা ছিল, এই সুযোগে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি আর্থিকভাবেও বেশ উপকৃত হবে, যেটি হিন্দুস্তানের গরিব মুসলমানদের সাহায্য-সহযোগিতায় পরিচালিত হয়ে আসছে। কারণ, এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর হাতে আসবে বলে আশা করা যায় না। কিন্তু নদওয়াতুল উলামার দায়িত্বশীল ও এই সম্মেলনের পরিকল্পনাকারীগণ সিদ্ধান্ত ঠিক করে রেখেছিলেন, এই পুরো সম্মেলনে কোথাও চাঁদা শব্দটির নামও উচ্চারণ করা হবে না এবং এই আরব মেহমানদের দ্বারা জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারের কল্পনাও কাছে ঘেঁষতে দেবেন না। নদওয়াতুল উলামার পরিচালক এক বৈঠকের ভরমজলিসে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন–

'দীর্ঘ দিন যাবত মনে বাসনা ছিল, আরবের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ইসলামের দাঈ ও আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীগণ আমাদের বাড়িতে মেহমান হবেন। আমরা আমাদের বুকের দাগগুলো তাঁদের দেখাব এবং বলব, ভারতীয় মুসলমানরা ঈমান ও ইসলামের এই দৌলতকে (যাকে তারা তাদেরই থেকে অর্জন করেছিল) কীভাবে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছে। যে-পাঠ তারা আমাদের পড়িয়েছিলেন, আমরা তা আজও ভুলিনি। আপনারা আসুন; এসে আমাদের মুখস্থ পাঠ শুনে যান। আমাদের মনের মণিকোঠায়ও এই চিন্তা ছিল না যে, তাদের সামনে আমরা ভিক্ষার হাত বাড়াব। আমি খোদ তাঁদের দেশে গিয়ে সব সময় তাঁদের দাওয়াত ও নেতৃত্বসুলভ পদমর্যাদার কথা মনে করিয়ে দিয়েছি। আমি পরিষ্কার ভাষায় বলেছি, এ-ব্যাপারে আমি তাঁদের অনেক উদার পেয়েছি। এখানে আমরা তাঁদের এজন্য তলব করেছি যে, তাঁদের

আমরা তাঁদেরই পূর্বপুরুষদের সংস্কার ও চরিত্রগঠনমূলক প্রচেষ্টাগুলোর ফলাফল দেখাব এবং এর দ্বারা তাঁদেরও কিছু উপকার হবে। এটা নয় যে, তাঁদের সামনে আমরা ভিক্ষার ঝুলি এগিয়ে ধরব। সবচেয়ে ধনী ও গুরুত্বপূর্ণ দেশ আরবের একজন সম্মানিত রাষ্ট্রদূতের সামনে তাঁদের আগমনের সময় ইকবালের এই কবিতাটি পাঠ করেছিলাম এবং আজও আমার সেই মূলনীতির ওপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে–

کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں　　غلام طغرل و سنجر نہیں میں
جہاں بینی مری فطرت ہے لیکن　　کسی جمشید کا ساغر نہیں میں

'তোমার করুণা যে, আমি নিঃসম্বল নই। আমি তাগরাল-সানজারের ভৃত্য নই। দেশময় ঘুরে বেড়ানো আমার স্বভাব বটে; কিন্তু আমি কোনো জমশেদের (রাজা-বাদশাহর) পানপাত্র নই।'

সম্মানিত সুধি! সোনার এই পাখিগুলো সবই উড়ে যাবে। আমরা ও আপনারা এখানে রয়ে যাব। মনে করবেন না, আপনারা ছুটি পেয়ে গেছেন। আমরা আপনাদের ছাড়বার পাত্র নই। আমাদের এই মাদরাসা আপনাদের চার আনা, আট আনা দ্বারাই চলছে। আপনাদের চার আনা, আট আনা আমাদের কাছে বেশি প্রিয়। কারণ, আপনারা ত্যাগ স্বীকার করে দান করেন। আপনারা ভুল বুঝবেন না, তাঁদের আমরা এজন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি যে, তাঁদের থেকে আমরা কোঁচড় ভরে গ্রহণ করব।'

কয়েকজন আরব মেহমানের অনুরোধে আমাদের কয়েকজন নদভী আলেম আরবিতে আমার এই ভাষণের সারমর্ম তাদের শোনায়। আমি যখন বক্তৃতা শেষ করে বসলাম, তখন শায়খুল আযহার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কী বললেন? আমি তাঁকেও বক্তব্যের সারাংশ শোনালাম। বক্তব্যে আমি এই কুধারণাও দূর করার চেষ্টা করেছি যে, সম্মেলনের আয়োজকদের পক্ষ থেকে অতিথিদের ওপর একরকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে যে, আপনারা কোনো প্রকার রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন না এবং আপনাদের বক্তব্যে সেই পরিস্থিতির কোনো ঝলক থাকতে পারবে না, যেটি বর্তমানে দেশে বিরাজ করছে। তার বিপরীতে কোনো-কোনো বক্তা সেসব গ্রেফতারির প্রতিবাদ করেছেন, যেগুলো ব্যাপকভাবে আলোচিত বিষয় ছিল। এধরনের বক্তব্য না দিতে কাউকে ইঙ্গিতও করা হয়নি।

ফজর নামাযের পর দাওয়াতি বক্তব্য

এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের একটি উপকারী ধারা এই ছিল যে, আরব প্রতিনিধি ও বিদেশি স্কলারগণ ছাড়াও খোদ ভারতীয় মুসলমানদের গুরত্বপূর্ণ একটি অংশ এখানে এসেছিলেন। তাঁদের মাঝে জাতীয় নেতৃবৃন্দও ছিলেন, বিভিন্ন দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণও ছিলেন। মসজিদের ইমাম-খতিবগণও ছিলেন, নানা দ্বীনি সংগঠনের নেতৃবর্গও ছিলেন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্ররাও ছিলেন। সেজন্য এমনসব বক্তব্যের প্রয়োজন ছিল, যেগুলো ভারতে অবস্থান করে দ্বীনের সুরক্ষা ও মুসলিম জাতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা ও এই জাতির গুরুত্ব ও উপকারিতা প্রমাণের পথ নির্দেশ করবে এবং সম্মেলনে নিষ্ঠা ও দ্বীনি জযবা নিয়ে আগত হাজার-হাজার শ্রোতা আপন-আপন গৃহে কোনো বার্তা নিয়ে ফিরতে পারে।

একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনার অধীনে অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে দারুল উলূমের মসজিদে ফজর নামাযের পর এসব বক্তব্য ঠিক করা হয়েছিল। সম্মেলনের এক দিন আগেই এসবের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাতে দ্বীনের স্বরূপ ও দাবির বিষয়টি খোলাসা করা হয়েছিল। সম্মিলিতভাবে জীবনযাপন করা, জাতির জন্য ত্যাগ স্বীকার ও নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল। নিজেদের জাহিলিয়াত থেকে বাঁচিয়ে রাখার এবং বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে চলার আহবান জানানো হয়েছিল এবং বোঝানো হয়েছিল এদেশে কাজ করার সঠিক পন্থা কী। সর্বশেষ ভাষণে দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছিল এবং আহ্বান জানানো হয়েছিল, আমাদেরকে গুণাবলিতে পরিবর্তন সাধন করতে হবে। কারণ, জাতি ও ব্যক্তির সাথে আল্লাহর আচরণ গুণাবলি অনুপাতে হয়ে থাকে – সত্তা অনুপাতে হয় না। আরও বলা হয়েছিল হিন্দুস্তানে আমাদেরকে কীভাবে থাকতে হবে, আমরা কীভাবে আল্লাহর প্রেমাস্পদ হওয়ার মর্যাদা অর্জন করতে পারব এবং কীভাবে এই দেশটিকে সঠিক মানবতার বার্তা পৌঁছাতে পারব।

নভেম্বরের ৩ তারিখের (তত দিনে বেশিরভাগ আরব অতিথি চলে গেছেন) রাতের শেষ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন বিহার ও উড়িষ্যার আমীরে শরীয়ত মাওলানা সাইয়্যিদ মিন্নাতুল্লাহ রহমানী সাহেব। এই অধিবেশনের বেশিরভাগ প্রোগ্রাম উরদুতে পরিচালিত হয়। আরবি বা ইংরেজিতেও এক-

দুটি ভাষণ হয়। আরবি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিষয়েও বেশ কটি পরিচিতিমূলক নিবন্ধ পাঠ করা হয় এবং 'আল-বা'ছুল ইসলামী'র সম্পাদক মৌলভী সাঈদুর রহমান আজমী 'ইসলাম ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব' বিষয়ের ওপর আরবিতে একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। পরিশেষে অধিবেশনের সভাপতি সাহেব সংক্ষেপে অথচ ক্রিয়াশীল বক্তব্য প্রদান করেন এবং তাঁরই দু'আর মধ্য দিয়ে চার দিনব্যাপী এই ৮৫সালা সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।[১]

আমার বোন আমাতুল্লাহ্ তাসনীম সাহেবার ইন্তেকাল

নদওয়াতুল উলামার ৮৫সালা সফল অনুষ্ঠান থেকে অবসর হয়ে যখন বেরেলিতে ফিরে এসে বাড়িতে পা রাখলাম, তখন সবার আগে ছোট বোন (আমার বড়) আমাতুল্লাহ তাসনীম সাহেবা – যিনি কিনা কিছুদিন যাবত অসুস্থ ছিলেন – এগিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই মহান ঐতিহাসিক সম্মেলনের সফলতার জন্য আমাকে মুবারকবাদ জানালেন, যার সফলতা ও আমার মুখ রক্ষার জন্য মহান আল্লাহ্র সমীপে অনেক দু'আ করেছেন এবং খতম পড়েছেন। কিন্তু এটা জানা ছিল না যে, মাত্র দু-মাসের ব্যবধানে তাঁর থেকে আমাদের বিরহের ঘটনা ঘটে যাবে, যা কিনা শুধু এই আনন্দকে বেদনায় পরিণত করেই ক্ষান্ত হবে না; বরং বহু বছরের জন্য হৃদয়ের ওপর একটি নকশা অঙ্কন করে যাবে।

মরহুমা আম্মাজানের পর তিনিই আমাদের ঘরের বরকত, রওনক ও আমাদের জন্য রাত-দিন দু'আকারী ছিলেন। ১৯৭৬ সালের ১৭ জানুয়ারি আমার নাগপুর, আওরঙ্গবাদ ও পুনা প্রভৃতি অঞ্চলে সফরে রওনা হওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। সে সময় চিকিৎসার জন্য তিনি লাখনৌ অবস্থান করছিলেন। আমি সন্ধ্যায় দারুল উলূম থেকে ঘরে এলাম যে, তাঁকে সালাম করে এবং তাঁর থেকে দু'আ নিয়ে সফরে রওনা হব। তখন আশঙ্কার কোনো লক্ষণ বা

১. এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ মুহাম্মাদ মিয়ার কলমে 'রোয়েদাদে চেমন' নামে মাকতাবা দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত হয়, যার কলেবর ২৯২ পৃষ্ঠা এবং নানা (প্রাণহীন) ছবি ও চিত্র দ্বারা সমৃদ্ধ। সম্ভবত অন্য কোনো সম্মেলনের বিবরণ এতটা ক্রিয়াশীলভাবে প্রকাশিত হয়নি যে, তাকে সম্মেলনের সবাক চিত্র বলা যেতে পারে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদি – যিনি সে সময় অসুস্থতার কারণে গ্রন্থ সমালোচনা করতে সক্ষম ছিলেন না – লিখেছেন, লেখক প্রোপাগাণ্ডাকে সাহিত্য বানিয়ে দিয়েছেন।

অস্থির হওয়ার মতো কোনো অবস্থা ছিল না। আমি দীর্ঘ সময় বসে তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। রওনার সময় তিনি যথারীতি আমাকে বিদায় জানালেন এবং আম্মাজানের নিয়ম অনুযায়ী إِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ পড়ে আমাকে আল্লাহর হেফাজতে তুলে দিলেন। তখন কে জানত, সচেতন অবস্থায় তাঁর সঙ্গে এটিই আমার জীবনের শেষ দেখা?

সফরের মধ্যখানে আমার বাড়ি ফিরে আসার এমন তীব্র প্রয়োজন দেখা দিল যে, নিজের মেজাজ ও অভ্যাসের বিপরীতে কারও পীড়াপীড়িই আমাকে বারণ করতে পারল না। আমি সামনের সমস্ত প্রোগ্রাম মুলতবি করে আওরঙ্গবাদ থেকে বিমানযোগে দিল্লি, দিল্লি থেকে ট্রেনে করে কানপুর এবং কানপুর থেকে কারে করে ২৫ জানুয়ারি মাগরিবের পর লাখনৌ এসে পৌঁছি। কার থেকে মাটিতে পা রাখামাত্র একটা সংবাদ আমার মাথার ওপর বজ্রের মতো নিপতিত হলো যে, আমার বোন পুরোপুরি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রয়েছেন। আমি এ-যাবত বেশ কজন রোগীর অবস্থা দেখেছি। তাছাড়া আমি একটি চিকিৎসক পরিবারের সন্তানও বটে। সেজন্য তার শেষ ফলাফল বজ্রের মতো আমার চোখের সামনে এসে হাজির হলো। এই দু-তিনটি দিন কিভাবে কাটল, তার বিবরণ শোনানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এই দিনগুলো আমার জীবনের কঠিনতর দিনগুলোর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের অসহায়ত্ব, জীবনের অসারতা, দুনিয়ার অস্থায়িত্ব, আল্লাহর অপার শক্তি ইত্যাদি সমস্ত বাস্তবতা চোখের সামনে এসে হাজির হলো। অবশেষে ১৮৭৬ সালের ২৮ জানুয়ারি সকাল ১০টায় সেই ঘরে, যেখানে তিনি পিতা ও ভাইয়ের ছায়ায় শৈশব থেকে যৌবন, বার্ধক্য ও আনন্দ-বেদনার অনেকগুলো দিন অতিবাহিত করেছেন নিজের জীবনটাকে মহান আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেন। আর কবি জিগারের এই পঙ্ক্তিটি যথাযথ বলেই প্রমাণিত হলো–

عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا

'আজীবনের অস্থিরতা একদম শান্ত হয়ে গেল!'

আমার এই বোনটি নেককার ও ইবাদাতগুজার নারী ছিলেন। একজন লেখিকাও ছিলেন। ভদ্র পরিবারগুলোতে যে বিষয়গুলোকে মেয়েদের গুণ ও যোগ্যতা বলে বিবেচনা করা হয়, এর সবগুলোই তার মাঝে পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল।[১] তিনি 'যাদে সফর'-এর মতো গ্রন্থের লেখিকা ছিলেন, যেটি

---

১. পুরানে চেরাগ ২/৩৬৮

হেজাযের রেডিও স্টেশন থেকে বেশ কবার প্রচার করা হয়েছিল। সম্ভবত এই মর্যাদা ভারতীয় আর কোনো নারীর অর্জিত হয়নি। 'বাচ্চূঁ কী কেসাসুল আম্বিয়া' ও 'হামারে হুজুর সা.'সহ আরও অনেকগুলো গ্রন্থ ও পুস্তিকা তিনি রচনা করেছেন। আমাদের বংশে মহিলাদের মাঝে তাবলীগি সভা ও দাওয়াতের ভিত রচনা করেছেন, যেটি আলহামদুলিল্লাহ আজও পর্যন্ত চালু আছে এবং তার দ্বারা অনেক উপকার হচ্ছে।

তাঁর সঙ্গে আমার যে-সম্পর্ক ছিল, ভাইয়ে-বোনে এমন সম্পর্ক খুব কমই থাকে। আমরা ছয় বছরের ছোট-বড় ছিলাম। আমরা দুজন একসঙ্গে কিতাব অধ্যয়ন করতাম। আমার বিদ্যার্জন ও সাহিত্যরুচির উন্নতিতে তাঁরও অবদান রয়েছে। তাঁরই উসিলায় সীরাত, ইতিহাস, কবিতা ও সাহিত্যের অনেক গ্রন্থের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে এবং তাঁরই সঙ্গে ও তত্ত্বাবধানে আমি সেগুলো অধ্যয়ন করেছি এবং আনন্দ গ্রহণ করেছি। ১৩৬৬ হিজরি মোতাবেক ১৯৪৭ সালের হজ্বে তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন। এই সঙ্গ আমাদের নয় থেকে দশ মাস অব্যাহত ছিল। এই সময়টিতে তাঁর স্বভাব ও চরিত্রের অনেকগুলো উজ্জ্বল দিক ও যোগ্যতা আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়েছে।

কিন্তু তাঁর জীবনগ্রন্থের সবচেয়ে মূল্যবান পাতা ও সবচেয়ে আলোকময় শিরোনাম ছিল তাঁর হৃদয়ের ব্যথা, দু'আর স্পৃহা, মনের অস্থিরতা, চোখের অশ্রুপাত ও দিন-রাতের আহাজারি, যেগুলো বাহ্যত তাঁর বিশেষ জীবনের ফলাফল ছিল বটে; কিন্তু বস্তুত ছিল তাঁর দাসত্ব প্রকাশের গায়েবি উপকরণ এবং তাঁর উন্নতি ও মর্যাদাবুলন্দির অজুহাত।[১]

এখানে দুটি কবিতা না লিখে আমি সামনে অগ্রসর হতে পারছি না–

کب سے لئے کھڑی ہوں میں کاسۂ گدائی　　اب تک ملا نہ مجھ کو اور شام ہونے آئی

بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ کر لے　　میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے

'সেই কখন থেকে আমি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু এখনও পাইনি কিছু। অথচ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ওহে বান্দাপরায়ণ! আমার মিনতির লাজ বাদ দাও। আমার নয় – তুমি তোমার দয়ার লাজ রক্ষা করো।'

---

১. 'পুরানে চেরাগ' ২য় খণ্ডে মরহুমাকে নিয়ে বিস্তারিত যে নিবন্ধটি (৩৪০-৩৬৯ পৃষ্ঠা) লেখা হয়েছে, তাতে কবিতার কিছু নমুনা দেখা যেতে পারে। তাঁর কবিতার সংকলনটি 'বাবে করম' নামে মাকতাবায়ে ইসলাম লাখনৌ প্রকাশ করেছে।

এখানে আমি সাঈদ আল-মালিক নবাব স্যার হাফেয আহমাদ সাঈদ খান নবাব ছাতারির একটি চিঠি উদ্ধৃত করছি, যেটি তিনি তাঁর সেই কবিতাগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমাকে লিখেছিলেন—

'জনাবের দান 'পুরানে চেরাগ' তো বহুদিন আগেই পড়ে শেষ করেছি। আর এখন 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত' শেষ হওয়ার পথে। পুরানে চেরাগ উরদু সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ দ্বারা পরিপূর্ণ বটে; কিন্তু আপনার মরহুমা বোনের আলোচনা দ্বারা আমি যে-পরিমাণ উপকার পেয়েছি, সে আমার জন্য বিরাট এক নেয়ামত। তার দ্বারা আল্লাহর দরবারে আমার আকুতি জানানোর নিয়ম শিখে ফেলেছি। বিশেষ করে আলোচনার শেষে যে-কটি কবিতা রয়েছে, সেগুলো একটি আহত হৃদয়ের আহাজারি, যার ফলে মহান আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় জোশ এসে পড়ে। এটি সেই ব্যথিত হৃদয়ের আকুতি, যার দ্বারা মহান আল্লাহর রহমতের দুয়ার খুলে যায়। এটি সেই ফরিয়াদ, যার মাধ্যমে আল্লাহর দরবার থেকে দু'আ কবুলের সাড়া আসে। আমার এই দীর্ঘ বয়সে এমন বেশ কটি সুযোগই এসেছে যে, আল্লাহ আমাকে হেদায়েতের পথ দেখিয়েছেন। কখনও যারপরনাই মমতার সঙ্গে। একবার আমি লন্ডনে ছিলাম। এমন সতর্কবাণী এল যে, স্বপ্নের মধ্যেই আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, এটিই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত। আমার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছিল এবং আমি কাঁপছিলাম। সেই পুরাতন কাহিনী লিখে আমি আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই যে, 'পুরানে চেরাগ' পাঠিয়ে আপনি আমাকে দু'আ করা শিখিয়েছেন। আল্লাহ আপনাকে এর বিনিময় দান করুন।'[১]

অপর এক পত্রে তিনি লিখেছেন—

'আপনার মরহুমা বোনের সেই কবিতাটি – যাতে বলা হয়েছে, দু'আর লাজ নয় – তুমি তোমার দয়ার লাজ রক্ষা করো – দু'আর সময় আমার মনে পড়ে যায়। আল্লাহপাক দয়া

১. পহেলা ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ রাহাত মনযিল আলীগড়

করে আমার বিপুল গুনাহ সত্ত্বেও দুনিয়া ও আখেরাতে আমার লাজ রক্ষা করুন। আমীন।

আপনার করুণাধন্য

আহমাদ সাঈদ

১৭ মার্চ ১৯৮১'

নবম অধ্যায়

জরুরি অবস্থার সময় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আমার সাক্ষাত এবং একটি ঐতিহাসিক পত্র ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

জরুরি অবস্থা জারির প্রেক্ষাপট

অধিকাংশ পাঠকেরই জানা থাকার কথা যে, ভারতের বর্তমান (তৎকালীন) প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী ১৯৬৭ সাল থেকে পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য রায়বেরেলির আসনটিকে বাছাই করেছিলেন। তার কারণ ছিল, তাঁর স্বামী ফিরোজ গান্ধীও এই আসন থেকেই পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তাঁরই নামে এখানকার ফিরোজ গান্ধী কলেজের নামকরণ করা হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি অতি অনায়াসে জয়লাভ করেছিলেন। আর তখন থেকেই মানুষ ভাবতে শুরু করেছিল, এই আসনে তাতে তাদের জয় একটি নিশ্চিত বিষয়। কিন্তু তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের পাঁচসালা মেয়াদে জনগণের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়, যেগুলো তিনি কংগ্রেস সরকার ও এই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে রেখেছিলেন। তাতে তাঁর জনপ্রিয়তায় ধস নামে। সেই সঙ্গে দেশের ব্যবস্থাপনা দিন-দিন দুর্বল হতে থাকে। সরকার কর্তব্যের কথা ভুলে যেতে থাকে এবং নানা অপরাধ ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে থাকে। তাতে জনগণের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক দুর্বল হতে; বরং ভেঙে যেতে শুরু করে এবং তার ঐতিহ্যবাহী আন্দোলন – যার মস্তক ছিল দেশের স্বাধীনতার অবলম্বন – একটি দলীয় সরকারে পরিণত হয়ে গেল, যার ভাগে সেই সকল অভিযোগ ও তিরস্কার আসতে থাকে। সরকার ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তদুপরি ১৯৭১ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ বিধান চালু করা হলো এবং কঠোরভাবে এই

বিধানের প্রয়োগ শুরু হয়ে গেল। ফলে যখন ১৯৭১ সালের জাতীয় নির্বাচনের সময় এল, তখন দেশের, বিশেষ করে এই আসনটির নির্বাচনি পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টে গেল। কিন্তু তারপরও রায়বেরেলিতে তাঁর জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল ছিল।

১৯৭১ সালের সাধারণ নির্বাচনে রায়বেরেলির আসনে তাঁর মোকাবেলায় মিস্টার রাজা নারায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেন, যিনি তাঁর পুরনো প্রতিপক্ষ ছিলেন। যদিও তিনি তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু তারপরও ইন্দিরাজি এক লাখ দুই ভোটের ব্যবধানে জিতে গেলেন। গণতন্ত্রের একটা দোষ; বরং এ-যুগের বড় ভুলগুলোর মধ্যে একটা ভুল হলো, প্রার্থীর সফলতা ও জনগণের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা প্রতিপক্ষের ওপর তার প্রকাশ্য বিজয় ও ভোটারদের নির্বিচার সিদ্ধান্ত ও তাদের স্বাধীন মতামতের ফলাফল হয়ে থাকে। সবাই জানেন, নির্বাচনে প্রার্থীর হার-জিত খোদ তার নির্বাচন বিষয়ে যোগ্যতা-দক্ষতা, নির্বাচন পরিচালনার অভিজ্ঞতা ও পুঁজির কম-বেশির ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এই নির্বাচনেও রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর সবার এটাও জানা ছিল যে, যদি ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনে জিতে যায়, তাহলে ভোটার ও নির্বাচনি এলাকার জনগণ এর দ্বারা পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাবে।

সাধারণ অবস্থায় যদি এই নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করা না যায়, তাহলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক নিয়মে চলতে থাকে এবং সরকার সহজে পার্লামেন্টারি মেয়াদ পূরণ করে ফেলে। এই নির্বাচনেও এমনটিই আশা ছিল। কিন্তু আশার বিপরীতে মিস্টার রাজনারায়ণ (যিনি খানিক জেদীও ছিলেন বটে) এলাহাবাদের উচ্চ আদালতে মিস্টার গান্ধীর বিরুদ্ধে নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল, এই নির্বাচনে কেন্দ্রের প্রভাব, সরকারি অফিসার এবং বিশেষভাবে উত্তর প্রদেশ সরকারের নানা সুযোগ-সুবিধা অবাধে ও নির্দ্বিধায় ব্যবহার করা হয়েছে। আর এসব বিষয় গণরায়ের ওপর শুধু প্রভাবই পড়েনি; বরং বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে ভোট দিতে তাদের বাধ্য করেছে।

ভারতের আদালতগুলোর বিচারিক কার্যক্রমে ধীরগতি কিংবা সরকারের প্রভাব ও নিয়ম-নীতির ফল ছিল যে, ১৯৭১ সালে এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে মি. রাজনারায়ণের পক্ষ থেকে যে-পিটিশন দাখিল করা হয়েছিল, তার আলোচনা

ও শুনানিতে এত সময় ব্যয় হয়ে গেল বা লাগানো হলো যে, গোটা চারটি বছর কেটে গেল। কিন্তু রাজনারায়ণের সৌভাগ্য বলুন আর ইন্দিরাজির দুর্ভাগ্য বলুন; এই মামলাটি ছিল এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারক জগমোহন লাল সিনহার আদালতে, যিনি আপন সচ্চরিত্রতার বদৌলতে স্থির করে নিয়েছিলেন, কারও দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে শুধু স্বাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে এই মামলাটি নিস্পত্তি করবেন। এটি ছিল স্বাধীনতার পর ভারতীয় আদালতের ইতিহাসে একটি নতুন অভিজ্ঞতা ও ঘটনা। এই মামলার রায় সারা দেশকে; বরং সমগ্র পৃথিবীর প্রচারমাধ্যম ও রাজনৈতিক অঙ্গনগুলোতে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল।

জাস্টিজ জগমোহন লাল ধরে নিয়েছিলেন, এই মামলার রায় প্রদান থেকে বিরত রাখতে তাকে প্রলোভন ও ভয়-ভীতি দেখানোর কোনো পন্থাই বাদ রাখা হবে না। সরকারি ও কংগ্রেসি মহলের জানা হয়ে গিয়েছিল, এই মামলার রায় ইন্দিরাজির বিপক্ষে যাবে। সর্বপ্রথম ইউপি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে তার ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা হলো। যখন এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো, তখন আবেদন জানানো হলো, মামলাটি বিলম্বিত করে দেওয়া হোক, যাতে প্রধানমন্ত্রী তাঁর নির্ধারিত রাষ্ট্রীয় সফরগুলো সম্পন্ন করে ফেলতে পারেন। একজন পার্লামেন্ট সদস্যের মাধ্যমে তাকে পাঁচ লাখ রুপির প্রস্তাব করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সুপ্রিম কোর্টে জজ বানানোর প্রলোভন দেখানো হয়েছে। কিন্তু কোনো কিছুই তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

এসব প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে তিনি নিজের বাসভবনও বদলে ফেললেন। তিনি কোর্ট রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে ঘোষণা করিয়ে দিলেন ১২ জুন মামলার রায় ঘোষণা করা হবে। এতটুকু রেয়াত করলেন যে, গুজরাট এ্যাসেম্বলির নির্বাচনের কারণে ৮ জুনের আগে রায় ঘোষণা থেকে বিরত থাকলেন, যাতে এই নির্বচনের ওপর মামলার রায় কোনো প্রভাব ফেলতে না পারে। ১২ জুন শেষ মুহূর্ত দিল্লির সেক্রেটারিয়েটের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকল।

কিন্তু অবশেষে তিনি ১২ জুন বেলা ১০ টায় হঠাৎ আদালতে এসে এই মামলার ২৫৮ পৃষ্ঠার রায়ের বিশেষ-বিশেষ অংশ পড়ে শোনালেন। পরে ঘোষণা করলেন, পিটিশনটি গ্রহণ করা হলো। দুই মিনিটের মধ্যে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, মিস্টার ইন্দিরা গান্ধী তাঁর আসন হারিয়ে ফেলেছেন। তারপর

এই খবরও প্রচার করা হলো যে, আগামি ছয় বছর পর্যন্ত তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকবেন ।[১]

জরুরি অবস্থা জারি

এই রায়ের পর মিস্টার গান্ধীর সামনে মাত্র দুটি পথ খোলা ছিল । এক ছিল, তিনি সরকার থেকে সরে গিয়ে পদত্যাগ করবেন । দ্বিতীয়ত তিনি সুপ্রিম কোর্টে আপিল করবেন । তিনি দ্বিতীয় পথটি অবলম্বন করলেন । বিরোধী দলগুলো সুপ্রিম কোর্টে তার বিরোধিতা না করার সিদ্ধান্ত নিল । কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে প্রবল চাপ ছিল, নৈতিক কারণে আপনার পদত্যাগ করা উচিত । শুধু কম্যুনিস্ট পার্টি পদত্যাগের বিরোধী ছিল । সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আয়ার রায় দিলেন, মিস্টার গান্ধীর বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বে-আইনি কাজ বা অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি । তিনি রায় ঘোষণা করলেন, মিস্টার গান্ধী যথারীতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ করতে পারবেন, আলাপ-আলোচনায়ও অংশ নিতে পারবেন; কিন্তু লোকসভায় তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না, যতক্ষণ-না সুপ্রিম কোর্ট তাঁর আপিল গ্রহণ করবে ।

এভাবে যদিও তাঁর আসন নিরাপদ থাকল; কিন্তু বিরোধী দলগুলোর (যারা জে প্রকাশ নারায়ণজির নেতৃত্বে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল) বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের জোর এত বেড়ে গিয়েছিল যে, মিস্টার গান্ধীর বিশেষ উপদেষ্টাবৃন্দ ও সমর্থকগণ তাঁকে পরামর্শ দিতে বাধ্য হলেন যে, ইন্টারনাল ইমারজেন্সি জারি করা ব্যতীত আপনার ক্ষমতায় টিকে থাকার আর কোনো বিকল্প নেই ।[২] ফলত ২৫ জুন বেলা ১১ টা ২৫ মিনিটে প্রেসিডেন্ট জরুরি অবস্থা জারির ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন । ঘোষণায় বলা হয়, দেশের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কারণে ভারতের শান্তি ও নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন । এই ঘোষণার মাধ্যমে সরকারকে সংবাদপত্রের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ ও মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পথ বন্ধ করার অধিকার দেওয়া হয় । 'misa'-এর আইন এবং আদালতি প্রক্রিয়া ব্যতীত যে-কাউকে গ্রেফতারের অধিকার সরকারের পূর্ব থেকেই ছিল ।

---

১. কুলদিপ নায়ার রচিত গ্রন্থ the judgement-এর অধ্যায় towards dictatorship পৃষ্ঠা ৩৩
২. কুলদিপ নায়ার রচিত গ্রন্থ the judgement-Gi Aa¨vq towards dictatorship পৃষ্ঠা ৩৩

পরদিন (২৬ জুন) সকালে কেবিনেটের বৈঠক তলব করা হলো। এই বৈঠকে কেবিনেটকে ইমারজেন্সি জারির বিষয়টি অবহিত করা হলো। ততক্ষণে জে প্রকাশ নারায়ণ, মুরারহি ও অন্য অনেক বিরোধী নেতাকে গ্রেফতার করে ফেলা হয়েছে। সেদিন দিল্লির বেশিরভাগ পত্রিকা প্রকাশ হতে পারেনি। কারণ, রাতেই পত্রিকা অফিসগুলোর বিদ্যুত লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। সরকারিভাবে ৬৭২ ব্যক্তিকে গ্রেফতারির খবর প্রকাশ করা হয়েছে। প্রদেশগুলোতেও ধরপাকড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিদেশি পত্রিকাগুলো বিশেষভাবে ইমারজেন্সি জারির বিষয়টির সমালোচনা করে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। একমাত্র রুশ পত্রিকা 'প্রাউদা' একে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর বিজয় বলে মন্তব্য করেছে।

ইন্দিরা গান্ধীর ছোট ভাই সঞ্জয় গান্ধী (যার বয়স ছিল তখন সবে ২৮ বছর এবং তখনও তিনি লেখাপড়া শেষ করেননি) – যে কিনা জরুরি অবস্থার আগেও বেশ তৎপর ছিল – সে সময় হঠাৎ করেই ভারতের রাজনীতি ও শাসনক্ষমতার আকাশে একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে সামনে চলে আসেন।[১] সারা দেশের মানুষ দেখল, তিনিই উপমহাদেশের অধিবাসীদের এক ধরনের ভাগ্যনিয়ন্তা ও মান-সম্মানের মালিক হয়ে গেছেন (যাদের মাঝে বড়-বড় গুণী-জ্ঞানী, দেশের প্রাক্তন শাসকমণ্ডলি, নিঃস্বার্থ ও নির্দোষ সেবক, বড়-বড় ত্যাগী নেতারাও আছেন। আছেন দেশের বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরাও) এবং দেশে একমাত্র তারই আদেশ-নিষেধ চলছে। ওয়াশিংটন পোস্টের লুইস এম শিমন সঞ্জয় গান্ধী ও তার মাকে নিয়ে লেখা এক নিবন্ধে তথ্য প্রকাশ করেন, ইন্দিরা গান্ধীর এখন তার মন্ত্রিপরিষদের সহকর্মীদের ওপর কোনো আস্থা নেই। ফলে তিনি এখন শুধু সঞ্জয় গান্ধীর ওপর নির্ভর করে দেশ চালাচ্ছেন। সঞ্জয় যা-কিছু করছেন, তাতে তার

---

১. আল্লাহর শান দেখুন। ১৯৮০ সালের ২৩ জুন আমি বোম্বাই থেকে লাখনৌ আসছিলাম। গাড়িটা বোধহয় হাওড়া স্টেশনে এসে থামল। তখন আমাদের ফার্স্ট ক্লাশের এক সহযাত্রী হিন্দু অফিসার কোনো এক প্রয়োজনে স্টেশনে নামলেন। ফিরে এসে তিনি চুপিচুপি বললেন, স্টেশনে বলাবলি হচ্ছে, সঞ্জয় গান্ধী বিমান দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। তখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে তার মৃত্যুর নিশ্চিত কোনো সংবাদ ছিল না। আমি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে সাবধানতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিলাম। গাড়ি যখন পরবর্তী স্টেশনে গিয়ে থামল, তখন স্টেশনের বাইরে শোকমিছিল বের হচ্ছিল, যার দ্বারা আমরা বিষয়টি নিশ্চিত হলাম।

কোনো জবাবদিহি করতে হচ্ছে না। ইন্দিরাজির কাছে কোনো বিষয়ে অভিযোগ করা হলে তিনি বলে দিচ্ছেন, সঞ্জয়কে বলুন।

সঞ্জয় গান্ধীর সবচেয়ে বড় যোগ্যতা ছিল, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন এবং পরে তাকে কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হতেন। যৌবনের জোশে এবং মেজাজি চরিত্রের কারণে তিনি কোনো প্রকার ছাড় দেওয়া, সুবিধা প্রদান ও দয়া-অনুকম্পার পক্ষপাতী ছিলেন না। অন্যথায় তার মাঝে একজন রাজনৈতিক নেতা কিংবা প্রবীণ একনায়কের মতো কোনো প্রকার অভিজ্ঞতা বা বিশেষ কোনো যোগ্যতা ছিল না। তার সখের ময়দান ছিল দুটি। নগরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সাজগোজ আর পরিবার-পরিকল্পনার কর্মসূচির কঠোর বাস্তবায়ন। ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে তুর্কমান গেটের হতভাগ্য জনবসতিটি তার প্রথম সখের টার্গেটে পরিণত হলো, যার বেশিরভাগ অধিবাসী ছিল মুসলমান। মোগল আমল থেকে এই মহল্লায় অনেকগুলো আদি পরিবার বাস করত। সেগুলোর মধ্যে বড়-বড় ভবনও ছিল, ছোট-ছোট ঘরও ছিল। কয়েকটি আধুনিক টাইপের বাড়ি এবং এসি বিল্ডিংও ছিল। মানুষের মাঝে গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল, এই এলাকাটিকে পুরোপুরি গুড়িয়ে দেওয়া হবে। জনগণ এই পরিকল্পনা ঠেকানোর জন্য তার কাছে আবেদন জানাল। তিনি শর্ত দিলেন, তোমরা জন্মনিরোধের জন্য ভিসেকটমি করাতে সম্মত হও। জনতা বাধ্য হয়ে ভিসেকটমি করাতে দুশো একজন লোক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ১৯ এপ্রিল ১৪ টি বুলডোজারের মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলের বাড়িগুলো গুড়িয়ে দেওয়া শুরু হলো। মহিলারা চিৎকার জুড়ে দিল। শিশুরা কান্নাকাটি করতে লাগল। পুরুষরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এক হাজার বাড়ি গুড়িয়ে দেওয়া হলো। এই অভিযানে একশো পঁচিশজন মানুষ প্রাণ হারাল এবং সাতশো গ্রেফতার হলো। কিন্তু পত্রিকাগুলোতে এ ব্যাপারে একটি শব্দও প্রচার হলো না।[১]

দিল্লি জামে মসজিদের আশপাশে মুসলমানরা ঝুঁপড়ির মতো অনেকগুলো ঘর ও দোকান তৈরি করে বসবাস ও ব্যবসা করত। ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে ওখানেও এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কর্নাল, রোহাতক, ভেওয়ানি ও গুড়গাঁও-এর কয়েকটি এলাকা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। কুলদিপ নায়ারের অনুমান হলো, শুধু লাখনৌতে দশ হাজার

---

১. তুর্কমান গেটের বিস্তারিত জানতে the judgement-এর ১৩৮-১৪০ নং পৃষ্ঠা পড়ুন

ভবন ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।[১] শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে একের পর এক অভিযোগ আসছিল যে, উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে এবং তারা তীব্র শীতের মধ্যে খোলা মাঠে পড়ে আছে। তিনি মুহাম্মাদ ইউনুস খানকে তদন্তের জন্য দায়িত্ব প্রদান করেন। কিন্তু তার রিপোর্ট অনুযায়ী কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি।

ভিসেকটমির আইন কার্যকর করতে গিয়ে অত্যন্ত নির্দয় ও নির্মম আচরণ করা হয়েছে। মুজাফফর নগর ও সুলতানপুরে পাশবিক কায়দায় এই আইন বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং প্রতিবাদকারী কিংবা বাড়ি-ঘর ছেড়ে পলায়নকারীদের অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। কোনো-কোনো গ্রামের লোকেরা প্রবল শীতের মধ্যে রাতের পর রাত ক্ষেতে-খামারে লুকিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছে। মানুষ দিল্লি ও বড়-বড় শহরে যেতে এমনভাবে ভয় পেত, যেমন একজন অপরাধী থানায় যেতে কিংবা খারাপ ছাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে ভয় পায়। এই আইনের বাস্তবায়নে বয়স, স্বাস্থ্য, পদমর্যাদা, বিবাহিত-অবিবাহিত কিছুরই তোয়াক্কা করা হয়নি। গোটা পরিবেশে ভীতি ও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ১৮৫৭'র দাঙ্গার পর ইংরেজ বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণের ফলে এদেশের মানুষ যে ধরনের অপমান, দাসত্ব ও অসহায়ত্ব অনুভব করেছিল, ঠিক তেমন একটা অবস্থা ও পরিস্থিতি সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হতে শুরু করেছিল।

লেখকের ইন্দিরাজির সঙ্গে সাক্ষাত ও খোলা চিঠি

আতঙ্ক ও অস্থিরতার এই পরিবেশ থেকে দেশের একটা পল্লী-গ্রামও মুক্ত ছিল না। ১৯৭৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর আমি কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে – যাদের মধ্যে নদওয়াতুল উলামার নায়েবে নাযেম স্নেহাস্পদ মৌলভী মুঈনুল্লাহ নদভী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য – জামাতে ইসলামী লাখনৌর আমীর স্নেহাস্পদ মৌলভী আবদুল গাফফার সাহেব নদভীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, যিনি ইমারজেন্সিতে লাখনৌ ডিস্ট্রিক জেলে ছিলেন। সে সময় রিপর্মিটরি এরিয়ায় প্রায় তিনশো রাজবন্দী অবস্থান করছিলেন এবং তাদের অধিকাংশের পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব তখন দেখা করতে এসেছিল। তখন মুসলিম ও অমুসলিম মিলে বিশজন কয়েদি মৌলভী আবদুল গাফফার

---

১. the judgement পৃষ্ঠা : ১৩৮-১৪০

সাহেবের কাছে এসে সমবেত হলো। সে সময় বেশ কজন বিশিষ্ট ও শিক্ষিত ব্যক্তি – যাদের মাঝে কয়েকজন অমুসলিম আইনজীবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল – আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একজন নিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে যেন আমি ইন্দিরাজির সঙ্গে সাক্ষাত করি এবং দেশকে ধ্বংসের সেই পথ থেকে উদ্ধার করি, যার ওপর দেশ বর্তমানে দ্রুতগতিতে ছুটে চলছে।

তাদের এই চিন্তার পেছনে সম্ভবত এই ধারণাটি-ই কাজ করেছিল যে, আমি একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তদুপরি বিদেশের সঙ্গে, বিশেষ করে আরব দেশগুলোর সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক আছে এবং ওখানে আমি কয়েকটি সংগঠন, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন রাবেতা আলমে ইসলামীর একজন বুনিয়াদি রোকন। এ ছাড়া আমি রায়বেরেলির এমন একটি সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সদস্য, যার গোটা জেলাজুড়ে দ্বীনি প্রভাব বিদ্যমান। আর তাদের জানা ছিল, নির্বাচনি রাজনীতির মাঠের একজন খেলোয়াড় ভোটের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী দূরতম কোনো সম্ভাবনাকেও উপেক্ষা করতে পারেন না।

তাদের কথায় আমিও ওজন দেখতে পেলাম। মাথায় চিন্তা এল, এই প্রচেষ্টার সুফল যতটাই ক্ষীণ হোক-না কেন; আমি তো জাতির একজন বিবেকবান সদস্য, ভারতের একজন সচেতন নাগরিক। সর্বোপরি একজন আলেমে দ্বীন হিসেবে এই চেষ্টা অবশ্যই করা দরকার। এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার যে, ভিসেকটমি পরিকল্পনায় কতিপয় আলেমের কাছ থেকে সমর্থনমূলক ফাতাওয়া গ্রহণ করা হয়েছিল এবং প্রমাণ করা হয়েছিল, এতে নৈতিক ও ধর্মীয় যে-সমস্যা দেখানো হয়েছে, সেটি সঠিক নয়। কৌশলে আমার অঙ্গনেও এই প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। একবার প্রেসিডেন্ট ফখরুদ্দীন আলী আহমাদ সাহেব লাখনৌ এসেছিলেন এবং গভর্নর হাউজে গভর্নর সাহেব ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শিয়া-সুন্নী আলেমদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। নগরীর ডেপুটি কমিশনার আমাকেও এর সংবাদ জানালেন এবং দারুল উলূমে আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁর বার্তা পৌঁছালেন। আমি প্রেসিডেন্ট সাহেবের নামে একটি পত্র লিখে মাওলানা আবুল ইরফান নদভীর মাধ্যমে (যার সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট সাহেব ব্যক্তিগতভাবে অবহিত ছিলেন) পাঠিয়ে দিলাম। তাতে আমি লিখেছি, আমি আপনার সঙ্গে আলাদাভাবে

দেখা করতে পারি। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এই সাধারণ সভায় – যেখানে শান্তভাবে কথা বলা যাবে না – আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আমি কোনো সার্থকতা দেখতে পাই না।

বৈঠক বসল। গভর্নর সাহেব ও দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে যখন নাম উল্লেখ করে-করে হাজিরি নেওয়া শুরু হলো এবং আমার নাম এল, তখন ফখরুদ্দীন আলী আহমাদ সাহেব বললেন, মাওলানার ব্যক্তিগত পত্র আমার কাছে এসেছে। তিনি এই সভায় না আসার যুক্তিসঙ্গত অজুহাত ব্যক্ত করেছেন এবং পরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন।

একবার অল ইন্ডিয়া রেডিওর প্রতিনিধিদলও দিল্লি থেকে লাখনৌ এলেন এবং এ ব্যাপারে আমার সমর্থন নিতে চাইলেন। কিন্তু আমি তাদের সুযোগ দেইনি এবং তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন।

ইন্দিরাজির সঙ্গে সাক্ষাত ও পত্র

জেলের আলোচনার পর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, প্রধানমন্ত্রীর ইন্দিরাজির সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতের জন্য আমি সময় চেয়ে আবেদন জানাব। এর জন্য আমি দুবার তাঁকে ডাকযোগে পত্র লিখলাম।[১] একবার মৌলভী ইসহাক জালীস নদভীকে দিল্লি পাঠালাম যে, আপনি গিয়ে মুহাম্মাদ ইউনুস খানের সঙ্গে দেখা করুন, খান আবদুল গাফফার খান সাহেবের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে যিনি ইন্দিরাজির একান্ত ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন। কিন্তু তারও কোনো সুফল এল না এবং আমি সেক্রেটারিয়েট থেকে সময় নির্ধারণের কোনো সংবাদ পেলাম না।

১৯৭৬ সালের ২৩ আগস্ট। আমি জোহর নামাযের জন্য মসজিদে যেতে ঘর থেকে বের হলাম। তখন জানতে পারলাম, এস.ডি.এম সাহেব আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। দেখা হলে তিনি জানালেন, আমাকে কালেক্টার সাহেব পাঠিয়েছেন। তিনি দিল্লি থেকে বার্তা পেয়েছেন, মাওলানাকে প্রাইম মিনিস্টার আগামী কাল রাষ্ট্রপতি ভবনে লাঞ্চে অংশগ্রহণের নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রেলমন্ত্রী মি. শফী কুরাইশি নির্দেশনা জারি করেছেন, আজই যেন তাঁর দিল্লি সফরের সব আয়োজন সম্পন্ন করা হয়। আমি আপনাকে বিষয়টি অবহিত করতে এসেছি।

---

১. '৭৬ সালের শুরুর দিকে আমাকে সৌদি আরব ও মরক্কো সফরে যেতে হয়েছিল। ফিরেছি মে মাসে। সেজন্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রচেষ্টা জুনের গোড়ার দিকে শুরু হয়েছিল।

আমি চিন্তা করলাম, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের একটি পথ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এর দ্বারা আমাকে উপকৃত হতে হবে এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য আলাদা সময় চেয়ে নিতে হবে। আমার আগ-পিছ কিছুই জানা ছিল না এই নিমন্ত্রণের পেক্ষাপট কী। আমি তাকে বললাম, আমি অসুস্থ মানুষ; একা সফর করতে পারি না। (এটি চোখের অপারেশনের আগের ঘটনা। দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণে কাছের কোনো সফরও একা করতে পারতাম না) তাই আমার দুজন সফরসঙ্গী দরকার। একজন আবদুর রাযযাক, যে কিনা আমার ঔষধ-পথ্যাদি ও রুটিন সম্পর্কে অবহিত। অপরজন আমার ভাগিনা মৌলভী সাইয়িদ মুহাম্মাদ রাবে' নদভী, যিনি আমার সহযোগী ও উপদেষ্টা। তিনি আমার এই প্রস্তাব মঞ্জুর করে নিলেন এবং সফরের আয়োজনের জন্য চলে গেলেন।

সৌভাগ্যক্রমে দিনকতক আগেই হঠাৎ আমার মাথায় চিন্তা এল, হতে পারে, আমি তাৎক্ষণিক কোনো ডাক পেয়ে যাব। তাই ইন্দিরাজির নামে একটি পত্র আগেই প্রস্তুত করে রাখা দরকার। আমি তাকিয়া মসজিদে বসে উরদুতে একটি সবিস্তার পত্র লেখালাম এবং ইংরেজি অনুবাদের জন্য সেটি ডক্টর আসেফ কুদওয়ায়ির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও কোনো-কোনো সময় রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের ফলে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য বক্তব্যটি আগে থেকেই লিখে রাখা দরকার। কারণ, অনেক সময় মতামত ব্যক্ত করার পুরোপুরি সুযোগ পাওয়া যায় না এবং অপর পক্ষের সামনেও চিন্তা-ভাবনা করার এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বক্তব্য লিখিত থাকা আবশ্যক। আমি তখনই লাখনৌ টেলিফোন করালাম যে, আমি জনতা এক্সপ্রেসে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। অনুবাদ কপিটি আমাকে স্টেশনেই পেয়ে যাওয়া দরকার।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সরকারি জিপ এসে পড়ল। আমার এই আশঙ্কাও ছিল যে, হয়তবা দিল্লি থেকে নিজ বাড়িতে যেতে না দিয়ে আমাকে সরকারি মেহমান বানিয়ে নেওয়া হবে। সেজন্য আমি পরিবারের লোকদেরও এ ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়ে রাখি। জিপের সঙ্গে সরকারি অফিসারও এলেন। আমি জিপে যখন তার সঙ্গে বসে রওনা হলাম, তখন নগরীর অনেকে মনে করেছিল, সম্ভবত সরকার আমাকে হেফাযতে নিয়ে গেছে। আর ইমারজেন্সির

এই পরিবেশে এমনটা ঘটা অসম্ভব কিছু ছিল না। পথে আমি জানতে পারলাম, আমার জন্য প্রতাপগড় স্টেশনকে নির্দেশনা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফার্স্ট ক্লাশের একটি কম্পার্টমেন্ট যেন আমার জন্য রিজার্ভ রাখা হয়। আমি সংশ্লিষ্ট অফিসারকে বললাম, আমি সাধারণত থার্ড ক্লাশ থ্রি টায়ারে ভ্রমণ করি। তিনি বললেন, এখন নতুন আয়োজন কঠিন হবে। কিন্তু এর জন্য আমি তাকে পীড়াপীড়ি করলাম এবং বললাম, এটি আমার নীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার।[১] স্টেশনের কর্মকর্তারা এ-ব্যাপারে অবহিত ছিলেন এবং রেলওয়ের দায়িত্বশীলগণ আমাকে আরামের সঙ্গে ভ্রমণ করানোর জন্য সব সময় তৎপর ছিলেন। আমি বললাম, রেলওয়ের অফিসার ইচ্ছা করলে থ্রি টায়ারে আমার জন্য তিনটা সিটের ব্যবস্থা করা কঠিন কিছু নয়। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তার ব্যবস্থা হয়ে গেল আর আমরা রওনা হয়ে গেলাম। লাখনৌ স্টেশনে স্নেহাস্পদ মৌলভী মুঈনুল্লাহ চিঠির অনুবাদ কপি নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। পরদিন গাড়ি দিল্লি পৌঁছলে রেলমন্ত্রী কুরাইশি সাহেবের একজন প্রতিনিধি স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে প্রাইম মিনিস্টারের আমন্ত্রণপত্র দিলেন, যার দ্বারা আমি জানতে পারলাম, দুপুরে রাষ্ট্রপতি ভবনে মৌরুতানিয়ার প্রেসিডেন্টের সম্মানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। সম্ভবত আরবি জানা ও ইসলামি দুনিয়ার সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্কের কারণে এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকবে। অথবা হতে পারে, এই প্রক্রিয়ায় তিনি আমাকে কাছে টানতে ও আপন করে নিতে চাচ্ছেন।

আমি যথারীতি নেহরু ইউনিভার্সিটি দিল্লির প্রফেসর মৌলভী সাইয়িদ আবুবকর হাসানির কাছে গিয়ে অবস্থান নিলাম। পরে মুহাম্মাদ রাবে'কে নিয়ে যথাসময়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছে গেলাম। ইন্দিরাজি তখনও এসে পৌঁছাননি। আমি একটা খালি জায়গা দেখে বসে পড়লাম। জানতে পারলাম, আমার একেবারে কাছে বসা লোকটি কংগ্রেস প্রধান মিস্টার বরুয়া। আমি তার সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন হয়ে পড়লাম। সে সময় আমার দৃষ্টিশক্তি খুব দুর্বল ছিল। হঠাৎ রাবে' বলে উঠল, মামুজি! প্রাইম মিনিস্টার আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁকে আদাব জানালাম এবং তাঁকে উদ্দেশ

---

১. অবশ্য পরে রেলওয়ের অব্যবস্থাপনা আর নিজের অক্ষমতার কারণে ব্যক্তিগত সফরও সাধারণ অবস্থায় ফার্স্ট ক্লাশে করতে শুরু করি।

করে কথা বলতে শুরু করলাম। বললাম, রেজিষ্ট্রি ডাকে আমি আপনাকে কয়েকখানা পত্র পাঠিয়েছিলাম, যেখানে আমি আপনার কাছে সাক্ষাতের সময় চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি এ-ব্যাপারে অজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। আমি বললাম, ঠিক আছে; এখন সময় দিন; আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কিছু কথা আছে। তিনি বললেন, আপনি কি কাল পর্যন্ত থাকবেন? আমি বললাম, এ-কাজের জন্য প্রয়োজন হলে থাকতে পারি। রমযান শুরু হতে আর দুদিন বাকি ছিল। কিন্তু আমি থাকা আবশ্যক মনে করলাম। তিনি দিল্লিতে আমার ঠিকানা জানতে চাইলেন এবং টেলিফোন নম্বর নিলেন। তারপর বললেন, আজই আপনাকে সাক্ষাতের সময় জানিয়ে দেওয়া হবে।

ঘটনাক্রমে সভায় আরবিজানা কোনো লোক ছিল না। আর মৌরুতানিয়ার প্রেসিডেন্ট আরবি ছাড়া আর জানতেন শুধু ফরাসি ভাষা। ইন্দিরাজি একজনকে ইঙ্গিত করলেন, আমাকে যেন তাঁর কাছে নিয়ে বসানো হয়। আমি যখন আরবিতে কথা বলা শুরু করলাম, তখন তিনি খুবই প্রীত হলেন এবং আমাকে আপন করে নিলেন। আমাকে তিনি মৌরুতানিয়া যাওয়ার দাওয়াত দিলেন।

আহার শেষে যখন আমি অবস্থানের জায়গায় চলে গেলাম, তার কয়েক মিনিট পরই সেক্রেটারিয়েট থেকে ফোন এল, প্রাইম মিনিস্টার কাল তিনটায় তাঁর অফিসে আপনাকে সাক্ষাত দেবেন। আমি নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে গেলাম। অফিসে তিনি একা ছিলেন। আলোচনা শুরু হলো। আমি পত্রখানা তাঁর সম্মুখে রাখলাম। তিনি বললেন, আমি দেখব। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা ছিল, ব্যস্ততার কারণে এমন প্রতিশ্রুতি আর পালন করা হয় না। এ-ধরনের চিঠি পরে আর পড়া হয় না।[১] তাই আমি বললাম, মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগবে। আপনি এখনই পড়ে নিন। তিনি ওখানেই পত্রখানা পড়ে নিলেন। তারপর আমার আলাপ শুরু হলো।

সেই আলোচনাটির সারমর্ম উপস্থাপন করার আগে আমি পাঠকদের পত্রখানা পড়িয়ে নিচ্ছি। তার আগে সবার জ্ঞাতার্থে বলে রাখছি, কোনো লেখার বিষয়বস্তুর আন্তরিকভাবে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য জরুরি হলো

---

১. একবার বাদশাহ ফয়সাল মরহুমের সঙ্গেও এ-রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। তিনি আমার সামনেই দীর্ঘ পত্রখানা খুলে পুরোটা পড়লেন এবং তারই আলোকে আলোচনা শুরু করেছিলেন।

শ্রোতা কিংবা পত্র প্রাপককে মনস্তাত্ত্বিকভাবে এই মর্মে সচেতন করে তুলতে হবে যে, এই লেখা বা পত্রে বৈধতার সীমানা রক্ষা করে শ্রোতার সঙ্গে সুবিচার করা হয়েছে, তার শ্রম ও প্রচেষ্টার যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রতি কোনো হতাশা বা কুধারণার প্রকাশ করা হয়নি। আমার এই পত্রের ভূমিকাটিও সেই মনস্তাত্ত্বিক নীতি ও দাওয়াতের কৌশল রক্ষা করেই লেখা হয়েছে। এখানে আমি পত্রখানা হুবহু তুলে ধরছি–

'মুহতারামা ইন্দিরা গান্ধী!

প্রধানমন্ত্রী ভারত

'আমি দীর্ঘদিন যাবত আপনার খেদমতে হাজির হয়ে আমার মনের আকুতি ও চিন্তাধারা ব্যক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম। গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমি একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা করেছিলাম যে, দিল্লিতে কিংবা আপনার পছন্দমতো অন্য কোনো জায়গায় অল্প সময়ের জন্য হলেও আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হোক। এর জন্য একখানা রেজিষ্ট্রি পত্রও আমি আপনার বরাবর প্রেরণ করেছিলাম। একে আমি দেশের জন্য উপকারী ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক কর্তব্য মনে করতাম। কিন্তু সেই পত্রের কোনো উত্তর আমি পাইনি। তখনকার তুলনায় এখনকার পরিস্থিতি আরও বেশি নাজুক ও হতাশাব্যঞ্জক। সেজন্য আমি পুনরায় চেষ্টা করেছি। এখন আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে সেই সুযোগ প্রদান করেছেন। আমি ভালো মনে করেছি, মৌখিক আলোচনা ছাড়াও কিছু কথা আপনাকে লিখিত আকারে উপস্থাপন করব, যাতে আপনি ঠাণ্ডা মাথায় তার ওপর চোখ বোলাতে পারেন।

'আমি প্রথমে একনিষ্ঠ মনে সেই সফলতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যেটি আপনি গোষ্ঠীগত দাঙ্গা, আইন-শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি ও সন্ত্রাস দমনে অর্জন করেছেন,[১] যেগুলো

১. এগুলো প্রথমবারের প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণের পরের ঘটনা। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, ১৯৮০ সালের পর বড়-বড় যেকটি দাঙ্গা আত্মপ্রকাশ করেছিল, (যেগুলোর মধ্যে মুরাদাবাদে ঠিক ঈদের নামাযের সময় সংঘটিত হয়েছিল, সেটি সবচয়ে বেশি

এই দেশটির সব ধরনের উন্নতি এবং বিশ্ববাসীর সামনে নিজের সঠিক অবস্থান তৈরি করে নেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায় ছিল এবং যেগুলো দেশে একটা অনিশ্চয়তা ও অনাস্থার পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিল। অনুরূপভাবে দেশের ব্যবস্থাপনা মেশিনারিতে আপনি যে-চাঞ্চল্য ও গতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তাও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য, যেটি দীর্ঘদিন পর এই দেশে সৃষ্টি হয়েছে।

'ধর্ম ও চরিত্রের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, জাতি-গোষ্ঠীর ইতিহাসের একজন সত্যিকার ছাত্র হিসেবে যদিও আমি এই আশাবাদ ব্যক্ত না করে পারি না যে, আপনি যদি সরকার পরিচালনায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি ভারতীয়দের হৃদয়গুলোকে স্পর্শ করা, তাদের মাঝে গভীর পরিবর্তন সাধন, দায়িত্ব সচেতনতা সৃষ্টি, মানবতাকে সম্মান ও মর্যাদাদানের স্পৃহা তৈরি, সত্যিকার দেশপ্রেমের অধিকতর গভীর ও ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হতো, তাহলে এর চেয়েও বেশি সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদী সফলতা অর্জিত হতো। এ ক্ষেত্রে আপনার বাধ্যবাধকতা ও সমস্যাবলির অনুভূতি আমার আছে, এত বড় একটি দেশের এই নাজুক পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দিতে ও পরিচালনা করতে গিয়ে আপনি যেগুলোর মুখোমুখি হচ্ছেন। কিন্তু শুরু থেকেই আমি আপনার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে মনে করে আসছি, আল্লাহ্ আপনাকে যে অসাধারণ যোগ্যতা, সঠিক প্রত্যয় ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দান করেছেন, তার দ্বারা আপনি এই সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাগুলোকে জয় করে নিতে পারেন।

'আমি শুরু থেকেই মনে করে আসছি, জরুরি অবস্থার মধ্যে বিপুলসংখ্যক মানুষের গ্রেফতারি, প্রচারমাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর (যেটি শুরু থেকেই এ-দেশের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়ে আসছে) নিষেধাজ্ঞা আারোপ করা

বেদনাদায়ক) সেগুলোর ক্ষেত্রে তিনি একজন দায়িত্বশীলের পরিচয় দিতে সক্ষম হননি।

আপনার মেজাজ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পারিবারিক ঐতিহ্য ও মূল চেতনার একদম পরিপন্থী। আর আপনি নিতান্তই সাময়িকের জন্য অপারগতাবশত এই পথটি অবলম্বন করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, দেশের পরিস্থিতি যখন ঠিক হয়ে যাবে, তখন আর এর কোনো আবশ্যতা থাকবে না। তখনই আপনি এই ইমারজেন্সি প্রত্যাহার করে নেবেন। তার সঠিক সময় ও সীমা তারাই করতে পারবেন, যারা ভেতরগত অবস্থা ও দেশের বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত। আর এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে আপনার ওপর আস্থা রাখা উচিত।

'কিন্তু একথা বলতে কোনো দোষ নেই যে, আমাদের প্রত্যেকের বাসনা হলো, সেই সময়টি তাড়াতাড়ি চলে আসুক, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাক। মানুষ মত প্রকাশের সেই স্বাধীনতা পেয়ে যাক, যা নিয়ে আমরা বিদেশিদের কাছে গর্ব করে থাকি। আর জীবনের সেই উষ্ণতা ও কোমলতা অনুভূত হোক, যেটি একটি জীবন্ত দেহের বৈশিষ্ট্য, লক্ষণ, জীবনের স্বাদ ও মূল্য। এ ক্ষেত্রে আমি একথাটি বলার জন্য আপনার অনুমতি কামনা করছি যে, আপনার অজান্তে ও ইচ্ছার বাইরে এসব গ্রেফতারিতে খুব অসাবধানতা ও বাড়াবাড়ি হয়েছে। ভদ্রতাবিবর্জিত ও স্বার্থপর কিছু লোক এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি থেকে অন্যায় স্বার্থ উদ্ধার করেছে এবং অনেক নিরপরাধ মানুষ গ্রেফতার হয়েছেন। হাজার-হাজার; বরং লাখ-লাখ নির্দোষ মানুষ এই অভিযানে নিগ্রহের শিকার হয়েছেন, যারা দিনরাত আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছেন। দেশ যে-রকম নৈতিক অধঃপতনের পথে চলছে, বিবেক যতটা অনুভূতিহীন ও মৃত হয়ে গেছে, সেই হিসেবে এমন আচরণ না স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারা অসম্ভব, না জনসাধারণের দ্বারা। এ ক্ষেত্রে আমি আপনাকে বড় রকম মজলুমও মনে করছি যে, প্রশাসনের দায়িত্বশীলগণ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় আপনার খুব বদনাম করেছে। ভারতের জনগণ – যারা সব সময় ভালবাসার মূল্যায়নকারী; বরং পুজারির ভূমিকা পালন করে

আসছে – আপনাকে এ দেশের না শুধু সবচেয়ে বড় ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্ব মনে করছে; বরং আপনার কাছে তারা আশা রাখছে যে, তাদের বেলায় আপনি একজন মমতাময়ী মা বলে প্রমাণিত হবেন। আর অনেকগুলো কারণে তাদের এই প্রত্যাশা যুক্তিসঙ্গতও বটে। আহ! আপনি যদি সেই নিষ্পাপ শিশু আর নির্বাক মায়েদের আহাজারি শুনতে পেতেন, যাদের বহুসংখ্যক নিরপরাধ আত্মীয়-আপনজন ও পৃষ্ঠপোষক কারাগারে আটক রয়েছে এবং তাদের আর্তি শুনবার মতো কেউ নেই।

'এদিকে প্রায় ছয় মাস যাবত – যখন থেকে ভিসেকটমি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে – পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গেছে। আমি আশঙ্কা করছি, আপনার পর্যন্ত সঠিক অবস্থা ও সঠিক ঘটনা পৌঁছতে দেওয়া হয় না। অন্যথায় আপনি এই পরিস্থিতিকে কোনো অবস্থাতেই অব্যাহত থাকার অনুমতি দিতেন না। অবস্থাটা হলো, আপনার ইচ্ছা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিপরীতে প্রাদেশিক সরকারগুলো এই আইনের প্রয়োগ ও তাতে সফলতা অর্জন করাকে তাদের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার উপায় হিসেবে বরণ করে নিয়েছে। এই ময়দানে তারা একজন অপরজনকে হার মানাতে চাইছে। ফলে একাজে তারা সেই সবই করছে, যেগুলো কোনো ভিনদেশি সরকার বা তার এজেন্টদের মাধ্যমে কোনো দেশের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের সঙ্গে করা হয়। তার ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, সারাটা দেশ একটা ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। ভীতি ও আতঙ্কের একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে।

'মানুষ আপন-আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং ভিসেকটমি অভিযানে যার-যার কোটা পূরণ করার লক্ষ্যে যারপরনাই অপমানজনক; বরং পশুসুলভ আচরণ করছে। বনের পশু-পাখিদের নিয়ে যেভাবে শিকার খেলা হয়, ঠিক সেভাবে গরিব শ্রমজীবি মানুষ ও অঁজপাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত অসচেতন লোকদের ধরে নিয়ে এবং অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বা হুমকি

দিয়ে অথবা ফুঁসলিয়ে নিজেদের হিসাব পূরণ করছে। ব্যবসার লাইসেন্স টিকিয়ে রাখতে বা নতুন লাইসেন্স পেতে এমনকি রোজকার জিনিসপত্র সংগ্রহের জন্যও শর্ত লাগানো হচ্ছে, তুমি ভিসেকটমির জন্য এতগুলো কেইস নিয়ে আসবে। সরকারি চাকুরিজীবি শ্রেণীটি – যারা মেরুদণ্ডের হাড়ের মর্যাদা রাখে এবং যাদের এখনও পর্যন্ত শান্ত ও দেশের সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ মনে করা হয় – সবচেয়ে বেশি পেরেশান। শিক্ষক শ্রেণীটি – দেশের নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত – বড় অস্থিরতা ও মানসিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সময় পার করছেন। এগুলোই আজ প্রতিটি আসরের আলোচ্যবিষয়। দেশের প্রতিজন মানুষকে আজ পেরেশান দেখা যাচ্ছে।

'এই পরিস্থিতির কুদরতি ফলাফল সেই নৈতিক স্খলন, যেটি লোভ কিংবা ভয়ের কারণে এমন একটি দেশে জন্ম নিতে পারে, যে-দেশে শিক্ষা ও দীক্ষার আগে থেকেই ঘাটতি ছিল। এর সবচেয়ে বড় বেদনাদায়ক দিকটি হলো, দেশের নাগরিকরা সেই আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাসের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে, যেটি স্বাধীনতা আন্দোলন, কংগ্রেস ও খেলাফতের সংগ্রাম-সাধনা, গান্ধীজি, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, নেহেরু পরিবার ও আমাদের সম্মানিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় অনেক ত্যাগের বিনিময়ে এদেশে সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের প্রতিজন মানুষ নিজেদের গোলাম, অসহায় ও অপদস্থ মনে করছে এবং এমনটি কমই অনুভূত হচ্ছে যে, এটি একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেটি সব দিক থেকে বাড়াবাড়ি ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত এবং এটি বিদেশিদের গোলামি থেকে মুক্তকরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এই আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাসের মূল্যায়ন, তার সুরক্ষা ও যেকোনো মূল্যে তাকে অক্ষুণ্ণ রাখার মতো মানুষ আপনি ছাড়া দ্বিতীয়জন পাওয়া যাবে না। কারণ, এটি অর্জনে আপনার পরিবারের মৌলিক ভূমিকা আছে এবং আপনি এই চারাটিকে

নিজের গায়ের ঘাম ও রক্ত দ্বারা সিঞ্চিত করেছেন। আপনি আপনার নেতৃত্বের আমলে এবং নিজের চোখের এই চারাটির শুকিয়ে যাওয়া দেখতে পারেন না।

'এ সময় আপনার দেশের বড় বেশি খবর নেওয়া দরকার। কারণ, কোনো জাতি যদি কাপুরোষিত ও দাসসুলভ চরিত্র অবলম্বন করে, তা হলে তার মধ্য থেকে আত্মমর্যাদাবোধ, উন্নত মানসিকতা ও নৈতিক সাহসিকতার গুণগুলো বেরিয়ে যায়। সেই জাতি তখন অর্থের লোভে কিংবা কারও ভয়ে ভীত হয়ে যেকোনে কাজ করতে পারে। তখন তারা ধরে নেয়, যেকোনো মূল্যে হোক আমার জীবনটাকে বাঁচাতে হবে, যেকোনা মূল্যে হোক আমার চাকুরিটা টিকিয়ে রাখতে হবে। তখন আর তাদের মাঝে বিবেক, নীতিবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কিছু থাকে না। তারপর সেই দেশটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষায় যতই উন্নতি লাভ করুক-না কেন খুশি হওয়ার কোনোই কারণ থাকে না। কারণ, জনগণ দ্বারা দেশ গড়ে – দেশ দ্বারা জাতি তৈরি হয় না। আর একটি জাতি তার চরিত্র, ভেতরগত গুণাবলি, আত্মমর্যাদাবোধ ও নৈতিক সাহসিকতা দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করে। জীবনের মান উন্নত হওয়া আর উপায়-উপকরণ দ্বারা জাতি সমৃদ্ধ হয় না।

'আমি আপনার অনেক সময় নিয়েছি। কিন্তু একটা বিষয় আমাকে একাজে বাধ্য করেছে যে, দীর্ঘ দিন পর ভারতে একটি একক নেতৃত্ব অস্তিত্বে এসেছে এবং কুদরত আপনাকে দেশের উন্নতি, পুনর্গঠন, তাকে মর্যাদার আসনে আসীন করার এবং শক্ত পায়ে দাঁড় করানোর এমন একটি অভূতপূর্ব সুযোগ দান করেছেন, যেটি খুব কমই মানুষের হাতে আসে। এই সুযোগটি যদি কোনোমতে হাতছাড়া হয়ে যায়, আস্থা, সুনাম, সুখকর আশা-আকাঙ্ক্ষার এই মূল্যবান ভাণ্ডারে যদি নাদান বন্ধুদের দ্বারা কোনো ঘাটতি এসে পড়ে, যেটি প্রায় এক শতকের প্রচেষ্টা আপনাকে দান করেছে এবং যার দ্বারা আপনাকে অনেক সুনাম অর্জন করতে হবে, তাহলে সেটি হবে

এই দেশের জন্য সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। এই ভাণ্ডারটিকে আপনার খুব সাবধানতার সঙ্গে ব্যয় করতে হবে। কারণ, এটি তিন পুরুষের সঞ্চিত সম্পদ। আর এমন ভাণ্ডার নিত্য সঞ্চিত হয় না। এই মুহূর্তে কেবল আপনারই সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি, সময়মতো সঠিক নেতৃত্ব, সত্যিকার দেশপ্রেম ও পরিস্থিতির সঠিক বাস্তবসম্মত পরিসংখ্যান দেশটিকে রক্ষা করতে পারে এবং তাকে হতাশা ও শঙ্কার সেই ডামাডোল থেকে বের করে আনতে পারে, যার মাঝে সে এই মুহূর্তে ধসে চলছে।

'আপনার অনেকগুলো মূল্যবান সময় নেওয়ার জন্য আপনার কাছে আমি আরও একবার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আপনার হিতকামী
আবুল হাসান আলী
দায়েরা শাহ ইল্‌মুল্লাহ
তাকিয়া কেলা, রায়বেরেলি।'

প্রাইম মিনিস্টার পত্রখানা পড়ে শেষ করলে আমি আমার আলোচনা শুরু করলাম। প্রথমে আমি তার পরিবারের সঙ্গে আমার জানাশোনার কথা উল্লেখ করলাম। বললাম, আমি আপনার দাদা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকেও দেখেছি এবং আমিনাবাদ পার্কে আমি তাঁর ভাষণ শুনেছি।

তারপর আমি ইমারজেন্সি সমগ্র দেশে আতঙ্কের যে-পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে, তার চিত্র আঁকি (যার সম্পর্কে নিশ্চয় তিনি অনবগত ছিলেন না) এবং তাঁর দল কংগ্রেসের মর্যাদা, তার নেতাদের ত্যাগ এবং এখন তার যে-বদনাম হচ্ছে, জনগণের মাঝে যে-হতাশা তৈরি হচ্ছে এসবের বিবরণ দিলাম। আমি বললাম, স্বাধীনতার কোনো আন্দোলন, কোনো প্রচেষ্টা এবং তার নেতাদের ব্যর্থতার জন্য এর চেয়ে বড় বিষয় আর কিছু হতে পারে না যে, মানুষ দাসত্বের সময়টার কথা স্মরণ করতে শুরু করবে। আমি বললাম, আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হলো, মানুষ আজ প্রকাশ্যে ইংরেজ আমলের কথা স্মরণ করছে এবং বলাবলি করছে, সেই যুগটাই নাকি এখনকার চেয়ে ভালো ছিল। আলোচনার একপর্যায়ে আমি কয়েকজন প্রবীণ মুসলমান নেতার গ্রেফতারির কথা উল্লেখ করলাম এবং বললাম, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, তাঁরা জনতাকে থানা ও পোস্ট অফিসে আগুন

লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন। এ বিষয়টি কিভাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে!

এই আলোচনা আধা ঘন্টা থেকে পৌনে এক ঘন্টা পর্যন্ত চলতে থাকে। তিনি বললেন, মাওলানা সাহেব! তা হলে বলুন, ভারতের ক্রমবর্ধমান জনবসতিকে – যার ফলে হাজারো সমস্যা জন্ম নিচ্ছে – কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করব? আমি বললাম, আগে অস্বাভাবিক পরিবেশের অবসান ঘটান, যে-পরিবেশে ঠাণ্ডা মাথায় ও খোলা মস্তিষ্কে চিন্তা করা সম্ভব নয়। তারপর এ বিষয়টির ওপর দেশের গুণী-জ্ঞানী ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের একটি সেমিনার আহ্বান করুন এবং চিন্তা-গবেষণা করুন।

এ সময়ে তাকে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির আগমন ও সাক্ষাতের সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো। তিনি ইঙ্গিতে সেই প্রোগ্রাম পিছিয়ে দিলেন। আমি যখন অনুভব করলাম, আমি আমার সব কথা বলে ফেলেছি এবং কথা আর বাড়ানোর প্রয়োজন নেই, তখন নিজেই তাঁর থেকে বিদায়ের অনুমতি নিলাম।

আলোচনা শেষ করে আমি নেজামুদ্দীন ফিরে এলাম এবং সেই রাতটি দিল্লিতে কাটিয়ে পরদিন সাহারানপুরে হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেবের খেদমতে হাজির হলাম। রমযানের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু হযরত ও অধিকাংশ মেহমান রোযা রেখেছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম এবং সফরের বিবরণ শোনালাম। শুনে হযরত খুব খুশি হলেন। পরদিন যখন আমি সাহারানপুর থেকে লাখনৌ পৌঁছলাম, তখন হঠাৎ জানতে পারলাম, আমাদের দীর্ঘদিনের সহকর্মী ভারতের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা মুহাম্মাদ উআইস সাহেব নদভী (শায়খুত তাফসীর দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা) দীর্ঘ রোগ ভোগার পর দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। অগত্যা আমাকে স্টেশন থেকেই সোজা আইশবাগ (লাখনৌর প্রসিদ্ধ কবরস্তান) চলে যেতে হলো, যেখান হযরতকে দাফন করা হবে। দিনটি ছিল রমযানের ১ আর আগস্টের ২৮ তারিখ।

আমি পরদিন লাখনৌ থেকে রায়বেরেলি পৌঁছলাম। খুবসম্ভব তার পরদিন মুহাম্মাদ ইউনুস খান সাহেব রায়বেরেলি এসে পৌঁছলেন। সম্ভবত তিনি প্রাইম মিনিস্টারের ইঙ্গিতে এসেছিলেন। অতিশয় ভদ্রতা ও আগ্রহের সঙ্গে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন। দুজনে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে

আলোচনা হলো। ঘটনাক্রমে সেদিন সুলতানপুরের মুসলমানদের ক্ষুদ্র একটি প্রতিনিধিদলও আমার কাছে এসেছিল, যারা ওখানকার প্রশাসনের বাড়াবাড়ির অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন। আমি ইউনুস খান সাহেবকে ওদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। কিন্তু তার আগমনের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আমি ধরতে পারলাম না। এটি হয় একটি নৈতিক ও সামাজিক সাক্ষাত ছিল কিংবা তার কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল। বিষয়টি আমি পরে যাচাই করে দেখতে পারিনি।

ইমারজেন্সির অবসান এবং তার থেকে সংগৃহীত কয়েকটি ফলাফল

১৯ মাস (১৫ জুন ১৯৭৫ থেকে ১৮ জানুয়ারি ১৯৭৭ পর্যন্ত) বহাল থাকা ইমারজেন্সির অবসানের ঘোষণা হলো। জনগণ স্বাধীনতা ও স্বস্তির শ্বাস নিল। এই ইমারজেন্সি থেকে প্রতিজন বিবেকবান মানুষ দুটি ফল বের করতে পারেন।

১. ভারতের নাগরিকদের মাঝে কঠিন পরিস্থিতি, অপ্রীতিকর ঘটনাবলি ও বাধ্যবাধকতা সহ্য করার অসাধারণ যোগ্যতা রয়েছে। শর্ত হলো, তাদেরকে কাজকারবার ও অর্থ উপার্জনের স্বাধীনতা থাকতে হবে। এই ইমারজেন্সি – যেটি ইংরেজ সরকারের আধিপত্য লাভের পর এই ধারার প্রথম ঘটনা) দেশবাসীর ওপর সেই প্রভাব ফেলতে পারেনি, যার আশা করা হচ্ছিল এবং যার ফলে একটি গণতান্ত্রিক দেশে যদি কোনো বিপ্লব নাও হয়; অন্তত গুরুতর ধরনের বিক্ষোভ ও হাঙ্গামা তো হতে পারত। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে যদি প্রকাশ্য কোনো অস্থিরতা ও নারাজির প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে, তাও করেছে মুসলমানরা। আর তা করেছে তারা ভিসেকটমি অভিযানের বিরুদ্ধে, যেটি মূলত তাদেরই ওপর প্রয়োগ করা হয়েছিল। লোকদলের প্রধান চৌধুরী চরণ সিং (যিনি জনতা গভর্মেন্টে কিছুদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন) কারামুক্তির পর একজায়গায় নিজের স্বধর্মীয় ও পার্টির লোকদের বলেছেন, আমরা গ্রেফতার হলাম আর তোমরা আঙুলটা পর্যন্ত নাড়ালে না! তোমাদের চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদার পরিচয় মুসলমানরা দিয়েছে। দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের কোনো প্রতিবাদ জানায়নি। কেবিনেটের সিনিয়র সদস্যবৃন্দ এবং তেজী বলে পরিচিত

পার্লামেন্ট সদস্যরাও প্রত্যাশিত কোনো ভূমিকা রাখেননি। অথচ এরা সেইসব লোক, যাঁরা স্বাধীনতার লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১]

২. ইমারজেন্সি জারির পর মানুষ এও দেখেছে যে, প্রশাসনে হঠাৎ কর্মতৎপরতা ও দায়িত্ববোধ চলে এসেছে। রেলগাড়িগুলো (যেগুলোর নিয়ম অনুসারে না চলা নিয়ম হয়ে গিয়েছিল) সময় অনুসারে চলতে শুরু করেছে। অপরাধও কমে গেছে। এর দ্বারা এই কষ্টদায়ক ও দুঃখজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, দেশের প্রশাসন সেই অবস্থায়ই চৌকস হতে পারে এবং মানুষ তার কর্তব্য পালন করতে পারে, যখন তারা শাস্তির ভয় কিংবা কঠোর কোনো সরকারের মুখোমুখি হয়। এটি কোনো স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের জন্য প্রশংসনীয় বিষয় হতে পারে না যে, তারা কঠোরতা ও প্রবল চাপের শিকার হয়েই কেবল নিয়ম-শৃঙ্খলার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে। অথচ কর্তব্যবোধ, নাগরিক জীবনের অনুভূতি, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বদেশিদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার জযবা ছাড়া একটি দেশ উন্নতি করতে পারে না। এসব হলো একটি শিক্ষিত, অনুভূতিশীল ও বিবেকবান দেশ ও জাতির বৈশিষ্ট্য।

এই দুটি বাস্তবতাকে খানিক খোলাসা ও স্বপ্রমাণিত করার জন্য আমি নিজের কিছু অভিজ্ঞতার কথা লিখছি। ১৯৭৫ সালের ১৫ জুন আমি কাচারি রোডে অবস্থিত তাবলীগি মারকাজে সুহৃদ ও সঙ্গীদের সাথে দুপুরের খানা খাচ্ছিলাম। এমন সময়ে ডাক্তার ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশি (যিনি হোমিওপ্যাথিতে একজন সফল চিকিৎসক) এসে বললেন, একজন পুলিশ অফিসার (যিনি আমার চিকিৎসাধীন) ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বলেছেন, দেশে ইমারজেন্সি জারি হয়ে গেছে (যে সংবাদ এখনও পত্রিকায় আসেনি)। সেদিন আমার রায়বেরেলি যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। সঙ্গে বিপুলসংখ্যক কিতাবও নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এই কিতাবগুলো মারকাজের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং তার অনেকগুলো বিভিন্ন আরব দেশ থেকে আমি হাদিয়াস্বরূপ পেয়েছিলাম। আমি অনুভব করলাম, এই পরিস্থিতিতে রেলের ভ্রমণ ঝুঁকিপূর্ণ। হতে পারে, পথে কোথাও গাড়ি আটকে দেওয়া হবে কিংবা

---

১. ১৯৭৭ সালের ৩ ও ৪ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত মিল্লী (জাতীয়) কনভেনশনের উদ্বোধনী ভাষণে আমি বলেছিলাম, 'মুসলমানদের সাহস সেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনে অনেক সাহায্য করেছে, যেটি দেশে ১৯ মাস অব্যাহত ছিল।'

রেললাইন উপড়ে ফেলা হবে। আর তখন আমার এই মূল্যবান সম্পদগুলো নষ্ট হয়ে যাবে।

অগত্যা আমি ত্রিবেণিতে যেতে বাধ্য হলাম, যেটি বিকালবেলায় লাখনৌ থেকে রওনা হয় এবং দীর্ঘদিন যাবত রায়বেরেলিতে দেরিতে পৌঁছছিল। কিন্তু মানুষ তাতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি দারুল উলূমের জিপ ভাড়ায় নিলাম এবং কিতাবের সঙ্গে রওনা হলাম। আমিনাবাদের চৌরাস্তায় পৌঁছে দেখলাম, ওখানে সুনসান নীরবতা বিরাজ করছে। কোথাও কোনো হাঙ্গামা নেই। চারবাগ রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে দেখলাম, ওখানেও নীরবতা কোনো স্লোগান নেই। না কোনো পতাকা, না কোনো মিছিল। আমি বললাম, সবই ঠিক আছে। রায়বেরেলি এসে জানতে পারলাম, ত্রিবেণি এই আজই সময়মতো এসেছে। পথে শিকল টানারও কোনো চেষ্টা হয়নি, যেটি কিনা রোজকার নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে আক্ষেপ জাগল, আমি অযথা কষ্ট করলাম আর বাড়তি কতগুলো টাকা খরচ করলাম!

এর দ্বারা আমার দেশ ও জাতির মেজাজের পরিমাপ হয়ে গেল। শুধু এই গাড়িটিই নয় – মাসের পর মাস সমস্ত গাড়িই যথাসময়ে রওনা হতে ও যথাসময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে থাকল। কিন্তু ইমারজেন্সির সময়কাল যতই দীর্ঘায়িত হতে থাকল, নিয়মতান্ত্রিকতার এই চিত্র হ্রাস পেতে থাকল এবং প্রশাসন ও সরকারি অফিসগুলোতে ঢিলেমি শুরু হয়ে গেল। জনসাধারণের মন থেকেও ইমারজেন্সির প্রভাব ও ভয় কমে যেতে থাকল। ধারণা হলো, এই মেয়াদকাল যদি আরও দীর্ঘতা লাভ করতে থাকে, তা হলে জনজীবন স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আর তখন নতুন ধরনের কোনো ইমারজেন্সি চালু করা বা এই নিপীড়নযন্ত্রকে আরও কষে চালানো ছাড়া কাজ হবে না। এই পরিস্থিতি আর দেশবাসীর এই মানসিক অবস্থা কোনো দেশপ্রেমিক ও বাস্তববাদী নাগরিকের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই শান্তিদায়ক ও সম্মানজনক হতে পারে না।

১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচন, তার ফলাফল ও ইন্দিরাজির আমার বাড়িতে আগমন

ইমারজেন্সির অবসানের পর-পর সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা হলো। ইন্দিরাজি যথারীতি রায়বেরেলির আসন থেকে প্রার্থী হলেন। আর আগের মতো রাজনারায়ণ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেন। নির্বাচনের ফলাফল

তা-ই বের হলো, যার আশা করা হচ্ছিল এবং যেটি ইমারজেন্সি ও ভিসেকটমি অভিযানের কুদরতি প্রতিক্রিয়া ছিল, যেমনটি একটি জাতির পক্ষ থেকে হওয়াই উচিত। এই সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরাজি রায়বেরেলির আসন থেকে দাঁড়ালেন আর সঞ্জয় গান্ধী দাঁড়ালেন অমিঠির আসন থেকে (২২ মার্চ ১৯৭৭)। দুজনই শোচনীয় পরাজয়ের শিকার হলেন। আর একথাটিও অকপটে বলতে পারি যে, উভয় আসনেরই জনগণ এর জন্য আনন্দিত হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফলে জনতা সরকার গঠিত হলো।

কিছুদিন যাবত ইন্দিরাজি তাঁর আসনে এলেন না। পরে নানাজনের পরামর্শে তিনি তাঁর এই পুরনো আসনটির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, পুরাতন সম্পর্ক তাজা করা এবং জনগণের খোঁজখবর নিতে রায়বেরেলি সফরের প্রোগ্রাম বানালেন। ১৩৯৭ হিজরির ঈদের পরদিন। আর খুবসম্ভব ১৯৭৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর। জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা আবুল লাইছ নদভী, দারুল মুসান্নিফীন আজমগড়ের পরিচালক মৌলভী সাইয়্যিদ সাবাহুদ্দীন আবদুর রহমান এম.এ, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষাসচিব ও দারুল মুসান্নিফীনের সহকারী পরিচালক মাওলানা আবদুস সালাম সাহেব কুদওয়ায়ী ঈদমিলনের জন্য আমার কাছে এলেন। আমি মাগরিবের নামাযের পর মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় শহরের একজন খান সাহেব – যিনি শহরের রাজনীতি ও নির্বাচনগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন – আমার কাছে এসে বললেন, ইন্দিরাজি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। আমি বললাম, আপনি যদি এই প্রোগ্রামটি মুলতবি করে দিতে পারেন, তা হলে অনেক উপকার হবে। কারণ, আমি এই ময়দানের লোক নই। তিনি বললেন, আপনি আপনার বাংলোয় পৌঁছবার আগেই তিনি এসে পড়বেন।

হলোও তা-ই। আমি যখন আমার বৈঠকখানায় গিয়ে পৌঁছলাম, ততক্ষণে অনেকগুলো কার ও জিপের একটি বহর আমার দরজায় এসে দাঁড়াল। আমি তাঁকে স্বাগত জানালাম। প্রথমে মাওলানা আবুল লাইছকে পরিচয় করিয়ে দিলাম, যিনি ইমারজেন্সির আমলে জেল খেটে এসেছেন। সাইয়্যিদ সাবাহুদ্দীন সাহেব ও মাওলানা আবদুস সালাম সাহেবের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলাম। সম্ভবত তাঁর আশা ছিল না, এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এ সময়ে এখানে উপস্থিত থাকবেন। তাঁর সঙ্গে প্রাক্তন ইউপির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলাপতি তড়পাঠি, ইউপির বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নারায়ণদাত তেওয়ারি ও মুহসিনা

কুদওয়ায়ী সাহেবাও ছিলেন। আমি বললাম, আমি আপনাকে এক ধরনের মজলুম মনে করি যে, লোকেরা বাস্তবতা ও সঠিক ঘটনাগুলোকে আপনার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছে এবং সঠিক অবস্থা ও জনগণের মনোভাব জানতে দেয়নি। আলোচনা এতটুকু গড়াল যে, মুহসিনা কুদওয়ায়ী সাহেবা বললেন, আপনি ইন্দিরাজির জন্য দু'আ করুন।

আমি বললাম, আমি সেই লোকগুলোর জন্য সব সময়ই দু'আ করি, যাঁদের দ্বারা দেশের উপকার হয় এবং যাঁরা দেশ ও জনগণের নিঃস্বার্থ সেবক। আমি চায়ের অফার করলে তিনি খানিক চিন্তা করলেন। আমি বললাম, গরিবের এখানে এসে কিছু পানাহার না করে যাওয়ার কোনো নিয়ম নেই। তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ও মুহসিনা কুদওয়ায়ী আমার পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে দেখা করতে অন্দরমহলে গেলেন। তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে আশপাশের বিপুলসংখ্যক নারী-পুরুষ এসে ভিড় জমিয়েছিল। তাঁকে একনজর দেখে সবাই যার-যার মতো ফিরে গেল। তার পর থেকে এই কাহিনীটি লেখা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার আর কোনো সাক্ষাত হয়নি।

জনতা সরকার ও তার অবসান

১৯৭৭ সালের নির্বাচনের ফলাফলে ভারতে জনতা সরকার গঠিত হয়েছিল, যেটি মাত্র সোয়া দুই বছর (এপ্রিল ১৯৭৭ থেকে আগস্ট ১৯৭৯) টিকেছিল। এই সরকারের সদস্যরা ছিলেন দেশের বাছাইকরা নেতা ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক এবং দীর্ঘ অপেক্ষা; বরং এক ধরনের হতাশার পর দেশের বাগাডোর যাদের হাতে এসেছিল। তারা ভালোভাবেই এই বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন যে, কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত দেশের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দল এবং সামান্য অলসতা বা দুর্বলতার ফলে ইন্দিরাজি আবার দেশের ক্ষমতায় চলে আসার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এমন যোগ্য ও সজাগ-সচেতন দলটি রাষ্ট্রপরিচালনায় দক্ষতার প্রমাণ দিতে পারেনি। অথচ তারা দেশের একটি নাজুক পরিস্থিতিতে দেশের বাগডোর হাতে নিয়েছিল। এটি ছিল বিভিন্ন দলের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত একটি জোট, যার অংশগুলোকে এখনও দৃঢ়তা ও মজবুতি তৈরি হতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়েও তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব ছিল। স্বজনপ্রীতি, পরিবারপ্রীতি ও দলীয়করণের ব্যাধি থেকে তারা নিরাপদ ছিলেন না। তাদের মাঝে সেই

দূরদর্শিতা, ত্যাগ ও কর্মপকিল্পনার অভাব ছিল, যেটি জনগণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক তৈরি, প্রশাসনকে চৌকস বানানো ও দেশ থেকে অন্যায়-অপরাধ দূর করার জন্য আবশ্যক ছিল।

অবশেষে ১৯৮০ সালের সাধারণ নির্বাচনে এই সরকারের পতন ঘটল এবং কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় এল।

জনতা পার্টির কয়েকজন নেতার সঙ্গে আমার একটি হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা

জনতা পার্টির শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন নেতা (যাদের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্বের পদেও আসীন হয়েছিলেন) কোনো এক সুধারণার ওপর ভিত্তি করে একবার চার্টার বিমানে করে লাখনৌ থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাদের কয়েকজন দল ক্ষমতায় থাকাকালে সেই বাস্তববাদিতা ও উদারতার প্রমাণ দিয়েছিলেন, যেমনটি দলীয় চরিত্র ও তাদের পুরনো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের থেকে আশা করা যাচ্ছিল না। এই গুণের জন্য আমি তাদের প্রশংসিত করলাম। কিন্তু তাদের আমি আল্‌ফ লায়লার সেই কাহিনীটি শুনিয়ে দিলাম, যেখানে বাগদাদের এক বিচক্ষণ ও মনস্তত্ত্ববিদ কাজী এক ব্যক্তিকে তার আমানতের সম্পদ উদ্ধার করে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি হলো, বাগদাদের এক ব্যক্তি যুদ্ধে যাওয়ার সময় তার জীবনের সঞ্চিত সমুদয় সম্পদ একজন সম্মানিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে আমানত রেখে গিয়েছিলেন এবং বলে গেছেন, আমি যদি নিরাপদে ফিরে আসি, তা হলে তো এই সম্পদ আমি নিজেই ফিরিয়ে নেব। অন্যথায় আমার উত্তরসূরীদের দিয়ে দেবেন।

কিছুদিন পর লোকটি নিরাপদ ফিরে এসে তার কাছে গেল এবং বলল, আমার আমানতগুলো ফিরিয়ে দিন। তিনি বললেন, আপনি আবার কবে আমার কাছে আমানত রাখলেন? আপনার কাছে কি লিখিত কোনো প্রমাণ বা কোনো সাক্ষী আছে? থাকলে নিয়ে আসুন। কিন্তু সম্পদের মালিকের কাছে এমন কোনো প্রমাণই ছিল না। কারণ, আস্থার কারণে তিনি এর কোনোটিরই প্রমাণ রাখা প্রয়োজন মনে করেননি। তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন এবং কাজীর কাছে গিয়ে নালিশ জানালেন। কাজী সাহেব বললেন, ঠিক আছে; তুমি একটু অপেক্ষা করো; আমি ব্যবস্থা করছি। পরে কাজী সাহেব এক

মজলিসে বললেন, অমুক ব্যক্তি দরবারে খেলাফতে বড় একটি পদে অধিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

অল্প সময়ের মধ্যে কাজী সাহেবের এই কথাটি শহরে রাষ্ট্র হয়ে গেল। দিনকতক পর কাজী সাহেব অর্থের মালিককে বললেন, এবার যাও; দেখবে, সে আপনা থেকেই তোমার আমানত ফিরিয়ে দেবে। লোকটি গেল। যেইমাত্র বুযুর্গ ব্যক্তির তার ওপর চোখ পড়ল, বলল, আরে ভাই! আপনি কোথায় ছিলেন? আমার কাছে তো আপনার ঠিকানা নেই। থাকলে আমি আপনাকে খুঁজে বের করে আপনার আমানত ফিরিয়ে দিতাম। আপনি অমুক সময় এসেছিলেন। আপনার পাত্রটা কি এমন ছিল? আপনার আমানত অমুক জায়গায় রাখা আছে। যান; নিয়ে নিন।

লোকটি তার আমানত যেমনটা রেখেছিলেন, ঠিক তেমন পেয়ে গেলেন। পরে তিনি কিংবা অন্য কেউ কাজী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী কৌশলটা প্রয়োগ করলেন যে, তিনি গিলে খাওয়া গ্রাস আবার উগড়ে দিলেন? কাজী সাহেব বললেন, ব্যাপার হলো, একজন মানুষ যখন বড় কিছু পেয়ে যায় কিংবা তার ওপর আস্থা স্থাপন করা হয়, তখন ছোটখাট জিনিস থেকে তার চোখ সরে যায়। লোকটি যখন জানতে পারল, সে এত বড় একটি পদ পেতে যাচ্ছে, তখন এই লোকটির সম্পদ তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। তা ছাড়া তখন তার মনে এই আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল যে, পাছে এই সংবাদ তার পদপ্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

আমি তাদের বললাম, আল্লাহ যখন আপনাদের এত বড় একটি দেশের শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন এবং জনগণ আপনাদের ওপর আস্থা জ্ঞাপন করেছিল, তখন ছোট-ছোট বিষয়গুলো – স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, প্রধানমন্ত্রিত্বের স্বপ্ন দেখা – আপনাদের ভুলে যাওয়া দরকার ছিল। আপনাদের বোঝা আবশ্যক ছিল, আপনাদের বিরোধী দলগুলো সব সময় আপনাদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার প্রচেষ্টায় তৎপর। তাদের শিকড় দেশের তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত। আপনারা বড় মূল্যবান একটি সুযোগকে হাতছাড়া করে ফেলেছেন এবং দেশের সেবা ও তাকে সেই দোষ-দুর্বলতাগুলো থেকে নিরাপদ করার সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছেন, যেগুলোর ব্যাপারে আপনাদের ও দেশের গুণীজনদের বিগত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল।

তারা আমার একথার কোনো উত্তর দেননি। খুবসম্ভব তাদের বিবেক স্বীকার করে নিয়েছিল, আমার কথাগুলো বাস্তব ও সত্য। তারা আমার সঙ্গে দুবার দেখা করেছিলেন আর আমি তাদের সামনে অকপটে নিজের প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছি।

দশম অধ্যায়

মরক্কো ও আমেরিকা সফর

জিদ্দা থেকে রাবাত

বিশ্বভ্রমণ ও পর্যটন আমার বদনামের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ১৯৬৩ সালে স্পেন সফরেরও সৌভাগ্য নসিব হয়েছিল। তা সত্ত্বেও আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম এলাকা – যেটি তারাবলিস থেকে শুরু হয়ে তানজা পর্যন্ত চলে গেছে – আমার এই পর্যটন এরিয়ার আওতার বাইরে থাকে। মারাকেশের বাদশাহ হাসান ছানী একবার অত্যন্ত জোরালোভাবে আমাকে মারাকেশ যাওয়ার ও তাঁর রমযানের বিশেষ মজলিসগুলোতে – যেগুলোতে তিনি নিজে খুব গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থিত থাকতেন – অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু আমি আমার এখানকার রমযানের রুটিনের কারণে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করতে বাধ্য হয়েছি। এবার আল্লাহ একটি উপযুক্ত সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন এবং এবার আর আমার কোনো অজুহাত থাকল না।

আমি কয়েক বছর যাবত রাবেতা আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়্যাহর সদস্য ছিলাম। ১৯৭৬ সালের ১১, ১২ ও ১৩ মে রাবাতে তার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। তার সেক্রেটারিয়েট ভারতে আমাকে সম্মেলনের আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিল। কিন্তু আমি তখন হেজাজে ছিলাম। রাবেতা আলমে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল-কাযায-এর কাছেও এর দাওয়াতনামা পৌঁছল। কিন্তু অন্য এক ব্যস্ততার কারণে তাতে অংশগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই নিজের পরিবর্তে তিনি আমাকে রাবেতার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি বানিয়ে দিলেন। ফলে দুদিক থেকে আমি তাতে অংশগ্রহণে বাধ্য হয়ে গেলাম। শায়খ সালেহ কাযায আমার ও আমার সফরসঙ্গী মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে' নদভীর সফরের সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে দিলেন। সে সময়ে আমি মদীনা শরীফে অবস্থানরত ছিলাম। সেখানে আমাকে বিষয়টি অবহিত করা হলো। আমার জন্য সম্ভাবনা ছিল, আমি

কায়রোর পথে এই সফরে রওনা হব। কিন্তু আমার আগ্রহ ছিল সফরটা সেই পথে করা, যেপথে তারাবলিস, তিউনিস ও আলজেরিয়ার সেই ঐতিহাসিক স্থানগুলো পড়ে, যেখানে আমার কখনও যাওয়া হয়নি। অন্তত এই স্থানগুলোর রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করা তো হয়ে যাবে এবং বিমানবন্দর ও উড়োজাহাজ থেকে একটা 'উড়ন্ত দৃষ্টি' পড়ে যাবে। ১৯৭৬ সালের মে মাসের ৬ তারিখে সৌদি বিমানে আমি আদ-দারুল বায়জার (Casablanca) উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। মদীনার প্রতিনিধিদল (শায়খ আবদুল মুহসিন ইবনে আব্বাদ-এর নেতৃত্বে) ও প্রখ্যাত ইখওয়ানী চিন্তাবিদ, আমার পুরাতন বন্ধু শায়খ মুহাম্মাদ গাযৃযালিও সেই বিমানে ছিলেন। বিমান পশ্চিম তারাবলিসের বন্দরে অবতরণ করল। কিন্তু যাত্রীদের নামার অনুমতি ছিল না। আলজেরিয়ার বিমানবন্দরেও নামার অনুমতি পাওয়া গেল না। আদ-দারুল বায়জা ছিল সফরের শেষ মনযিল। এখানে এক দিন এক রাত অবস্থান করলাম। এখানে নিমন্ত্রণে আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ আল্লামা ডক্টর তকিউদ্দীন আল-হেলালীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। এখানকার লাইব্রেরীগুলোতে নিজের বিভিন্ন গ্রন্থ দেখলাম। এক মসজিদে এক যুবক আমাকে জিজ্ঞেস করল, শায়খ আবুল হাসান নদভী কেমন আছেন? আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাকে তুমি জান কীভাবে? বলল, 'মাযা খাসিরাল আলামু...' গ্রন্থের মাধ্যমে। আমি বললাম, তুমি যার সঙ্গে কথা বলছ, ইনিই এই গ্রন্থের লেখক।

৭ মের জুমা মেকনাসে পড়লাম। শায়খ তকিউদ্দীন হেলালী সাহেব এখানে থাকেন। ৮ মে ফাস-এর ঐতিহাসিক নগরীটি পরিদর্শন করলাম, জ্ঞান-বিদ্যার কেন্দ্র হওয়ার সুবাদে এবং ইতিহাসের বিচারে যার অবস্থান ভারতের দিল্লি-লাখনৌ ও পাকিস্তানের লাহোর-মুলতানের মতো। সাইয়িদ ইদরীস হাসান ছানী ১৯২ হিজরিতে এই নগরীর ভিত রচনা করেন। তিনি নিজের কুড়াল দ্বারা দাগ টেনে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! একে আজীবনের জন্য ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র বানিয়ে দিন, যেখানকার অধিবাসীরা সব সময় তোমার রাসূল ও মহান সাহাবাগণের আদর্শের অনুসরণ করে চলবে। আর এজন্যই তার নাম পড়ে গিয়েছিল 'ফাস'। আরবিতে ফাস মানে কুড়াল। প্রায় ১২০০ বছর যাবত এই নগরী ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হয়ে থাকল। ইসলামি বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় জামেয়া আল-কারুয়ীন এই নগরীতেই অবস্থিত। প্রতিটি যুগেই বিপুলসংখ্যক আলেম ও অলী এখানে

জন্য নিতে থাকেন। আমি জামেয়া আল-কারুয়ীন ও তার গ্রন্থাগার পরিদর্শন করলাম, যেখানে ৬০০০ দুর্লভ পত্র সংরক্ষিত আছে।

১০ মে সোমবার আমি রাজধানী রাবাতে চলে আসি। এখানে একাধিক শীর্ষস্থানীয় আলেম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে আমার দেখা হলো, যাদের মাঝে ওস্তাদ আবুবকর আল-কাদেরী, ডক্টর আবদুল করীম খতীব ও ডক্টর মাহ্দি বানাবুদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরদিন ১১ মে থেকে সম্মেলন শুরু হয়ে গেল। সংস্থার শ্রদ্ধেয় সভাপতি ওস্তাদ মুহাম্মাদ আল-ফাসীর (যিনি বাদশা হাসানেরও ওস্তাদ) বিজ্ঞোচিত ভাষণের পর বিপুলসংখ্যক প্রতিনিধির মধ্য থেকে পাঁচজন বক্তৃতা করেন। এই পাঁচজনের মধ্যে আমিও ছিলাম।

আমার ভাষণের প্রতিপাদ্য ছিল, শায়খ সা'দীর এই পঙ্ক্তিদুটো–

یتیمے کہ نہ کردہ قرآں درست
کتبخانۂ چند ملت بشست

আমি বললাম, এই মোজেজা নেতিবাচক ছিল না – ছিল ইতিবাচক ও গঠনমূলক। তিনি যদি কয়েকটি কুতুখানার ওপর বিলুপ্তির রেখা টেনেও থাকেন, কিন্তু মানবতাকে এর চেয়েও অনেক বড় ও বিশাল কুতুবখানা, বিদ্যাপীঠ ও শক্তিশালী জগতজোড়া শিক্ষাগত আন্দোলন উপহার দিয়েছিলেন, যার নজির কোনো জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তারপর আমি পৃথিবীতে নবুওতে মুহাম্মাদী বৈপ্লবিক যে-অবদান রেখেছে, তার ওপর সবিস্তার আলোকপাত করেছি এবং বলেছি, তাঁর বৈপ্লবিক চরিত্রের একটি দিক ছিল, তিনি মানবীয় জ্ঞান-বিদ্যার নানাবিধ ও অনেক সময় পরস্পরবিরোধী এককগুলোতে ঐক্য, সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় কীর্তিটি হলো, তিনি বিদ্যাচর্চার মাঝে ডুবে থাকা লোকগুলোকে সেই মানসিক বেষ্টনি থেকে বের করে বাস্তব জীবনে নিয়ে আসেন, যার মাঝে তারা হাজার-হাজার বছর যাবত অবরুদ্ধ ছিল এবং তাদেরকে বিকৃত পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে পরীক্ষার জগতে বিচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

কনফারেন্সের অধিবেশনগুলো ১৩ মে পর্যন্ত চলতে থাকে। অতিথিদের সম্মানে গুরুত্বপূর্ণ অনেক জায়গায় ভোজ ও সংবর্ধনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ মে শুক্রবার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। ভাষণের শিরোনাম ছিল ازمة العالم الاسلامي الحقيقية (ইসলামি বিশ্বের

প্রকৃত সমস্যা)। রাবাত রেডিও থেকে আমার এই ভাষণটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করে। সংস্কৃতিক মন্ত্রী স্বয়ং সভায় উপস্থিত থেকে ভাষণটি শুনেছেন। পরিচিতিমূলক আলোচনায় আমার পিতাজি মরহুমের গ্রন্থ 'নুযহাতুল খাওয়াতির' সর্বশীর্ষে ছিল। আলোচনার প্রাণ ছিল, ইসলামি বিশ্বের আসল শূন্যতা ও সংকট শুধুই ঈমানি ও নৈতিক। আমার ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য ঈমানের সেই মৌখিক ও বিশ্বাসগত মর্ম নয়, যার দ্বারা একজন মানুষ কুফরের বৃত্ত থেকে বের হয়ে ইসলামের সীমারেখায় প্রবেশ করে এবং তার দ্বারা তাদের ওপর ইসলামের বিধিবিধান আরোপিত হয়। ঈমানের যে-স্তরটি প্রাথমিক বিশ্বাস ও মৌলিক ইসলামি চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ত, সে-ক্ষেত্রে মুসলমান আজও দুনিয়ার অন্যসব জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এখানে আমার উদ্দেশ্য ঈমানের সেই উত্তাপ, বিশ্বাসের সেই কঠোরতা এবং ঈমানি চেতনা, যেগুলোর দ্বারা সাহাবা কেরামের বুকগুলো আবাদ ছিল, তাঁদের মস্তিষ্ক মাতোয়ারা ছিল। আমার উদ্দেশ্য এমন উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, যে কিনা পৃথিবীকে আলো ও উত্তাপ দ্বারা ভরে দিয়েছিল। আখলাক দ্বারাও আমার উদ্দেশ্য বাহ্যিক চরিত্র ও লেনদেন নয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য নৈতিক দৃঢ়তা, নীতিমালার অনুসরণ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া।

রাবাত থেকে আমরা মরক্কোর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এটি দূরপ্রাচ্যের একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক শরহ এবং দীর্ঘকালের ইসলামি শাসনের কেন্দ্র। কখনো দূরপ্রাচ্য বোঝাতে এই শহরটির নাম উল্লেখ করা হয়। এই গোটা অঞ্চলটাকে বলা হয় মরক্কো। পথে আদ-দারুল বায়জায় কিছু সময় অবস্থান করে প্রাচ্যের পুরোধা আল্লামা আল্লাল ফাসীর (যাঁর সঙ্গে আমার অনেক আগ থেকেই পরিচয় ছিল এবং রাবেতার সভাগুলোতে একসঙ্গে কাজ করেছি। বছরদুয়েক আগে তিনি ইন্তেকাল করেছেন) শোকসভায় অংশগ্রহণ করেছি। আমি শুরুতে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা আলোচনা করেছি যে, তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়েছিল একজন আলেমে দ্বীন হিসেবে।

তিনি প্রাচ্যের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার আগে জামেয়াতুল কারুমীনের সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ও আমাদের দেশের সেইসব আলেমের মাঝে অনেক মিল পাওয়া যায়, যাঁরা নিজ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও দর্শনকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি ভারতের আলেমসমাজ ও চিন্তাবিদগণ সম্পর্কে সাধারণ আরব আলেম ও পণ্ডিতগণের চেয়ে বেশি অবগত ছিলেন। বিশেষভাবে তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব দেহলবি (রহ.)-এর খুব প্রশংসা করতেন এবং তাঁর খুব ভক্ত ছিলেন। আমি যখনই তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছি, কখনই তাঁর মজলিসকে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার আলোচনা থেকে মুক্ত পাইনি।

১৬ মে রবিবার আমরা মরক্কোর প্রাচীন নিদর্শনাবলি ভ্রমণ করলাম, যেগুলো বিশাল একটি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল এবং যেগুলো ইসলামি দুনিয়ার অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি। ১৬ মে রাষ্ট্রীয় নিমন্ত্রণ ও সাক্ষাতের প্রোগ্রাম ছিল। ঘটনাক্রমে বাদশা হাসান সেসময় মরক্কোয় অবস্থানরত ছিলেন। রাজপ্রাসাদে অতিথিদের একটি ত্রিভুজের আকারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। বাদশাহ হাসান এলেন এবং সালাম করলেন। সংস্থার সভাপতি শায়খ মুহাম্মাদ আল-ফাসী একজন-একজন করে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরে আমাকে সবার পক্ষ থেকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হলো।

আমি বললাম, আমি আপনাকে ইসলামি বিশ্বের পক্ষ থেকে একটি মহান বার্তা শোনানোর সৌভাগ্য অর্জন করতে চাচ্ছি। তা হলো, আজ জগতের সমস্ত মুসলমান অস্থির মনে অপেক্ষা করছে, ইসলামি জগতের দিগন্ত থেকে নতুন কোনো তারকা উদিত হবে। এ সময়ে মুসলমান এমন একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছে, অসাধারণ কোনো নেতা-ই তাদের সেখান থেকে উদ্ধার করে আনতে পারে, যিনি হবেন অসাধারণ ঈমানি শক্তি, দৃঢ় প্রত্যয় ও পরিপূর্ণ ইখলাসের গুণে গুণান্বিত এবং যিনি রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইসলামের সেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করবেন। এর জন্য আপনার পিতা স্বনামধন্য সুলতান মুহাম্মাদ আল-খামেস-এর ওপর সবার দৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু আল্লাহপাক তাঁকে সে পর্যন্ত দুনিয়াতে থাকতে দেননি। বিস্ময়ের কী আছে যে, আল্লাহ আপনার দ্বারা সেই কাজটি নিতে চাচ্ছেন।

বাদশা হাসান অকপটে আরবিতে জবাবি বক্তব্য দিলেন, যেটি ছিল বিশুদ্ধ ও অসাধারণ সাহিত্যপূর্ণ।

আদ-দারুল বায়জায় এক রাত অবস্থান করে আমরা মরক্কো থেকে ১৮ মে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ওখানে অবস্থানকালেই আমি نحن الآن في المغرب (আমরা এখন প্রাচ্যে) শিরোনামে একটি নিবন্ধ লেখা শুরু করি, যার

শুরুটা ছিল এরকম–'তারপর সেই কথাগুলো উপস্থাপন করা হলো, যার দ্বারা দূরপ্রাচ্যের প্রকৃত রূপ উন্মোচিত হতে পারে এবং নতুন লড়াই ও সফলতা অর্জন করা যেতে পারে। এই নিবন্ধে আমি ইসলামি সভ্যতার গুরুত্ব এবং জীবনের ওপর তার প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করি। এ ব্যাপারে আমি দূরপ্রাচ্য ও ইসলামি দেশগুলোকে সংস্কারমূলক ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাই।

আমেরিকা ভ্রমণ

আমেরিকার সফরকে আমি আমার দ্বীনি, দাওয়াতি ও রচনামূলক জীবনের জন্য জরুরি মনে করতাম যে, যে লোকটি পশ্চিমা সভ্যতা, পশ্চিমা সমাজ ও পশ্চিমা চিন্তারীতির ওপর শুরু থেকেই সমালোচনা করে আসছে, তার সেই দেশটি অবশ্যই স্বচক্ষে দেখা দরকার, যেখানে পশ্চিমা সভ্যতা, শিক্ষা ও শিল্পগত উন্নতি (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) শীর্ষরেখায় পৌঁছে গেছে এবং যে দেশটি সমগ্র বিশ্বের ওপর পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলছে।

আমেরিকা সফরের প্রেক্ষাপট কয়েকবারই তৈরি হয়েছিল। বছরদুয়েক আগে ১৯৭৫ সালে শিকাগোতে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মৃত্যুর শতবর্ষ উপলক্ষ্যে একটি হাদীছ কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছিল। আমার কাছে তার আমন্ত্রণপত্র এসেছিল এবং তাতে অংশগ্রহণে খুব পীড়াপীড়ি ছিল। কিন্তু সময়টা ছিল ইমারজেন্সির আমল। যথাসময়ে অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাও সামনে এসে হাজির হলো। ফলে আমি যেতে পারলাম না। অবশেষে ১৯৭৭ সালে আমেরিকার বিখ্যাত মুসলিম সংগঠন এম.এস.এর (Muslim Students Association Of America And Canada) পক্ষ থেকে তার বার্ষিক কনফারেন্সে যোগদানের সুযোগ পেলাম, যেটি ২৭ মে থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল। এই আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে এমন একটি পীড়াপীড়ি, তাগাদামূলক পত্র ও একাধিক আন্তরিক সুপারিশ এসেছে, যেগুলো উপেক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। সেগুলোর মাঝে আমার সুহৃদ প্রফেসর আনীস (পাকিস্তানের সাবেক মন্ত্রী প্রফেসর খুরশিদ আহমাদ সাহেবের ছোট ভাই) ও মৌলভী ইরফান আহমাদ খান সাহেব সাহারানপুরী (এম.এ আলীগ)-এর পত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল।

এদিকে আমার বাম চোখের অপারেশনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা এই ভ্রমণের পক্ষে জোরালো সমর্থন জোগায়, যার সফলতার ওপর নতুন করে অধ্যয়ন ও

লেখালেখির জীবন নির্ভরশীল ছিল। অভিজ্ঞজনরা বলেছেন, এমন নাজুক অপারেশনের জন্য একমাত্র উপযুক্ত জায়গা হলো আমেরিকার যুক্তরাজ্য। শ্রদ্ধেয় মাওলানা যাফর আহমাদ আনসারী সাহেব বিশেষভাবে আমাকে এর ওপর জোর দিলেন। তিনি বলতেন, সার্জারিতে আমেরিকা ব্রিটেনের তুলনায় এতটাই অগ্রসর, যতখানি এগিয়ে ব্রিটেন ভারত-পাকিস্তানের তুলনায়। সর্বোপরি হযরত শায়খুল হাদীছ অত্যন্ত জোরালোভাবে তাড়াতাড়ি অপারেশনের তাকিদ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ডাক্তারগণ এই পরামর্শও দিয়েছেন যে, একাজে যদি আরও বিলম্ব করা হয়, তাহলে নতুন-নতুন জটিলতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই বিষয়গুলো আমেরিকা সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও এই যথোপযুক্ত আমন্ত্রণটি কবুল করে নেওয়ার পক্ষে সমর্থন জোগাল। আরও আশা ছিল, এই সুযোগে বিপুলসংখ্যক মুসলমানের উদ্দেশে – যারা আমেরিকায় অবস্থান করছে এবং বাহ্যত এখনও ওখানেই থাকবে – এবং হাজার-হাজার মুসলিম ও আরব ছাত্র-যুবকদের[1] উদ্দেশে ভাষণদানের সুযোগ পাওয়া যাবে। আর দ্বীনের একজন দাঈ এমন মূল্যবান সুযোগ কখনও হাতছাড়া হতে দিতে রাজি হন না।

এম.এস.এর কনফারেন্সে

১৯৭৭ সালের ২৮ মে সকালে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে করে বোম্বাই হয়ে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এবং রাত সাড়ে বারোটায় (ভারতীয় সময় অনুযায়ী পরদিন দশটায়) নিউইয়র্কের কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। ভাগ্য ভালো যে, বিমানবন্দরেই মুহাম্মাদ খুরশিদ সাহেবকে পেয়ে গেলাম, যাকে সাইয়িদ হুসাইন সাহেব এ কাজের জন্য কষ্ট দিয়েছেন। বিমানবন্দরে এসে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আমাদেরকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ওখানে আমরা ঘণ্টাকয়েক বিশ্রাম নিলাম। পথে যখন জানতে পারলাম, তিনি বালাকোটের বাসিন্দা, তখন আমার সফরের ক্লান্তি অর্ধেক দূর হয়ে গেল।

---

১. সে সময় পুরো উত্তর আমেরিকায় এম.এস-এর সদস্যসংখ্যা ছিল ৪০০০। তার ২১টি শাখা ছিল। সদর দফতর ছাড়াও আমেরিকা-কানাডার বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলে তার অনেকগুলো শাখা ছিল, যেগুলোকে চেপ্টার বলা হয়। তখন এই চেপ্টারের সংখ্যা ছিল ১৬০। ১৯৭৭ সালে সংগঠনের সভাপতি ছিলেন মি. ইয়াকুব মির্জা, সহসভাপতি মি. নাজিরুদ্দীন আলী হায়দারাবাদি ও সেক্রেটারি জেনারেল ডক্টর মাহমুদ রুশদান জর্ডানি।

নিউইয়র্কে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করে প্রথমে ইন্ডিয়ানা পোলিশ এবং পরে সেখান থেকে মালবিউমঙ্গটনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম, যেখানে একদিন আগেই কনফারেন্স শুরু হয়ে গিয়েছিল। এটি এই সংগঠনের চতুর্দশ বার্ষিক সম্মেলন ছিল। কনফারেন্সের চার দিনব্যাপী প্রোগ্রাম ছিল। ২৮ মে সকাল সাতটায় আমি ভাষণ দিলাম, যার বিষয়বস্তু ছিল 'ইসলামি দাওয়াতের কর্মীদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন'। একটি ভাষণ আরবদের উদ্দেশে দিলাম। আরও একটি বক্তৃতা করলাম পর্যালোচনা ও পরামর্শের ধারায়। এক দিন দরসে কুরআনও হলো।

উত্তর আমেরিকা ও কানাডা সফর এবং তার বক্তৃতাবলি

এই জরুরি প্রোগ্রাম থেকে অবসর হয়ে এম.এস.এর সহসভাপতি নাজিরুদ্দীন আলী সাহেব, প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর প্রফেসর আনীস আহমাদ সাহেব ও ইরফান আহমাদ খান সাহেব আমার জন্য আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণের কর্মসূচী তৈরি করলেন, যার ব্যাপ্তি ছিল তিন সপ্তাহ। অপারেশনের ব্যাপারটিও চূড়ান্ত হলো। এ বিষয়টি বিশেষভাবে ভাই আনীস আহমাদ সাহেব মাথায় তুলে নিলেন এবং সময় ব্যয় করলেন। অবশেষে ভ্রমণ শেষ করে ফ্লোরোডেলফিয়ায় ডাক্তার শে আই ইনস্টিটিউটে ডাক্তার শে আই-এর হাতে অপারেশন হবে বলে সিদ্ধান্ত হলো, যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে।

আমেরিকার এই সফরে উত্তর আমেরিকা ও কানাডার প্রায় সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ শহর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে মুসলমান ছাত্র, শিক্ষিতজন ও জীবনের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত লোকদের মাঝে ভারতীয়, পাকিস্তানি ও আরব মুসলমানদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। এই প্রোগ্রাম হাটন ও নিউইয়র্ক থেকে শুরু করে শিকাগোতে গিয়ে শেষ হয়। উত্তর আমেরিকার শহরগুলোতে নিউইয়র্ক, জার্সি সিটি, ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর, বোস্টন, শিকাগো, ডিট্রাইট, সল্ট লেক সিটি, সান ফ্রান্সিসকো, সান জুযে, লস্ এঞ্জেল্স (কেলিফোর্নিয়া) এবং কানাডার মন্ট্রিয়াল ও টরেন্টো অন্তর্ভুক্ত ছিল। এম.এস-এর প্রস্তুতকৃত প্রোগ্রামে শুধু ওয়াশিংটন সংযোজিত হলো, যেখানে এই ভ্রমণের পর আমার যাওয়া হলো এবং যেখানকার ইসলামি সেন্টারের ভাষণ এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত আছে।

এই ভ্রমণে সাধারণভাবে বিশটি ভাষণ দিয়েছি, যেগুলোর মধ্যে উরদু-আরবি ভাষণের সংখ্যা অর্ধেক-অর্ধেক। এই সফরে আমেরিকার পাঁচটি বিখ্যাত ইউনিভার্সিটিতে – কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি (নিউইয়র্ক), হারওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি (ক্যাম্ব্রিজ), ডিট্রাইট ইউনিভার্সিটি (আনআবর), দক্ষিণ কেলিফর্নিয়া ইউনিভার্সিটি (লস্ এঞ্জেলস্), এবং আউটা ইউনিভার্সিটি (সল্ট লেক সিটি) – ভাষণদানের সুযোগ ঘটেছে। ইউনাইটেড ন্যাশন্স নিউইয়র্ক ভবনের নামায হলে এবং টরেন্টো ও ডিট্রাইট-এর জামে মসজিদে জুমার খুতবাও দিতে হয়েছে। এই ভাষণগুলোতে বিপুলসংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান (আমেরিকায় বেশিরভাগ উচ্চশিক্ষিত মানুষ মুসলমান) এবং ভারতীয়, পাকিস্তানি ও আরব তরুণ-যুবক অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করত। বক্তৃতা শেষে এই দেশ ও বর্তমানকালের রীতি অনুযায়ী শ্রোতারা প্রশ্ন করত এবং নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমাধান ও নির্দেশনা চাইত। বিপুলসংখ্যক মানুষ এই ভাষণগুলো রেকর্ড করে নিয়ে আপন অঙ্গনে ও আত্মীয়-বন্ধুদের মাঝে প্রচার করত এবং সেগুলোর কপি বন্ধুদের উপহার দিত।

এই ভাষণগুলোতে সত্য ও স্পষ্ট নানা কথা বলা হয়েছে। নিঃস্বার্থ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নিজের অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার নির্যাস উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও আমেরিকান সভ্যতার ব্যাপারে সেই উঁচু স্তর থেকে কথা বলা হয়েছে, যেটি কুরআন ও ইসলাম তার অনুসারী ও একজন সত্যিকার জ্ঞানপিপাসুকে দান করে এবং যার ওপর দাঁড়িয়ে তাকালে পুরাতন ও নতুন দুনিয়াকে একটা অন্তঃসারশূন্য মরিচিকা বা মিথ্যা প্রবঞ্চনা বলে প্রতীয়মান হয়। তাতে বক্তার মেধা, অধ্যয়নশক্তি, দূরদর্শিতা ও অন্তরদর্শিতার কোনো দখল ছিল না। এটি ছিল সেই শিক্ষা ও বার্তার পরিচয়, যেটি তার অনুসারীদের পর্বতের সেই চূড়ায় তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়, যেখান থেকে সারাটা জগত পায়ের তলায় দেখা যায়, তার চোখের জং দূর হয়ে যায়, তার কাছে প্রতিটি বস্তু তার আসল রূপে পরিদৃশ্য হতে শুরু করে।[১] এখানে ভাষণগুলোর সারমর্ম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কারণ, সেগুলোর সংকলন

---

১. এই সফরের বিশদ বিবরণ এবং হৃদয়গ্রাহী ও তথ্যসমৃদ্ধ কাহিনী আমার ভাগিনা ও সফরসঙ্গী মৌলভী সাইয়িদ মুহাম্মাদ রাবে' নদভীর কলমে 'দু মাহীনে নয়ী দুনিয়া মে' (দুমাস আমেরিকায়) শিরোনামে ছাপা হয়েছে।

উরদু ইংরেজি ও আরবি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ভাষণগুলোতে বিশেষভাবে দুটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। একটি হলো পশ্চিমা সভ্যতার সমালোচনা, তার ব্যর্থতা ও তার সৃষ্ট সমস্যাবলির বিশ্লেষণ। অপরটি আমেরিকায় বসবাসরত মুসলমানদের তাদের অবস্থান, আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের সংরক্ষণের তাকিদ এবং এ ব্যাপারে শঙ্কা ও আশার প্রকাশ ও পরামর্শ। কয়েকটি শিরোনামের ওপর চোখ বোলালেই এই ভাষণগুলোর প্রাণ ও মেজাজের কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।

আমেরিকান ও পশ্চিমা সভ্যতাকে সামনে রেখে যে-ভাষণগুলো প্রদান করা হয়েছে, সেগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ছিল, আমেরিকায় যন্ত্রের জয়জয়কার, জ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি আর মনুষ্যত্বের অধঃপতন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এই ভূখণ্ডটা যদি স্বভাবধর্মের নেয়ামতে ধন্য হতো, তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরকম হতো। আমেরিকা একই সময়ে দুর্ভাগা ও ভাগ্যবান দেশ। কারণ, আল্লাহর তাকে বিপুল নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন, বিশাল শক্তি ও উপকরণ দান করেছেন। এটি হলো তার জন্য সৌভাগ্য।

দুর্ভাগ্যটা হলো, সে সত্য ও সঠিক ধর্মের নেয়ামত লাভ করেনি। আর যেভাবে সে বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করেছে, সেভাবে নৈতিকতার প্রতি মনোযোগী হয়নি। এখানে বলা হয়েছে, যদি প্রশ্ন করা হয়, পাশ্চাত্যের জন্য উপযোগী ধর্ম কোনটি আর অনুপযোগী কোনটি, তাহলে তার বাস্তবসম্মত ও সঠিক উত্তর এই ছিল যে, তার জন্য সবচেয়ে উপযোগী ধর্ম ছিল ইসলাম আর সবচেয়ে অনুপযোগী ধর্ম হলো খ্রিস্টবাদ। কিন্তু তার জন্য দুর্ভাগ্য যে, সে সেই ধর্মটাকেই বরণ করে নিল, যে কিনা বলে, মানুষ জন্মগতভাবে পাপী। সে মানুষের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করে। সে মানবতার গায়ে কলঙ্ক লেপন করে। তার ইতিহাসে অনেক তাড়াতাড়ি বৈরাগ্য ও দুনিয়াত্যাগের ঝোঁক সৃষ্টি হয়ে গেছে, আর কালিসা (গির্জা) জ্ঞান ও বিবেকের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে, ব্যক্তিগত অপরাধের জন্য আদালত কায়েম করেছে যে, যার নিশানায় পরিণত হয়েছে, তাদের সংখ্যা বিগত বিশ্বযুদ্ধে নিহতদের সংখ্যার চেয়ে কম নয় এবং যার ফলস্বরূপ গোটা পৃথিবীর গতি একদম বস্তুমুখী হয়ে গেছে এবং তার মাঝে বিশেষ কোনো ধর্ম নয়; বরং ধর্মের প্রতি অনাস্থা, এক ধরনের ঘৃণা ও প্রতিশোধস্পৃহা তৈরি হয়ে গেছে। আরও বলা হয়েছে, পশ্চিমা সভ্যতা তার কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছে এবং তার পতন শুরু হয়ে গেছে। আরও বলেছি,

আমেরিকার সব ধরনের প্রচেষ্টা ও উদারতা ব্যর্থ হচ্ছে এবং সে কঠিন সমস্যা ও ঝুঁকির সম্মুখীন। কারণ, সে যে দেশ ও জাতিগুলোর সহায়তা করে, তারা তার না নিষ্ঠ, না কৃতজ্ঞ। বরং তার বিপদ দেখে তারা খুশি হয়। তাই এই সাহায্য আর এই উদারতা নিষ্ঠা থেকে মুক্ত এবং নিছক একটা বাণিজ্য।

আমেরিকায় বসবাসরত মুসলমানদের উদ্দেশে যে ভাষণগুলো প্রদান করেছি, সেগুলোতে বলা হয়েছে, আপনারা সাবধান থাকুন, যেন আমেকিরকান বা ইউরোপিয়ান ইসলাম জন্ম নিতে না পারে। ভাষণে বলা হয়েছে, ইসলামের বিশেষ একটি মওসুম, আবহাওয়া ও নির্দিষ্ট স্তরের তাপমাত্রারও (Temperature) প্রয়োজন আছে। ইসলাম যুগপৎ বিশ্বাস ও আমল, লেনদেন ও চরিত্র, চেতনা ও অনুভূতির বাহক এবং বিশেষ একধরনের রুচিবোধও তার আছে; এমন রুচি, যে কিনা মানুষকে কাবু করে ফেলে এবং তাকে নতুন একটি ধাঁচে সাজিয়ে তোলে।

আমেররিকায় বসবাসরত বন্ধুদের বলা হলো, আপনারা যেকোনো উন্নতির ওপর ঈমানের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকে প্রাধান্য দিন এবং আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের ঈমানের ব্যাপারে নিশ্চয়তা অর্জন করুন। যদি তারা ঝুঁকির মধ্যে থাকে, তাহলে আর একটা দিনও এখানে থাকা আপনার জন্য জায়েয নয়। আর যদি নিশ্চিন্ত হন যে, এখানে আপনাদের জীবন আল্লাহর ইচ্ছা ও চাহিদা অনুপাতে চলতে পারে এবং যদি আপনার অন্তর সাক্ষ্য দেয়, এখানে আপনারও ঈমান রক্ষা পাবে, সন্তানদের ভবিষ্যতও নিরাপদ থাকবে, তা হলে এখানে অবস্থান করা আপনার জন্য শুধু জায়েযই হবে না; বরং উপকারী ও বরকতময়ও হতে পারে। এতদ্বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতগুলো হাদীছের সূত্রে ঈমানের ওপর জীবন ও মৃত্যুর মূল্য এবং তার থেকে বঞ্চিত হওয়ার হুশিয়ারি ও শঙ্কার কথা স্পষ্ট ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে।

শিশুদের দ্বীনি তা'লীম ও তারবিয়াত, এর জন্য প্রতিষ্ঠান খুলে নেওয়া এবং উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নিজের সুরক্ষা ও উন্নতির জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টিকে মূল সাব্যস্ত করা, হৃদয়ের ব্যাটারিতে চার্জ দিতে থাকা, গুরুত্বের সঙ্গে নামায ও দু'আর পাবন্দি করা, মহান পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করা ও স্তরভেদে তাঁদের খেদমতের স্বীকৃতি প্রদান করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

বলা হয়েছে, আমেরিকার এই ইয়াজুজি (অরাজক) পরিবেশেও অলির মর্যাদা অর্জন করা এবং অনেক বড় আত্মিক মর্যাদায় পৌঁছে যাওয়া সম্ভব। মহিলাদেরও পুরুষদের থেকে আলাদা জায়গায় বসিয়ে নিষ্ঠাপূর্ণ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে যথাসম্ভব ইসলামি সমাজ অবলম্বন ও ইসলামি জীবনের আদব ও সীমারেখার মেনে চলার তাকিদ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, পশ্চিমা সভ্যতা শান্তিময় জীবন খুঁজে ফিরছে। আপনারা এদেশে ইসলামি জীবন ও ইসলামি সমাজরীতির এমন একটি নমুনা উপস্থাপন করতে পারেন, যেটি এখানকার সোসাইটির জন্য – যারা জীবন থেকে অনীহ হয়ে উঠেছে, যাদের পারিবারিক বন্ধন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে – আর্কষণ সৃষ্টি করতে পারে এবং তাদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ হতে পারে।

এই ভাষণগুলোর সংকলন যখন 'নয়ী দুনিয়া (আমেরিকা) মে সাফ সাফ বাতেঁ' নামে বই আকারে প্রকাশিত হয় এবং শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রহ. (যিনি সে সময় স্থায়ীভাবে মদীনায় বসবাসরত ছিলেন) এই ভাষণগুলো পড়িয়ে শুনলেন, তখন তিনি আমাকে পত্র লিখলেন :

> 'আপনার আমেরিকার ভাষণগুলো আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি খুব গুরুত্বের সঙ্গে ভাষণগুলো শুনেছি। কিন্তু বুঝতে পারলাম না, আমেরিকানদের এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পন্থা কী। আপনি মাইকের সামনে বসে কয়েকটি কথা বলে দিলেন আর হিতাকাঙ্ক্ষীরা কয়েকটি কপি ছাপিয়ে বাজারে ছেড়ে দিল। এর চেয়ে বেশি আর কী হলো বুঝতে পারলাম না। আমার মতামত হলো, ইংরেজি ও আরবিতে এর যত বেশি কপি প্রচার করা যাবে, ততই ভালো হবে। এর প্রচার ও প্রসারের খুব প্রয়োজন রয়েছে। যদি আপনার মাথায় এর কোনো পন্থা থাকে, তাহলে আমাকে অবশ্যই লিখবেন। আমার খেয়াল হলো, হিতাকাঙ্ক্ষীদের দৃষ্টি আকষণ করে অন্তত এক লাখ কপি ইংরেজি, আরবি ও উরদুতে বিতরণ করা দরকার। যদি লাখনৌতে উরদুতে ছাপা হয়, তাহলে এক হাজার কপি আমার। ছাপাখরচ যা লাগে, আমি পাঠিয়ে দেব।'

হযরত শায়খুল হাদীছ তাঁর কালের একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম ও হাদীছবিশারদ ছিলেন। বরং উঁচুমাপের একজন অলীও ছিলেন। তাঁর এই

পছন্দ হওয়া একটি সনদের সমান। তাছাড়া এর দ্বারা অনুমান করতে পারছি, আমার এই সফর ও ভাষণাবলি অত্যন্ত উপকারী ও সুফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে।

চোখের অপারেশনের ব্যাপারে দ্বিধা এবং অবেশেষে সিদ্ধান্ত

আমেরিকায় সে সময় চোখের সুবিজ্ঞ দুজন সার্জন ছিলেন। একজন হলেন ডাক্তার মামনি বাল্টিমোরে। অপরজন ডাক্তার শে ফিলাডেলফিয়ায়। প্রথমজন ইহুদি আর পরেরজন খ্রিস্টান।[১] তারা চোখ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর পহেলা জুলাই অপারেশনের তারিখ ঠিক করলেন।

আমি প্রোগ্রামগুলো শেষ করে ফিরে এলাম এবং স্নেহাস্পদ ডক্টর আহমাদ মুতী' সিদ্দীকির বাড়ি নদওয়া দুডমির নিউইয়র্ক-এর উঠলাম। এখানে আমি জুনের শেষ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলাম। এখানে এসে উঠবার পর অপারেশনের ব্যাপারে মনে এত দ্বিধা তৈরি হয়ে গেল, যেমনটা আমার জীবনের তেমন একটা ঘটেনি। কারণ, আমি এই ডান চোখটির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলাম। মনে চিন্তা জাগল, যদিও সার্জন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আশ্বস্ততা ব্যক্ত করেছেন; তবু ভাবলাম, মানুষের অনুমান সঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে। আল্লাহ্ না করুন, যদি ভুলই প্রমাণিত হয়, তাহলে আমেরিকা থেকে আমি হিন্দুস্তান যাব কী করে! একমাত্র সঙ্গী মুহাম্মাদ রাবে' তার অন্ধ সাথীটিকে কী করে দেশে পৌঁছাবে! বোধহয় আমি কোনো সমস্যায় জীবনে ইসতেখারার এত নামায পড়িনি, যতখানি এক্ষেত্রে পড়েছি। তাছাড়া একটি স্থিরীকৃত বিষয়কে বাতিল করাও সহজ ছিল না, যেখানে আমরা হাসপাতালকে লিখিতও দিয়ে দিয়েছি, রোগী সমস্ত ফলাফল মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন। অবশেষে একটা বুদ্ধি মাথায় এল যে, আমি হযরত শায়খের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলব – যিনি সে সময় মক্কায় ছিলেন – এবং আমার এই দ্বিধা ও সমস্যার কথা জানাব। হতে পারে, তিনি অপারেশন মুলতবি রাখার পরামর্শ দেবেন আর একটা অজুহাত আমার হাতে চলে আসবে।

---

১. ভারত থেকে রওনার সময় আমার একাধিক বন্ধু – যাঁদের মাঝে মাওলানা ওমর পালনপুরি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য – কোনো ইহুদি সার্জন দ্বারা অপারেশন করাতে কঠোরভাবে বারণ করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু আল্লাহর কাছে এই অপারেশন হওয়াই স্থির ছিল। আবার বরকতেরও কারণ ছিল। তাই অনেক চেষ্টা করেও হেজাযের সঙ্গে টেলিযোগাযোগ স্থাপন করতে পারলাম না। ডক্টর মুতী' বললেন, তিনটা লাইন আছে। কিন্তু চেষ্টা করে একটাতেও সংযোগ পাওয়া গেল না। পরে জানতে পারলাম, অপারেশনের পর-পর আমাকে ভারতে ফিরে আসতে হবে আর তাতে অপারেশন-পরবর্তী সাবধানতা অবলম্বন করা সম্ভব হবে না ভেবে শায়খ আপনা থেকেই অপারেশন না করানোর পরামর্শ দিয়ে পত্র পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাকদিরের সিদ্ধান্ত ছিল ভিন্ন। এই পত্র আমার কাছে না এসে চলে গেল লাখনৌ। তার কোনো এক খাদেম আমার বর্তমান ঠিকানায় না পাঠিয়ে চিঠিখানা লাখনৌর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছে। অপারেশনের পর হিন্দুস্তান গিয়ে আমি এই চিঠি হাতে পাই। আমার দ্বিধা সত্ত্বেও সুহৃদ আনীস আহমাদ সাহেবের (যার ভাগে এর ছাওয়াব লিখিত ছিল) পীড়াপীড়ি ছিল যে, অপারেশনটা অবশ্যই করিয়ে নিন। ডক্টর মুতী'রও এই মত ছিল। হঠাৎ ফিলাডেলফিয়ার সফরের এক দিন আগে (২৮ জুন) আমার মনের খটকা ও দ্বিধা দূর হয়ে গেল আর আমি অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম।

চোখের সফল অপারেশন

ফিলাডেলফিয়ার স্টেশনে প্রফেসর আনীস আহমাদ সাহেবকে পেয়ে গেলাম। ২৯ জুন আই ইনস্টিটিউটে ভর্তির কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল। অপারেশনের যাবতীয় আয়োজন ও স্বাস্থের বিভিন্ন পরীক্ষা-নীরিক্ষা হয়ে গেল এবং ১লা জুলাই আল্লাহর নামে অপারেশন হলো। ডাক্তার শে – একজন বিদেশি রোগীর সঙ্গে যার বিশেষ সহমর্মিতা ও একধরনের আন্তরিকতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল – অপারেশনের ফলাফলে বেশ আশ্বস্ত ছিলেন। এটিও তাকদিরের বিষয় ছিল যে, অপারেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আমি রাবেতা আলমে ইসলামীর অফিসের মাধ্যমে হযরত শায়খকে অপারেশনের তারিখ ও দু'আর আবেদন জানিয়ে যে টেলেক্সবার্তা পাঠিয়েছিলাম, সেটি হযরত তখন পেলেন, যখন আমাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

তখন মক্কা মুকাররমায় ঈশার নামাযের সময় ছিল। বার্তা পেয়ে হযরত নিজেও দু'আয় মনোনিবেশ করলেন এবং খাদেমদেরও তখনই হারাম শরীফে পাঠিয়ে দিলেন। অপর দিকে লাখনৌ দারুল উলূমেও অপারেশনের

সাফল্যের জন্য স্নেহাস্পদ মৌলভী মুঈনুল্লাহ সাহেব খতমের বিশেষ আয়োজন করলেন। দিল্লির তাবলীগ জামাতের মারকায নিজামুদ্দীনেও দু'আর বিশেষ ব্যবস্থা করা হলো। এসবই ছিল মহান আল্লাহর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ। অপারেশনের সময় নিউইয়র্কের অধিবাসী সাইয়িদ সাজেদ হুসাইন সাহেব (ইউপি সরকারের প্রাক্তন রেভিনিউ সেক্রেটারি ও বর্তমানে নদওয়াতুল উলামা অর্থসম্পাদক সাইয়িদ হেদায়াত হুসাইনের পুত্র) ও আমার সুহৃদ আনীস আহমাদ সাহেব হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতালে ৬ দিন থাকা জরুরি ছিল। কিন্তু ডাক্তার শে আরও ৬ দিন বাড়িয়ে দিলেন। এ সময়ে ইরাক বংশোদ্ভূদ আমেরিকান বন্ধু উস্তাদ মাজদি ফাওজি খতীব ও জম্মু-কাশ্মীরের জনাব আবদুল ওয়াহীদ সাহেব বেশ আন্তরিকতার প্রমাণ দিলেন।

বারো দিনের পর অন্যান্য সুহৃদগণও আমাকে দেখতে ও খোঁজখবর নিতে থাকেন। নিউইয়র্ক থেকে সাইয়িদ মাযহার হুসাইন সাহেব, শিকাগো থেকে স্নেহাস্পদ নিশাত সাহেব, কাজী আফজাল বিয়াবানি সাহেব ও ফসীহ সাহেব লাখনভী কারে করে আটশো মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে এসেছেন। নিউইয়র্ক থেকে মুহাম্মাদ খুরশিদ সাহেব, নিউজার্সি থেকে স্নেহাস্পদ মুয্‌যাম্মিল হুসাইন সিদ্দীকি ও তার পিতা, টরেন্টো থেকে সামীউল্লাহ সাহেব সপরিবারে আমাকে দেখতে এসেছেন। আর এ বিষয়টিও আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল যে, কক্ষের পড়শিদের সঙ্গেও আমার বিশেষ এক ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এক আমেরিকান মহিলা রবিবার দিন আমাকে বলল, মি. নাদভী! আমরা তোমার জন্য আজ চার্চে প্রার্থনা করেছি।

১৩ জুলাই হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলাম এবং টেম্পল ইউনিভার্সিটির কাছে পার্ক টাউন নামক বিল্ডিং-এ সাইয়িদ সাফওয়াত আলী সাহেব খায়রাবাদির ফ্ল্যাটে স্থানান্তরিত হলাম। এখানে আমার শিক্ষক মাস্টার সামী' সাহেব সিদ্দীকি তার দু-পুত্র ডক্টর আহমাদ মুতী' ও মুহাম্মাদ রজীকে সঙ্গে করে এসেছিলেন।

শিকাগোতে

এক সপ্তাহ পর ডাক্তার শে চোখ পরীক্ষা করলেন এবং সেলাই কাটলেন। আমি বিশ্রামের সময়টুকু (যার মেয়াদকাল ছিল ২ সপ্তাহ) পার করার জন্য স্নেহাস্পদ রাবে'কে নিয়ে ২২ জুলাই তৃতীয়বারের মতো শিকাগো চলে গেলাম এবং সেখান থেকে আমার একনিষ্ঠ বন্ধু সাইয়িদ আজমতুল্লাহ সাহেব

কাদেরির বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। ওখানে আমি নিজঘরের আরাম ও শান্তি পেলাম। এখানে বন্ধুবর ডক্টর আবদুস সালাম সাহেব আনসারী, ইরফান আহমাদ খান সাহেব, নিশাত সাহেব ও কাজী বিয়াবানি সাহেবের উপস্থিতি আমাকে সফর ও অসুখের ক্লান্তি অনুভব করতে দেয়নি। এখানে হঠাৎ একদিন যখন আমি ফজর নামাযের অজু করছিলাম, তখন নিউইয়র্ক থেকে কল এল। আমি রিসিভার কানে লাগালাম। কণ্ঠটা স্নেহাস্পদ হাসান আসকারি সাহেবের। তিনি জানালেন, এই তো ঘণ্টাকয়েক আগে আমি মদীনা থেকে নিউইয়র্ক এসেছি। বললেন, কয়েকটা দিন আপনার সঙ্গে থাকার এবং রাবে'র সহযোগিতা করার জন্য প্রথম ফ্লাইটে শিকাগো আসছি।

এই প্রিয় ও অতিপরিচিত কণ্ঠ শুনে – যার মাঝে ভালবাসা ও নিষ্ঠার উত্তাপ এবং পবিত্র মদীনার বাতাসের সুবাস মিশ্রিত ছিল – আমার অন্তরটা খুশিতে বাগবাগ হয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারেক সাহেব এসে পড়লেন এবং পরে ফিরে আসার সফরে লন্ডন এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিলেন, যেখান থেকে তার কর্মস্থল মদীনায় চলে যাওয়ার কথা ছিল। তারই থেকে প্রথমবারের মতো আমি মক্কার মাদরাসা সাওলাতিয়ার মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মাদ সামীউল্লাহ সাহেবের মৃত্যুর খবর শুনলাম।

২ আগস্ট বিমানে করে আমি শিকাগো থেকে ফিলাডেলফিয়া গেলাম। ডাক্তার শে অবশিষ্ট তিনটি সেলাই কাটলেন, অপারেশনের সাফল্যের জন্য আমাকে মুবারকবাদ দিলেন এবং ভারত ফিরে আসার অনুমতি দিলেন। এখানে বলে রাখা দরকার, ডাক্তার শে আমার এই অপারেশনের ফি নেননি এবং হাসপাতালের খরচাদিতেও যথাসম্ভব ছাড় দিয়েছেন। আমি আরও দুদিন নিউইয়র্কে অবস্থান করে ৬ আগস্ট ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এই অপারেশনের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা এবং তার জন্য যাওয়া-আসার কাজে প্রফেসর আনীস সাহেবের বড় একটি ভূমিকা ছিল। তিনি যা কিছু করেছেন, এম.এস.এ'র পক্ষ থেকে অর্পিত কর্তব্যের চেয়ে তা অনেক বেশি ছিল। আল্লাহপাক তাকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

এয়ার ইন্ডিয়ার নিউইয়র্ক থেকে বোম্বাই পর্যন্ত উড়াল ছিল মাত্র সতেরো ঘণ্টার। পথে স্টপেজ ছিল শুধু লন্ডনে। লন্ডন এয়ারপোর্টে ট্রানজিট থেকে টেলিফোনে স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ মাসরুর লাখনভী, মৌলভী আতীকুর রহমান

সম্ভলী ও জিয়া ইবনে মৌলভী আব্বাস নদভীর সঙ্গে কথা হলো। আমরা রাত সাড়ে বারোটার সময় বোম্বাই এসে পৌঁছলাম। সুফী আবদুর রহমান সাহেব, ভাই ইসমাঈল মানসূরী সাহেব, হাজী ইয়াকুব সাহেব ও মৌলভী আবদুল্লাহ সুরতী বিমানবন্দরে এলেন। আমরা কিংটঙ্গ ফ্লাইটে সকালে দিল্লি এসে পৌঁছলাম। এই আনন্দময় ও নিরাপদ সফরের খুশির মধ্যে দিল্লি পৌঁছে শুধু এতটুকুই ব্যতিক্রম পেলাম যে, আমাকে আপন ফুফাত ভাই সাইয়িদ মুহাম্মাদ ইয়ামীন হাসানীর মৃত্যুর খবর শুনতে হলো। আমেরিকায় টেলিফোনে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত কথা বলা যেত। আর কখনও শুনিনি, লাইন খারাপ। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও দিল্লিতে লাখনৌর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলাম না।

সন্ধ্যার ট্রেনে আমরা লাখনৌর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এবং ৯ আগস্ট ১৯৭৭ মঙ্গলবার নিরাপদে লাখনৌ এসে পৌঁছলাম। আমাদের এই দাওয়াতি ও চিকিৎসাবিষয়ক সফর সফলতার সঙ্গে সমাপ্ত হলো। আমি শুধু স্বাধীনভাবে চলাফেরাই নয়; বরং সরাসরি অধ্যয়ন ও লেখালেখির যোগ্য হয়ে গেলাম এবং প্রায় ১৩-১৪ বছর পর দিল্লির অল মিল্লি (সর্বজাতীয়) কনভেনশনে – যেটি ১৯৭৭ সালের জুন মাসে ৩ ও ৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হলো। আমি আমার উদ্বোধনী ভাষণ – যেটি লিখিত আকারে ছিল – নিজেই পড়লাম এবং বন্ধুরা এর জন্য খুব আনন্দ প্রকাশ করল এবং আমাকে মুবারকবাদ জানাল।

একাদশ অধ্যায়

পাকিস্তান সফর ও দুটি গুরুতর দুর্ঘটনা

রাবেতার এশীয় কনফারেন্স ও পাকিস্তান সফর

আমার পাকিস্তান সফরের ধারা (যেটি আমার শ্রদ্ধেয় মুরশিদ হযরত আবদুল কাদের রায়পুরির পাকিস্তান সফর ও পাকিস্তানে অবস্থানের কারণে কয়েক বছর যাবত লাগাতার চলতে থাকে) '৬২ সালের পর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[১] মাঝে একবার জেনেভা থেকে ফেরার পথে দেড়-দুদিন করাচিতে অবস্থান করি। অন্যথায় সাধারণত সৌদি আরব কিংবা ইউরোপ যাওয়ার সময় করাচি বিমানবন্দরেই করাচির আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাত হয়ে যেত। এভাবে পাকিস্তান সফরে মাঝখানে প্রকৃত অর্থে গ্যাপ গেল ষোলো বছরের। এই দীর্ঘ গ্যাপ এমন এক লোকের জন্য, যার বছরে দু-তিনবার হেজায ও আরব দেশগুলো সফর করার সুযোগ ঘটে এবং যিনি এই সময়ে তিন থেকে চারবার ইউরোপ ও একবার আমেরিকায় দীর্ঘ সফর করে এসেছেন একটা অসাধারণ, অপ্রত্যাশিত ও অযৌক্তিক বিষয় ছিল, যার জন্য পাকিস্তানের বন্ধু-সুহৃদদের অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ রয়ে গেল এবং কেউ-কেউ এই ধারণাও পোষণ করতে পারেন যে, আমি অপ্রয়োজনীয় সাবধানতার পথ অবলম্বন করেছি।

যেলোক জাযীরাতুল আরব, মিশর, সিরিয়া, কুয়েত, ইরান ও দূরপ্রাচ্য এবং সবশেষে ইউরোপ-আমেরিকাকে সরাসরি সম্বোধন করে অভিযোগের ডালি খুলেছেন, তাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করেছেন এবং তাদেরকে অবাধে পরামর্শ দিয়েছেন, সেই লোকটির পাকিস্তান ও পাকিস্তানের

---

১. '৬২ সালের ১৬ আগস্ট হযরত রায়পুরি লাহোরে ইনতেকাল করেন। হযরতের দরবারে হাজিরি দিতে এই যে সফরগুলো আমি করতাম, সেগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। করাচি যাওয়ার সুযোগও কখনও ঘটেনি।

নাগরিকদের (যাদের সঙ্গে তাঁর দ্বীন, বংশ, সভ্যতা ও সামাজিকতার গভীর বন্ধন আছে এবং কোনো-কোনো দিক থেকে যেটি সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র) অনবরত উপেক্ষা করা কিংবা তার জন্য সময় বের না করা একধরনের অবিচার, অমানবিক ও দাওয়াতি ও ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে একধরনের ত্রুটি ও দায়িত্বহীনতা ছিল।

কিন্তু পরিস্থিতি ও ঘটনাবলি এভাবেই সামনে আসতে থাকল এবং এই সফর মুলতবি হতে থাকল। অথচ বহু আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রের মোকাবেলায় – যাদের সামনে লেখক একাধিকবার বক্তৃতায় নিজের কলিজাটা বের করে মেলে ধরেছেন এবং নিজের মনের অভিব্যক্তিগুলো কলিজার রক্ত দ্বারা লেখা গ্রন্থের আদলে বারবার উপস্থাপন করেছেন – এই মহান ইসলামি দেশটি (যেখানে মুসলিম জাতি সংখ্যার দিক থেকে এবং তার চেয়েও বেশি নিজেদের যোগ্যতার দিক থেকে সবচেয়ে বড়) রাজনীতি ও সভ্যতার ময়দানে নেতৃত্বসুলভ ভূমিকা পালন করতে পারে। যদি সে একটি সঠিক মুসলিম সমাজ ও নির্ভুল ইসলামি রাষ্ট্রের নমুনা পেশ করতে পারে, তাহলে না সে শুধু সারা পৃথিবীর ওপরই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে; বরং হিন্দুস্তান ও হিন্দুস্তানি মুসলমানদের জন্যও উপকারী ও একটি শক্তিতে পরিণত হতে পারে।

আরবিতে প্রবাদ আছে–

كُلُّ أَمْرٍ مَرْهُوْنٌ بِوَقْتِهٖ

মানে প্রতিটি বিষয় তার সময়ের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত ও শর্তের দায়ে আবদ্ধ, যেন সেটি একটি বন্ধকি বস্তু।

অবশেষে ১৯৭৮ সালের জুন মাসের শেষের দিকে রাবেতা আলমে ইসলামী মক্কা মুকাররমার পক্ষ থেকে প্রথম এশীয় কনফারেন্সের আমন্ত্রণপত্র এসে পৌঁছল, যেটি সে বছরেরই জুলাই মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত হলো। রাবেতার প্রতিষ্ঠাতা পর্ষদের একজন সদস্য ও ভারতের নাগরিক হিসেবে – যেটি কিনা পাকিস্তানের প্রতিবেশী রাষ্ট্র – এই কনফারেন্সে আমার অংশগ্রহণ সব দিক থেকেই জরুরি ও যুক্তিযুক্ত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে রাবেতার সেক্রেটারিয়েট আমার বন্ধুবর মুহতারাম মাওলানা মানযুর নু'মানি – যিনি পর্ষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন – ছাড়াও আমার আরও দুজন প্রিয় সহকর্মী

আল-বা'ছুল ইসলামীর সম্পাদক সাইয়িদ মুহাম্মাদ আল-হাসানি ও তা'মীরে হায়াতের সম্পাদক মৌলভী ইসহাক জালীস নদভীকেও আমন্ত্রণ করেন। তার আগে আমাকে জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারর উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অংশগ্রহণের প্রোগ্রাম ছিল। এই সফরে আমার সঙ্গী ছিলেন নদওয়াতুল উলামার উপ-পরিচালক মৌলভী মুঈনুল্লাহ সাহেব নদভী। এই বৈঠক থেকে অবসর হয়ে আমাকে সরাসরি হেজায থেকে করাচি যেতে হবে। আমি মৌলভী মুঈনুল্লাহ নদভী ও স্নেহাস্পদ খলীলুর রহমান সাজ্জাদ (মাওলানা মানযুর নু'মানির পুত্র)-এর সঙ্গে জিদ্দা থেকে করাচির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারার ভাইস চ্যান্সেলর শায়খ আবদুল মুহসিন আব্বাদও সেই বিমানে ছিলেন। করাচিতে রাবেতার সদস্যবৃন্দ ও প্রতিনিধিদের সরকারিভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং তাদের ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে রাখা হয়। কিছুক্ষণ পর মাওলানা মানযুর নু'মানি এবং মুহাম্মাদ মিয়াও এসে পৌছান।

মাওলানা ইসহাক জালীস নদভী – যিনি মূলত হাজারা জেলার অধিবাসী ছিলেন এবং পাকিস্তানে যার বংশগত ও পারিবারিকভাবে ও সাংবাদিক হিসেবে পরিচিতি ছিল – আমাদের পৌছার কয়েক দিন আগেই ওখানে পৌছে যান। তাঁর মিশন ছিল আমাদের এই সফরটিকে যত বেশি সম্ভব উপকারী ও ফলপ্রসূ বানানো। কারণ, এই সফর দীর্ঘ বিরতির পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল। তাছাড়া এর অল্প কদিন আগেই জেনারেল জিয়াউল হক সাহেব দেশটির বাগডোর হাতে তুলে নিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় দীর্ঘদিন পর দেশ একটি নতুন ধর্মীয়, নৈতিক ও বাস্তবসম্মত গতি লাভ করেছিল। তার আরও একটি কাজ ছিল, আগেভাগে এসে তিনি আগে থেকেই ভাষণ, বৈঠক ও ভ্রমণের সেই প্রোগ্রামগুলো তৈরি করে ফেলবেন, যেগুলো দ্বারা অল্প সময়ে পাকিস্তানের বিভিন্ন চিন্তাধারা ও সুশীল সমাজ পর্যন্ত এর বার্তা পৌছানোর ব্যবস্থা করা, ইসলামি সম্পর্ক, অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা, নিঃস্বার্থ ও ভদ্র প্রতিবেশী ও ভ্রাতৃত্বের হক আদায় করা। মৌলভী ইসহাক সাহেব – আল্লাহ যাকে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দান করেছেন – করাচির আত্মীয়-বন্ধুদের পরামর্শ ও সহায়তায় অত্যন্ত চমৎকারভাবে এই দায়িত্বটি আঞ্জাম দেন।

আমরা কনফারেন্স শুরুর ঠিক আগ মুহূর্তে যখন করাচি পৌছলাম, ততক্ষণে এই প্রোগ্রাম বিন্যস্ত ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গেছে।

রাবেতার এই কনফারেন্স – যেটি তার প্রথম এশীয় কনফারেন্স ছিল – পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক উদ্ভোধন করেন। মিস্টার এ.কে বারুহি – যিনি সে সময় পাকিস্তানের আইন ও ধর্মমন্ত্রী ছিলেন – মেজবান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কনফারেন্সের সভাপতি মনোনীত হন। রাবেতার সেক্রেটারিয়েটের পক্ষ থেকে আমাকে, ইন্দোনেশীয় প্রতিনিধি প্রফেসর ডক্টর রুশদি ও ফিলিপাইনের আবুবকর সাহেবকে সহ-সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও রাবেতার প্রতিষ্ঠাতা পর্ষদের প্রায় সবকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য এসেছিলেন। ভারত থেকে দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তায়্যেব সাহেব, উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি মাওলানা মুফতী আতীকুর রহমান, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আস'আদ মাদানি, জামায়াতে ইসলামীর আমীর মৌলভী মুহাম্মাদ ইউসুফ, কয়েকটি ইসলামি পত্রিকার সম্পাদক ও কয়েকজন বিশিষ্ট আলেম এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কনফারেন্স শান্ত ও পরিপাটি পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো। শেষ অধিবেশনের শেষ ভাষণ আমার ওপর অর্পিত হলো। আমি একটি আরবি, একটি ফারসি ও একটি উর্দু কবিতা দ্বারা ভাষণ শুরু করি। আমি শ্রোতাদের নানা অঞ্চল, নানা সংস্কৃতি ও নানা ভাষার প্রতি লক্ষ্য রেখেছি। আরবি কবিতাটি ছিল–

حَمَامَةَ جَرْعَى حَوْمَةِ الْجَنْدَلِ اسْجَعِي
فَأَنْتِ بِمَرْأًى مِنْ سُعَادٍ وَمُسْمَعِ

'ও হে হাওমাতুল জানদালের রহস্যের পায়রা! এর চেয়ে ফুর্তি করার সুযোগ তুমি পাবে না। কারণ, সু'আদ (প্রেমিকা) কাছেই আছে; সে তোমাকে দেখছেও।'

আমি বললাম, আপনারা সবাই এই মাহফিলের 'শুধু সু'আদই নয় – আপনারা হলেন সু'আদা।

ফারসিতে আমি কবি ইকবালের আর উরদুতে আমীর মাইনাঈর কবিতা পড়েছি। ইকবালের কবিতাটি ছিল–

تا تو بیدار شوی نالہ کشیدم ور نہ
عشق کاریست کہ بے آہ و فغاں نیز کنند

আমীর মাইনাঙ্গর কবিতাটি ছিল–

امیر جمع ہیں احباب درد دل کہ لے
پھر التفات دل دوستاں رہے رہے نہ رہے

তারপর আমি বললাম, এই পুরো সম্মেলনের যে সারমর্ম ও বার্তা সম্মানিত উপস্থিতিগণ এখান থেকে নিয়ে যাবেন এবং যাকে আপন-আপন দেশে ও পরিবেশে নেতৃত্বসুলভ দায়িত্ব ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে তাদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবে, সেটি সেই বাক্য থেকে উত্তম আর কিছু হতে পারে না, যেটি কিছু মানুষের ইসলাম ত্যাগের ফেতনার সময় নবীজির প্রথম প্রতিনিধি হযরত আবুবকর (রা.)-এর মুখ থেকে বের হয়েছিল এবং যেটি তাঁর খেলাফতে নবুওতের দায়িত্বের অনুভূতির আয়না, তাঁর ঈমানি মর্যাদাবোধ ও সিদ্দীকিয়াতের বহিঃপ্রকাশ ছিল আর যেটি ইতিহাসের ধারাকে এমনভাবে বদলে দিয়েছিল যে, মুরতাদ হওয়ার ধারা দেশজয়ের স্রোতে পরিণত হয়ে গেল। বাক্যটি ছিল–

اَيَنْقُصُ الدِّيْنُ وَاَنَا حَيٌّ

(আমি জীবিত থাকতে দ্বীনে কোনো ঘাটতি আসবে এ হতেই পারে না!)

রাবেতার সম্মেলন থেকে অবসর হয়ে – যেটি ৯ জুলাই শেষ হয়েছিল – আমি মৌলভী মুঈনুল্লাহ নদভী সাহেব ও মুহাম্মাদ মিয়ার সাথে নিউটাউন জামে মসজিদের খতীব কারী রশীদুল হাসান (নবাব সাইয়িদ নুরুল হাসান খান মরহুমের নাতি) সাহেবের বাসায় স্থানান্তরিত হলাম, যেটি দারুল উলূম নিউটাউনের বাউন্ডারিতে অবস্থিত। কারী সাহেব আমার ভাগিনী জামাই। তার ওখানে নিজঘরেরই মতো শান্তি ও আরাম ছিল। করাচিতে দিনকতক থাকার প্রোগ্রাম ছিল। আমাদের বংশের প্রায় দু-তৃতীয়াংশ সদস্য – যাদের বেশিরভাগই টুংক ও ভুপালের আত্মীয় – করাচিতে বসবাসরত। করাচির দূরত্ব সর্বজনবিদিত। তাদের কতক এমন আছেন, যাদের সঙ্গে দেখা হয়নি বহু বছর হয়ে গেছে। আমি করাচির এই সংক্ষিপ্ত সফরকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করলাম এবং সেই আত্মীয়-স্বজন ও ভাইদের সঙ্গে মিলিত হলাম। তাদের অনেকে মুহাম্মাদ মিয়ার নামটাই শুনেছে শুধু – দেখেনি কখনও। সেজন্য তার দেখা পেয়ে তারা অনেক খুশি হয়েছেন।

পুরাতন বন্ধুদের মাঝে মাওলানা মুহাম্মাদ নাযেম সাহেব নদভী বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বছরের-পর-বছর আমরা দুজন একসঙ্গে থেকেছি এবং দুজন একত্রে লেখাপড়া করেছি এবং ইল্‌মি ও দ্বীনি কাজ করেছি। দুজনের মাঝে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। এদের ছাড়া পাকিস্তানের সাবেক একাউন্টেন্ট জেনারেল শ্রদ্ধেয় ভাই সাইয়িদ মুহাম্মাদ জামীল সাহেবও আত্মীয়র চেয়ে কম ছিলেন না। এর আগে করাচিতে আমার সব সময় তাঁরই বাড়িতে থাকা হয়েছে। লাখনৌর অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধুও যখন আমার উপস্থিতির কথা জানতে (রাবেতার কনফারেন্সে প্রদত্ত আমার ভাষণ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছিল) পারল, তখন তারাও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে নিউটাউন এসে-এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে লাগল।

বক্তৃতাবলি ও মজলিসসমূহ

রাবেতার কনফারেন্স থেকে অবসর গ্রহণের পর সেই সভা-সমাবেশগুলোতে বক্তব্যদানের ধারা শুরু হয়ে গেল, যেগুলো আগে থেকেই প্রোগ্রাম করা ছিল কিংবা উপস্থিত সময়ে যেগুলোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে পাকিস্তানি কাওমি ইত্তিহাদের সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর গফুর আহমাদ (ফেডারাল মন্ত্রী শিল্প ও কৃষি পাকিস্তান সরকার)-এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি সংবর্ধনার ভাষণ (৯ জুলাই ১৯৭৮), করাচি ইউনিভার্সিটির ভাষণ (১১ জুলাই ১৯৭৮), দারুল উলূম কোরেঙ্গি করাচি (১২ জুলাই ১৯৭৮), মাদরাসায়ে আরাবিয়া নিউটাউন করাচি (১৩ জুলাই ১৯৭৮), হামদর্দ ন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের সভাপতি হাকীম মুহাম্মাদ সাঈদ সাহেবের আমন্ত্রণে সন্ধ্যায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত সভার ভাষণ (১৩ জুলাই ১৯৭৮), ইসলামাবাদ হোটেলে অনুষ্ঠিত ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিলের সংবর্ধনা সভার ভাষণ (১৮ জুলাই ১৯৭৮), যার সভাপতিত্ব সুপ্রিম কোর্ট পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি আনওয়ারুল হক সাহেব করেছেন, আল্লামা ইকবাল ওপেন ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদ (১৮ জুলাই ১৯৭৮), দারুল উলূম হাক্কানিয়া আখুরাখটক (১৯ জুলাই ১৯৭৮),[1]

---

১. এটি সেই জায়গা, যেখান থেকে হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর জিহাদ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এবং সেখানেই ২০ জুমাদাল উলা ১২৪২ হিজরিতে (২০ ডিসেম্বর ১৮২৬) মুজাহিদ ও মহারাজা রনজিৎ সিং-এর বাহিনীর মাঝে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যে যুদ্ধে মুজাহিদগণ জয়লাভ করেছিলেন। বিস্তারিত জানতে 'সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ' প্রথম খণ্ড; পৃষ্ঠা ৫০১-৫০৬ দেখুন।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ফয়সালাবাদ (২৩ জুলাই ১৯৭৮), জামেয়া তা'লীমাতে ইসলামিয়া ফয়সালাবাদ (২৩ জুলাই ১৯৭৮), ইসলামী জমিয়তে তালাবা পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি লাহোর (২৫ জুলাই ১৯৭৮), কুরআন একাডেমি মডেল টাউন, লাহোর (২৬ জুলাই ১৯৭৮) ও ওয়াক্‌ফ প্রসাশনের সদস দফতর (২৭ জুলাই ১৯৭৮)-এর ভাষণগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১]

এই ভাষণগুলোতে আমি – যেগুলোতে বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ, বুদ্ধিজীবি, শিক্ষাবিদ, বড়-বড় আলেমে দ্বীন, সাংবাদিক-সাহিত্যিক ও সমাজপতিগণ বিপুলসংখ্যক অংশগ্রহণ করেছেন – ইসলামি ইতিহাসের অধ্যয়ন, জীবনের অভিজ্ঞতা, নিজের সীমিত চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি ও নিষ্ঠার সারনির্যাস তুলে ধরেছি, যার পেছনে না কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, না ভালো-মন্দ কোনো প্রতিক্রিয়ার চিন্তা। কবি গালিবের ভাষায় (একটি শব্দের পরিবর্তনের সঙ্গে)–

نہ ستائش کی تمنا نہ گلہ کی پروا

'না প্রশংসার আশা রাখি, না জীবিকার পরোয়া।'

এই ভাষণগুলোতে শ্রোতাদের সামনে সেই বাস্তবতাগুলো তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো অনেক সময় বাইরের লোকেরা ঘরের লোকদের এবং যারা সব সময় দেখে তাদের তুলনায় বেশি অনুভব করতে পারে। কারণ, একটি বিশেষ আলো এবং বিশেষ স্তরের উষ্ণতা ও শীতলতার মাঝে অবস্থানকারী ব্যক্তি সেই পরিবেশের অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তারই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে ও শোনে। সেগুলোতে পাকিস্তানি ভাইদেরকে তাদের দায়িত্ব এবং সেই বৃহৎ ঘোষণা ও দাবির স্পর্শকাতরা ও বিরাটত্বের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার আবশ্যকতা ছিল, যার ওপর পাকিস্তানের ভিত রচিত হয়েছিল এবং তার জন্য ভারতীয় মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি কুরবানি দিয়েছিল এবং তার থেকে তারা কোনো স্বার্থ উদ্ধার করেনি। তাতে ইসলামি ইতিহাসের এই অধ্যয়ন, বিভিন্ন জাতি ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনীমালা থেকে সংগৃহীত এই ফলাফল বিশেষভাবে চমকাত যে, মুসলমান শক্তিগুলো, সরকার ও সমাজের সবচেয়ে ক্ষতি করেছে ক্ষমতালোভী ও সুবিধাবাদী মুসলমানরা।

---

১. এই ভাষণগুলোর সংকলন 'হাদীছে পাকিস্তান' নামে মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম, করাচির পক্ষ থেকে ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

এই ধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি দিয়েছি প্রফেসর গফুর সাহেবের বাড়িতে এক সংবর্ধনাসভায়। এই সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, শিক্ষিতজন, সমাজপতি, দেশবরেণ্য সাহিত্যিক ও সাংবাদিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই ভাষণটিতে আমি বলেছি–

'আপনাদেরকে তিনভাবে কুরবানি দিতে হবে। আমাদের প্রতিটি কুরবানির জন্য আমাদের ইতিহাসে একজন ইমাম বিদ্যমান আছেন। একটি কুরবানি হলো, যেটি সায়্যিদিনা হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) ইয়ারমুকে পেশ করেছিলেন যে, তাঁকে যুদ্ধ চলাকালীন পদচ্যুত করা হয়েছিল। কিন্তু তার কপালে কোনো ভাঁজ পড়েনি। তিনি বললেন, আমি যদি ওমরের জন্য লড়ে থাকি, তাহলে এখন আর যুদ্ধ করব না। আর যদি আমি আল্লাহর জন্য লড়াই করে থাকি, তাহলে আমার জোশ ও তৎপরতায় কোনো ব্যতিক্রম আসবে না। আর জগত দেখেছে, তাঁর জিহাদের জোশ ও শাহাদাতের তামান্নায় কোনো পরিবর্তন আসেনি।

'দ্বিতীয় কুরবানি হলো সেটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতি হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর মোকাবেলায় খেলাফত থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে উম্মতের ভাঙন রোধের জন্য পেশ করেছিলেন।

'তৃতীয় কুরবানি সেটি, যেটি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয় (রহ.) ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজকে ইসলামি জীবন ও ইসলামি চরিত্রের পথের ওপর তুলে আনার জন্য নিজের জীবনকে পরিবর্তন করে এবং নিজপরিবারের স্বার্থ থেকে চোখ বন্ধ করে পেশ করেছিলেন।

এখন এই তিন কুরবানিই পাকিস্তানের ইসলামি জনগোষ্ঠীর দিতে হবে।'

অবশেষে বলা হলো, বর্তমান শতাব্দি কোনো একজন মু'তাসিম বিল্লাহর অনুসন্ধান করে ফিরছে,[১] যিনি তাঁরই মতো দ্বীনি মর্যাদাবোধ ও ইসলামি ঐক্যের মহড়া দেখাবেন, সমগ্র ইসলামি দুনিয়ায়; বরং বিশ্বমানবতার জন্য সুবিচার, সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতার পৃষ্ঠপোষকতা করবেন এবং তাঁর নৈতিকতা

---

১. খলীফা হারুনুর রশীদের পুত্র খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ আব্বাসি। তাঁর কাছে সংবাদ এল, কোনো এক খ্রিস্টান দেশে একজন মুসলিম নারীর উপর অবিচারের ঘটনা ঘটেছে। শুনে তিনি তার নামে বাজি লাগালেন এবং ভরমজলিস পরিত্যাগ করে উঠে একটি অসিয়তনামা লিখে তাকে উদ্ধার করতে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।

ও চরিত্রের ক্রিয়ায়, তাঁর সম্মানে পৃথিবীর কোথাও কেউ কারও ওপর অবিচার করার সাহস পাবে না।

সন্ধ্যায় হামদর্দের সভায় যোগ দিলাম, যেটি অত্যন্ত কেতাদুরস্ত ও ফিটফাট ছিল। বক্তব্য শোনার জন্য মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে এসেছিল। এই সভায় আমি বলেছি, মিল্লাত ও মানবতার মুক্তির জন্য শুধু ঐক্য যথেষ্ট নয়। আসল বিষয় ঐক্যের সেই সূত্র ও সেই লক্ষ্য, যার ওপর এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের ইতিহাস প্রমাণ দেয়, অনৈক্যই অনৈক্যের সঙ্গে সঙ্ঘাতে জড়ায় না – ঐক্যও ঐক্যের সঙ্গে সঙ্ঘাতে লিপ্ত হয়। আর সেই ঐক্যগুলো, যেগুলো ভাষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, বংশ, দেশ কিংবা রাজনীতির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এখন পর্যন্ত গড়ার পরিবর্তে ভাঙনের কাজ বেশি করেছে। সেজন্য শুধু ঐক্য কোনো অর্থ বা উপকারিতা বহন করে না।

এ যাবত যে ঐক্যের সবচেয়ে ভালো পরীক্ষা হয়েছে, সেটি হলো ইসলামের সেই ঐক্য, যার ভিত্তি ছিল আল্লাহর একত্বের বিশ্বাস, মানবতার মর্যাদা, সুবিচার ও সাম্যের নীতি ও মানুষের নিঃস্বার্থ সেবার প্রত্যয়ের ওপর। তারপর ইকবালের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি কোট করে বলেছি, আত্মম্ভরিতা ও শক্তির নেশায় মানবতার জামা কতবার ছিঁড়েছে, জ্ঞান ও বিবেক কিভাবে খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে, তার হিসাব কেউ রাখেনি। আপনাদেরকে ঐক্যের মাধ্যমে মানবতার বিনির্মাণে কাজ করতে হবে। আপনাদেরকে সেই জাহিলি সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত হতে হবে, যেটি মাঝে-মধ্যে ভাষা বা সনাতন সভ্যতার পুনর্জীবনের নামে আত্মপ্রকাশ করে, যার মাঝে ইসলামি যুগের আগেকার সভ্যতা-সংস্কৃতিকে জীবিত করে তোলার স্লোগান দেওয়া হয় এবং যার শঙ্কা পাকিস্তানেও বিদ্যমান। সেটি এই দেশটিকে টুকরো-টুকরো করে ছাড়বে।

ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিলের প্রদত্ত সংবর্ধনায় বলেছি, ইসলামি বিশ্ব একটা অন্তবর্তী যুগ অতিক্রম করছে। যে ডালের ওপর দেশ ও জাতির বাসা বিদ্যমান, সেই ডালটি হলো সমাজ ও দেশের সাধারণ জীবন ও নাগরিকদের স্বভাব ও চরিত্র। এই ডাল যদি এই বাসার ভার বহন করতে সক্ষম না হয়, তাহলে এই বাসা শূন্যে ঝুলে আছে এবং তার কোনো ভরসা নেই। সমাজ হলো জমি আর অন্য সবকিছু হলো বাগান ও ইমারত। এই ভূমি যদি কুরআনের ভাষায় 'বালির টিলা' হয়, যেটি সারাক্ষণ স্থানান্তরিত হতে থাকে

আর আমাদের সমাজ যদি হয় উড়ন্ত বালি, তাহলে ধরে নিতে হবে গোটা দেশ, সরকার, প্রতিষ্ঠান, উন্নতি, সভ্যতা এসব হলো পানির ওপর অঙ্কন।

ওয়াক্ফ প্রশাসনের ভাষণে বলা হয়েছিল, দুনিয়া হলো একটি পবিত্র ওয়াক্ফ আর মুসলমান তার মুতাওয়াল্লী। আল্লাহর এই লোকালয়টা কোনো দোকান নয়। না এটা কোনো জুয়ার আসর, না শক্তিমানদের শিকারের জায়গা।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাষণাবলিতে মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাবিষয়ক সমস্যাবলির আলোচনা করেছি এবং ইসলামি দুনিয়ায় উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ও রীতি কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে আলোকপাত করেছি। শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষালয়গুলোর আসল উদ্দেশ্য হলো, ইসলামি বোধ-বিশ্বাস ও মহান পূর্বসূরীদের থেকে প্রাপ্ত আদর্শ ও জ্ঞানের ভাণ্ডারটি নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া; এমনকি এগুলোকে তাদের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে দেওয়া, যেন তারা জ্ঞানে ও চিন্তা-চেতনায় এর যোগ্যরূপে গড়ে ওঠে এবং তাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক এর ওপর আশ্বস্ত হয়ে যায়। সর্বোপরি তারা যেন চরিত্র গঠনের কর্তব্য পালন করে, শুধু বিদ্যা অর্জন করেই ক্ষান্ত না হয়, পরকালের অনন্ত জীবনে সুখী হতে পারে এবং ইসলামি প্রজন্মের সাহিত্যিক ও পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবিদের 'জরবে কালীমি' দান করতে সক্ষম হয়। কারণ, এগুলো ছাড়া না পাথর পানি হতে পারে, না সমুদ্র জয় হতে পারে।

আল্লামা ইকবাল ওপেন ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদের ভাষণে ইসলামি দেশগুলোতে চিন্তার দ্বন্দ্ব ও তার কারণ নির্ণয়ে আলোকপাত করেছি এবং বলেছি, বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামি জনগোষ্ঠীকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে দিয়েছে, যাদের এক শ্রেণী অপর শ্রেণী সম্পর্কে শুধু অপরিচিতই নয়; বরং পরস্পর মুখোমুখী অবস্থানে রয়েছে। আর এটিই এই দেশগুলোর অস্থিরতা, নিত্যদিনকার বিবাদ-বিসম্বাদ, শাসক শ্রেণীর শক্তিগুলো বিফলে যাওয়া ও অপাত্রে ব্যয় হওয়ার কারণ, যেটি জাতির বুকের ঈমানি ঝরনা থেকে বিদ্যুত ও শক্তি সৃষ্টি করার পরিবর্তে প্রতিনিয়ত তাকে প্রতিরোধ করতে এবং বুকের মাঝে চাপ তৈরি করে রাখতে বাধ্য করে।

একটি ভাষণ এদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী (মাজমাউল বুহূছিল ইসলামিয়্যা) ইসলামাবাদে ইমাম চতুষ্টয় ও পূর্বসূরী আলেমগণের ফিক্‌হি ও

ইজদিহাদি প্রচেষ্টা ও জগতের সমস্ত ব্যস্ততা ও মনোযোগ থেকে পুরোপুরি একাগ্র হয়ে মাসআলা উদ্ভাবন ও ফিক্হি মাযহাবগুলো সুবিন্যস্ত সংকলনের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করা বিষয়ে প্রদান করেছি। এই ভাষণটি আরবিতে ছিল। এই সভায় প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ ও বিশিষ্ট আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভাষণাবলিতে বলেছি বর্তমান যুগের চ্যালেঞ্জ কী এবং আলেমদের দায়িত্ব কী। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বস্তুবাদ। এর ওপর জয়ী হলে আমাদেরকে যে শক্তিটির দরকার, সেটি হলো অটল ঈমান, গভীর জ্ঞান, দুনিয়াবিমুখতা, কানা'আত, আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস। এটিই সেই অস্ত্র, যার দ্বারা আপন-আপন যুগের আলেমগণ সমাজের ওপর তাঁদের মর্যাদার ছাপ বসিয়েছেন এবং বড়-বড় প্রতাপশালী শাসক ও ক্ষমতাবানদের ঘাড় তাদের সামনে অবনত হয়ে গিয়েছিল। সেই সহজ-সরল লোকগুলোর আজও প্রয়োজন আছে, যারা এই গুণে গুণান্বিত হবেন। এই শূন্যতা – যেটি আমাদের সমাজে এই শ্রেণীটির অনুপস্থিতির কারণে সৃষ্টি হয়েছে এবং যার ফলে সমাজ বিশৃঙ্খলা আর সমাজের জ্ঞানবান শ্রেণীটি রাক্ষুসে ক্ষুধায় আক্রান্ত – এই নায়েবে রাসূলদের ছাড়া আর কেউ পূরণ করতে পারবে না, যাঁরা কিতাব ও হেকমতের সাথে আত্মশুদ্ধিরও ধারক।

দ্বীনি ইল্‌মের ছাত্রদের উদ্দেশে বলা হয়েছিল, কালের বিবর্তনের অভিযোগ অর্থহীন। আল্লাহর রীতি অপরিবর্তনীয়। তার একটি হলো উপকারিতার সম্মান ও স্বীকৃতি এবং উপকারীর অন্বেষণ। উপকারিতা ও যোগ্যতার মাঝে আল্লাহ বশীকরণশক্তি ও চুম্বকের আকর্ষণ রেখেছেন। আপনারা কোনো একটি বিদ্যায় বিশিষ্টতা অর্জন করুন; দেখবেন, সেই বিদ্যা আপনার চোখের তারা হয়ে যাবে। কবির ভাষায়–

کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی

'শোনো প্রিয়! যেখানেই থাক-না কেন; গুণ-যোগ্যতা অর্জন করো।'

নিষ্ঠা ও বিশেষ যোগ্যতা এমন দুটি রাজপালক, যার ওপর ভর করে আপনি শূন্যে উঁচু থেকে উঁচুতে উড়তে পারেন। আমি আরও বলেছি, দ্বীন হলো জীবন্ত এবং জীবিতদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কোনো প্রতিষ্ঠান ইতিহাস দ্বারা

নয় – আন্দোলন দ্বারা চলে। আলেম সমাজকে ইল্‌মি গভীরতা, সজাগ মস্তিষ্ক, কর্ম ও কুরবানির শক্তিই জীবিত রাখতে পারে।

পাকিস্তানের এই সফরে একটি বিষয় আমাকে খুব আনন্দিত করে তুলেছিল। আমার স্নেহাস্পদ মৌলভী ফজলে রাব্বী নদভীর প্রচেষ্টায় আমার রচনাগুলো পাকিস্তানে খুব প্রচার পেয়েছে। তিনি আমার বইগুলোর প্রচার-প্রসারের জন্য এই বছরদুয়েক হলো 'নশরিয়াতে ইসলাম' নামে নাযেমাবাদ, করাচিতে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছেন। তার এই উদ্যোগের ফলে পাকিস্তানে আমার বইগুলো খুব প্রচার পেয়েছে। পাকিস্তানের রুচিবান নাগরিকরা আমার বইগুলো হাতে-হাতে তুলে নিয়েছে। অধিকাংশ সভায় আমি দেখেছি, লোকেরা, বিশেষ করে যুবকরা আমার কোনো-না-কোনো একটি বই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমার একটি অটোগ্রাফ পাওয়ার আবেদন জানাচ্ছে। দ্বীনের একজন দাঈ ও বিশেষ কোনো চিন্তা ও লক্ষ্যের ধারক লেখকের জন্য এটি খুবই আনন্দের বিষয়। একটি বিষয় দেখে স্বভাবতই আমার খুব আনন্দ লেগেছে এবং আমি বেশ আশ্বস্ত হয়েছি যে, আমার বইগুলো এদেশে এত অধিক প্রচার পেয়েছে, যতখানি বোধহয় ভারতেও পায়নি।

গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতসমূহ ও প্রাসঙ্গিক সফর

পাকিস্তানের এই সফরে আমি যাদের সঙ্গ লাভ করেছি এবং তারা আমার এই আগমন দ্বারা – যেটি দীর্ঘ বিরতির পর হয়েছে – উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করেছেন, তাদের মধ্যে জাস্টিজ আফজল চিমা সাহেব (সভাপতি নযরিয়াতি কাউন্সিল), মাওলানা যাফর আহমাদ সাহেব আনসারি, মাওলানা হাকীম আবদুর রহীম আশরাফ, মাওলানা সায়্যাহুদ্দীন কাকাখেল, মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানি ও মাওলানা সামীউল হক সাহেব (আখুরাখটক) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদিন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত ডাক্তার আবদুল হাই সাহেব আরেফি মুদ্দাযিল্লুহুও এসে আমাকে সাক্ষাতদানে ধন্য করেছেন। লাহোরে আমি ডাক্তার মুনীর সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করি। একদিন জাস্টিজ মুশতাক সাহেব,[১] চিফ জাস্টিজ পাঞ্জাব হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনে আমাকে

১. ইনিই জুলফিকার আলী ভুট্টোর ব্যাপারে সেই ঐতিহাসিক রায়টি দিয়েছিলেন, যার গুঞ্জন পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানে দীর্ঘদিন যাবত শোনা গিয়েছিল।

দাওয়াত করলেন। এই বৈঠকে হাইকোর্টের বিচারপতিবৃন্দ ও বিশিষ্ট আইনজীবিগণের সঙ্গে ইসলামি বিচারব্যবস্থা চালু করা, তার প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় হয়। লাহোর অবস্থানকালে মধ্যখানে জুমা এল। আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে আমার পুরনো বিদ্যাপীঠ ও বিশ্বাসের কেন্দ্র শেরনাওয়ালা দরওয়াজার লাইনওয়ালী মসজিদে জুমা আদায় করলাম, যেটি মাওলানা আহমাদ আলী সাহেব (রহ.)-এর দরসে কুরআন ও জনকল্যাণের কেন্দ্র ছিল।

হযরতের পুত্র মাওলানা উবায়দুল্লাহ আনওয়ার আমার সঙ্গে ভাই ও বন্ধুসুলভ আচরণ করলেন এবং সাদর আতিথেয়তা দ্বারা ধন্য করলেন। আমার পুরনো বন্ধু ও সুহৃদ হাজী আবদুল ওয়াহেদ এম.এ, ডাক্তার আবদুল্লাহ চুগতাই ও মাওলানা যাফর ইকবাল সাহেব প্রমুখের সঙ্গে দেখা করে পুরনো আমলের স্মৃতি তাজা করলাম। লাহোর পৌঁছে আমার অনুভূত হলো, আলেম, সাহিত্যিক ও জ্ঞানীজনদের একটি প্রজন্মের (যাদের সঙ্গে আমার ১৯২৯-১৯৪৭ সালের মধ্যে পরিচয় হয়েছিল) বেশিরভাগ সদস্য এই নশ্বর জগত পরিত্যাগ করে অবিনশ্বর জগতে পাড়ি জমিয়েছেন।

কবির ভাষায়–

إِذَا ذُرْتُ أَرْضًا بَعْدَ طُوْلِ اجْتِنَابِهَا
فَقَدْتُ صَدِيْقِيْ وَالْبِلَادُ كَمَا هِيَا

'দীর্ঘদিন পর আমি যখন কোনো ভূখণ্ডে যাই, গিয়ে দেখি, আমার বন্ধুরা অনেকে হারিয়ে গেছে; অথচ নগরী যেমনটা তেমনই আছে।'

আমি শাহী মসজিদ, জাহাঙ্গিরের দুর্গ, আল্লামা ইকবালের সমাধি, শাহেদরাহ (জাহাঙ্গিরের সমাধি) গিয়ে পুরনো স্মৃতিগুলো তাজা করলাম। যেন ভাববাচ্য বলছিল–

ہو اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ
ادھر سے مدتوں آیا گیا ہو

'এই গলির প্রতিটি অণু সম্পর্কে আমি অবহিত। কারণ, এ পথে আমি বহুবার আসা-যাওয়া করেছি।'

একদিন ডক্টর ইসরার আহমাদের পীড়াপীড়িতে তাঁর দ্বীন প্রচার কেন্দ্র মডেল টাউনে কুরআনের ছাত্র ও শহরের ধর্মপরায়ণ লোকদের উদ্দেশে

বক্তৃতা করি। সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হলাম প্রিয় ভাই সাইয়িদ আহমাদ আল-হাসানী, সাইয়িদ ইবরাহীম হাসানী ও সাইয়িদ ইসহাক হাসানীসহ[১] ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের দেখা পেয়ে, যারা মূলত একই পরিবারের সদস্য ছিলাম এবং লাখনৌ ও রায়বেরেলিতে বছরের-পর-বছর একসঙ্গে ছিলাম। কিন্তু এখন সবাই যার-যার জায়গায় থাকি – কারও সঙ্গে কারও দেখা হয় না।

লাহোর এসে এখানে জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদুদীর সঙ্গে তাঁর আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব ও আমাদের দুজনের পুরনো সম্পর্কের কারণে সাক্ষাত না করা আমার মেজাজের পরিপন্থী ছিল। আমি নাকী নবাব সাহেবের মাধ্যমে – যিনি আমাকে ফয়সালাবাদ থেকে লাহোর আসার ব্যবস্থা করেছিলেন – মাওলানার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতের জন্য সময় চাইলাম। তিনি দিনের ৯-১০টা সময় দিলেন। আমরা দুজন অতিশয় আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে মিলিত হলাম। হাঁটুর ব্যথার কারণে মাওলানা হাঁটাচলা করতে অক্ষম ছিলেন। আলাপচারিতায় জেনারেল জিয়াউল হকের কথা উঠল। মাওলানা বললেন, তাঁকে কোনোভাবেই ব্যর্থ হতে দেওয়া উচিত হবে না। আমি তাঁকে আমার আন্দোলন 'পয়ামে ইনসানিয়াত'-এর সঙ্গে পরিচিত করলাম, যেটি আমরা ভারতে পরিচালনা করছিলাম। মাওলানা বললেন, সমাজ সংশোধনের জন্য পাকিস্তানেও তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রখ্যাত আমেরিকান নওমুসলিম ও লেখিকা মুহতারামা মরিয়ম জামীলার সঙ্গেও তার বাসভবনে আমার সাক্ষাত হয়। আমরা দুজন রচনার মাধ্যমে পরস্পর পরিচিত হয়ে গিয়েছিলাম এবং দুজনের চিন্তা-চেতনায় অনেক মিলও পাওয়া যাচ্ছিল। এই বৈঠকে তার স্বামী মুহাম্মাদ ইউসুফ খান ও তার এক সন্তানও উপস্থিত ছিলেন।

এই ভ্রমণের সবচেয়ে জরুরি ও প্রিয় সফর ছিল আমার শায়খ ও মুরশিদ মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব রায়পুরির বাড়ি ও সমাধিস্থল সার্গোদ জেলায় হাজিরি দেওয়া। ওখানে আমি দুদিন অবস্থান করি, যেটি আমার এই সফরের সবচেয়ে আনন্দঘন, শান্তিময় ও বরকমতয় মুহূর্ত ছিল। শ্রদ্ধেয়

---

১. আমাদের বংশে হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর যাদের রক্তের সম্পর্ক আছে, এই তিন ভাই তাদের মধ্যে সবার বড়। তাদের দাদা সাইয়িদ ইসহাক সাহেব মরহুম সাইয়িদ সাহেবের আপন নাতি ছিলেন। তিনি আমার পিতাজির ফুফা ও বংশের সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।

মাওলানা আবদুল জলীল সাহেব (হযরত রায়পুরির ভাতিজা) ও মাওলানা হাফেয আবদুল ওয়াহীদ সাহেব (হযরত রায়পুরির ভাগিনা) আমার সঙ্গে ভাই ও বন্ধুর মতো আচরণ করলেন। আমার ভক্তবৃন্দও বরাবর আসতে থাকে আর আমি তাকে নিজের বাড়ি মনে করে ওখানে অবলীলায় অবস্থান করি। আমার বন্ধুদের মাঝে বিশেষভাবে মুহাম্মাদ মিয়া (মুহাম্মাদ আল-হাসানী) মরহুম এখানকার এই আনন্দঘন মুহূর্তগুলোকে খুব স্মরণ করতেন।

করাচিতে আরবি ভাষার পণ্ডিত ও সাহিত্যিক আল্লামা আবদুল আযীয মায়মানের সঙ্গেও আমার দেখা হলো। এই সাক্ষাতের জন্য তিনি নিজেই অপেক্ষমাণ ও আগ্রহী ছিলেন। আমি সাহস করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আরবির কতগুলো কবিতা আপনার মুখস্থ আছে? তিনি কয়েক সেকেণ্ড নীরব থেকে বললেন, এই তো ৭৫ হাজার থেকে এক লাখের মধ্যে হবে।

যেহেতু রমযানের আর অল্প কদিন বাকি ছিল; তাই সফর সংক্ষিপ্ত করে আমাকে ভারতে চলে আসতে হলো। এই সফরে পেশোয়ার – যেখান থেকে নদভী বন্ধুরা আমাকে নিতে এসেছিল – এবং বালাকোট যেতে না পারার আক্ষেপ মনে রয়ে গেল, যেখানে বন্ধুরা সাইয়িদ আহমাদ শহীদের উত্তরসূরীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

শুধু পাকিস্তান অবস্থানকালেই আমি ওখানকার অধিবাসীদের – যাদের সঙ্গে আমার দ্বীন, বংশ, সভ্যতা ও সমাজের দ্বিগুণ-দ্বিগুণ ও গভীর-গভীর সম্পর্ক ছিল এবং যাদের সঠিক কর্মনীতি ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সঙ্গে খোদ ভারতীয় মুসলমানদের মর্যাদা ও নিরাপত্তার অনেক সম্পর্ক ছিল এবং একটি মুসলিম রাষ্ট্রে হিসেবেও তাতে স্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করা জরুরি ছিল – সঠিক পরামর্শ প্রদান এবং তাদের সামনে বসে দ্বীন ও জীবনের স্বরূপ উপস্থাপনের ওপরই ক্ষান্ত হইনি; বরং ওখান থেকে চলে আসার পরও এর ধারা চালু থাকল। বিশেষভাবে আমার স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ মিয়া ওখানকার পরিস্থিতি অধ্যয়ন ও অবগতির আলোকে অত্যন্ত জোরালো ও গবেষণামূলক অনেকগুলো নিবন্ধ লিখেছিল, যার বেশিরভাগ তা'মীরে হায়াত' ও 'নেদায়ে মিল্লাত'-এ প্রকাশিত হয় এবং কোনো-কোনো স্বনামধন্য পাকিস্তানি পত্রিকাও সেগুলো পুনঃপ্রচার করে। সেগুলোর কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য ছিল, পাকিস্তানের পরিস্থিতিতে এই মুহূর্তে স্থিতিশীলতা বজায় থাকা এবং ধর্মপ্রিয় শ্রেণীটিকে দেশের সংশোধনের সুযোগ দেওয়া সবচেয়ে বড় কাজ এবং যেকোনো মূল্যে

বিশৃঙ্খলা, তাড়াহুড়া, অধৈর্য ও 'নতুনেই স্বাদ'-এর দর্শন থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলতে হবে, যেটি কিনা অধিকাংশ মুসলিম দেশের মেজাজে পরিণত হয়ে গেছে।

তাছাড়া এই তথাকথিত গণতন্ত্র ও বারবার নির্বাচনের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, যার ফলে সমাজের অসুস্থ মানসিকতা দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত ভ্রষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা ও ক্ষতিকর প্রচারমাধ্যমের প্রভাবে ভালো কোনো দলের পক্ষে ক্ষমতায় সিংহাসনে আরোহণের আশা করা যায় না এবং সেই যুগটা ফিরে আসার আশঙ্কা পুরোপুরি বিদ্যমান, যার থেকে অনেক কষ্টে উদ্ধার পাওয়া গেছে। তার সেই নিবন্ধগুলোর সংকলন 'নাশরিয়াতে ইসলাম নাযেমাবাদ করাচি' 'পাকিস্তান উমীদূঁ ওয়া আন্দীশূ' কে ছায়া মেঁ' (আশা ও শঙ্কার ছায়ায় পাকিস্তান) নামে প্রকাশ করেছে।

একটা গুরুতর পারিবারিক দুর্ঘটনা ও পরীক্ষা

পাকিস্তান সফর থেকে ফিরে আসার পর একটি মাসও অতিক্রম করেনি; এই সময়ে ১৯৭৯ সালের ১৪ জুন আমার জীবনে সেই বিরাট ঘটনাটা ঘটে গেল, যেটা শুধু আমার মন, মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও ক্ষুদ্র একটি পরিবারের সীমাবদ্ধ জীবনকেই নয় – আমার সমস্ত চিন্তা, বিদ্যা, দাওয়াতি জীবন, কর্মপরিকল্পনা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনাকে ওলট-পালট করে দিল। ঘটনাটা হলো আমার (সত্যিকার অর্থে) প্রাণপ্রিয় মুহাম্মাদ আল-হাসানি ওরফে মুহাম্মাদ মিয়ার মৃত্যুর ঘটনা, যার ধরন ছিল তারই পিতা ও আমার মুরব্বী ডাক্তার হাকীম মৌলভী সাইয়িদ আবদুল আলী সাহেব (রহ.)-এর মৃত্যুঘটনার মতো। পবিত্র কুরআন হযরত মূসা (আ.)-এর দু'আ উদ্ধৃত করেছে–

وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ۝ هٰرُوْنَ اَخِي ۝ اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ۝ وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ۝

'আপনি আমাকে আমারই পরিবার থেকে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী ঠিক করে দিন; আমার ভাই হারুনকে। আর তাকে দিয়ে আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন আর তাকে আমার কাজে আমার অংশী বানান।'

কিন্তু এটি ছিল মুখের কথার দু'আ, যেটি আল্লাহ কবুল করেছেন। আর অবস্থা হিসেবে আমার দু'আয় 'আমার ভাই'-এর পরিবর্তে বলা চলে وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ مُحَمَّدَ بْنَ اَخِيْ আমার ও তার মাঝে চিন্তা, রুচি, মেজাজ, রচনা ও চিঠির মান এবং রচনার ধারায় এতটাই মিল ছিল, যেমনটি দুজন ব্যক্তিত্বের

মাঝে খুবই কম দেখেছি। সম্ভবত তারই ফল ছিল যে, আমি লাখনৌ থেকে কয়েকশো মাইল দূরে বোম্বাইয়ে – যেখানে এক সফর থেকে ফেরার পথে অবস্থান করছিলাম -- তার মৃত্যুর আগের দিন স্বপ্নে দেখলাম, লাখনৌর যে ঘরে আমি ও সে আমার ভাইজানের স্নেহের ছায়ায় প্রতিপালিত হয়েছিলাম, সেখানে আমি মারা গেছি এবং আমি আলমে বরযখ থেকে পরিবারের লোকদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি; কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে আবার ওখানে ফিরে যেতে হবে। আমি এই বলেও আক্ষেপ করছিলাম যে, আমি আয়ু খুব কম পেয়েছি। পরদিনই তার মৃত্যুর ঘটনাটা ঘটে গেল।[১] ১৫ জুন যখন আমি বোম্বাই থেকে রায়বেরেলি পৌঁছলাম, ততক্ষণে এখানে সব কিছু সম্পন্ন হয়ে গেছে।

আরবিতে তার দক্ষতা সম্পর্কে আমি বেশি কিছু লিখতে চাই না। কারণ, তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-ইসলামুল মুমমতাহানু'র ভূমিকায় এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেছি। এখানে আমি তারই কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করে ক্ষান্ত হতে চাই।

'আরব বিশ্বে ধর্মবিমুখ ইসলামপরিপন্থী জাতীয়, সমাজতান্ত্রিক ও বস্তুবাদী আন্দোলন ও প্রচারণা এবং বস্তুতান্ত্রিক জীবন তাদের স্বভাবে এমন একটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দিল, যে তাদের কলমকে এমন একটি ঝরনায় পরিণত করে ফেলল, যে পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ফুঁসে উঠছে এবং অত্যন্ত জোশ ও শোরের সঙ্গে পতিত হচ্ছে। তারই ফলে তাদের কলম থেকে এমনসব বিষয়বস্তু নির্গত হয়েছে, যেগুলোর মাঝে ঝরনার শোর আর তুফানের জোর বিদ্যমান। হয়তবা অনেকের জন্য আমার একথাটি অসহ্য মনে হবে এবং অনেকে একে বাড়াবাড়ি বলে ধরে নেবেন যে, তারা এখন সাইয়িদ কুতুব শহীদ (রহ.)-এর চোখে চোখ রেখে কথা বলছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, একজন অনারব যুবক (মুহাম্মাদ মিয়া) আর একজন পরিণত বয়সের আরব সাহিত্যিক (সাইয়িদ কুতুব)-এর মধ্যকার পার্থক্য মাথায় রেখে কোথাও কোথাও তাদেরও অতিক্রম করে ফেলে যে, ফোয়ারার গতি তারই জোশের ফলাফল হয়ে থাকে। আর এই জোশ তারা তাদেরই পিতৃপুরুষ ও হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর সম্পর্ক ও ভক্তি থেকে লাভ করেছে, যার নজির মধ্যপ্রাচ্যে একদম অনুপস্থিত না হলেও থাকলে আছে একেবারেই সামান্য।

---

১. মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৪৪ বছর।

আমি এই নিবন্ধটি – যেটি 'পুরানে চেরাগে অন্তর্ভুক্ত – ফারসির একটি কবিতা দ্বারা সমাপ্ত করেছিলাম। সেই কবিতাটিও এখানে উদ্ধৃত করছি যে, প্রকৃত অবস্থা ফুটিয়ে তুলতে এবং হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে এর চেয়ে ভালো আর কোনো ব্যবস্থা হতে পারে না।

মুহাম্মাদ মিয়ার ইনতেকালে আমি আমার আরবি রচনার একজন শ্রেষ্ঠ অনুবাদক, আরব জাতীয়তাবাদ ও আরব জনগণের বিপথগামিতার একটি সমালোচনাকারী জোরালো কলম, আরবি ভাষায় দ্বীনের একজন প্রচারক, বিদগ্ধ মুজাহিদ, উরদুর ভালো একজন নিবন্ধকার ও জীবনীকার হারালাম। আমার জন্য আরও একটা বিরাট ক্ষতি ছিল যে, 'পয়ামে ইনসানিয়াতে' আমার কলমি মুখপাত্র ও তার সঙ্গে শতভাগ একাত্মতা পোষণকারী একজন সহকর্মী আমার থেকে জুদা হয়ে গেল, যার দ্বারা আমি সব সময় মহামূল্যবান সহযোগিতা পেয়েছি।

আরও একটা দুর্ঘটনা

মুহাম্মাদ মিয়ার পর এবং তার বর্তমানেও সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা আমি স্নেহাস্পদ মৌলভী ইসহাক জালীস নদভী থেকে পেতাম, যার ওপর আন্দোলনে আমার সব কজন সহকর্মীর চেয়ে বেশি আস্থা রাখতে পারতাম এবং যিনি স্থান-কাল-পাত্র বুঝে কথা বলা এবং শ্রোতাদের প্রতিটি শ্রেণীকে প্রভাবিত করার আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তিনি যেখানেই যেতেন, মানুষ তার ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে যেত। তিনিও আপন সহকর্মী ও সুহৃদ মুহাম্মাদ মিয়ার ইনতেকালের মাত্র তিন সপ্তাহ পর ৮ জুলাই ১৯৭৯ আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। আমি তারও জানাযা-দাফনে অংশ নিতে পারিনি। আমি এই হৃদয়বিদারক লেখাটি এই দুই প্রিয় ব্যক্তির আত্মাকে সম্বোধন করে একটিমাত্র শব্দ সংযোজন করে এই পঙ্ক্তিটি দ্বারা শেষ করছি–

زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا
تمہیں سو گئے داستاں کہتے کہتے

'পরম আগ্রহের সঙ্গে শুনছিল যুগ। কিন্তু তোমরা কাহিনী বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়েছ!'

দ্বাদশ অধ্যায়

সৌদি রাষ্ট্রপ্রধান ও দায়িত্বশীলগণের নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ লিখিত বার্তা, হারাম শরীফের অপ্রীতিকর ঘটনা, কাতারের সীরাত কনফারেন্স ও ফয়সাল এওয়ার্ড

একটি গুরুত্বপূর্ণ লিখিত বার্তা

পাঠকগণ লেখকের সেই তুচ্ছ প্রচেষ্টাগুলো সম্পর্কে অবগত আছেন, যেগুলো তিনি শুরু থেকেই পবিত্র হেজায ও জাযীরাতুল আরবকে তার সঠিক মর্যাদা ও অবস্থানের ওপর দেখার বাসনার বহিঃপ্রকাশ ও সেই আশঙ্কাগুলো চিহ্নিত করার ধারাবাহিকতায় করে আসছিলেন, যেগুলো প্রত্যেক মুসলমানের জন্য উদ্বেগের কারণ। এই ধারাটি শুরু হয় আমার প্রথম হজ্বসফরের সময়। তখন সৌদি সরকারের ভাবী রাজা সৌদ ইবনে আবদুল আযীয-এর নামে একটি সবিস্তার পত্রের মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছিল, যার আলোচনা এই বইয়ের প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে এসেছে এবং যেটি পরে بين الجباية والهداية নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারে প্রকাশিতও হয়েছে। তারপর বাদশাহ ফয়সাল মরহুমের সঙ্গে (যিনি রাষ্ট্রের আসল মস্তিষ্ক ছিলেন) ব্যক্তিগত সাক্ষাত ও তাঁর নামে বিস্তারিত পত্রের ধারা তাঁর শাহাদাত পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এ সময়ে দেশের অন্যান্য দায়িত্বশীলবর্গ, বাদশাহ ফাহাদ (যিনি বাদশাহ খালেদের স্থলাভিষিক্ত ও রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হন), বাদশাহ খালেদ, শিক্ষামন্ত্রী এবং হজ্ব ও আওকাফ মন্ত্রীর সঙ্গে পত্রযোগাযোগের ধারা চালু থাকল। সেই পত্রগুলোর সমষ্টি আরবিতে کیف ننظر المسلمون الی الحجاز و جزیرۃ العرب আর উরদুতে حجاز مقدس اور جزیرۃ العرب امیدوں اور اندیشوں کے درمیاں নামে প্রকাশিত

হয়েছে। রাবেতা আলমে ইসলামী ও জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারার কমিটির মিটিং ও কনফারেন্সগুলোর স্টেজ থেকেও এবং মুতামার আদ্দাওয়া ওয়াদ্দু'আত ও মুতামারুত তা'লীম-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও বৈঠকগুলোতেও এ বিষয়টি নানা আঙ্গিকে ও নানা ধরনে উপস্থাপন করা হচ্ছিল। আর দূর দেশের একজন মুসলমানের পক্ষে – যার কোনো রাষ্ট্রীয় পদ বা ক্ষমতা নেই – এর চেয়ে বেশি কিছু করার ক্ষমতা ছিল না!

কিন্তু এই দেশটিতে বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে বছরে দু-তিনবার উপস্থিতি, প্রতিবার কয়েক সপ্তাহ; এমনকি কোনো-কোনোবার কয়েক মাস অবস্থান করা, দেশটির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিটি শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, চিন্তাবিদ ও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুবাদে এবং দেশ থেকে নিত্য প্রকাশমান পত্র-পত্রিকার অধ্যয়ন ও রোজকার প্রত্যক্ষদর্শনের ফলে আমি ওখানকার জীবনের স্বরূপ ও ঘটনাবলি জ্ঞাত হতে থাকি এবং দিন-দিন এই অনুভূতি তীব্র-থেকে-তীব্রতর হতে থাকে যে, মোটের ওপর দেশ ও সমাজের মোড় দ্রুতগতিতে পাল্টে যাচ্ছে। যদিও তাতে কোনো পরিকল্পনা, বিদেশি প্রভাব বা ষড়যন্ত্রের কোনো দখল ছিল না।

আমি আরও অনুভব করলাম, পরিবর্তনের এই গতি যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে আল্লাহ না করুন সেই দিনটি বেশি দূরে নয়, যেদিন বাইতুল্লাহ শরীফ ও তার আশপাশ এই উন্নত জীবন ও সমাজের (যে কিনা নিজের জন্য ইউরোপ-আমেরিকাকে আদর্শ বানিয়ে নিয়েছে) সমুদ্রে একটি দ্বীপের বেশি কিছু থাকবে না এবং এমন একটি প্রজন্মের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যারা হারাম শরীফের নির্মাণ ও তার আবেদন সম্পর্কে পুরোপুরি অনবহিত থাকবে আর এই উপসাগর বিস্তৃত-থেকে-বিস্তৃততর এবং গভীর-থেকে-গভীরতর হতে থাকবে। আর স্রেফ হজ্ব সম্পাদন (যার কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকা আল্লাহপাকের অমোঘ সিদ্ধান্ত) আর বাইরের মুসলিম দেশগুলোর মুসলমানদের দ্বীনি চেতনা, ইসলাম ও আল্লাহর রাসূলের জন্মভূমির শ্রদ্ধা ও নবীপ্রেমই শুধু তাকে ইসলাম ও ইসলামি বিশ্বের সঙ্গে জুড়ে রাখবে।

এখানকার সভ্যতা ও সামাজিক বিপ্লব, জাগতিক উন্নতি, পাশ্চাত্যের অনুসরণ ও মিডিয়ার প্রভাবে বাইরে থেকে আসা মুসলমানরা এখানে তাদের ঈমান ও দ্বীনি জযবাকে খোরাক দেওয়া ও তাদের সামনে অনুসরণীয় ইসলামি চরিত্র ও সমাজের নমুনা উপস্থাপনকারী উপাদান ও পরিবেশ পাবে

না, দূর দেশগুলোর অনারব মুসলিম দেশগুলোর যার সব সময় প্রয়োজন। বরং এই আশঙ্কাও আছে যে, মানুষ এই পবিত্র ভূমিতে এসে (যার মাটিকে তারা চোখের সুরমা বানানোর জন্য পাগলপারা থাকে এবং যার প্রতিটি কথা ও কাজকে তারা দলিল মনে করে) এমন অভিজ্ঞতা ও ঘটনাবলির মুখোমুখি হবে, যেগুলো তাদের ঈমান, সুন্নতের অনুসরণের জযবা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের মোকাবেলার প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞায় ব্যাঘাত তৈরি করবে। এখানে এসে তারা তালগোল পাকিয়ে ফেলবে।

১৩৯৯ হিজরিতে (১৯৭৯ সাল) আমি প্রয়োজন বোধ করলাম যে, দেশটির দায়িত্বশীলগণের সামনে (যাঁরা পরিচালনা-বিষয়ক নানা ব্যস্ততা ও দেশের রাজনৈতিক চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে সমাজের নৈতিক অবস্থার পরিসংখ্যান নেওয়ার সময় পান না) এমন একটি লিখিত পত্র উপস্থাপন করব, যাতে শুধু ইঙ্গিত আর নীতিকথা বলেই ক্ষান্ত হব না; বরং সুনির্দিষ্ট ঘটনাবলির, সংখ্যা-শুমার, সময় ও স্থানের সূত্র উল্লেখ করে ইতিহাসের আলোকে সেই সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও পরিবর্তনের কথাও ব্যক্ত করব, যেগুলো সমাজে নতুন চিন্তাধারা তৈরির কাজে নিয়োজিত কতগুলো প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানের কারণে সাধিত হচ্ছে এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে একটা নতুন সমাজ ও নতুন প্রজন্ম তৈরির কাজ এগিয়ে চলছে। আমি যে কমিটিগুলোর সদস্য ছিলাম, সেগুলোতে অংশগ্রহণের সুবাদে ১৯৭৯ সালের শুরুর দিকে দীর্ঘ সময় হেজাযে অবস্থানের সুযোগ পেলাম।

এ সময়ে আমি এই দৃষ্টিভঙ্গি মাথায় নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়তে শুরু করলাম, সেগুলো থেকে তথ্য-উপাত্ত জোগাড় করলাম, আত্মমর্যাদাশীল ও সচেতন বন্ধু-সুহৃদ, আলেমে দ্বীন, স্কলার ও মধ্যম সারির নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলাম এবং তাদের প্রতিক্রিয়া শুনলাম। এ সময়ে অভ্যন্তরীণ ও ঘরোয়া জীবনের এমন বহু বিষয় আমার সামনে ফুটে উঠল, যেগুলো জানা ও উপলব্ধি করা একজন বিদেশির জন্য খুবই দুষ্কর।

আমি এই পুরো রেকর্ডটি সামনে রেখে একটি বিস্তারিত লেখা তৈরি করলাম। এই লেখায় প্রথমত এ দেশের সঙ্গে আমার সম্পর্কের সূচনা, অবগতি লাভের উপায়, ক্ষেত্র ও দেশের প্রতিষ্ঠাতাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও চিন্তা-চেতনার সঙ্গে আমার একাত্মতার কথা উল্লেখ করলাম এবং বললাম, এই দেশটির প্রতিষ্ঠা, এর মাধ্যমে আল্লাহপাক তাওহীদের প্রচার-প্রসার,

নজিরবিহীন শান্তি-নিরাপত্তা, পানির প্রাচুর্য, যোগাযোগের সুবিধা, লুটেরা বেদুঈনদের মূলোৎপাটন এবং হেজাযের সুরক্ষা ও শান্তির যে মহান কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছেন – যার কোনো উপমা বিগত ইতিহাসে পাওয়া যায় না – তার জন্য ভারতবর্ষের সুস্থ চিন্তা ও সচেতন মুসলমানরা, আমাদের নেতৃস্থানীয় দ্বীনি ব্যক্তিবর্গ, আমাদের ওস্তাদ ও পীর-মাশায়েখ অপার আনন্দ অনুভব করেছেন, আল্লাহপাকের শোকর আদায় করেছেন এবং দেশটির প্রতিষ্ঠাতাদের জন্য দু'আ করেছেন।

তারপর হঠাৎ সম্পদের প্রাচুর্য, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন, নিঃস্বার্থ ও গভীর চিন্তার উপদেষ্টামণ্ডলির অভাব, সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা না থাকা ইত্যাদি কারণে সরকারকে যেসব সমস্যার এবং দেশ ও সমাজকে যেসব হুমকির সম্মুখীন হতে হয়েছে, আমি সেদিকে ইঙ্গিত করলাম এবং তার ফলে হঠাৎ যে পরিস্থিতির উদ্ভব হলো, তারও চিত্র তুলে ধরলাম। এই পরিবর্তনে যেকটি প্রতিষ্ঠান ও উপকরণ ক্রিয়াশীল ভূমিকা রাখছে, আমি সেগুলোকে ছয়টি শিরোনামে বিভক্ত করলাম–

১. প্রচারমাধ্যম (Public Media), যেগুলোর মধ্যে আমি টেলিভিশনকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি।

২. চলচ্চিত্র ও সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা ক্যাসেট।

৩. সাংবাদিকতা (পত্রিকা-ম্যাগাজিন)।

৪. শিক্ষা (বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়)।

৫. খেলা। খেলায় প্রতিযোগিতা ও ম্যাচের ওপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনোযোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং একাজে দেশের নাগরিকদের আগ্রহ উন্মাদনার পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া।

৬. জীবনমানের উন্নতি, বিলাস সামগ্রীর প্রাচুর্য ও বিনোদনের ঝোঁক।

তারপর আমি এক-একটা বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করেছি। প্রচারমাধ্যম ও টেলিভিশনের ব্যাপারে দিন-তারিখ উল্লেখ করে আমি সেসব প্রোগ্রাম ও তামাশার সূত্র উল্লেখ করেছি, যেগুলো তরুণদের মাঝে সময়ের আগেই যৌন অনুভূতি জাগিয়ে তোলা কিংবা তাদের চেতনায় উন্মাদনা সৃষ্টির জন্য একটা শক্তিশালী ইনজেকশনের ভূমিকা পালন করছে। এ বিষয়ে আমি কিছু মার্কিন চলচ্চিত্রের কথা উল্লেখ করেছি, যেগুলোতে গাড়ি চুরি করা ও অন্যান্য অপরাধের ঢং শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং একাজে কিছু লোকের কীর্তি

দেখানো হয়েছে, যার ফলে তরুণ-যুবকদের মাঝে অপরাধপ্রবণতা এবং অপরাধে নিজেদের কীর্তি প্রদর্শনের স্পৃহা তৈরি হচ্ছে। এই আলোচনায় আমি গোয়েন্দা ছবিগুলোর কথাও উল্লেখ করেছি। এ ক্ষেত্রে খোদ আমেরিকায় কতিপয় মনস্তত্ত্ব ও সমাজবিদের উদ্ধৃতি ও তাদের রিপোর্টের কিছু কাটিং উপস্থাপন করেছি, যারা টেলিভিশনের এই প্রভাব ও সমাজের ওপর তার ধ্বংসাত্মক ক্রিয়ার কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ও সাহসিকতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন।[১]

টেলিভিশনের প্রতি সীমাতিরিক্ত ঝোঁক ও গভীর মনোযোগ শিক্ষার মান, ছাত্রদের পরিশ্রম, একাগ্রতা ও পরীক্ষার ফলাফলের ওপর যে প্রভাব ফেলছে, সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। শিশু-অপরহণ, শিশুহত্যা ও নানা অপরাধে নিত্যনতুন যে মাত্রা যুক্ত হচ্ছে এবং জাতির পুরোষিত চরিত্র ও সৈনিকসুলভ জীবনের ওপর (যে ক্ষেত্রে আরব জাহিলি যুগেও অদ্বিতীয় ছিল) এর যে প্রভাব পড়ছে, আমি সেদিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করেছি। অনুরূপভাবে চলচ্চিত্র ও চরিত্র বিনষ্টকারী ক্যাসেটের ছড়াছড়ির কথাও উল্লেখ করেছি এবং দিন-তারিখ উল্লেখ করে তার দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেছি। এ ক্ষেত্রে পোশাকের সেই নতুন মডেল ও নমুনার প্রদর্শনির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, যেগুলো অসৎ মানসিকতা তৈরিতে সহায়কের ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া পত্র-পত্রিকার অর্ধনগ্ন ও উত্তেজনাকর বিজ্ঞাপন ও যৌন সুড়সুড়িমূলক গানের ব্যাপক ছড়াছড়ির কথাও আলোচনায় এনেছি, যেগুলোর ক্যাসেট অতি সহজেই সংগ্রহ করা যায় এবং যার মধ্যে ভিডিওর বড় একটা ভূমিকা রয়েছে।

অনুরূপভাবে পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তিকার অসুস্থ চিন্তা ছড়ানো, প্রায়শই ইসলাম নিয়ে অবজ্ঞা করা, ইসলামের প্রতি সংশয় প্রকাশকারী নিবন্ধ প্রচার, কোনো কোনো নাস্তিক, ইসলামবিদ্বেষী ও নাফরমান কবি-সাহিত্যিককে আদর্শ ব্যক্তিত্বরূপে উপস্থাপনের প্রবণতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নম্বর ৪ এ শিক্ষাসিলেবাস ও শিক্ষাব্যবস্থার কিছু ত্রুটি, কিছু ভুল পাঠ্যগ্রন্থ, কোনো-কোনো মহিলা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিকাদের পর্দাহীনতা ও ফ্যাশনপুঁজা,

---

১. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে T.U. ADARNO-এর গ্রন্থ MAsAS COMMUNICATION পড়ুন।

উচ্চশিক্ষার জন্য যুবকদের ব্যাপকাহারে আমেরিকা যাওয়া, শিক্ষামন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাগ্রহণের জন্য ছাত্রদের ওখানে পাঠানো এবং তাদের জন্য এমন পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে তারা সেই চিন্তা-চেতনা ও বুঝ-অনুভূতি হারিয়ে ফেলবে, যেটি ছিল তাদের গর্বের ধন এবং তারা ওখানকার রঙে রঙিন হয়ে যাবে এসব বিষয়ে আলোচনা করেছি।

নম্বর ৫ এ খেলাধুলা, খেলার প্রতিযোগিতায় তরুণ-যুবকদের মত্ততা, (যেটি উন্মাদনার স্তরে পৌঁছে গেছে) ক্রীড়া টিমগুলোকে অস্বাভাবিক গুরুত্ব প্রদান, ম্যাচের সময় নামায ও জামাত বর্জন, নামাযে উদাসীনতা, রাষ্ট্র ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তাদের সঙ্গে পৃষ্ঠপোষকতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির কথা এবং এর প্রভাব ও কুফলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ ও সর্বশেষ নম্বরে দেশে হঠাৎ জীবনের মান উন্নত হয়ে যাওয়া, সোনার প্রাচুর্য এবং তার ফলে পণ্যমূল্য ও জমির দাম বেড়ে যাওয়া, বাড়িগুলোর সোভা-সৌন্দর্য এবং সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের বিষয় বিবাহ-শাদিতে অপচয়, বিয়ের শর্তাবলি ও নিমন্ত্রণে রাজকীয় ব্যয় ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। তার শুধু একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে, জিদ্দার মেরিডিয়ান হোটেলে এক রাত বিয়ের উৎসব পালনের ফি এক রাখ রিয়াল। বিয়ের মনগড়া শর্তাবলি, দাবি-দাওয়া ও আড়ম্বরে প্রতিযোগিতার ফলাফল এই দাঁড়াল যে, বর্তমানে বিবাহ সমাজে একটা ঝামেলাপূর্ণ কাজ ও একটা সংকটের রূপ ধারণ করেছে। এ বিষয়ে এক তরুণের একটি সাক্ষাতকারের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে, যেটি 'উকাজ' পত্রিকায় ৭ শাবান ১৩৯৮ সংখ্যায় 'একটা নাজুক সামাজিক সমস্যা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক যুবক ছাত্র অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলেছে, আমাদের এই যুগ ও সমাজের একটা ঝামেলাপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সমস্যা হলো বিবাহ।

এসব বাস্তবতা ও ঘটনাবলি উপস্থাপন করার পর বলা হয়েছিল, জাযিরাতুল আরবের ওপর দরিদ্রতা ও আয়-উপকরণের স্বল্পতার একটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে, যেটি কয়েক শতাব্দি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কিন্তু তার ফলে ইসলামের এই কেন্দ্রটি সেই হুমকির সম্মুখীন হয়নি, যেমনটা সম্পদের এই প্রাচুর্য, জীবনমানের উন্নতি ও স্বচ্ছলতার এই যুগে তৈরি হয়ে গেছে। বরং সেই দরিদ্রতা ও পশ্চাদপদতার যুগ থেকে উপকার এই হয়েছিল যে, বিরুদ্ধবাদী ও সম্প্রসারণবাদীদের লোভাতুর কুদৃষ্টি থেকে দেশটি নিরাপদ

থেকেছে। তারা কখনও এদিকে চোখ ফিরিয়ে তাকানো বা শক্তি ব্যয় করার প্রয়োজনীতা বোধ করেনি। কারণ, এখানে এসে তাদের কোনো জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি একদম বিপরীত।

তারপর বলা হয়েছে, এসব বাস্তবতা ও আশঙ্কার কারণে আমি এই দুঃসাহস দেখিয়েছি যে, এই লেখাটি – যেটি সর্বসাধারণের মাঝে প্রচারের জন্য নয় – দায়িত্বশীলবর্গের খেদমতে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থাপন করছি, যাতে এই বাস্তবতা তাদের সম্মুখে সুনির্দিষ্ট প্রামাণ্যরূপে এসে পড়ে এবং পরিস্থিতির স্পর্শকাতর অনুভূতি ও তার প্রতিকারের জন্য তাঁরা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এই লেখাটি – যেটি الى أين تتجه الجزيرة العرب والى أى غاية تنتهى (আরব দেশটি কোন দিকে যাচ্ছে এবং কোথায় তার গন্তব্য?) শিরোনামে তৈরি করা হয়েছিল এবং টাইপ ও সাইক্লোস্টাইল করে সংরক্ষণে রাখা হয়েছে।[১]

সৌভাগ্যবশত সে সময় বাদশাহ খালেদ আমলাদেরসহ তায়েফে অবস্থানরত ছিলেন। আমি রাবেতার মহাসচিব শায়খ মুহাম্মাদ আলী আল-হারকানের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম এবং বললাম, তায়েফ গিয়ে আমি বাদশাহর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি বাদশাহ খালেদের প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। কিন্তু তায়েফ গিয়ে আমি জানতে পারলাম, জর্ডানের বাদশাহ হুসাইন এসেছেন। ফলে বাদশাহ খালেদের বেশিরভাগ সময় তাঁকে স্বাগত জানানো ও তাঁর সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় ব্যয় হচ্ছে। আমি যখন অনুমান করলাম, এই অবস্থায় বাদশাহর সঙ্গে দেখা করতে হলে আমাকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে, তখন আমি মক্কায় ফিরে এলাম। এসে পত্রের একটি কপি রাবেতা আলমে ইসলামীর সভাপতি বন্ধুবর শায়খ আবদুল আযীয বিন বায-এর খেদমতে আর একটি কপি প্রধান বিচারপতি শায়খ আবদুল্লাহ বিন হুমাইদ-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলাম। কিছু দিন পর তাঁদের দুজনেরই পক্ষ থেকে পত্র এল। দুজনই লিখেছেন, আমি আপনার পত্রখানা ব্যক্তিগত একটি চিঠিসহ বাদশাহর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার পত্রে আমি লিখেছি, আপনার দেশের একজন সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী ও নিষ্ঠ ব্যক্তি এই পত্রখানা দিয়েছেন। আপনি অন্য কাউকে দিয়ে পড়িয়ে না শুনে বরং নিজে পড়ুন।

---

১. ফুলস্কেপ সাইজে এই লেখাটির কলেবর ছিল ১৮ পৃষ্ঠা।

দুজনই বাদশাহকে প্রায় একই কথা লিখেছেন। অথচ তাদের একজন আরেকজনের খবর জানতেন না। পরে আমি বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পেরেছি, বাদশাহ স্বয়ং, তাঁর পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত, তাঁর প্রধানমন্ত্রী ফাহাদ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রমুখের কাছে এই পত্রখানা পৌঁছে গেছে এবং তাঁরা বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। আল্লাহ যদি এর কোনো সফলতা দান করেন।

একটা দুর্ভাগ্য

আমি আমার এই পত্রের প্রচার সঙ্গত মনে করিনি। কারণ, তাতে লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমার উদ্দেশ্য দেশটির বদনাম করা বা তার ব্যাপারে কোনো অনাস্থা কিংবা কুধারণা তৈরি করা ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এর একটি কপি 'আল-ইখওয়ানুল মুসলিমূন'-এর মুখপত্র 'আদ্দাওয়াহর (যেটি কায়রো থেকে বের হয়) সম্পাদক কিংবা অন্য কোনো কর্মকর্তার হাতে পড়ে যায়। তার চেয়েও দুর্ভাগ্য হলো, এর প্রথম প্রকাশিত কিস্তিটি হেজাযে ঠিক সেদিন পৌঁছে, যেদিন হারাম শরীফের অপ্রীতিকর ঘটনাটা ঘটে, যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে। আদ্দাওয়াহর এই সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করা হলো। কিন্তু আল্লাহর শোকর যে, এই লেখার সঙ্গে এই ঘটনার কোনো যোগসূত্র আছে বলে মনে করা হয়নি।

হারাম শরীফের অপ্রীতিকর ঘটনা

যিলহজ্বের শেষ দিন (২০ নভেম্বর ১৯৭৮) আমি স্নেহাস্পদ আবদুল্লাহ হাসানিকে (মুহাম্মাদ আল-হাসানি মরহুমের পুত্র) সঙ্গে করে মধ্যরাতে জিদ্দা পৌঁছলাম। উদ্দেশ্য ছিল রাবেতার নির্ধারিত আওকাফ মন্ত্রীদের সেই কমিটিতে অংশগ্রহণ করা, যার কিনা ১লা মুহাররাম ১৪০০ হিজরি (২১ নভেম্বর ১৯৭৯) থেকে মক্কায় কাজ শুরু করার কথা ছিল। সৌদি আরবের আওকাফ মন্ত্রী শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব আবদুল ওয়াসে', সিরিয়ার আওকাফ মন্ত্রী আবদুস সাত্তার আস-সাইয়িদ, জর্ডানের আওকাফ মন্ত্রী কামেল আশ-শরীফ এবং কোনো এক আফ্রিকান দেশের আওকাফ মন্ত্রী (যার নাম আমার মনে নেই) এই কমিটির সদস্য ছিলেন। রাবেতা তার প্রতিনিধিত্বের জন্য মহাসচিব শায়খ মুহাম্মাদ আল-হারকান ও আমাকে নির্বাচন করেছিল।

আমি বরাবরের মতো জিদ্দায় আমার অবস্থানস্থল আবদুল গনী নূর অলী সাহেবদের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। আমরা ইহরাম বেঁধে এসেছিলাম এবং

পরদিনই ওমরা পালন ও কমিটিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ছিল। সকালে যখন চোখ খুললাম, তখন মেজবানরা আমাকে জানাল, এইমাত্র মক্কা থেকে টেলিফোন এসেছে, ইরানিরা হারাম শরীফ দখল করে নিয়েছে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরই তারা এই সংবাদ প্রত্যাহার করে বলল, ইরানিরা নয় – একদল কট্টরপন্থী আরব ওখানে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। পরক্ষণেই রাবেতার দফতর থেকে স্বয়ং এক দায়িত্বশীলের ফোন এল, শায়খ আবুল হাসানকে বলে দাও, যেন তিনি হারাম শরীফে না এসে সোজা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে চলে আসেন। পরামর্শ অনুযায়ী আমরা সোজা হোটেলে চলে গেলাম এবং ওখানে কমিটির সদস্যদের সম্মানে আয়োজিত রাবেতার দাওয়াতে অংশগ্রহণ করলাম।

সন্ধ্যায় মাগরিবের পর কমিটি কাজ শুরু করল। সৌদি আরবের আওকাফ মন্ত্রী শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব আবদুল ওয়াসে'কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঘটনা কী? তিনি বললেন, কিছু কট্টরপন্থী ও ধর্মীয় উন্মাদ অরাজকতা তৈরি করেছে। পরে জানতে পারলাম, মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-কাহ্তানি হঠাৎ নিজেকে মাহ্দি বলে দাবি করেছে এবং মানুষ তার হাতে বায়'আত নিতে শুরু করেছিল। তার থেকেই হারাম শরীফে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে এবং গোটা দেশ ও মুসলিম বিশ্বে তোলপাড় শুরু হয়েছে।[১]

এই ধারার এটি প্রথম ঘটনা, যেটি কারামিতাদের নিন্দনীয় ঘটনার পর সংঘটিত হলো। এর কারণে মুসলিম বিশ্বের সমস্ত মুসলমানের ঘাড় লজ্জা ও অনুশোচনায় অবনত হয়ে গেল, শত-শত বছর পর হারাম শরীফের মর্যাদা,

---

১. এই ফেতনার আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন মাহ্দিয়াতের দাবিদার মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-কাহ্তানি আর সামরিক গুরু জাহিমান আল-উতাইবি। তারা তাদের অনুসারীদের নিয়ে পাঁচ দিন যাবত হারাম শরীফের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করে রাখে। পাঁচ দিন পর সেনাবাহিনী এই দখলদারদের নির্মূল করতে সক্ষম হয় এবং প্রায় দু-সপ্তাহ পর বাইতুল্লাহর ইমামের ইমামতিতে যথারীতি নামাযের জামাত শুরু হয়। এই অভিযানে মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-কাহ্তানি সৌদি সেনাদের হাতে নিহত হয়। আর জাহিমান উতাইবি গ্রেফতার হয়ে পরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই অপ্রীতিকর ঘটনায় কয়েক দিন যাবত হারাম শরীফের মাতাফ তাওয়াফকারীদের থেকে শূন্য ছিল, যেমনটি বিগত কয়েকশো বছরেও ঘটেনি। আর এ সময়ে বাইতুল্লায় নির্ধারিত ইমামের পেছনে যথারীতি নামাযের কোনো জামাত হয়নি। দোহায় বসে টেলিভিশনের পর্দায় হারাম শরীফের এই দৃশ্য দেখে চোখ অশ্রুসজল আর হৃদয় অস্থির হয়ে উঠত।

নিরাপত্তা ও আদব হুমকির মুখে পড়ে গেল। হারাম শরীফ তার আশপাশ ও সমগ্র মক্কা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। জানা গেল, এই লোকগুলো বেশ কিছু দিন যাবত জানাযার আদলে (যেগুলোর কোনো তদন্ত করা হয়নি) হারাম শরীফে অস্ত্র এনে কোনো একটি গোপন স্থানে জমা করছিল। পুলিশ ও সেনাবাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল ঠিক; কিন্তু হারাম শরীফে স্বাধীনভাবে সামরিক অভিযান পরিচালনায় তারা দ্বিধান্বিত ছিল।

এমতাবস্থায় বিদেশি হাজীগণ এবং যারা সে সময় ওখানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, তারা কেমন একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা অনুমান করা কঠিন কাজ নয়। আমি এই কাহিনী কয়েকজন ভারতীয় হাজীর কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে শুনেছি, যারা সেই ফজরের নামাযে উপস্থিত ছিলেন, যার পরেই এই ঘটনাটা ঘটেছিল।

কমিটির বৈঠক থেকে অবসর গ্রহণের পর আমি ও স্নেহাস্পদ আবদুল্লাহ আমাদের পুরাতন অবস্থানস্থল ডক্টর মৌলভী আব্বাস নদভীর বাড়িতে চলে গেলাম, যেটি মনসুর সড়কে অবস্থিত। আমি তো বহুবার আল্লাহর ঘরে হাজিরি দিয়েছি। কিন্তু বেচারা আবদুল্লাহকে দেখে আমার আফসোস লাগছিল যে, ছেলেটা এ-ই প্রথমবার ওমরা করতে এসেছে! কিন্তু দুর্ভাগ্য, দূর থেকে হারাম শরীফের মিনার দেখা ছাড়া আর সব কিছু থেকে ও বঞ্চিত থাকল। হারামের চতুর্দিকে সেনাপ্রহরা ছিল। অনেকগুলো ট্যাংক ও সামরিকযান ছিল। আমরা ব্যর্থ ও নিরাশ হয়ে ইহরাম খুলে ফেললাম এবং ওমরার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম।[১]

১৪০০ হিজরির ৫-৯ মুহাররাম (২৬-৩০ নভেম্বর ১৯৭৯) কাতারের রাজধানী দোহায় অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সীরাত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। আমি তার ব্যবস্থাপনা পরিষদ ও নির্বাচনি কমিটির সদস্য ছিলাম। আমার অংশগ্রহণ জরুরি ছিল। আমি মহাররমের ৩ তারিখ বুধবার স্নেহাস্পদ আবদুল্লাহকে সঙ্গে করে বাহরাইনের পথে দোহার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। আমরা যে বিমানে ভ্রমণ

---

১. তার পরবর্তী বছর আমরা ওমরা আদায় করলাম। ইহরাম খোলার কাফফারায় কুরবানি দিলাম। হারাম শরীফের এই ঘটনা ইসলামি ও দাওয়াতি মিশনের কর্মীদের জন্য একটা বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করল যে, সরকার তাদের সন্দেহ ও আতঙ্কের চোখে দেখতে লাগল এবং তাদের কাজে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়ে গেল।

করছিলাম, সেই বিমানেই রাবেতার প্রতিনিধিদল মহাসচিব শায়খ মুহাম্মাদ আল-হারকানের নেতৃত্বে রওনা হয়েছিল। বিমানে আমরা একত্র হয়ে গেলাম। আমরা দোহায় ওখানকার সর্ববৃহৎ হোটেল গাল্‌ফ হোটেলে সরকারের মেহমান হলাম।

কাতারের সীরাত কনফারেন্স

এটি তৃতীয় আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ছিল, যার আমন্ত্রণ কাতার সরকার জানিয়েছিল। প্রথম কনফারেন্স ১৩৯৬ হিজরিতে (১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যার আলোচনা দীর্ঘদিন যাবত মানুষের মুখে-মুখে ছিল। দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৩৯৭ হিজরিতে তুরস্কে। এবার এই তৃতীয় কনফারেন্স ১৪০০ সালের মুহাররাম মাসে (নভেম্বর ১৯৭৯ সাল) কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত হলো। এই কনফারেন্সের আমন্ত্রণ প্রদান ও আয়োজনে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আল-আনসারীর বিশেষ ভূমিকা ছিল, যিনি অত্যন্ত ঈমানদার, প্রাণবন্ত ও আমলদার মানুষ। কাতার সরকারও তার দেশের কলেবর ও বর্গ সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও রাজকীয় মানের আথিয়েতার কর্তব্য আঞ্জাম দিয়েছে। আমার বহুসংখ্যক কনফারেন্স ও আলোচনাসভায় অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু এত উদারতা, এত তৎপরতা এর আগে আর কোনো কনফারেন্সে আমি দেখিনি। অতিথিরাও ছিলেন গুণে-মানে-যোগ্যতায় অসাধারণ। আমেরিকা থেকে নিয়ে ইন্দোনেশিয়া, মরক্কো ও রাবাত থেকে নিয়ে ইরাক ও উপসাগরের শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন, ইসলামি সংগঠনের নেতৃবর্গ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলি এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আল-আনসারী আমার 'আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ' গ্রন্থটির (অল্প কদিন আগে যার রচনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং দারুশ শুরূক জিদ্দার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে) নতুন সংস্করণ বের করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, আলোচ্য বিষয়ের সাথে মিল থাকায় তিনি কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীদের এই বইটি হাদিয়া দেবেন।[১]

---

১. এই বইটি নতুন ধারায় রচিত সীরাত গ্রন্থগুলোর একটি, যেটি বড় সাইজে ৪৯৯ পৃষ্ঠায় বাজারে এসেছে। এতে এমন কয়েকটি নতুন আলোচনা, ইতিহাসের তুলনামূলক অধ্যয়ন, প্রাক ইসলামী যুগের ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

এসে পৌঁছার পর আমি কনফারেন্সের সেক্রেটারির পক্ষ থেকে চিঠি পেলাম, মুসলিম বিশ্ব থেকে যেসব প্রতিনিধি এসেছেন, তাদের মুখপাত্রের ভাষণটি আপনাকে দিতে হবে। আপনি নিবন্ধ প্রস্তুত করে ফেলুন। আরব দেশগুলোর সভা-সমাবেশে সভাপতির ভাষণের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি হয় প্রতিনিধিদের মুখপাত্রের। আর কোনো প্রতিনিধির কাঁধে এই দায়িত্ব অর্পিত হওয়া তার অপার সম্মান ও আস্থাশীলতার প্রমাণ বহন করে। পরদিন ছিল জুমাবার। আমার বক্তব্যের লিখিত কপি নেওয়ার জন্য যখন লোক এল, তখন আমরা নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু তখনও আমি কিছুই লিখিনি। আমার এই লেখাটি ছাপা হবে এবং সম্মেলনে বিতরণ হবে, যেটি পরদিনই সকালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। আমি এই দায়িত্বপালনে অপারগতা প্রকাশ করলাম এবং বললাম, আল্লাহর ফজলে এখানে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আলেম ও চিন্তাবিদগণ উপস্থিত আছেন; তাদের মধ্য থেকেই একজন এই কর্তব্য আঞ্জাম দেবেন। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি লেখার সময় পাইনি।

৫ মুহাররাম ১৪০০ হিজরি শনিবার যখন আমি সম্মেলনস্থলে পৌঁছলাম, ততক্ষণে হল কানায়-কানায় ভরে গিয়েছিল এবং তাতে তুরস্ক, মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে নিয়ে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম দেশগুলোর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন, যাদের অনেকেরই চেহারা আমার পরিচিত। আমি দেখলাম, প্রতিটি আসনে মুদ্রিত প্রোগ্রাম রাখা আছে আর তাতে প্রতিনিধির মুখপাত্রের ভাষণে আমারই নাম লেখা আছে। এবার আর কোনো উপায় থাকল না যে, উপস্থিত যা মুখে আসে এবং আল্লাহ আমাকে দিয়ে যা বলান বলতে হবে। কাতারের বাদশাহ খলীফা ইবনে হাম্‌দ আলে ছানীর বৈদেশিক সফর থাকায় তার পুত্র (যিনি ভাবী বাদশাহ এবং বর্তমানে

চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। জাযিরাতুল আরব, মক্কা, মদীনা ও তায়েফের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ-ই প্রথমবার আলোকপাত করা হয়েছে, যেটি এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া আরও বেশকটি গবেষণামূলক আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে, যার আলোচনা এটি ছাড়া আর কোনো গ্রন্থে আসেনি। এই গ্রন্থটি বিভিন্ন আরব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। এ যাবত আরবির তিনটি এডিশন দারুশ শুরুক-এর পক্ষ থেকে বের হয়েছে। দুটি এডিশন অপর দুটি লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উরদু, ইংরেজি ও হিন্দি অনুবাদও প্রকাশিত হয়ে পাঠকমহলে ব্যাপক সমাদর লাভ করেছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী) কনফারেন্স উদ্বোধন করেন এবং বাদশাহর লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান। তাঁর পরে ওই দেশের প্রধান বিচারপতি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আল-মাহমূদ ভাষণ দান করেন।

আমার বক্তব্যের পালা এল। আমি অনুভব করলাম, আমার মন ও মস্তিষ্ক এই হৃদয়কাড়া বিষয়বস্তুর মিষ্টতা এবং যে মহান সত্তার সঙ্গে এর সম্পর্ক, তাঁর বড়ত্ব ও ভালবাসায় ভরপুরই নয়; বরং পাগলারাও। শুধু বিষয়বস্তুই নয়; একের পর এক শব্দ-বাক্যও সামনে এসে-এসে হাজির হচ্ছে। তখনই রহস্যটি বুঝতে পারলাম যে, এই ভাষণ আগে কেন প্রস্তুত করা সম্ভব হলো না। আমি প্রথমে পাকিস্তান ও তুরস্কের কনফারেন্সগুলোর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সেগুলোর যথার্থতা ও সেই দেশগুলোর ওপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নানা অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করলাম। একথাও বললাম, নবীজির বদৌলতে যে বিপ্লব; বরং যে নবজীবন তারা লাভ করেছিল, এটি তারই স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ, ছিল, যেটি তারা আদায় করেছে।

উপমহাদেশের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আমি আল্লামা ইকবালের সেই কবিতাগুলোর সারমর্ম তুলে ধরলাম, যেগুলো তিনি ওখানকার মুসলমানদের ভাববাচ্যে ব্যক্ত করেছিলেন।

তারপর আমি তুর্কি জাতির ওপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবদানের কথা উল্লেখ করলাম এবং বললাম, এই দ্বীন ও দাওয়াত তুর্কি জাতিকে মধ্য এশিয়ার একটা অখ্যাত ও সীমিত পরিসর ও বেষ্টনি থেকে বের করে – যেখানে তারা নাম-পরিচয়বিহীন অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করছিল – এই সুবিস্তৃত মাঠে এনে দাঁড় করিয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছে, মক্কা-মদীনার অভিভাবকত্বের মর্যাদা দান করেছে, হারামে মক্কী ও মসজিদে নববীর নবনির্মাণের সুযোগ দান করেছে, যা আজও পর্যন্ত অব্যাহত আছে।[১]

তারপর আমি বললাম, এখন এই তৃতীয় কনফারেন্সটি একটি উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত স্থানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সময়টা হিজরি পঞ্চদশ শতাব্দির আসি-আসির। আর স্থান হলো জাযিরাতুল আরব। তারপর আমি জাযিরাতুল আরব ও আরব জাতির সুবাদে নবুওতে মুহাম্মাদির সেই অবদানের কথা

---

১. বাইতুল্লাহর বর্তমান ইমারত সুলতান মুরাদের এবং মসজিদের নববীর বর্তমান ইমারত সুলতান আবদুল মজীদ ছানীর নির্মাণ।

উল্লেখ করলাম, যার পরিমাণ পৃথিবীর সমস্ত জাতি ও রাষ্ট্রের তুলনায় আরবদের ওপর বেশি। এ ক্ষেত্রে আমি আল্লামা ইকবালের দুটি চরণ ফারসিতে আবৃত্তি করলাম। কারণ, কনফারেন্সে ফারসি বুঝবার মতো লোকও উপস্থিত ছিলেন। তারপর আরবিতে তার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করলাম।

চরণদুটি ছিল–

از دم سیراب آں امی لقب
لالہ رست از ریگ صحرائے عرب

'এই উম্মী নবী অভিধার কল্যাণে আরবের মরু সাহারায় ফুল ফুটেছে।'

আমি যখন এই চরণদুটির বিশ্লেষণমূলক অনুবাদ করলাম এবং আরবের পরিস্থিতির ওপর তাকে খাপ খাইয়ে দিলাম, তখন অনেকগুলো চোখে অশ্রু ও অনেকগুলো চেহারায় আনন্দ ও প্রতিক্রিয়ার ঝিলিক ছিল। তারপর আমি খানিক স্পষ্ট ভাষায় ও সাহসিকতার সঙ্গে বললাম, আল্লাহ্ না করুন যদি ইসলামের আগমন না ঘটত এবং আরব তার দাওয়াত নিয়ে উঠে না দাঁড়াত, তাহলে জাযিরাতুল আরবের কী হতো এবং তার সেই দেশ ও রাষ্ট্রগুলোকে কে কোথায় খুঁজতে যেত, যেগুলোর সঙ্গে সারা বিশ্বের প্রত্যেক মুসলমান আস্থা ও ভালবাসার সম্পর্ক রাখে এবং বিশ্বময় যাদের বিত্ত ও উদারতার গান গাওয়া হয়? ইসলাম না এলে এর জন্য হাজারো বছর অপেক্ষা করতে হতো। কিন্তু তারপরও এই মর্যাদার নাগাল পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ ছিল।

কবির ভাষায়–

بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے   یہ سب پودا انھیں کی لگائی ہوئی ہے

'এই যে জগতে আমরা জৌলুস দেখতে পাচ্ছি; এসব তাঁরই লাগানো চারা।'

আমরা সবাই নবুওতে মুহাম্মাদির ছায়ায় প্রতিপালিত হচ্ছি। সেই দস্তরখানের নেয়ামত ভোগ করছি, যেটি আকায়ে নামদার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা মানবতার জন্য বিছিয়ে রেখেছেন। তাঁর কারিশমা যে, এই মুহূর্তে আমি একজন ভাবী সম্রাট ও আরবের বড়-বড় আলেমগণের পাশে উপবিষ্ট এবং নিজের মাতৃভাষায় নয় – তাঁর ভাষায় (যেটি এখন আমারও ভাষা) এমন একটি মহতি সভায় ভাষণ দিচ্ছি।

তারপর আমি বললাম, এই কনফারেন্সের যদি কোনো বার্তা থাকে, তাহলে সেটি হলো, আমরা আমাদের ইসলামি আরবি সমাজের সেই বৈপরীত্বটা দূর করে ফেলব, যেটা বর্তমানে তার মাঝে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের ব্যাধি আলহামদু লিল্লাহ কুফর-শিরক নয়। আমাদের রোগটা হলো 'নিফাক'। আমরা ঘোষণা করি এক আর কাজ করি আরেক। আমরা বলি এক আর করি আরেক। এই বৈপরীত্ব আমাদের এই সমাজকে অনির্ভরযোগ্য ও মর্যাদাহীন বানিয়ে দিয়েছে। আর আমাদের মাঝে আজ সেই আকর্ষণ অবশিষ্ট নেই, যেটি মানুষের জন্য ইসলাম গ্রহণের কারণ হতো।

আমার ভাষণের পর শায়খ আবদুল্লাহ ইবরাহীম আল-আনসারী (যিনি এই কনফারেন্সের প্রাণপুরুষ এবং এক দিক থেকে স্বাগতিক সভার সভাপতি ছিলেন) ভাষণ দান করেন। এই বৈঠক সেই কমিটিগুলোর গঠনের মধ্যদিয়ে সমাপ্ত হলো, যেগুলো ইতিমধ্যে যার-যার বিদ্যাগত ও গবেষণামূলক কাজ শুরু করে দিয়েছে। এই বৈঠকে অনেকগুলো জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ পাঠ করা হলো, যেগুলো বিজ্ঞ প্রতিনিধিগণ প্রস্তুত করে এনেছিলেন। এই বৈঠকে কাজের নকশা তৈরি করা হলো এবং নানা প্রস্তাবনা পাশ হলো।

বৈঠকের বাইরে আমি একটি ভাষণ দিলাম জামে মসজিদে মাগরিবের নামাযের পর। এই ভাষণে আমি শারেকার একটি ভাষণের আদলে – যার শিরোনাম ছিল 'খালীজুন বাইনাল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন' (ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যকার দূরত্ব) আমি সেই ব্যবধান ও দূরত্বের কথা ব্যক্ত করলাম, যেটি ইসলামি শিক্ষা ও মুসলমানদের জীবনের মাঝে সৃষ্টি হয়ে গেছে। এখানেও আমি আল্লামা ইকবালের দুটি চরণের ব্যাখ্যা দিলাম।

نالم از کسے می نالم از خویش
که ما شایان شان تو نه بودیم

'হে আল্লাহর রাসূল! আমি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ বা কারও কাছে ফরিয়াদ করছি না। অভিযোগ আমার নিজের বিরুদ্ধে। আর ফরিয়াদ এর বিরুদ্ধে যে, আমরা আপনার যোগ্য ছিলাম না।'

সীরাত কনফারেন্সের আমার উদ্বোধনী ভাষণ টেলিভিশনের পর্দায় দুবার দেখানো হলো। আমি নিজচোখে আমাকে ভাষণ দিতে দেখলাম এবং নিজকানে আমার ভাষণ শুনলাম এবং শ্রোতাদের প্রভাবিত চেহারা অবলোকন করলাম।

পাঁচ দিনের মাথায় এই কনফারেন্সের সুভসমাপ্তি ঘটল এবং অতিথিগণ হাদিয়াস্বরূপ প্রাপ্ত কিতাবগুলো নিয়ে পরিপূর্ণ সম্মান ও আরামের সাথে নিজ-নিজ দেশে ফিরে গেলেন।

ফয়সাল এওয়ার্ড

হারাম শরীফের অপ্রীতিকর ঘটনা, তারই কিছুদিন আগে রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলবর্গের কাছে আমার লিখিত পত্র প্রদান (উপরে যার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে) তারপর ঠিক একই দিন হারামের ঘটনাটা সংঘটিত হওয়া ও আদ্দাওয়ায় আমার পত্রের ছাপানো চিঠির প্রথম কিস্তিটি সৌদি আরব পৌঁছানোয় আমার মনে ভাবনা জাগতে লাগল, এর কারণে হয়ত আমার রাবেতা ও জামেয়ার সদস্যপদ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে এবং এ যাবত এই পবিত্র ও প্রিয় ভূমিতে আসার যে সুযোগ-সুবিধা ও দেশটির দায়িত্বশীলবর্গের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের এবং তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের যে সুযোগ আমার ছিল, আমি তার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব। কিন্তু ভেতর থেকে আমার মন আশ্বস্ত ছিল যে, আমি যা কিছু করেছি, সবই দ্বীনের দাবি ও কর্তব্যের অনুভূতি এবং এই পবিত্র ভূমির ভালবাসা ও সম্পর্কের খাতিরে করেছি।

কিন্তু আমি বিস্মিত হলাম, যখন হঠাৎ সে বছরের ফয়সাল এওয়ার্ডের জন্য – যেটি মুসলিম বিশ্বে প্রায় সেই মর্যাদা রাখে, যেমনটি নভেল পুরস্কারের – আমার নাম ঘোষণা হলো। আমি আমার দায়েরা শাহ ইলমুল্লাহ্য় আমার আবাসস্থলে বসে যথারীতি লেখালেখির কাজ করছিলাম। এমন সময় স্নেহাস্পদ মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে' লাখনৌ থেকে এল এবং আমাকে সংবাদ জানাল, আপনার জন্য ফয়সাল এওয়ার্ড ঘোষিত হয়েছে।[১] এই সংবাদ ও মুবারকবাদ নিয়ে তার এসেছে। বার্তাটি এসেছে এওয়ার্ড কমিটির সভাপতি মীর খালেদ ফয়সাল ইবনে আবদুল আযীয-এর পক্ষ থেকে। তাতে রিয়াদ এসে এওয়ার্ড গ্রহণের আমন্ত্রণ ছিল। এর জন্য মুবাদরকবাদ দিয়ে পাঠানো

১. সে বছর এই এওয়ার্ড দুজন ব্যক্তির মাঝে বণ্টন করা হয়েছিল। একজন আমি আর অপরজন ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মুহাম্মাদ নাসের, যিনি দ্বীনের বড় মাপের একজন দাঈ, মুজাহিদ ও রাবেতার প্রতিষ্ঠাতা পর্ষদের সদস্য ছিলেন। প্রথম এওয়ার্ডটি মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল আ'লা সাহেব মওদুদি পেয়েছিলেন, যার কিছু দিন পরই তিনি ইনতিকাল করেছিলেন।

তারগুলোর মধ্যে খুবসম্ভব প্রথম তারটি এসেছিল হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেবের। তিনি রেডিওর সূত্রে মদীনায় একব্যক্তির মাধ্যমে সংবাদটি পেয়ে বলেছিলেন, 'আলী মিয়াকে এখনই মুবারকবাদ দিয়ে তার পাঠাও। কারণ, হতে পারে, তিনি এটি গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে বসবেন। আমার এই তারকে তিনি ইঙ্গিত বলে ধরে নেবেন।'

ফয়সাল এওয়ার্ডের নিয়ম হলো, কমিটির পক্ষ থেকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনের কাছে মতামত চাওয়া হয়, আপনাদের মতে এই এওয়ার্ডের অধিকারী কে? তারপর যার পক্ষে বেশি মতামত আসে, তার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এওয়ার্ডের অর্থের পরিমাণ হয় নগদ দুলাখ রিয়াল, একটি স্বর্ণপদক ও একটি সার্টিফিকেট, যাতে এওয়ার্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিশেষ কিছু সেবার কথা উল্লেখ থাকে। এই এওয়ার্ড একটি সম্মেলনে প্রদান করা হয়, যেখানে বর্তমান বাদশাহ, ভাবী বাদশাহ, সরকারের মন্ত্রীবর্গ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বড়-বড় আলেমগণ উপস্থিত থাকেন।

১৪০০ হিজরির ২৪ সফর (১৪ জানুয়ারি ১৯৮০) থেকে ২৬ সফর (১৬ জানুয়ারি ১৯৮০) পর্যন্ত নির্বাচন কমিটিগুলোর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের নামের তালিকা ঠিক করা হয়। আমার নামে শিক্ষামন্ত্রী শায়খ হাসান আবদুল্লাহ আলে শায়খ-এর পক্ষ থেকে বিশেষ ও জোরালো তার এল যে, আমার খাতিরে হলেও আপনি এই সম্মেলনে অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি নিজে যাব না; স্নেহাস্পদ ডক্টর আবদুল্লাহ আব্বাস নদভীকে আমার স্থলাভিষিক্ত বানাব এবং তিনি আমার পক্ষ থেকে পদক ও এওয়ার্ড গ্রহণ করবেন।

আমি তখনই কমিটির সভাপতির নামে পত্র লিখলাম। তাতে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর লিখলাম, ভালো তো ছিল, দ্বীনের খাদেমরা তাদের পুরস্কার দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতে লাভ করবে। কিন্তু আমার অজান্তে এই ঘোষণাটি হয়ে গেল। এখন আমার জন্য বাদশাহ ফয়সাল মরহুমের (যাঁর নামে এই পুরস্কারের নামকরণ) সুমহান ইসলামি সেবাগুলোর স্বীকৃতি ও সম্মানে একে গ্রহণ করা ব্যতিরেকে আর কোনো উপায় থাকল না। আমি দু'আ করি, পুরস্কার যার আলামত এবং তার মাঝে অন্তর্নিহিত বিষয়গুলো যেন আল্লাহ পূরণ করে দেন। আমি নিজে উপস্থিত হতে পারছি না। ভাই

ডক্টর আবদুল্লাহ্ আব্বাস নদভীকে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছি। তিনি আমার পক্ষে এই এওয়ার্ড গ্রহণ করবেন এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম ও কৃতজ্ঞতা পৌঁছাবেন।

তারপর আমি লিখলাম, এই এওয়ার্ড দুটি দিক বহন করে। একটি তার অন্তর্নিহিত মূল্য। মানে মর্যাদা ও স্বীকৃতি। একে আমি লজ্জাশীলতার সঙ্গে গ্রহণ করছি। অপরটি এর আর্থিক দিক। মানে সেই অর্থ, যেগুলো এর সঙ্গে পাওয়া যাবে। এর জন্য আমি আপনার কাছে অনুমতি চাচ্ছি, আমার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইসলামের স্বার্থে ও দ্বীনের সেবামূলক কাজে এই অর্থ ব্যয় করব, যার ঘোষণা মৌলভী আবদুল্লাহ্ আব্বাস নদভী দেবেন।

১২ ফেব্রুয়ারি রিয়াদের ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের ফয়সাল হলে সন্ধ্যা আটটায় পুরস্কার বিতরণি সভা অনুষ্ঠিত হলো। বাদশাহ খালেদ ইবনে আবদুল আযীয-এর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে শাহজাদা ফাহ্‌দ ইবনে আবদুল আবদুল আযীয অনুষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বেশ কয়েকজন শাহজাদা, মন্ত্রীবর্গ ও রিয়াদের গভর্নর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আমরী ফাহ্‌দ ইবনে আবদুল আযীয এওয়ার্ড তুলে দেন। এওয়ার্ডপ্রাপ্তদের জীবনবৃত্তান্তও পড়ে শোনানো হয়। অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয়, আবুল হাসান নদভী ডক্টর আবদুল্লাহ্ আব্বাস নদভীকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। ইনি তাঁর পক্ষ থেকে পদক ও এওয়ার্ড গ্রহণ করবেন।

ডক্টর আবদুল্লাহ্ আব্বাস নদভী আমার পক্ষ থেকে এওয়ার্ড গ্রহণ করলেন। তিনি আমার পত্রও পাঠ করে শোনালেন এবং ঘোষণা করলেন, অর্ধেক অর্থ আফগান শরণার্থীদের দেওয়া হবে। এক চতুর্থাংশ জামায়াতে তাহফীযুল কুরআন-এর জন্য,[১] শায়খ সালেহ্ আল-কাযার (সাবেক

---

১. এই আন্দোলন ও এর জন্য প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো পাকিস্তানের এক সাধু ও সামর্থ্যবান ব্যবসায়ী আলহাজ্ব ইউসুফ সিঠি সাহেবের সুকীর্তিগুলোর একটি। তিনি অনুভব করলেন, ইসলামের খোদ কেন্দ্রস্থলে হেফযে কুরআনের প্রচলন কমে যাচ্ছে। এই অনুভূতি থেকেই তিনি এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং মোটা অংকের অর্থ এর জন্য বরাদ্দ দেন এবং এর জন্য একটি নিয়ম-নীতি ঠিক করে নেন, যার মাঝে তিনি এলাকার লোকদেরও যুক্ত করে নেন আবার সৌদি সরকারও তাতে অংশগ্রহণ করেন। এই ব্যবস্থাটি সৌদি আরব ও আফ্রিকায় খুব ছড়িয়ে পড়েছে এবং এর বদৌলতে হাজার-হাজার তরুণ এ পর্যন্ত কুরআনের হাফেয হয়ে গেছে।

সেক্রেটারি জেনারেল রাবেতা আলমে ইসলামী) যার পরিচালক। এক চতুর্থাংশ মাদরাসা সাওলাতিয়া মক্কা মুকাররমার জন্য।

নির্ভেজাল দ্বীনি শিক্ষার কেন্দ্র এই মাদরাসাটি হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব মুহাজিরে মক্কীর একটি অনবদ্য কীর্তি। আমরা ভারতীয় মুসলমানদের এর জন্য গর্ব করতে হয়। এ যাবত এই মাদরাসা থেকে বড়-বড় অনেক আলেমে দ্বীন বের হয়েছেন এবং আপন-আপন দেশে দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত অপরজন খোদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি নিজহাতে এওয়ার্ড গ্রহণ করেছেন।[১]

নিজের মূল্য বোঝো ইয়ায!

ফয়সাল এওয়ার্ড ঘোষণার অল্প কদিন পর (৪ ফেব্রুয়ারি) দারুল মুসান্নিফীন-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির বৈঠক ছিল, যেখানে আমারও অংশগ্রহণের কথা ছিল। আমার অজান্তে দারুল মুসান্নিফীন-এর পরিচালক শ্রদ্ধেয় ভাই সাইয়িদ সাবাহুদ্দীন আবদুর রহমান এই সুযোগে একটি সংবর্ধনাসভার আয়োজন ও তাতে আমাকে দারুল মুসান্নিফীন-এর পক্ষ থেকে মানপত্র প্রদানের পরিকল্পনা ঠিক করেন। আমি যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছি, তখন দেখে আমি লজ্জিত হলাম যে, তিনি আন্তরিকতা ও সম্পর্কের খাতিরে এর অসাধারণ আয়োজন সম্পন্ন করেছেন এবং আশপাশের আলেমসমাজ ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মানপত্রেও তিনি তাঁর সাহিত্যপূর্ণ শক্তিশালী কলম দ্বারা এমনসব কথা লিখেছেন, যেগুলো তাঁর নিষ্ঠা ও ভালাবাসা তাকে দ্বারা লিখেয়েছে।

আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য দাঁড়ালাম। আমি আমার বক্তব্য মাহমুদ ইয়াযের সেই কাহিনী দ্বারা শুরু করলাম, যার একটি উক্তি 'নিজের দাম বোঝো ইয়ায!' প্রবাদ হয়ে বিখ্যাত হয়ে গেছে। আমি বললাম, সুলতান মাহমুদ গজনবির দরবারি ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা দেখল, ইয়াযের ওপর (যে কিনা

১. তথ্যসূত্র : 'আলজাযিরা' ২৬ রবিউল আউয়াল ১৪০০ হিজরি (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০। পরবর্তী বছর ১৯৮১ সালে খেদমতে ইসলামের এই এওয়ার্ড লাভ করেন বাদশাহ খালেদ। তার পরের বছর শায়খ আবদুল আযীয বিন বায। তার পরের বছর বাদশাহ ফাহ্দ।

একজন গোলাম ছিল) বাদশাহর সেই মনোযোগ ও বিশেষ দৃষ্টি আছে, যেমনটি তাদের আর কারও কপালে জোটেনি। ফলে তাদের মনে হিংসা জন্মে গেল। সুযোগ পেয়ে একদিন তারা সুলতানের কাছে নিবেদন পেশ করল, জাহাঁপনা! আপনি তো এই গোলামটাকে খুব ভালবাসেন এবং অন্য সকল দরবারি থেকে একে ভিন্ন চোখে দেখেন। তাকে আপনি এমন নৈকট্য দানে ধন্য করেছেন, যেমনটি আর কেউ অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু তার আনুগত্যে আমাদের সন্দেহ আছে। আমরা প্রায়ই দেখি, সে রাজদরবার থেকে উঠে তার নির্জন কক্ষে চলে যায় এবং কিছু সময় ওখানে অবস্থান করে ফিরে আসে। জাঁহাপনা! আমরা তদন্ত করে দেখা আবশ্যক মনে করি, নির্জনে গিয়ে ও আসলে কী করে। দরবারিরা বারবারই বাদশাহর কানে এই সন্দেহের কথা দিতে থাকল।

বারবার শোনার পর বাদশাহর মনেও প্রশ্ন জাগল, আসলে ও নির্জনে গিয়ে কী করে বিষয়টা তদন্ত করেই দেখি না। একদিন ইয়ায সেই নির্জন কক্ষে যেতে উদ্যত হলে বাদশাহও তার পিছনে-পিছনে গেলেন। দেখলেন, ওখানে একটা পুরাতন জুব্বা রাখা আছে। ইয়ায কক্ষে ঢুকে তার সামনে দাঁড়াল এবং বারকয়েক 'ইয়ায! কদরে খোদ রা বশেনাস' (নিজের দাম বোঝো ইয়ায!) বাক্যটি আওড়াল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে কেন আস? আর এই কথাটার অর্থ কী? ইয়ায বলল, আমি যখন এই দরবারে এসেছি, তখন গরিবানা হালতে এসেছিলাম। এই জুব্বাটা তখন আমার গায়ে ছিল। আমি চাচ্ছি, যেন আমি নিজের আসল পরিচয় না ভুলি এবং আমার মনে থাকে, আমি কোন অবস্থায় এসেছিলাম আর রাজদৃষ্টি আমাকে কোথায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে। সেজন্য আমি এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজের অতীত ও আসল অবস্থাটা স্মরণ করি, যাতে আমার দেমাগ বিভ্রান্ত না হয় আর আমি প্রতারণার শিকার না হই।

আমিও আমার পুরাতন জুব্বাটা (শুরুর দিককার নিঃস্বতা ও অসারতা) সংরক্ষণ করে রেখেছি। আর আমিও তাকে সামনে রেখে 'ইয়ায! কদরে খোদ রা বশেনাস' (নিজের দাম বোঝো ইয়ায!) বলি। আমার সেই জুব্বাটা হলো, ১৯৩১ সালে যখন আমি আমার ওস্তাদ আল্লামা তকিউদ্দীন আল-হেলালির সঙ্গে একজন খাদেম হিসেবে এখানে এসেছিলাম, তখন তাঁর মাধ্যমে আমি মনোবাসনা ব্যক্ত করেছিলাম, যেন অন্তত একজন কর্মচারী হিসেবে (যার বেতন সে সময় আমার দৃষ্টিতে ২৫-৩০ রুপি হতে পারত) আমাকে এখানে

রেখে দেওয়া হয় এবং আমি কোনো খেদমত করার সুযোগ লাভ করি। কিন্তু সেদিন আমাকে এ কাজের যোগ্য মনে করা হয়নি। আর আজ এই মহান প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমাকে এই সম্মান প্রদান করা হচ্ছে! কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্ আমি আমার আসল পরিচয় সম্পর্কে অবহিত আছি। আমার অতীত আমার মনে আছে। নিজের ব্যাপারে আমি কোনো রকম প্রতারণার শিকার নই। আর সেজন্য নিজেকে উদ্দেশ করে এখনও বলছি, 'ইয়ায! কদরে খোদ রা বশেনাস – ইয়ায! কদরে খোদ রা বশেনাস'। আর এরই মাঝে আমি নিজের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিহিত আছে বলে মনে করি।

অনুরূপ আরও (সীমিত পরিসরে) একটি সভা দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার বন্ধু-সহকর্মীগণ শিক্ষক পরিষদের পক্ষ থেকে আয়োজন করেন। তাতেও আমি এই একই ধারায় আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দারুল উলূম দেওবন্দের শতবর্ষপূর্তি সম্মেলন মুরাদাবাদ ট্রাজেডি, পয়ামে ইনসানিয়াত কনভেনশন

দারুল উলূম দেওবন্দের শতবর্ষপূর্তি সম্মেলন

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার বয়স একশো বছরেরও কিছু বেশি সময় অতিক্রম করছিল। দারুল উলূম দেওবন্দ শুধু একটি দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই নয় – (যাকে উপমহাদেশের আযহার বলা সব দিক থেকেই সঙ্গত। বরং কোনো-কোনো দিক থেকে এটি মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও বড়) বিশ্বাসের সংশোধন, কুরআন-সুন্নাহর প্রচার-প্রসারের একটি ইতিহাস নির্মাতা দাওয়াত। এটি মূলত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর বংশের সংস্কারমূলক মিশনেরই ধারাবাহিকতা, যেখানে কাল, পরিস্থিতি ও শাসনক্ষমতায় পরিবর্তনের কারণে জাতির অবশিষ্ট দ্বীনি সম্পদের সংরক্ষণ, তার জন্য একটি বড় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, উন্নতির কর্মকৌশল ও কার্যকর প্রচেষ্টার ময়দান সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে (সাময়িকের জন্য) প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষার পজিশন অবলম্বন করা হয়েছিল, যার কারণ ও সূত্র বোঝা ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের ভয়াবহতা এবং তার ব্যাপক ও গভীর প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করা ব্যতীত সম্ভব নয়।[১]

দারুল উলূম দেওবন্দ সব দিক থেকেই যোগ্য ছিল যে, এর শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করা হবে, তার নানামুখী সেবার; বরং বহুমুখী জয়ের পরিসংখ্যান নেওয়া হবে এবং তার ইতিহাসকে না শুধু দেশ; বরং জাতির সম্মুখে

---

১. দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ও তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝতে লেখকের গ্রন্থ 'মামালিকে ইসলামিয়্যাহ মেঁ ইসলামিয়্যাত ও মাগরেবিয়্যাত কী কাশমকাশ'-এর 'দারুল উলূম দেওবন্দ' অধ্যায়টি পড়ুন।

উপস্থাপন করা হবে। সেইসঙ্গে হাল আমলের দাবি, সময়ের বাস্তবতা ও দেশের সঠিক পরিস্থিতিরও পরিসংখ্যান নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতের জন্য কর্মপথ ঠিক করা হবে (যেমনটি আগে বলা হয়েছে) যে, প্রতিষ্ঠান ইতিহাস দ্বারা নয় – আন্দোলন দ্বারা জীবন্ত থাকে আর আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন বাস্তবসম্মত আত্মসমালোচনা, উন্নতি লাভের শক্তি, সজীবতা এবং প্রতিটি যুগে নতুন-নতুন সফলতাদানের যোগ্যতা।

দারুল উলূম দেওবন্দের শতবর্ষপূর্তি সম্মেলন অনুষ্ঠানের চিন্তা অনেক পুরনো। হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ হুসাইন আহমাদ সাহেব মাদানী (রহ.)-এর জীবদ্দশায়ই ১৯৪৯ সালের এক শুরার বৈঠকে প্রথমবারের মতো তার প্রস্তাবনা সামনে আসে। এ ক্ষেত্রে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ-এর আমীর ও দারুল উলূম দেওবন্দের শুরা সদস্য মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেব সাহারবি ও মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর নু'মানির ভূমিকা ছিল সবচেয়ে জোরালো।

দেশ বিভক্তির পর এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেল, যার কারণে অনুভব করা হচ্ছিল, একটি সর্বভারতীয়; বরং একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে দারুল উলূমের আন্তর্জাতিকতার প্রমাণ দেওয়া হবে, যাতে সরকারের দায়িত্বশীলগণও দারুল উলূমের গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হন এবং তার সঙ্গে কোনো রকম অসদাচরণের চিন্তা মাথায় না আনেন। কিন্তু মাওলানা মাদানি (রহ.) এই যুক্তিতে দ্বিধা প্রকাশ করেন যে, এমন একটি অনুষ্ঠান সামাল দেওয়া কঠিন হবে। তাঁকে দারুল উলূমের ঐতিহাসিক দস্তারবন্দি মাহফিলের হাওয়ালা দেওয়া হলো, যেটি ১৩২৭ হিজরির রবিউল আখারে (এপ্রিল ১৯১০) অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং কল্পনারও বেশি সফল হয়েছিল এবং যার আনন্দঘন ও আলোকজ্জ্বল স্মৃতি আজও পর্যন্ত সতেজ আছে। তিনি উত্তরে বললেন, 'এটি সেই মহান ব্যক্তিগণের বৈশিষ্ট্য ছিল, যারা সে সময় দারুল উলূমের পরিচালনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন।'[১]

---

১. একথা বলে মাওলানা মাদানি হযরত শায়খুল হিনদ মাওলানা মাহমুদ হাসান (রহ.), হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম সাহেব রায়পুরি (রহ.), হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহেব সাহারানপুরি (রহ.) ও হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানুবি (রহ.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেন, যারা উক্ত সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন এবং তার সফলতা অর্জন ও সব ধরনের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য সর্বান্তকরণে আল্লাহর কাছে দু'আয় রত ছিলেন।

মাওলানা বলেন, কিন্তু এই ভরপুর ফেতনার যুগে যথাযথভাবে এমন একটি সম্মেলন করা এবং তাকে সামাল দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হবে। অন্য অনেকেও নানা ধরনের সমস্যার কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু অবশেষে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং তার প্রস্তুতির জন্য একটি অফিস খোলা হলো। কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেল এবং সম্মেলন মুলতবি হয়ে গেল।

সে সময়েই ১৯৭৫ সালে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার ৮৫সালা শিক্ষা সমাবর্তন পালন করা হলো, যেটি আশার চেয়েও বেশি সফল ও ফলদায়ক হলো, যার বিস্তারিত বিবরণ অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা ও নজির দারুল উলূম দেওবন্দের শতবর্ষপূর্তি সম্মেলনের চিন্তা ও আয়োজনে বাড়তি শক্তির জোগান দিল এবং অবশেষে সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত হয়ে গেল, আল্লাহর ওপর ভরসা করে ৩, ৪, ৫ জুমাদাল উলা ১৪০০ হিজরি (২১, ২২, ২৩ মার্চ ১৯৮০) এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য সর্বপ্রথম একটি বৃহৎ ব্যবস্থাপনা ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও ছক তৈরি হলো। তারপর বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এবং দারুল উলূমের সেসব সদস্য ও পৃষ্ঠপোষকের আদর্শের ক্রিয়ায়, যাঁরা দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতাবর্গের প্রাণ ও চেতনার অনুসরণ ও তার প্রতিটি কাজে জরুরি মনে করতেন এই পরিধিকে সংক্ষিপ্ত করে ফেললেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হতে-হতেও সেটি বেশ ব্যাপকই রয়ে গেল। দারুল উলূমের সুদূরপ্রসারী ক্রিয়া, তার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা, তার ছাত্র-অনুরক্তদের সংখ্যাধিক্য ও ব্যাপক জনপ্রিয়তার আলোকে নির্দ্বিধায় ধারণা করা যাচ্ছিল, এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ভক্ত-অনুরক্তরা দলে-দলে আসবে এবং তাদের সংখ্যা অতি অনায়াসে হাজার-হাজার কেন, কয়েক লাখ হয়ে যাবে। আর সেজন্য তার আয়োজনও সেই অনুসারেই হওয়া দরকার।

আমার ১৯৬২ সাল থেকেই দারুল উলূমের মজলিসে শূরার সদস্যপদের মর্যাদা অর্জিত ছিল এবং আমি মজলিসে শূরার অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সভাগুলোতে অংশগ্রহণ করছিলাম, যেগুলোতে এই সম্মেলনের ব্যাপারে চিন্তা করা হতো। ক্ষুদ্র একটি দলের অভিমত ছিল, এই সম্মেলনকে নিরেট জনসভার রং চড়ানো যাবে না এবং তার পরিধি এত ব্যাপক করা যাবে না, যাকে সামাল দেওয়া কঠিন হবে এবং যেখানে দারুল উলূমের আসল বার্তা তার ছাত্র ও ভক্তবৃন্দের কানে পৌঁছানো অসম্ভব হবে এবং তাদেরকে তাদের

কর্তব্য, তাদের কাছে সময় ও দ্বীনের যে দাবি আছে, সেগুলো তাদের কানে পৌঁছানো অসম্ভব হবে। কিন্তু সেই দলটিই বেশি প্রভাবশালী ছিল, যারা একে এই উপমহাদেশের একটি স্মরণীয় ও ভোলা যায় না এমন একটি দ্বীনি মাহফিলে পরিণত করতে চাচ্ছিলেন এবং তার মাধ্যমে সরকার বৃহৎ জনগোষ্ঠী, সমমনা ও বিরুদ্ধবাদীদের ওপর দারুল উলূমের গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদার এমন একটি চিত্র বসিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন, যার নজির দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। অবশেষে আমি অভিমত ব্যক্ত করলাম, এই সম্মেলনকে দুভাগে ভাগ করে নেওয়া হোক। প্রথম দুদিন তার ছাত্রবৃন্দ, তার সনদপ্রাপ্ত ও আলেমসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এই অংশে দারুল উলূমের ইতিহাস, তার প্রতিষ্ঠাতা ও অভিভাবক শ্রেণীর আলেমগণের চিন্তা-চেতনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হবে এবং দায়িত্ব, কর্তব্য ও মর্যাদা সম্পর্কে তাদের ধারণা দেওয়া হবে। শেষ দিনের অধিবেশনটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, যেখানে জনসাধারণকে ওয়াজ-নসিহত করা হবে। কিন্তু সম্ভবত এই বিভক্তি ও বাধ্যবাধকতা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে মনে করে একে শুরু থেকেই সাধারণ সভার রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। দেশে সম্মেলনের প্রচার-পাবলিসিটি এত হয়ে গেল যে, তাতে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা কঠিন হয়ে গিয়েছিল।

সম্মেলনের ব্যাপারে মজলিসে শূরার সর্বশেষ যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো, সৌদি আরবের রাষ্ট্রপ্রধান বাদশাহ খালেদের কাছে আবেদন জানানো হবে, আপনি এই সম্মেলনে আপনার বিশেষ একজন প্রতিনিধি পাঠান। এই আবেদনপত্র লেখার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হলো। আমি তাতে দারুল উলূমের পরিচিতি বর্ণনা করতে গিয়ে তার সংশোধনমূলক প্রচেষ্টাসমূহ, সুস্থ আকিদা ও বোধ-বিশ্বাসের প্রচার-প্রসার, নানামুখী দ্বীনি ইল্ম, বিশেষ করে কুরআন ও হাদীছের প্রচার এবং শিরক-বিদ'আতের মূলোৎপাটনে দারুল উলূমের কীর্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম। পরে আবেদন জানালাম, আপনি আপনার প্রতিনিধি হিসেবে বড় মাপের কোনো আলেম বা শীর্ষস্থানীয় কোনো মন্ত্রীকে নির্বাচন করুন।

প্রথমে আমার খেয়াল ছিল, শিক্ষামন্ত্রী মহামান্য শায়খ হাসান আবদুল্লাহ আলে শায়খ এর জন্য বেশি উপযোগী হবেন। কিন্তু পরে নানা সুবিধার কথা বিবেচনা করে আইনমন্ত্রী শায়খ ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম-

এর নাম প্রস্তাব করলাম। এই বৈঠকের দিনকতক পরই আমার সৌদি আরব সফরের প্রয়োজন দেখা দিল। (সম্ভবত জামেয়া ইসলামিয়ার সর্বোচ্চ সভায় অংশগ্রহণের জন্য) হারামাইন শরীফাইনের কাজ শেষ করে কোনো এক প্রয়োজনে আমি রিয়াদ গেলাম। ওখানে জানতে পারলাম, বাদশাহ খালেদ এই বৈঠকে অংশগ্রহণ ও সৌদি আরবের প্রতিনিধিত্বের জন্য জামেয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ-এর ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর আবদুল্লাহ আবদুল মুহসিন তুর্কিকে নির্বাচন করেছেন। তিনি যখন জানতে পারলেন, আমি রিয়াদ এসেছি, তখন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা করা ব্যক্ত করলেন, যাতে তিনি এই সম্মেলনের ধরন ও পরিধি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারেন এবং তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে পারেন। আমার সঙ্গে আলোচনার পর যখন তিনি জানতে পারলেন, সম্মেলন ব্যাপক আকারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং তাতে কয়েক লাখ মানুষ অংশ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এত ব্যাপক আকারে করা হচ্ছে কেন? আমি তাঁকে দারুল উলূমের গণসম্পৃক্ততা কথা বললাম। জানালাম, এই সম্মেলন সীমিত পরিসরে আয়োজন করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

আমি যখন জানতে পারলাম, ইনি বাদশাহর প্রতিনিধি হিসেবে যাচ্ছেন, তখন জরুরি মনে করলাম, তাঁর আদর-আপ্যায়নও সেই অনুপাতে হওয়া দরকার এবং তাঁকে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি বানানো আবশ্যক।[১]

আমি এও অবগত হয়েছিলাম যে, সৌদি সরকার দারুল উলূমকে আর্থিক সাহায্য দিতে ইচ্ছুক। ডক্টর তুর্কিও আমাকে বললেন, আমার সম্মুখে সুনির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা পেশ করবেন, যেগুলো আগে থেকেই ঠিক করা থাকবে। আমি আমার নানা ব্যস্ততার কারণে দেশে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। পৌঁছতে-পৌঁছতে আমার সম্মেলনের তারিখ কাছাকাছি হয়ে যাবে। সেজন্য এই সংবাদগুলো দায়িত্বশীলবর্গকে আগেই জানানো জরুরি

---

১. আমি মজলিসে শূরায় প্রস্তাব পেশ করেছিলাম, যেহেতু এমন একজন নেতৃস্থানীয় বা আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব সামনে নেই; যাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কটি অধিবেশনের সভাপতির মর্যাদা দেওয়া যায় এবং তাতে কেউ কোনো আপত্তি তুলবে না, তাই ভালো হবে, আমরা প্রতিটি অধিবেশনের আলাদা-আলাদা সভাপতি নিযুক্ত করব।

মনে করলাম। এ লক্ষ্যে আমি জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা তায়্যেবার ছাত্র আমার স্নেহাস্পদ মৌলভী খলীলুর রহ্মান সাজ্জাদ নদভীকে ভারত পাঠিয়ে দিলাম যে, সে গিয়ে মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তায়্যেব সাহেব ও তাঁর সহকর্মীদের বিষয়টি অবহিত করবে। সে আগে-ভাগে পৌঁছে গেল এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, ডক্টর তুর্কি প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করবেন।

আমি ১৯ মার্চ বোম্বাই পৌঁছে গেলাম। কোনো এক বন্ধু দিল্লি থেকে ফোন করে আমাকে জানাল, উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী অংশগ্রহণ করছেন এবং তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। শুনে আমি মনক্ষুণ্ন হলাম যে, এটা একটা খাপছাড়া ব্যাপার। বিষয়টা দারুল উলূমের মর্যাদা, ঐতিহ্য ও সেই সম্মেলনের সঙ্গে মিল খায় না, যার মঞ্চে এমন-এমন নির্ভরযোগ্য ও বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন উপস্থিত থাকবেন যে, ওখানকার প্রতিটি কর্ম ও প্রতিটি আচরণ দ্বীনি সনদ ও ফাতাওয়ার মর্যাদা পাবে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

আমি ২০ মার্চ দিল্লি পৌঁছে গেলাম। আমার সঙ্গে আমাদের জিদ্দার মেজবান আলহাজ্ব নূর অলী (স্বত্বাধিকারী আবদুল গনী মুহাম্মাদ নূর অলী কোম্পানী), তাঁর পুত্র স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ ইউসুফ নূর অলী, বোম্বাইয়ের বন্ধুগণ, যাদের মধ্যে আমার মেজবান আলহাজ্ব গোলাম মুহাম্মাদ (ওরফে মুহাম্মাদ ভাই, স্বত্বাধিকারী বাম্বে আন্ধ্রা ট্রান্সপোর্ট), সূফী আবদুর রহমান (ওরফে ওমর ভাই, চান্দ ভাই, নাগদেবী স্ট্রীট) ও বন্ধুবর ইসমাইল মানসুরী সাহেব প্রমুখ ছিলেন। আমরা সম্মেলনের শুরুর সময়টি ইচ্ছাকৃতভাবে দিল্লির নেজামুদ্দীনে কাটালাম। পরে কারযোগে এমন একটি সময়ে দিল্লি থেকে রওনা হলাম যে, আমরা যখন মিরাঠের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তখন প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার তাকে নিয়ে ফিরে আসছিল। আমরা মাগরিব ও ঈশার মাঝামাঝি সময়ে দারুল উলূম এসে পৌঁছলাম। দেখে মনে হলো, সমাবেশ যেন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আমি ও আমার সঙ্গীরা অনেক কষ্টে থাকার জন্য জায়গা পেলাম। আমি অসুস্থও ছিলাম। কদিন যাবতই আমি পায়ের ব্যথায় ভুগছিলাম। কয়েক পা হাঁটাও আমার পক্ষে কষ্টকর ছিল।

পরদিন (২২ মার্চ) আমি সম্মেলনস্থলে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখে মনে হলো, যেন একটি মানববন। আরাফাত ময়দানের হালকা একটি দৃশ্য। বন্ধুবর ডক্টর আবদুল্লাহ যায়েদ (ভাইস চ্যান্সেলর জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারা) এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করছিলেন। মঞ্চে আরবের কয়েকজন বিশিষ্ট ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব উপবিষ্ট, যাদের মধ্যে মিসরের আওকাফমন্ত্রী বন্ধুবর ডক্টর শায়খ আবদুল মুনঈম আন-নাম্‌র, ডক্টর ইউসুফ আল-কারজাবী, কুয়েতের আওকাফমন্ত্রী শায়খ ইউসুফ আল-হাজ্জী ও আবদুল্লাহ আল-আকীল প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই অধিবেশনে আমার আরবিতে ভাষণদানের প্রোগ্রাম ছিল। ব্যবস্থাপকগণ আমাকে আরবিতে ভাষণ দিতে ইঙ্গিত করলেন।

কিন্তু এই বিশাল জনসমাবেশে (যারা আরবি জানে না, বোঝে না) আরবিতে ভাষণ দেওয়া একটা কৃত্রিম ও লোকদেখানো কাজ বলে প্রতীয়মান হলো, যার জন্য আমার মন প্রস্তুত হলো না। আমার ধারণা ছিল, (এমনকি এ ব্যাপারে আমার কাছে তথ্যও ছিল) এখনও পর্যন্ত এই বিশাল সমাবেশে – যারা হিন্দুস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এই ভক্তি, বিশ্বাস ও চেতনা নিয়ে এসে সমবেত হয়েছে, তারা তাদের ঈমানকে তাজা করে, দ্বীন ও শরীয়তের সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করে এবং হিন্দুস্তানের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দ্বীন ও মিল্লাতের সম্পর্ক ও অফাদারির প্রত্যয়-প্রতিজ্ঞাকে পোক্ত বানিয়ে ঘরে ফিরবে – এখনও পর্যন্ত কোনো সঞ্জীবনী বার্তা এবং তাদের দ্বীনি অনুভূতিকে জাগ্রত করার আমন্ত্রণ পেশ করা হয়নি, যেটি তাদের এই সফরের অর্জন ও পাথেয় হবে। এ যাবত আলোচনা যা হয়েছে, বেশির ভাগই হয়েছে দারুল উলূমের ইতিহাস ও বড়দের গুণকীর্তন বিষয়ে, যার দ্বারা স্বল্প জ্ঞানের এই লোকগুলো তাদের জীবন ও কর্মরীতিতে কোনো ফলাফল বের করতে সক্ষম হবে না। এই সমাবেশটি দেখার পর আমার অন্তরে এমন একটি ভাষণদানের প্রবল স্পৃহা জাগ্রত হলো, যার দ্বারা আল্লাহর সরলমনা বান্দাগুলো – যারা দূর-দূরান্ত অঞ্চল থেকে গাঁটের পয়সা খরচ করে আলেমদের সাক্ষাত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা শোনার আগ্রহ নিয়ে এসেছে – একটি দ্বীনি আস্থা, হিন্দুস্তানে দ্বীনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ও ইসলামের একজন ধারক-বাহক হিসেবে জীবন যাপনের এবং ইসলামি জীবনের নমুনা উপস্থাপনের দায়িত্বের অনুভূতি নিয়ে ফিরে যাবে এবং আমাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের সামনে

জবাবদিহি করতে না হয় যে, আল্লাহর এই বান্দাদের তোমরা কেন ডেকেছিলে!

আমি আরবিতে কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করে আরব মেহমানদের কাছে আরবিতে ভাষণ না দেওয়ার অজুহাত উপস্থাপন করেছি। আমি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি, এই বিশাল সমাবেশ নিজের ভাষায় দ্বীনি কথাবার্তা শোনার অধিকারও সংরক্ষণ করে, আবার প্রবল আগ্রহীও। সেজন্য আমি উরদুতেই ভাষণ দেব।

আমি ভাষণ শুরু করলাম। আমার মনে হচ্ছিল, নিজের চেষ্টায় যা কিছু বলছিলাম, তার চেয়ে বেশি আসছিল স্বতস্ফূর্তভাবে। এ ছিল সেই সরলমনা ঈমানদার শ্রোতাদের কৃতিত্ব, যারা আপাদমস্তক কান হয়ে বসে ছিল।

এখানে আমি সেই ভাষণের কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। আমি হিন্দুস্তানি মুসলমানদের এবং এই নিষ্ঠাবান মজমাকে তাদের সেই জিম্মাদারির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে, যেটি এ দেশে শুধু জাতীয় স্বাতন্ত্র বহাল রাখার ক্ষেত্রেই নয় বরং দাওয়াতি ও নেতৃত্বসুলভ কর্তব্য পালনে তাদের ওপর অর্পিত হয়; বলেছি–

'আমি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করছি এবং আমি চাচ্ছি, আপনারাও ঘোষণা করুন; আমরা এমন জীব-জন্তুর জীবন যাপন করতে সম্মত নই, যাদের শুধু নিরাপত্তা দরকার যে, আমাদের যেন কেউ মারতে না পারে। এমন জীবন যাপনে এবং এমন অবস্থান গ্রহণ করতে আমরা হাজারবার অস্বীকার করছি। এই মাটিতে আমরা আযান ও নামাযের সঙ্গে থাকতে চাই। বরং আমরা তারাবীহ-ইশরাক-তাহাজ্জুদও ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই। আমরা এক-একটি সুন্নতকে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে রাখব। আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শকে সামনে রেখে জীবনটাকে পরিচালিত করব। তাতে আমরা একটি বিন্দু-বিসর্গও ছাড় দিতে রাজী নই।

আমি বিশেষ কোনো মাদরাসা বা বিশেষ কোনো জামেয়ার কথা বলছি না। কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বিশেষ কোনো পরিকল্পনা বা ইমারতের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার নয়। বিষয়টি হলো ঈমানি ইল্‌মের আজীবনের জন্য টিকে থাকার এবং ইসলামি ব্যক্তিত্বের সুরক্ষার। আপনাদের অন্যদের পেছনে হাঁটার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। না আল্লাহ আপনাদের এদেশে এজন্য পাঠিয়েছেন যে, আপনারা অপরের তল্পীবাহক হয়ে জীবন কাটাবেন আর

তাকিয়ে থাকবেন, দেশের গতি কখন কোন দিকে মোড় নেয়। আমরা কোনো জাতীয় ধারা সম্পর্কে অবহিত নই। আমরা জানি শুধু ইসলামিয়াতের ধারা। আমরা জগতের নেতৃত্বের জন্য সৃষ্ট হয়েছি।

দেশ আজ আত্মহত্যার জন্য কসম খেয়েছে। সে আজ আগুনের কুণ্ডে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত। চরিত্রহীনতা ও মানবতাবিধ্বংসী পাঁকে হাবুডুবু খাচ্ছে দেশ। আপনারাই পারবেন হিন্দুস্তানকে; বরং গোটা এশিয়াকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে। আপনারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা বলুন। নিলামের বাজারে নেমে আসার এবং নিজেদের বিক্রি করার কোনো আবশ্যকতা আপনাদের নেই যে, মানুষ বলবে, আপনারা একটি দুষ্পাপ্য পণ্য। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আপনাদের ক্রয় করার সাহস রাখে না। তাই আমি পরিষ্কার ভাষায় বলছি, এই দেশটিকে আপনারাই রক্ষা করতে পারেন। কারণ, আপনাদের কাছে তাওহীদের বিশ্বাস ও মানবীয় সমতার মূলনীতি আছে। আপনাদের কাছে সামাজিক সুবিচারের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা আছে। আপনারাই সব কিছুর উর্ধ্বে। আপনারাই সেইসব লোক, যাদের কাছে পরকালে বিশ্বাস আছে এবং আপনারা 'শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য' কথাটির ওপর বিশ্বাস রাখেন। আপনারা তাদের দলভুক্ত নন, যাদের দৃষ্টি শক্তির ওপর নিবদ্ধ থাকে এবং যাদের চোখে বিত্ত-বৈভব আর সংখ্যাধিক্যই সব কিছু। আপনারা তাদেরও মাঝে পরিগণিত নন, যারা নির্বাচনে সফলতা অর্জন ও পার্লামেন্টে পৌঁছে যাওয়াকেই সবচেয়ে বড় মেরাজ মনে করে।

আমার বন্ধুগণ! আমি পূর্ণ আস্থা ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি, মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবি (রহ.) ও তাঁর আত্মার বার্তা এটিই। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) এই ভাবনায় বিভোর ছিলেন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী ও মাওলানা মাদানি (রহ.) আপন-আপন ধারায় সব সময় এ ভাবনায়ই অস্থির ছিলেন যে, ভারতীয় মুসলমানরা তাদের বৈশিষ্ট্য ও জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এ দেশে টিকে থাকবে। তারা কুরআন ও সুন্নাহকে বুকে আকড়ে রাখবে। বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে টানা-হেঁচড়া করার পরিবর্তে তাওহীদ ও সুন্নাতের ওপর জোর দেবে। দেওবন্দের এটিই বার্তা এবং এটিই তার বৈশিষ্ট্য যে, সে জাতির মূল পুঁজিটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন।'

তারপর আমি প্রয়োজন বোধ করলাম, খোদ দারুল উলূমের ছাত্রদেরকে তাদের সংস্কৃতি ও আদর্শের গঠন-উপাদান ও দলগত স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অবহিত করব, যেগুলোর সুরক্ষা ও প্রতিনিধিত্ব আজও জরুরি।

আমি বললাম–

'এই বিদ্যালয়টির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এটি তার দৃষ্টিকে বিরোধপূর্ণ বিষয়াদির পরিবর্তে তাওহীদ ও সুন্নাতের ওপর নিবদ্ধ রেখেছে। (এটি সেই উত্তরাধিকার ও আমানত, যেটি হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. শাহ ইসমাঈল ও সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রহ.-এর উসিলায় তার কাছে এসেছে এবং আজও পর্যন্ত এটি তার প্রিয় বিষয়)।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো সুন্নতের অনুসরণের স্পৃহা ও ভাবনা।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের ভাবনা, সব সময় আল্লাহকে স্মরণে রাখা এবং ঈমান ও নিজের আমলের হিসাবের জযবা।

চতুর্থ উপাদানটি হলো আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার চেতনা-প্রচেষ্টা ও দ্বীনি মর্যাদাবোধ।

এই চার উপাদানের সমন্বয়ে একজন মানুষ দেওবন্দী হয়। কারও মাঝে যদি এর একটি উপাদান কম পাওয়া যায়, তা হলে তাও দেওবন্দিয়াত অসম্পূর্ণ। এটিই হলো দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতীক। এই চারটি উপাদানই তার মাঝে বরাবরই বিদ্যমান থাকছে।

আমার এই বক্তব্য চলাকালে এবং বক্তব্য শেষ হওয়ার পরে শ্রোতাদের ওপর এর বিশেষ এক ধরনের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। আমার একাধিক সুহৃদ – যারা এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন – আমাকে শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন। ভাবে বোঝা গিয়েছিল, আমার এই বক্তব্য মানুষের মনের কথা ছিল এবং এর দ্বারা তাদের আত্মার পিপাসা নিবারিত হয়েছে। আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার পরক্ষণেই মাওলানা মুফতী মাহমূদ সাহেব মরহূম (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তান) – যাকে পাকিস্তানে দেওবন্দী চিন্তাধারার একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি মনে করা হতো এবং হিন্দুস্তানে দীর্ঘ দিন যাবত মাদরাসা শাহী মুরাদাবাদে অধ্যাপনার খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন – দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমার সমর্থনে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, দেওবন্দিয়াতের পরিচিতিতে যা কিছু বলা হয়েছে, তা একশোতে একশোভাগই সঠিক।

আমার এই বক্তব্য বাদ দিলেও এই সম্মেলন এদিক থেকেও সফল ছিল যে, দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপনকারী বহুসংখ্যক আলেম (যাদের বিরাট একটি অংশ পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশে থেকে এসেছেন) দীর্ঘ

দিন পর পরস্পর মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছেন। তারা তাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে দেখলেন, তার সম্প্রসারণ, উন্নতি ও নতুন ভবনগুলো দর্শন দ্বারা নিজেদের চোখগুলোকে আলোকিত করে ধন্য হয়েছেন। মুসলমানরা; এমনকি দেশের অমুসলিম নাগরিকরাও দারুল উলূম দেওবন্দ ও ওলামায়ে দেওবন্দের প্রভাব অনুভব করল এবং প্রত্যক্ষ করল মুসলমানদের মাঝে দ্বীনি শিক্ষা ও দ্বীনি শিক্ষাব্যবস্থার এখনও কতখানি গুরুত্ব বিদ্যমান আছে এবং এর মাঝে তাদের জন্য কেমন একটা চুম্বকীয় আকর্ষণ বিরাজমান, যেটি কিনা হাজার-হাজার মুসলমানকে দূর-দূরান্ত থেকে টেনে নিয়ে আসে।

শতবর্ষপূর্তি সম্মেলনের পর

কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই সফল ও স্মরণীয় সম্মেলনের পর থেকেই দারুল উলূমের ইতিহাসে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলার একটা নতুন যুগ শুরু হয়ে গেল, যার মধ্যে বোধ করি, এই প্রতিষ্ঠানটির গ্রহণযোগ্যতা, এর শক্তিশালী প্রভাব ও সেসব দ্বারা লাভবান হওয়ার সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার অনুভূতিরও দখল ছিল, এই সম্মেলন যার প্রমাণ দিয়েছিল। এই বিরোধ দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তায়্যেব সাহেব ও মজলিসে শূরার মাঝে এতটাই স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করল যে, তার আর কমিটির সদস্যবর্গ ও ঘনিষ্ঠজনদেরও মাঝে সীমাবদ্ধ থাকল না – সাধারণ মানুষ ও মিডিয়া পর্যন্তও পৌঁছে গেল। আমার মনে আছে, সম্মেলনের দিনকতক পর দারুল উলূম দেওবন্দেরই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য কমিটির বিশিষ্ট কয়েকজন সদস্যকে লাখনৌ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, যাতে আলাদা বসে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতে পারি।

মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তায়্যেব সাহেব, মাওলানা মুফতী আতীকুর রহমান সাহেব, মাওলানা সাঈদ আহমাদ সাহেব আকবরাবাদি ও খুবসম্ভব মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ সাহেবও এসেছিলেন। আমার বন্ধুবর মাওলানা মুহাম্মাদ মানযুর নু'মানিও উপস্থিত ছিলেন। আমি যখন মাওলানা কারী তায়্যেব সাহেবের সঙ্গে মুসাফাহ করলাম, তখন সর্বপ্রথম তাঁর মুখ থেকে যে কথাটি বের হয়েছিল, সেটি হলো, 'সবদিক থেকে আমাদের সম্মেলনের সফলতার মুবারকবাদ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এ তো আমাদের জন্য অনেক বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াল! অবশেষে এই বিরোধ বাড়তে-বাড়তে এমন একটা

জায়গায় গিয়ে উপনীত হলো যে, কারী তায়্যেব সাহেব দিল্লির এক সাধারণ সভায় দারুল উলূমের সংবিধান ও তার মজলিসে শূরার বিলুপ্তি ঘোষণা করলেন এবং তার জন্য একটি এডহক কমিটি গঠন করে দিলেন।

অপরদিকে ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি ১৯৮২ তে দেওবন্দে অনুষ্ঠিত সভায় মজলিসে শূরা কারী তায়্যেব সাহেবকে তাঁর পদ থেকে অব্যাহতি দিল, একজন নতুন মুহতামিম নির্বাচন করল[১] এবং দারুল উলূমের বেশ কজন শিক্ষক ও কর্মচারীকে স্ব-স্ব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিল। আবার তার বিপরীতে কারী সাহেবের কয়েকজন অনুসারী দেওবন্দের জামে মসজিদে একটি সমান্তরাল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন। দারুল উলূমের সঞ্চিত অর্থ ফ্রিজ করে দেওয়া হলো। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশে দারুল উলূম দেওবন্দের ভক্ত-অনুসারীদের মাঝে এই বিরোধের জন্য বেদনা ও অনুশোচনা পরিলক্ষিত হলো এবং গোটা উপমহাদেশের দ্বীনি শিক্ষাব্যবস্থার ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ল। মজলিসে শূরার কোনো সদস্য এই বিরোধ দূর করার অনেক চেষ্টা করেছেন। তারা বারবারই উভয় পক্ষের দায়িত্বশীলবর্গের সঙ্গে একাকি ও সম্মিলিতভাবে বসে কথা বলেছেন এবং এমন একটি ফর্মুলা উপস্থাপন করেছেন, যেটি মোটের ওপর উভয় পক্ষেরই জন্য গ্রহণযোগ্য ছিল।[২]

তাদের চেষ্টা ছিল, আলেমদের মর্যাদা, দ্বীনি শিক্ষার নৈতিক ফলাফল ও সনাতন শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যতের জন্য যে হুমকিটা তৈরি হয়ে গেছে, যতটুকু সম্ভব তার দূর হয়ে যাক। তাদের এই উদ্যোগের পেছনে আরও একটি বিষয় কাজ করছিল। তারা চিন্তা করেছিলেন, কারী সাহেব এখন জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.)-এর একান্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। আলেমসমাজে

---

১. নতুন নিযুক্ত মুহতামিম হলেন মাওলানা মারগূবুর রহমান, যিনি দারুল উলূমেরই একজন প্রবীণ ছাত্র ও প্রবীণ শূরা সদস্য ছিলেন।

২. ফর্মুলাটা ছিল, কারী সাহেব দারুল উলূমের বিলুপ্ত সংবিধান পুনর্বহাল করবেন এবং মজলিসে শূরাকে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি (গভর্নিং কমিটি) হিসেবে মেনে নেবেন, যেমনটি এতকাল ছিল। তার বিপরীতে এই বিরোধপূর্ণ সময়টাতে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, মজলিসে শূরা সেগুলো পুনর্বিবেচনা করবে এবং সকলের সম্মতির ভিত্তিতে নতুন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

তিনি বিশেষ মর্যাদা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের আসনে অধিষ্ঠিত, যেমনটি অন্য কারও মাঝে মেলা ভার।[১]

তাছাড়া আজ অর্ধশতাব্দিরও বেশি সময় তিনি এই দারুল উলূমের সেবা করে আসছেন এবং তাকে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় তিনি যেন এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারেন যে, দারুল উলূম থেকে বিরহ ও সাথী-সতীর্থদের অনাস্থার কোনো দাগ তাঁর গায়ে থাকবে না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, (যেমনটা বিবদমান দুটি পক্ষের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘটনায় বেশিরভাগ অভিজ্ঞতাই এরূপ হয়ে থাকে) এই প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখল না। এই প্রচেষ্টায় সেই লোকগুলোর কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায়নি, কারী সাহেবের মর্যাদা, তাঁর মনের প্রশান্তি ও দারুল উলূমের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি প্রিয় হওয়া দরকার ছিল এবং তাঁকে নিজেদের যেকোনো স্বার্থ ও বুঝ-অনুভূতির ওপর প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক ছিল। অবশেষে আশঙ্কা যা ছিল, তা-ই ঘটে গেল এবং ১৪০৩ হিজরির ৬ শাওয়াল (১৭ জুলাই ১৯৮৩) তিনি এই নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন এবং জান্নাতে তাঁকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করুন।

এর চেয়ে বেশি বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের আলোচ্য নয়। এটি হলো হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তায়্যেব সাহেবের জীবনচরিত ও দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাসের আলোচ্য।

মুরাদাবাদ ট্র্যাজেডি

১৯৮০ সালের সংসদ নির্বাচনে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী রায়বেরেলি ও অন্ধ্রপ্রদেশ এই দুটি আসন থেকে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্টতা নিয়ে পাস করেছিলেন। সঞ্জয় গান্ধী নির্বাচিত হন আমিঠি থেকে। এই নির্বাচনে কংগ্রেস ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে। এ সময়কার সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনাটি হলো মুরাদাবাদের সেই সহিংসতা, (সত্যিকার অর্থেই এটা একতরফা

---

১. এই গ্রহণযোগ্যতা আর মর্যাদারই ফলে তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয়েছিল, যেখানে নানা চিন্তাধারার অনেকগুলো গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব ছিল এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন।

আক্রমণ ছিল) যেটা ১৯৮০ সালের ১৩ আগস্ট ঈদের দিন ঈদের মাঠে ঠিক ঈদের নামাযের পরপর সংঘটিত হয়েছিল। এমনিতেই তো সাম্প্রদায়িক সংঘাত (একতরফা হোক বা দোতরফা) বিভক্তির পর হিন্দুস্তানের ইতিহাস নয় – লিখন হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৪ সালে জমশেদপুর ও রাওরকেলার দাঙ্গায় – যেমনটি উপরে বলে এসেছি – ছয় হাজার মুসলমান প্রাণ হারায়। কিন্তু মুরাদাবাদের ঘটনায় বদনামটা এজন্য বেশি করে দেখা দিয়েছিল যে, এই ঘটনাটা ঈদের দিন ঈদের মাঠে সংঘটিত হয়েছিল, যেটি ভারতের সর্ববৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ ধর্মের সবচেয়ে বড় আনন্দের দিন এবং যার কর্মসূচিতে (যেটি স্রেফ দুরাকাত নামায আদায়ের লক্ষ্যে গোসল, পরিচ্ছন্নতা অর্জন, নতুন কিংবা পরিষ্কার কাপড় পরিধান এবং একজন অপরজনকে ঈদের মোবারকবাদ জানানোর বেশি কিছু নয়) কোনো একটি কাজও কোনো গোষ্ঠীর কাছে আপত্তিকর নয়। উৎসবের এমন আনন্দঘন ক্ষেত্রগুলোকে, আনন্দের এমন অনুষ্ঠানকে শ্রদ্ধা জানানো; বরং তাতে কোনোভাবে অংশগ্রহণ জংলি জাতি-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। আর এটি মানুষের সর্বশেষ ভদ্রতা ও নাগরিক অধিকারের দাবিও বটে।

ঘটনাটা বড় করে দেখার আরও একটি কারণ আছে। তা হলো এই ঘটনায় নিহতদের মাঝে বড় একটি সংখ্যা ছিল নিষ্পাপ শিশুদের, যারা পরম আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে নতুন পোশাক পরে পরিবারের বড়দের সঙ্গে ঈদগাহে এসেছিল। মুরাদাবাদ ঈদগাহের পাশে মেলা বসে। মানুষ মেলা দেখাতে এবং এটা-ওটা কিনে দিতে শিশুদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে। সেজন্য অন্যান্য শহরের তুলনায় এখানকার ঈদগাহে শিশুদের অংশগ্রহণ বেশি হয়। আরও একটি ব্যাপার হলো, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সাধারণত শহর কিংবা রাজ্যের বিস্তৃত অঞ্চলে দীর্ঘদিন পর একবার সংঘটিত হয়। কিন্তু এটি সংঘটিত হলো একটি সীমিত জায়গায় এবং সময়ের অল্প ব্যবধানের মাথায়, যার ফলে এটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চেয়ে বেশি সামরিক আক্রমণের রূপ ধারণ করেছিল।

ঘটনাটা এভাবে ঘটল যে, মুসলমানরা ঈদগাহে নামায পড়ছিল। এমন সময় একটা শূকর ঈদগাহের ভেতরে ঢুকে গেল (যেটা খুবসম্ভব একটা ষড়যন্ত্র এবং আগে থেকে পাকানো একটা পরিকল্পনার ফলাফল ছিল)। যারা মুসলমানদের সভ্যতা ও মেজাজ সম্পর্কে অবহিত আছেন, তারা জানেন,

জগতে যত ঘৃণিত জীব আছে, তার মধ্যে মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য হলো শূকর। বিশেষভাবে সেই সময়টিতে, যখন তারা গোসল করে পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে ঈদগাহে এসেছে। এই ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে মুসলমানদের বাগ্বিতণ্ডা হয়। পুলিশের কাছে মুসলমানদের প্রশ্ন ছিল, ঈদের মাঠে শূকর ঢুকল কী করে? একে তোমরা বের করে নিয়ে যাও। কিন্তু মুসলমানদের একথায় পুলিশ অপমানিত বোধ করল। কোনো এক দিক থেকে কিংবা ওখানকার পুলিশ ক্যাম্প থেকে একটা ঢিলও এল।

আল্লাহপাক দেখার জন্য যাদের চোখ দিয়েছেন, বহুদিন যাবত তারা অনুভব করছেন, (যেমনটি আমি 'পয়ামে ইনসানিয়াত'-এর কোনো-কোনো বক্তব্যে বলেছিও) আমাদের ভারতীয় সমাজ থেকে (যাদের মধ্যে কোনো শ্রেণীই বাদ নেই) সহ্য করার ক্ষমতা দিনদিন বিদায় নিচ্ছে। বিশেষ করে যে সমাজটি বিভিন্ন উপাদান, শ্রেণী-পেশা ও নানা গোষ্ঠী দ্বারা গঠিত, তাদের জন্য এটা খুবই আশঙ্কাজনক ব্যাপার। তো এতটুকু ঘটনায় একদিক থেকে ক্ষোভ প্রকাশ, অপরদিক থেকে নির্বিচার ফায়ারিং শুরু হয়ে গেল। কোনো-কোনো পরিসংখ্যানে জানা গেছে, সে সময় ঈদগাহে ৬০ হাজার প্রাপ্তবয়স্ক লোক আর সমসংখ্যক শিশু উপস্থিত ছিল। মুরাদাবাদের ঐতিহ্য হলো, সেখানকার ছোট-ছোট মসজিগুলোতে সাধারণত ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় না। মুসলমানরা বেশিরভাগ ঈদগাহেই নামায পড়তে আসে। ফলে যে জায়গাটি ছিল, ঈদগাহ, সেটি বধ্যভূমিতে পরিণত হয়ে গেল। ভারত টাইম্‌স দুশো ব্যক্তি নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। অন্যান্য প্রচারমাধ্যম লিখেছে, পুলিশের গুলিতে চার থেকে পাঁচশো মুসলমান ঈদের মাঠে প্রাণ হারিয়েছে।[১]

এ ঘটনায় সবচেয়ে বেশি আপত্তিকর আচরণটা ছিল পিএসির, যাদের দায়িত্ব দেশের নাগরিকদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা এবং যাদের বিনাশর্তে নিরপেক্ষ থাকার কথা। কিন্তু আলীগড়, মিরাঠ, মুরাদাবাদ ও বিহারের বিভিন্ন শহরের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে, পুলিশের এই দলটা এসব

---

১. মুহাম্মাদ আজম খান সাহেব এমএল তার এসেম্বলির ভাষণে দাবি করেছেন, এই ঘটনায় ২০০০ মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে, যাদের মাঝে শিশু ছিল ৭০০। ঈদগাহের ইমাম ডক্টর কামাল ফাহিম সাহেব বলেছেন, মসজিদের ভেতরে তিন সারি লাশ ছিল। প্রতি সারিতে ১৬৫টি করে লাশ ছিল। তা ছাড়া মসজিদের বাইরে পিএসির গুলিতে বহুসংখ্যক মানুষে প্রাণ হারিয়েছে।

দাঙ্গায় সবচেয়ে বেশি জড়িত ও পক্ষপাত প্রমাণিত হয়েছে। মুসলমানদের বিভিন্ন সংগঠন সরকারের কাছে একের-পর-এক অভিযোগ করে আসছিল। কিন্তু সরকার তার প্রতিকারের পরিবর্তে উল্টো সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। মুরাদাবাদের এই ঘটনার সময়কার ডিএম-এর রেকর্ডও এ ক্ষেত্রে অনেক সংশয়পূর্ণ ও পক্ষপাতমূলক ছিল।

শুরুতে এই দাঙ্গা পিএসি ও মুসলমানদের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরদিনই সাম্প্রদায়িক ও দুর্বৃত্তমনা কতগুলো গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতার পোশাক পরিয়ে একে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় পরিণত করে দিল! এর বিশেষ একটি কারণ ছিল, মুরাদাবাদ দীর্ঘদিন যাবত বড় একটি শিল্প ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত। এই শহরের একটি বিশেষ শিল্প (পাত্রতৈরি) বহির্বিশ্বেও, বিশেষ করে সৌদি আরব ও উপসাগরীয় অঞ্চলে বেশ সমাদৃত ছিল। আর এই শিল্প-ব্যবসা বেশিরভাগই ছিল মুসলমানদের হাতে। এই সূত্রে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা এই শহরে আসছিল এবং এটি নতুন-নতুন ভবন ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণের আদলে মুসলমানদের জীবনমানে স্বাচ্ছন্দ ও উন্নতির প্রকাশ ঘটছিল। বিভিন্ন দাঙ্গা ঘটনার তদন্ত ও পরিসখ্যান নিয়ে তথ্য মিলেছে, যেসব শহর ও স্থানে কোনো শিল্প কিংবা ব্যবসা উল্লেখযোগ্যভাবে মুসলমানদের হাতে আছে, সেগুলোই দাঙ্গার টার্গেটে পরিণত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি আলীগড়, বেনারস, মিরাঠ ও মুরাদাবাদের নাম উল্লেখ করতে পারি।

এই ন্যাক্কারজনক দাঙ্গায় রাষ্ট্রযন্ত্রকে যেভাবে সক্রিয় হওয়া আবশ্যক ছিল, সেটি হয়নি। এই আচরণে সেই নির্বাচনি রাজনীতির বিরাট দখল ছিল, যেখানে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণের সময় চিন্তা করা হয়, আগামি নির্বাচনের ওপর এর কী প্রভাব পড়বে। শহর ও রাজ্যের প্রশাসন (যারা নির্বাচন অনুষ্ঠান ও হারানো-জেতানোর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সহায়ক প্রমাণিত হয়) এর দ্বারা কী বার্তা গ্রহণ করবে। ভোটারের সংখ্যা কোন দিকে ভারী। এই বিষয়টাই গোটা সমাজকে দূষিত, প্রশাসনকে অকার্যকর ও অপরাধপ্রবণ লোকদের স্বাধীন; বরং দুঃসাহসী বানিয়ে রেখেছে। এখানেও ঠিক একই ঘটনা ঘটল। মুরাদাবাদের প্রশাসন ও পুলিশ অফিসারদের মাঝে যতটা দ্রুত রদবদল করা আবশ্যক ছিল, তা করা হয়নি। শহরে কয়েক সপ্তাহ যাবত ভীতি ও আতঙ্ক বিরাজমান থাকে। মুসলমানদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট

পোড়ানো হয়। অনেকগুলো মসজিদ গুড়িয়ে দেওয়া হয়। নারী ও শিশুদের নৃশংসতার শিকারে পরিণত করা হয় এবং কোটি-কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট করা হয়। এর জন্য সারা দেশে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানানো হয়। বিদেশি প্রচারমাধ্যমগুলোও এসব ঘটনা ফলাও করে প্রচার করে। ঘটনাটা ঈদের দিন ঘটানোর কারণে এর ঘৃণ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতাকে অধিক বাড়িয়ে তোলে।

মুসলিম মজলিসে মুশাওরাতের কার্যকরী কমিটির বৈঠক ও মুরাদাবাদের ঘটনাস্থল পরিদর্শন

মুসলিম মজলিসে মুশাওরাত-এর নেতৃবর্গ এই দাঙ্গার ভয়াবহতা পুরোপুরি উপলব্ধি করেন। এর অন্তর্ভুক্ত দলগুলো যেহেতু গোটা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে, তাই আপন-আপন সংগঠনের পক্ষ থেকে তারা যথাসময়ে প্রতিবাদ ও মুসলমানদের চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আমন্ত্রণপত্র পাঠানো ও মানুষের সময়ের চিন্তা করে একটি প্রোগ্রাম করতে সময়ের প্রয়োজন হয়। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ দিল্লিতে মজলিসে মুশাওরাত-এর কার্যকরি পরিষদের মিটিং বসে। এই বৈঠকে মজলিসের প্রায় সকল দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন। একটি বিষয় আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে, মজলিসের একটি প্রতিনিধিদল – যেটি বড়জোর মুসলিম সংগঠনগুলোর নেতাদের দ্বারা গঠিত হবে – মুরাদাবাদ যাবে। তারা সেখানকার দাঙ্গার ঘটনা সম্পর্কে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করবে এবং এ ব্যাপারে যা কিছু করা দরকার আঞ্জাম দেবে। কিন্তু যেহেতু এঁরা সবাই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছেন এবং তখনও পর্যন্ত মুরাদাবাদ যাওয়ার কোনো দিন-তারিখ নির্ধারিত ছিল না; তা ছাড়া এই পরিদর্শনের ব্যাপারে সরকার ও প্রশাসনের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে হবে, যাতে কোনো মহল একে নতুন কোনো দাঙ্গা বা সংকট তৈরির অজুহাত বানাতে না পারে।

মিটিং-এর পরদিনই পরিদর্শনে যাওয়ার তারিখ স্থির করা গেল না। কারণ, প্রস্তুতি ও আয়োজনে কিছু সময়ের তো প্রয়োজন। কোনো-কোনো সদস্যের কিছু বাধ্যবাধকতাও ছিল যে, পরদিনই যাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই মিটিং-এ (মজলিসের সভাপতি মুফতী সাহেবের কোমলতা ও খাতিরের সুযোগে) বেশ কটা যুবক, কয়েকজন সাধারণ মানুষ ও আলীগড়ের কয়েকজন

ছাত্র ঢুকে গিয়েছিল, যারা না মজলিসের সদস্য ছিল, না আমন্ত্রিত ছিল। কমিটির সদস্যগণ যখন প্রতিনিধিদলের যাওয়ার আয়োজনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন এবং তার জন্য কিছু সময়ও নেওয়া প্রয়োজন বোধ করলেন, তখন এই যুবকদের মাঝে হঠাৎ উত্তেজনা তৈরি হয়ে গেল। তারা বলতে শুরু করল, 'হয় আপনারা কালই যান, নাহয় নিজ-নিজ কবরে গিয়ে শুয়ে থাকুন।'

এই বৈঠকে মজলিসে মুশাওয়ারাতের সভাপতি মাওলানা আতীকুর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর আমীর মৌলভী মুহাম্মাদ ইউসুফ, বিহার ও উড়িষ্যার আমীরে শরীয়ত ও অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড-এর সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ রহমানি সাহেব, মুসলিম লীগের সভাপতি আলহাজ ইবরাহীম সুলায়মান শেঠ, সাইয়িদ শিহাবুদ্দীন সাহেব এম.পি, মুসলিম মজলিসের সভাপতি ও প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শায়খ যুলফিকরুল্লাহ, মৌলভী আবদুল করীম পারিখ নাগপুর, ডক্টর মুহাম্মাদ ইশতিয়াক হুসাইন ও আরও কয়েকজন সম্মানিত ও প্রবীণ ব্যক্তি উপস্থিত-ছিলেন, যারা আপন-আপন বিদ্যা, জ্ঞান ও দক্ষতা অনুপাতে দ্বীন ও জাতির খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছেন এবং তাদের একজনও ঈমানবেঁচা গাদ্দার বা সরকারের ক্রীড়নক ছিলেন না।

হাঙ্গামা এতটাই তীব্র আকার ধারণ করল যে, আশঙ্কা দেখা দিল, যুবকরা এই বিজ্ঞ ও প্রবীণ ব্যক্তিত্বদের কারও গায়ে হাত তুলে বসে কিনা! জাতির মর্যাদাকে ওরা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় কিনা! ইসলামের তো শিক্ষা হলো, 'যেলোক আমাদের বড়কে সম্মান করে না, ছোটকে স্নেহ করে না, সে আমাদের দলের লোক নয়।' ইসলামের এই শিক্ষার প্রতিফলন আমরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীটির যুবকদের মাঝে প্রত্যক্ষ্য করেছি। আমরা দেখেছি, তারা প্রবল বিরোধের ক্ষেত্রেও প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করা পছন্দ করে না এবং মুখের ওপর তাদের অপমান-অবমাননামূলক আচরণ করে না। তাদের এই গুণটিই গান্ধীজি, মতিলাল নেহেরু ও মালুজিকে পর্যন্ত এই সুযোগ দিয়েছিল যে, তারা নিজেদের পরিকল্পনাকে পূর্ণতা দান করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তার ফলে তারা বেশ নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় জাতির সেবা আঞ্জাম দিতে পেরেছেন। এই ঘটনা আরেকবার

জাতির ভবিষ্যতের দিক থেকে বিচলতা ও ভাবনা তৈরি করে দিল যে, ওরা যে নাজুক পরিস্থিতি অতিক্রম করছে, এর মাঝে তারা কীভাবে দ্বীন ও জাতির পুঁজি রক্ষা করতে পারবে এবং নেতৃত্বের গুণাবলিকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে?

১৫ সেপ্টেম্বর মুশাওরাতের একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করল। দলের সদস্যরা তাঁকে তাঁদের মুরাদাবাদ যাওয়ার প্রোগ্রামের কথা অবহিত করলেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কিন্তু গাড়ির ব্যবস্থা না হওয়ায় পরদিনই তাঁরা মুরাদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারলেন না। তাঁরা ১৭ তারিখ সকালে মুরাদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং আনুমানিক ১১টার সময় মুরাদাবাদ পৌঁছে গেলেন। এই প্রতিনিধিদলের সদস্যসংখ্যা ছিল ১৯, যাদের মাঝে মজলিসের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব সদস্য ও মুসলিম সংগঠনগুলোর বেশিরভাগ দায়িত্বশীল শরীক ছিলেন। মুরাদাবাদের কমিশনার মিস্টার টেক্রো ও জিআইজির ডি শর্মা প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা করেন, গেস্ট হাউজে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে মুসলিম ও অমুসলিম প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দের সাক্ষাত ও কথা বলার সুযোগ করে দিলেন। প্রতিনিধিদল শান্তমনে তাদের কথাবার্তা শোনেন এবং দাঙ্গা ও তার নেপথ্য কারণগুলো সম্পর্কে সরাসরি তথ্য হাসিলের চেষ্টা করেন।

স্থানীয় অমুসলিম প্রতিনিধি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের বড় একটি দল তাঁদের সঙ্গে এসে দেখা করেন ও ঘটনা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রতিনিধিদলে সদস্যবর্গ – যাদের মাঝে আমিও একজন ছিলাম – এই লজ্জাজনক ঘটনায় বিস্ময়, আক্ষেপ ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। অমুসলিম প্রতিনিধিদের মধ্যে মিস্টার দিয়ানন্দ গুপ্ত আমার কাছে বিশেষভাবে আলাদা কথা বলার জন্য সময় চাইলেন। একান্ত আলাপচারিতায় তিনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, এই দাঙ্গার সবচেয়ে বড় কারণটা হলো সেইসব মুসলিম প্রতিষ্ঠান, যেগুলো মুরাদাবাদে যাওয়া-আসার পথে মাদরাসা ও জামেয়া নামে বিস্তৃত পরিসরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিন্দুরা মনে করে, এগুলো এক-একটা মিনি পাকিস্তান এবং এগুলোতে মুসলমানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তার কথায় আমি ধরে নিলাম, মুসলমানদের ব্যাপারে হিন্দুদের মনে এখনও পর্যন্ত তিক্ততা, অসন্তোষ ও কুধারণা বিরাজমান, যা দূর করতে

অনেক কৌশল, দক্ষতা ও সময়ের প্রয়োজন। এ সময়ে আমি অনুভব করলাম, দেশের সরকার, প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের যে কাজগুলো করা দরকার, সেগুলো ছাড়াও 'পয়ামে ইনসানিয়াত'-এর ধারার আন্দোলনেরও খুব প্রয়োজন রয়েছে যে, এটিই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান।

মুসলমান দায়িত্বশীলগণ স্বীকার করেছেন, সর্বসাম্প্রতিক প্রশাসনিক রদবদলের ফলে পরিস্থিতি খানিক বদলাতে শুরু করেছে। তারা এই অভিমতও ব্যক্ত করলেন যে, সরকারি কর্মকর্তাগণও যদি পীড়াপীড়ি করেন, তবু আপনারা রাতে থাকবেন না। অন্যথায় দুর্বৃত্তদের পানি ঘোলা করার সুযোগ মিলে যেতে পারে। প্রতিনিধিদল অনুভব করল, আমরা আমাদের কাজ যা করার করে ফেলেছি এবং স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ পরম নিষ্ঠার সঙ্গে এই পরামর্শ দিচ্ছেন। তাই তাঁরা ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং রাতেই মুরাদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। কোনো-কোনো মহল থেকে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছিল, ফিরে আসতে এত তাড়াহুড়া করা হলো কেন? একে তারা ভয় ও দুর্বলতা বলে ধরে নিয়েছিল। অথচ ঘটনা এমন ছিল না।

পয়ামে ইনসানিয়াত কনভেনশন লাখনৌ

মুরাদাবাদ ট্রাজেডি (যার সঙ্গে আলীগড়, এলাহাবাদ ও আরও কয়েকটি শহরের দাঙ্গাও সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল) পয়ামে ইনসানিয়াত-এর আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও তার উপকারিতাকে আরও অধিক স্পষ্ট ও একটি সুস্পষ্ট বাস্তবতায় পরিণত করে দিয়েছিল এবং অত্যন্ত তীব্রভাবে এই আবশ্যকতা তৈরি হয়ে গেল যে, সমগ্র ভূ-ভারতের প্রতিটি চিন্তাশীল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের লাখনৌতে আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং সর্বসাম্প্রতিক ঘটনাবলির আলোকে – যেগুলো শুধু মুসলমানদেরই চ্যালেঞ্জ ছোড়েনি; দেশের প্রতিজন বিবেকবান মানুষকে – যারা ঘটনাবলি থেকে নিরপেক্ষ ফলাফল বের করার যোগ্যতা রাখেন – দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতির ভয়াবহতার ওপর ভাবতে বাধ্য করে তুলেছে – একটি কর্মনীতি খুঁজে বের করা হবে। কিন্তু এত বিশাল একটি সমাবেশের জন্য – যেখানে দেশের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন মহলের অনুভূতিশীল, দরদী, বিজ্ঞ ও দেশের জন্য হিতকামী লোকদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সমবেত করতে হবে – বেশ

সময়ের প্রয়োজন। অনেক ভেবে-চিন্তে ও হিসাব করে গুরুত্বপূর্ণ এই সমাবেশের জন্য ২৭ ও ২৮ অক্টোবর তারিখ ঠিক করা হলো। স্থান নির্ধারণ করা হলো লাখনৌর সফেদ বারাদরি কয়সরবাগ (যে কিনা হিন্দুস্তানের অনেকগুলো ঐতিহাসিক ও সিদ্ধান্তমূলক সভা-সম্মেলন প্রত্যক্ষ করেছে)।

সম্মেলনটি যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হলো এবং বহুদিন পর একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলন অতিশয় শান্তভাবে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো। তাতে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ইউনিভার্সিটিগুলোর প্রফেসরবৃন্দ, সাবেক ও বর্তমান একাধিক মন্ত্রী, সাবেক চিফ সেক্রেটারি, সামাজিক ও স্যোশাল রিফর্মার ও কর্মীবৃন্দ, কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষক, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দায়িত্বশীলবর্গ, ব্যবসায়ী, আইনজীবি, ডাক্তার ও ভারতের বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছেন। আমি কোনো প্রকার বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ না করেই এই সম্মেলনের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে নেওয়া সঙ্গত মনে করলাম, যাতে মঞ্চ থেকে স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ও চিন্তাধারা প্রকাশ করতে পারি এবং এই আন্দোলনকে তার আসল রূপে উপস্থাপন করতে সক্ষম হই। আমি আমার এই ভাষণে (যেটি 'দেশের আসল সমস্যা ও প্রকৃত হুমকি' শিরোনামে উরদু, ইংরেজি ও হিন্দিতে রূপান্তরিত হয়ে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে) সর্বাগ্রে অত্যাচার ও রক্তপাতের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করলাম, যেটি গোটা দেশ, সভ্যতা ও জাতিগোষ্ঠীর পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যেগুলোর উপস্থিতিতে না কোনো গঠনমূলক কাজ হতে পারে, না দেশ ও ধর্মের সেবা চলতে পারে। তারপর এ কাজের জন্য এমন একদল স্পষ্টবাদী মানুষের প্রয়োজন, যারা জুলুমকে জুলুম, অবিচারকে অবিচার ও ভুলকে ভুল বলতে সক্ষম হন।

আমি বলেছি, এমন মানুষের উপস্থিতি দেশের প্রকৃত সম্পদ, তার মূল্যবান পুঁজি ও তার অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি। তারপর আমি শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন দেশনেতার কিছু লেখার উদ্ধৃতি উপস্থাপন করলাম, যেগুলো বিগত দাঙ্গাগুলোর সময় প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ডক্টর যাকের হুসাইন খান (প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ভারত) জে প্রকাশ নারায়ণজি ও পণ্ডিত জাওহারলাল নেহেরু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারপর আমি এই বাস্তবতা তুলে ধরেছি যে, এখনও পর্যন্ত এদেশে কোনো নিরেট গভীরতা, স্থায়ী ও গ্রহণযোগ্য পরিবর্তন আসেনি। এখানে মানবজীবনের মূল্য পুরোপুরি

বোঝা-ই হয়নি। এখানে একটা মিথ্যা বা একটি সত্য শ্লোগান হাজার-হাজার মানুষকে পাগল বানাতে পারে। আমরা দেশটিকে স্বাধীন করাতে যতটা চেষ্টা করেছি, জাতির বিবেককে স্বাধীন বানাতে তার এক চতুর্থাংশ, এমনকি এক দশমাংশেরও সমান চেষ্টা করিনি। আমরা ব্রিটেনকে তাদের জুলুমের কারণে ঘৃণার পাত্র বানিয়েছি। কিন্তু জুলুমের প্রতিটি ধরন থেকে তাকে ঘৃণ্য বানাবার চেষ্টা করিনি।

তারপর বলেছি, যারা এই ঝড়ের মোকাবেলা করছেন, তাদের বেশিরভাগ রাজনীতি ও সরকারের বাইরে সত্যিকার রূহানী ও বিজ্ঞজনদের মাঝেই পাওয়া যায়। এই দুটি শ্রেণী সাধারণত সবার পরে পতনের শিকার হয়। আর যখন তাদেরও মাঝে অনাচার ঢুকে পড়ে, তখন আর সেই দেশ ও সভ্যতাকে বাঁচানোর মতো কোনো শক্তি দুনিয়াতে থাকে না।

তারপর এ ক্ষেত্রে আমি চারটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি, যেগুলোকে প্রস্তাবের আকারে সম্মেলনে উপস্থাপন করেছি এবং সম্মেলন সেগুলোকে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করেছে। প্রথম প্রস্তাবটি ছিল নৈতিক ও মানবীয় ভিত্তিগুলোকে অবলম্বন করে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরিবিষয়ক। দ্বিতীয়টি ছিল শিক্ষাসিলেবাস, যার ফলে পরস্পর বিদ্বেষ তৈরি হচ্ছে, সম্পর্ক বিনষ্ট হচ্ছে এবং বারবার দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ছে। তৃতীয়টি ছিল পত্র-পত্রিকায় বাড়াবাড়িমূলক, অবাস্তব, একতরফা, ও সাম্প্রদায়িকতা উসকে দেওয়ার মতো সংবাদ প্রকাশ করা বিষয়ক যে, এই চরিত্রটা শুধরে নেওয়া দরকার। অন্যথায় শান্তি প্রতিষ্ঠা কঠিন হবে। আমি সংবাদপত্রগুলোকে বিশেষভাবে গঠনমূলক ভূমিকা পালনের প্রতি জোর দিয়েছি। চতুর্থ প্রস্তাবটি ছিল, পুলিশের সংশোধন, পুলিশ বাহিনীকে নতুন করে সাজানো এবং তাকে অনুভূতিশীল ও বিবেকবান বানানো প্রসঙ্গ, যে প্রস্তাব মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন হোমমিনিস্টার VAID BHAI উপস্থাপন করেছিলেন।

এই কনভেনশনের জন্য আমি সভাপতির যে ভাষণটি লিখে নিয়েছিলাম, সেটি উরদু, ইংরেজি ও সংক্ষিপ্তাকারে হিন্দিতে ছাপিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং কনভেনশনে বিতরণ করা হয়েছিল। পরে বিভিন্ন গুণীজন ও রাজনৈতিক পার্টিগুলোর নেতাদের কাছে পৌঁছানো হয়েছিল। কনভেনশনের শেষে একটি ক্রিয়াশীল বক্তব্যের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও

সভ্যতা-সংস্কৃতির দেশে জীবন যাপনের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছিল। তাতে আত্মসংযম, মনের উদারতা, ভুলের অনুভূতি ও তার স্বীকৃতি, ঘৃণার পরিবর্তে ভালবাসা ও ধ্বংসের বদলে গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল, এই দাঙ্গাগুলোর পেছনে মূলত অর্থপুঁজা, হিংসা ও হীনতা কাজ করছিল। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলেছি, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আমাদের দেশে সকল বাস্তবতা, ও সত্যতা মরে গেছে। শুধু দুটা বাস্তবতা জীবিত আছে। একটা হলো অর্থের মোহ আর অপরটা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। সারাটা দেশ আজ দুটি শিবিরে বিভক্ত। একটি হলো শাসকের শিবির আর অপরটি শাসিতের শিবির। একজন বিক্রেতা, অপরজন ক্রেতা। একজন নাগরিক, অপরজন নাগরিকের ওপর শাসন চালাতে চান। 'জোর যার মুলুক তার' এই নীতিরই প্রতিফলন ঘটছে এখন।

শেষে আমি বললাম, এই সম্মেলনে বারবারই 'পয়ামে ইনসানিয়াত'কে আমার হীন সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আমি পরিষ্কার ভাষায় বলছি, এটি আমার আন্দোলন নয়। আমার কোনো অস্তিত্ব নেই। খোদ আমারই 'পয়ামে ইনসানিয়াত' দরকার। এই পয়ামে ইনসানিয়াত পয়গম্বরদের পয়গাম। আল্লাহর প্রেরিত বান্দা ও রূহানী মানুষগুলোর বার্তা। আপনারা একে আল্লাহর পয়গম্বরদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করুন। তাহলে বরকত আসবে এবং তাঁর রহমত নাযিল হবে।

এই কনভেনশনে বেশ কজন বিশিষ্ট গুণীজন ও সমাজকর্মী অংশগ্রহণ করেছেন, যাদের মধ্যে BOMCEF-এর প্রেসিডেন্টে কাশিরামজি, জওহারলাল ইউনিভার্সিটি দিল্লির প্রফেসর মিস্টার সুন্ধি, পুনার প্রাক্তন মেয়র ও মহারাষ্ট্রের হোমমিনিস্টার VAID BHAI লাখনৌর প্রাক্তন মেয়র দাওজি গুপ্ত ও ডক্টর দি কাপুর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রফেসর সুন্ধি এমনও পর্যন্ত বলেছেন যে, 'সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ দুটাই ফেল হয়েছে। তাদের থেকে কোনো কল্যাণের আশা করা যায় না। আমি মাওলানাকে বলব, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাব্যবস্থা অসম্পূর্ণ। আপনার কাছে আমি আবেদন রাখছি, আপনি আমাদের দিকনির্দেশনা করুন।'

এভাবে এই কনভেনশনের মাধ্যমে আমি আমার ক্ষীণ আওয়াজকে খানিক উঁচু স্বরে এবং কিছুটা হলেও ব্যাপক পরিসরে পৌছানোর সুযোগ পেলাম। এর বেশি কিছু করার সাধ্য তো আমার নেই।

চতুর্দশ অধ্যায়

ইসলামি সাহিত্য আলোচনা, একটি শিক্ষাসম্মাননা কাশ্মিরবিষয়ক ভাষণাবলি, পারিবারিক দুর্ঘটনা দারুল মুছান্নিফীন ও আলজেরিয়ার সেমিনার

ইসলামি সাহিত্য আলোচনা নদওয়াতুল উলামা

'কারওয়ানে যিন্দেগী'র প্রথম খণ্ড থেকেই পাঠকগণ ধারণা নিয়ে থাকবেন যে, নিজের অধ্যাপনা ও শিক্ষকতার আমলেও এবং লেখালেখি ও সাহিত্যচর্চার পরিধির মধ্যেও সব সময় আমার মনে এই অনুভূতি জাগ্রত ছিল যে, সাহিত্য তার নিজের মধ্যে গঠন ও ধ্বংসের বিরাট একটি শক্তি বহন করে। এর দ্বারা একদিকে যেমন সুস্থ বোধ-বিশ্বাসের বিনির্মাণ ও নির্দোষ চিন্তা-চেতনার গোড়ায় পানিসিঞ্চনের কাজ নেওয়া যায়, তেমনি অপরদিকে মানুষের নৈতিকতা ও মানবতার ওপর করাত চালানো এবং আদর্শিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি করা যায়। প্রতিটি যুগেই এর উজ্জ্বল ও অনস্বীকার্য বহু স্বাক্ষ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এ যুগে সাহিত্যের (তার ব্যাপক অর্থে) আধুনিক শক্তিশালী উপকরণ সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার ফলে বিশ্বজনীনতা ও কর্তৃত্ব অনেক বেড়ে গেছে। দীর্ঘদিন যাবতই দেখা যাচ্ছে, দর্শনের পথ ধরে মুসলমানদের বিদ্বান ও চিন্তাশীল শ্রেণীটির মাঝে নাস্তিকতা ও সংশয়বাদিতার প্লাবন ঢুকে পড়ত। কিন্তু পরে বিজ্ঞানের (বিশেষ করে দেহতত্ত্ব বিজ্ঞান) পথে এই প্লাবন সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর মাঝে ঢুকতে শুরু করেছে। কোথাও-কোথাও এই প্লাবন আসত মনস্তত্ত্ব, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির পথে। আর এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসছে সাহিত্যের মাধ্যমে।

বিশেষ করে ইসলামি চিন্তা ও দাওয়াতের ধারক-বাহকদের জন্য এ বিষয়টা উদ্বেগের কারণ যে, আরব দেশগুলোতে, বিশেষ করে মিসরে প্রায়

অর্ধশতাব্দিকাল যাবত সাহিত্য-সমালোচনা ও যুবকদের মনন ও সাহিত্যজগতের ওপর সেসব সাহিত্যিক ও লেখকদের ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, যাদের বিশ্বাসে দোদুল্যমানতা, চিন্তা-চেতনায় অস্থিরতা ও লেখনিতে সংশয়বাদিতার ঝোঁক পাওয়া যেত। এজন্য একদিকে প্রয়োজন ছিল, আরবি সাহিত্যের ভরপুর ভাণ্ডার থেকে শক্তিশালী ও মনকাড়া সেই নমুনাগুলো খুঁজে বের করে আনা এবং সেগুলোকে জনসম্মুখে উপস্থাপন করা, যেগুলোকে সহজপ্রিয়তা ও পুরাতন সাহিত্য-ঐতিহাসিকদের অনুকরণে দৃষ্টির আড়ালে ফেলে রাখা হয়েছিল কিংবা কোনো আলেম, দাঈ বা কোনো দ্বীনি ব্যক্তিত্বের কলম থেকে বের হয়েছিল বলে সেগুলোকে 'সাহিত্যের বালাম' থেকে সরিয়ে রাখার শাস্তি দেওয়া হয়েছিল এবং শত- শত বছর যাবত সেগুলোর ওপর আবরণ পড়ে ছিল। আরেক দিকে আবশ্যক ছিল, আরবি সাহিত্যের এমনসব শিক্ষক, লেখক ও পণ্ডিতদের একত্রিত করা হবে, যাঁরা আরবি সাহিত্য, রচনা, সমালোচনা ও সাহিত্যের ইতিহাসকে সঠিক পথের ওপর তুলে আনার চেষ্টা করবেন এবং নতুন প্রজন্মকে বিশুদ্ধ খাবার পৌঁছাতে একটি নতুন গ্রন্থভাণ্ডার ও একটি নতুন গবেষণাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

এই দুটি কাজের প্রথমটির প্রতি সেই নিবন্ধটির মাধ্যমে সবাইকে দাওয়াত জানানো হয়েছে, যেটি দামেশ্‌কের রয়েল একাডেমি 'আল-মাজমাউল ইল্‌মী আল-আরাবী'র (বর্তমানে মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ) সদস্যপদ গ্রহণের সময় লেখা হয়েছিল এবং এখন সেটি 'মুখতারাত মিন আদাবিল আরাব'-এর স্বতন্ত্র একটি ভূমিকা।[১]

আরবি সাহিত্যের উঁচুমাপের কয়েকজন শিক্ষক স্বীকার করেছেন, আমার এই নিবন্ধটি চিন্তাজনক প্রমাণিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে তাঁদের মাঝে ইসলামি সাহিত্যের আন্দোলন তৈরি হয়েছে।

আমার দ্বিতীয় লক্ষ্যটির জন্য আবশ্যক ছিল, উপযুক্ত কোনো একটি জায়গায় ইসলামি সাহিত্য শিরোনামে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের

---

১. আরবি সাহিত্যের উপর বিশেষ একটি শ্রেণীর ইজারাদারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও তার বিস্তৃত মর্ম ও ময়দান বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে আমি আমার গ্রন্থ 'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত'-এর তৃতীয় খণ্ডে 'তিন শতাব্দির পত্রাবলি'র সাহিত্যগত মর্যাদার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দেখুন 'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৪০-২৪৫। তা ছাড়া এই বইটির ভূমিকাও পড়ে দেখা যেতে পারে।

আয়োজন করা হবে, যেখানে আরব দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আরবি সাহিত্যের শিক্ষক ও সমালোচকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধাদি উপস্থাপন ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য কাজের একটি পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি করে নেওয়া হবে।

আমার এই চিন্তা খুব তাড়াতাড়ি বাস্তবতার রূপ ধারণ করে নিল এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, ১৭ থেকে ১৯ এপ্রিল ১৯৮১ দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হবে, যার বিষয়বস্তু 'বিশেষত আরবি সাহিত্যে এবং অন্যান্য ভাষার সাহিত্যে ইসলামি উপাদানের অনুসন্ধান'। আরব দেশগুলোতে এই দাওয়াত ও আন্দোলন আমাদের আশা ও ধারণার চেয়ে অনেক বেশি সমাদৃত হলো এবং সবাই একে স্বাগত জানালেন। এই সেমিনারে অংশ নিতে আরবের বিপুলসংখ্যক বিজ্ঞ স্কলার ও সাহিত্যিক লাখনৌ এলেন, যাঁদের মাঝে হাল আমলের বেশ কজন উঁচুমাপের লেখক, ফ্যাকালটি অফ আর্টস-এর ডিন, কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। সাধারণত আরব দেশগুলোর প্রতিনিধিদলগুলো যে মানের হয়ে থাকে, তাঁদের তুলনায় এই সাহিত্যিকদের বিদ্যাগত স্তর ছিল আলাদা।

আরব দেশগুলোর সাহিত্যিকদের সংখ্যা ছিল তিন ডজনেরও অধিক, যাঁদের মাঝে একজন ছিলেন মজলিসে ওযারা মামলিকাতে সৌদিয়ার প্রাক্তন সেক্রেটারি সাইয়িদ আবদুল আযীয রেফায়ী, যিনি আরবি সাহিত্য ও ইতিহাসের ভাণ্ডার থেকে সাহাবা কিরামের সেই ব্যক্তিত্বগুলোর সাহিত্যের দিকটি নিয়ে একটি সিরিজ প্রস্তুত করেছেন, যাঁরা সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। আরও একজন ছিলেন ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা, যিনি 'আশ-শি'রুল ইসলামী' (ইসলামি গদ্য সাহিত্য), 'আন-নাছরুল ইসলামী' (ইসলামি পদ্য সাহিত্য) ও দাওয়াতের আদব বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থাগার তৈরি করে ফেলেছেন। ছটি নামকরা আরব বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি শাখার পরিচালকগণও অংশগ্রহণ করেছিলেন। মিশরের আওকাফমন্ত্রী ডক্টর যাকারিয়া বারবি, কাতার সরকারের ধর্মমন্ত্রী শায়খ আবদুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী প্রমুখও আমাদের এই সেমিনারে অংশ নিয়েছিলেন।

অপরদিকে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামি বিদ্যাপীঠগুলোর শিক্ষকগণও এসেছিলেন। আরবদের মজলিস আলাদা আর উরদু সাহিত্যের মজলিস আলাদা অনুষ্ঠিত হতো। আমি বেশ তাড়াহুড়ার

মধ্যে স্বাগত ভাষণটি প্রস্তুত করে ফেললাম। সেখানে আমি এই আলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করেছি এবং এ ক্ষেত্রে ভারতে যেসব কাজ হচ্ছে, তারও পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেছি। আমাকে সেমিনারের সভাপতি নির্বাচন করার কারণে এই স্বাগত ভাষণটি সভাপতির ভাষণে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

সেমিনারের উরদু সাহিত্য শাখায় (দারুল মুসান্নিফীন-এর পরিচালক সাইয়িদ সাবাহুদ্দীন এম.এ যার সভাপতিত্ব করেছিলেন) আমি যে-ভাষণটি প্রদান করেছি, সেটি সেমিনারের উরদু কার্যবিবরণী 'দ্বীন ও সাহিত্য' গ্রন্থে দেখা যেতে পারে। এখানে আমি শুধু একটি নির্বাচিত অংশ উপস্থাপন করছি।

'কোনো ধর্মানুসারীর মুখ থেকে নির্গত হোক, কোনো নবীর মুখ থেকে নিসৃঃত হোক বা কোনো আসমানি গ্রন্থের লেখা হোক; সাহিত্য সাহিত্যই। শর্ত হলো, কথাটি এমন ধারায় উপস্থাপন করতে হবে যে, তা মনের ওপর ক্রিয়া করতে হবে, বক্তা নিশ্চিন্ত হবেন, আমি কথাটি ভালোভাবে ব্যক্ত করেছি এবং শ্রোতা তার দ্বারা স্বাদ উপভোগ করবেন এবং তাকে গ্রহণ করে নেবেন। সৌন্দর্যপ্রিয়তা তো হলো, সৌন্দর্য যে-আকারেই থাকুক তাকে পছন্দ করতে হবে। আপনি বুলবুলকে বাধ্য করতে পারবেন না, সে এই ফুলে বসবে, ওই ফুলে বসবে না। এ কেমন সৌন্দর্যরুচি, কেমন সত্যপ্রিয়তা যে, গোলাপ যদি মদশালার আঙিনায় তার ছায়ায় ফোটে, তাহলে সেটি গোলাপ এবং তার দ্বারা স্বাদ উপভোগ করা যাবে; কিন্তু যদি সে মসজিদের ফুলবাগানে ফোটে, তাহলে তাতে কোনো সৌন্দর্য নেই? সে তার আত্মপ্রকাশ ও পরিস্ফুটনের জন্য মসজিদের আঙিনার সাহায্য নিয়েছে এ কি তার অপরাধ?

ইকবালের ভাষায়—

حسن بے پروا کو اپنی بے نقابی کے لئے
بن اگر شہروں سے پیار ہو شہر کہ بن؟

'নগ্নতার জন্য বেপরোয়া সৌন্দর্যের যদি শহরের চেয়ে বন বেশি প্রিয় হয়, তাহলে শহরের চেয়ে বন ভালো হয়ে যাবে নাকি?'

সেমিনারহলে এমন কিছু নির্বাচিত উক্তি ও কবিতা টাঙানো হয়েছিল, যেগুলোর দ্বারা সাহিত্যের আসল উদ্দেশ্য ও তার আত্মার প্রকাশ ঘটছিল।

সেগুলোর মধ্যে আমারও কিছু লেখার নির্বাচিত বক্তব্য ছিল। ছিল ইকবালেরও কয়েকটি পঙ্ক্তি। যেমন– তাঁর বিখ্যাত দুটি কবিতা, যার দুটি চরণ নিম্নরূপ–

اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا
مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا

'ওহে চক্ষুষ্মান! দেখার রুচি থাকায় কোনো দোষ নেই। কিন্তু যে-চোখ বস্তুর স্বরূপ দেখে না, তার মূল্য কী? জ্ঞানের উদ্দেশ্য অনন্ত জীবনের জ্বলন। এই একটা বা দুটা শ্বাস অঙ্গারের চেয়ে বেশি কিছু নয়।'

আরবি সেমিনারহলে এগুলোর আরবি অনুবাদও ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

এই সেমিনারের ফলাফল হিসেবে একটি কমিটি গঠন করা হলো, যেটি স্বতন্ত্রভাবে শুধু এই মিশন নিয়েই কাজ করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এই কমিটি কোন-কোন বিষয় নিয়ে কাজ করবে, তাও বুঝিয়ে দেওয়া হলো। স্বতন্ত্র এই সেক্রেটারিয়েটটির কেন্দ্র বানানো হলো দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামাকে। আমার স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ রাবে' নদভীকে (যিনি এই পুরো আলোচনাসভার সঞ্চালক ছিলেন) তার পরিচালক নির্বাচন করা হলো।[১]

হাদীছের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ

১৪০১ হিজরির (মোতাবেক সেপ্টেম্বর ১৯৮১) যিকাদার প্রথম সপ্তাহে জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওওরা ও রাবেতা আলমে ইসলামী মক্কার গুরুত্বপূর্ণ সভাগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য আমার হেজায সফরের কর্মসূচি

---

১. এই আলোচনা সভারই ক্রিয়া ছিল যে, তার কোনো গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও অংশগ্রহণকারী (যাঁদের মাঝে বেশিরভাগই ছিলেন জামেয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ-এর সম্মানিত শিক্ষক) 'রাবেতাতুল আদাবিল ইসলামী' নামে রিয়াদে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন দাঁড় করান এবং ১৯৮৪ সালের মে মাসের কোনো এক তারিখে তার একটি প্রতিনিধিদল পবিত্র মক্কায় আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং আমাকে তার সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করেন। সিদ্ধান্ত হলো, এই সংগঠনের কেন্দ্র থাকবে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায়। ওস্তাদ আবদুল বাসেত বদর তার মহাসচিব এবং মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে' নদভী ও মৌলভী ওয়াজেহ রশীদ নদভী তার যুগ্মমহাসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। আর এ বছরেরই (১৯৮৪) শেষের দিকে নদওয়াতুল উলামায়ই তার একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

হাতে এল। বছরকয়েক যাবত হজ্বের মওসুমে রাবেতা হজ্ব করতে আসা আগ্রহী লোকদের ও পবিত্র মক্কার আলেম ও সত্যান্বেষী নাগরিকদের বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের অধ্যয়ন, গবেষণা ও চিন্তা দ্বারা উপকৃত করার লক্ষ্যে অনেকগুলো ভাষণ-বক্তৃতার ধারা শুরু করেছিল। রাবেতার কেন্দ্রীয় ভবনের সুপরিসর কনফারেন্সহলে এসব ভাষণ ও প্রবন্ধ শোনানোর ব্যবস্থা হতো। ১৪০১ হিজরিতে (১৯৮১ খ্রি.) তার মহাসচিব শায়খ মুহাম্মাদ আলী আল-হারকান (যিনি স্বয়ং উঁচুমাপের একজন হাদীছবিশারদ ছিলেন) আমাকে ফরমায়েশ করলেন, এ বছরকার স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠানের আমি উদ্বোধন করব এবং হাদীছের প্রামাণ্যতার ওপর নিবন্ধ পাঠ করব।

আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিলাম। তবে বিষয়বস্তুতে খানিক রদবদল করার অনুমতি নিয়ে নিলাম যে, হাদীছের প্রামাণ্যতার ওপর অনেক কিছু লেখা ও পড়া হয়েছে। আমি নিজের জন্য 'ইসলামি মেজাজ-পরিবেশ তৈরি ও সুরক্ষায় হাদীছের মৌলিক ভূমিকা' এই বিষয়টি ঠিক করে নিলাম।[১]

এই নিবন্ধে আমি নতুন এক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং নতুন একটি ধারায় দেখানোর চেষ্টা করেছি মুসলমানদের জীবনে হাদীছের অবস্থান কী, সুন্নাহর প্রয়োজনীয়তা উম্মতের কতখানি এবং পবিত্র সুন্নাহ থেকে এই উম্মতের সম্পর্ক ছিন্ন এবং হাদীছে নববীর সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার মাঝে উম্মতের কত বড় ক্ষতি এবং ইসলামি অস্তিত্বের জন্য কত বড় আশঙ্কা নিহিত। মুসলিম বিশ্বের কোনো-কোনো অঞ্চলে হাদীছের প্রামাণ্যতার ক্ষেত্রে সংশয় ও অনাস্থা তৈরির যে আন্দোলন চলছে, সেটা ইসলামের বিরুদ্ধে গভীর ও ভয়াবহ এক ষড়যন্ত্র[২] এবং তার পেছনে কোন লক্ষ্য ও প্রেরণা কার্যকর? আমি ইতিহাসের আলোকে প্রমাণিত করেছি, উম্মতের আত্মসমালোচনার জন্য হাদীছ একটি শক্তিশালী উপায়, উম্মতের সংশোধক ও সংস্কারকদের একটি

---

১. আমার এই নিবন্ধটি আরবিতে 'দাওরুল হাদীছ ফী তাকবীনিল মানাখিল ইসলামী ওয়া ছিয়ানাতিহী' নামে এবং ইংরেজিতে ROLE OF HADITH IN THE PROMOTION OF ISLAMIC CIAIMATE AND ATTITUDE নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

২. যে কাজে দুর্ভাগ্যবশত লিবিয়া বর্তমানে সকলের বাড়া।

দীক্ষাপীঠ। ইসলামের ইতিহাসের সংশোধন ও সংস্কারমূলক প্রায় সবগুলো আন্দোলন, শিরক-বিদ'আদের মোকাবেলা ও কুপ্রথা ও জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটন ও বিশ্বাসের শুদ্ধিকরণের প্রচেষ্টাগুলো হাদীছ ও সুন্নাহর জ্ঞান ও তার পঠন-পাঠনের ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেখানেই এই ধারা শেষ কিংবা দুর্বল হয়ে গেছে, সেখানেই এই আন্দোলন ও প্রচেষ্টাগুলোও (আলেমে দ্বীন, দুনিয়াত্যাগী ও সৎকর্মশীল লোকদের উপস্থিতি সত্ত্বেও) দীর্ঘদিন যাবত মওকুফ থাকে। এ ক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যান নিয়েছি এবং ইতিহাসের অনেক সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছি। এই নিবন্ধটি ১৪০১ হিজরির যিকাদার ১৬ তারিখে পাঠ করা হয়। সে সময় মক্কার পণ্ডিতশ্রেণী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলি ও হাজীদের বিপুলসংখ্যক লোক উপস্থিত ছিলেন।

একটি শিক্ষাসম্মাননা

অক্টোবরের ১৬ তারিখে রাবেতার বৈঠক ও হজ্ব সমাপন করে আমি যখন নিজের অবস্থানের জায়গায় এসে পৌছলাম, তখন হঠাৎ করেই জানতে পারলাম, কাশ্মির ইউনিভার্সিটি আমাকে ডক্টর অফ লিটারেচারের সম্মাননা ডিগ্রি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যেটি ২৯ অক্টোবর সনদবিতরণ কনভেনশনে প্রদান করা হবে। জম্মু-কাশ্মিরের গভর্নর বি.কে নেহেরু, কাশ্মির ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর অহীদুদ্দীন সাহেব ও প্রফেসর আলে আহমাদ সরওয়ার সাহেবের পত্র ও তারবার্তা এল, কালবিলম্ব না করে মঞ্জুরির সংবাদ প্রেরণ করুন।

এই 'দুর্ঘটনা' আমার জন্য একদম অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক ছিল। সামান্য দ্বিধা ও মানসিক দ্বন্দ্বের পর এবং এই শর্তে যে, এর ধরন নিরেট বিদ্যাগত ও সাহিত্যময় হবে এবং রাজনীতির সঙ্গে এর দূরতমও কোনো সম্পর্ক থাকবে না আমি আমার প্রিয়জন ও বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই সম্মাননা গ্রহণ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গকে তারের মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম। আমার সামনে আমার ওস্তাদ মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নদভী, নবাব সদর ইয়ার জংগ, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানি ও মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদির নজির ছিল, যাঁদের মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড় এই ডিগ্রি প্রদান করেছিল এবং তাঁরা গ্রহণ

করেছিলেন। মনের এক কোণে এই ভাবনাও ছিল যে, এই সুযোগে আমি আধুনিক শিক্ষায় অভিজ্ঞ শিক্ষিতজন, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলি ও দেশের বেশ কজন দায়িত্বশীলের সম্মুখে ইসলামি শিক্ষা ও ইসলামি শিক্ষার ধারক-বাহকদের সম্পর্কে নিজের চিন্তাধারা ও পরামর্শগুলো উপস্থাপন করার সুযোগ পাব। দ্বীনের একজন দাঈ হিসেবে এই সুযোগটি হাতছাড়া করাও সমীচীন মনে হলো না।

১৯৮১ সালের ২৯ অক্টোবর কনভেনশন অনুষ্ঠিত হলো, যেটি আমার জন্য এই জীবনে একটি নতুন অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা ছিল। এই পুরো অনুষ্ঠানে (যেখানে আমি নিজেকে অপরিচিত ও অচেনা অনুভব করছিলাম) আমার শুধু একটি বিষয়েরই প্রতি হৃদ্যতা ছিল যে, আমি আমার নিবন্ধটি পাঠ করার সুযোগ পাব, যাকে আমি 'ইসলামি শিক্ষার মর্যাদা ও আলেমদের করণীয়' শিরোনামে প্রস্তুত করেছিলাম। এই নিবন্ধে আমি আমার মন ও মস্তিষ্ককে আধুনিক শ্রেণী ও দায়িত্বশীলগণের সম্মুখে বের করে দেখানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেছি।

কনভেনশনের রীতি-প্রথা ও নিয়মতান্ত্রিকতা পূর্ণ করতে যতটা বিলম্ব হচ্ছিল, আমার অন্তরে অস্থিরতাও ততটা বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে, না জানি শেষ পর্যন্ত নিজের চিন্তার কথা উপস্থাপন করার সময় না থাকে, যেটি আমার এই সফর ও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ও আসল মূল্য। এই অনুষ্ঠান গভর্নর বি.কে নেহেরুর সভাপতিত্বে ও কাশ্মিরের মুখ্যমন্ত্রী শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হলো। এ সময় ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর মাধুরি আরশাহও উপস্থিত ছিলেন। তাদেরও ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদানের সিদ্ধান্ত ছিল।

আল্লাহ আল্লাহ করে নিবন্ধটি পাঠ করার সময় আমার এল। নিবন্ধটি উরদুতে লিখেছিলাম। উরদুর সঙ্গে কাশ্মিরিদের বিশেষ সম্পর্ক ও হৃদ্যতা থাকার দরুন সাধারণ উপস্থিতি, সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও উরদু জানা থাকার ফলে খোদ গভর্নর মনোযোগসহকারে আমার প্রবন্ধটি শুনছিলেন এবং বেশ ভালোভাবেই শুনছিলেন। আমি এই শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতি থাকার সুবাদে আমার বক্তব্যের সূচনা সেই প্রথম অহীর আলোচনা দ্বারা করেছি, যেটি একজন নিরক্ষর নবীর জবানে এমন একটা জাতির মাঝে যারা

'নিরক্ষর জাতি' অভিধায় ভূষিত ছিল – এই বাস্তবতার ঘোষণা করে দিল যে, জ্ঞানের সফর প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানময় আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে শুরু করা দরকার। কারণ, সফর অনেক দীর্ঘ, বন্ধুর ও ঝুঁকিপূর্ণ।

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ

(পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন)

তারপর এই প্রথম অহী কলমের কথাও ভোলেনি, যেটি সম্ভবত তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও মক্কার কোনো ঘরে পাওয়া যেত না। কিন্তু আল্লাহ ঘোষণা দিলেন, বিদ্যার ভাগ্য কলমের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এই উম্মী নবীর (যিনি নিজে কখনও কলম ব্যবহার করেননি) আগমনের ফলে যে উম্মত অস্তিত্ব লাভ করবে, তারা কলম দ্বারা পুরোপুরি কাজ নেবে।

اَلَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

(যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন)

তারপর এই বিপ্লবী ও অবিনশ্বর বাস্তবতাও বর্ণনা করলেন যে, জ্ঞানের কোনো পরিসীমা নেই।

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(তিনি মানুষকে সেই জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না)

তারপর আমি ইউনিভার্সিটিগুলোর কর্তব্যবিষয়ে আলোকপাত করি এবং বলি, ইউনিভার্সিটিগুলোর প্রথম কাজ হলো চরিত্রগঠন।

আমি বললাম–

'ইউনিভার্সিটিকে (মানে ইউনিভার্সিটির ছাত্রদেরকে) এমন ক্যারেক্টার তৈরি করতে হবে, যেটি তাদের বিবেককে ইকবালের ভাষায় 'এক মুষ্ঠি যবে'র বিনিময়ে বিক্রি করতে প্রস্তুত হবে না। আজকালকার দর্শন ও নিয়ম মনে করে, এই বাজারে সকলেরই মূল্য নির্ধারিত আছে। কাউকে যদি অল্প দামে ক্রয় করা না যায়, তাহলে তাকে বেশি দামে ক্রয় করে নিতে হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত সফলতা হলো, সে চরিত্রগঠনের দায়িত্ব পালন করবে। সে এমন শিক্ষিত মানুষ তৈরি করবে, যার পক্ষে নিজের বিবেককে বিক্রি করা সম্ভব হবে না, যাকে জগতের কোনো অপশক্তি, কোনো নষ্ট দর্শন, কোনো

ভুল আমন্ত্রণ-আন্দোলন কোনো মূল্যেই ক্রয় করতে পারবে না, যে ইকবালের ভাষায় পূর্ণ আস্থা ও গর্বের সঙ্গে বলতে পারবে–

کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں　　غلام طغرل و سنجر نہیں میں
جہاں بینی مری فطرت ہے لیکن　　کسی جمشید کا ساغر نہیں میں

'তোমার করুণা যে, আমি নিঃসম্বল নই। আমি তাগরাল-সানজারের ভৃত্য নই। দেশময় ঘুরে বেড়ানো আমার স্বভাব বটে; কিন্তু আমি কোনো জমশেদের (রাজা-বাদশাহর) পানপাত্র নই।'

আরেকটি দায়িত্ব হলো, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে এমন যুবকরা বের হবে, যারা তাদের জীবনগুলোকে সত্য, সততা, জ্ঞান ও হেদায়েতের জন্য কুরবান করতে প্রস্তুত থাকবে। যারা কারও জন্য অভুক্ত থাকার মাঝে সেই স্বাদ পাবে, যেমন স্বাদ মানুষ পেট পুরে আহার করার মধ্যে পেয়ে থাকে। যারা হারানোর মাঝে সেই আনন্দ লাভ করবে, যেটি অনেক সময় মানুষ অর্জনের মধ্যে লাভ করে না। যারা নিজেদের যৌবনের সর্বোত্তম শক্তিগুলোকে, মেধার সর্বোত্তম যোগ্যতাগুলোকে এবং আপন বিদ্যালয়ের অনুদান (যার দ্বারা তাদের থলেগুলোকে ভরে দেওয়া হয়েছিল) মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যয় করবে।

ভদ্র মানবীয় জীবন যাপনের মৌলিক গুণগুলো হলো আল্লাহভীতি, মানবপ্রীতি, আত্মনিয়ন্ত্রণের সাহস-যোগ্যতা, ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার অভ্যাস, মানবতার মর্যাদা, মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের সুরক্ষার চেতনা, অধিকারের আদায়ের ওপর কর্তব্যপালনকে প্রাধান্য দেওয়া, নিপীড়িত ও দুর্বল মানুষগুলোর সহায়তা, নিপীড়িনকারী ও শক্তিমানদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার সাহসিকতা, যেসব মানুষ সম্পদ ও ক্ষমতা ছাড়া আর কোনো যোগ্যতা রাখে না, তাদের সমীহ না করা, নির্ভীকতা, সকল ক্ষেত্রে; এমনটি আপন জাতি ও আপন দল-সম্প্রদায়েরও মোকাবেলায় সত্য কথা বলার সাহস, আপন-পর নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে বিচারের পাল্লা সমান রাখা এবং কোনো একটি সচেতন ও চক্ষুষ্মান শক্তির প্রতিটি মুহূর্তে আমাকে দেখছেন এবং তাঁর কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে, তাঁর কাছে হিসাব দিতে হবে বলে বিশ্বাস করা। এগুলো হলো সুস্থ, শান্তিময়, নিঃশঙ্ক ও সফল জীবন যাপনের মৌলিক শর্ত এবং একটি উন্নত ও সুশৃঙ্খল সমাজ ও একটি

শক্তিশালী, নিরাপদ ও মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রয়োজন এবং তার সুরক্ষার গ্যারান্টি।

এগুলো শিক্ষাদান ও এর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রথম দায়িত্ব এবং এগুলো অর্জন করা সমাজের শিক্ষিত শ্রেণী ও দেশের বিজ্ঞজনদের প্রথম কর্তব্য। আমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে, এই কাজগুলো সম্পাদনে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কতখানি সফল এবং তাদের সনদপ্রাপ্ত লোকগুলো কতখানি মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য এবং ভবিষ্যতে এসব লক্ষ্য অর্জন ও পূর্ণতাদানে আমরা কতটুকু প্রত্যয়ী; এর জন্য আমরা কী-কী আয়োজনের কথা চিন্তা করেছি।'

আমার এই নিবন্ধপাঠের পর গভর্নর বি.কে নেহেরু ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, আমি সনদবিতরণের অনেক কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু এমন চিন্তাজাগানিয়া (ইন্‌স্‌পায়্যারিং) ভাষণ আমি আর শুনিনি। এই ভাষণটি উরদুতে ছেপে যখন জম্মু-কাশ্মিরের মুখ্যমন্ত্রী শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহর কাছে পাঠানো হলো, তখন আমাকে তিনি নিম্নলিখিত পত্রখানা পাঠালেন।

'জম্মু

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২

শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাহেব!

আস্‌সালামু আলাইকুম

আপনার পত্রখানা ডিসেম্বরের ৩০ তারিখে (১৯৮১) আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। আমার কথা মনে আছে বলে আপনাকে ধন্যবাদ। ২৯ অক্টোবরের সনদবিতরণ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত আপনার বক্তব্যের কপি উরদু ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই আমার হাতে এসে পৌঁছেছিল। উল্লিখিত অনুষ্ঠানে আপনার আগমন ও চিন্তাজাগানিয়া ধারায় সমকালীন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আপনার বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী, আপনার সেই কথাগুলোর প্রতিধ্বনি আজও এখানে শোনা যাচ্ছে। ইসলামি শিক্ষামালার আলোকে সমকালীন জীবনের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক সমস্যাগুলোর চিত্র আপনি যেভাবে অঙ্কন করেন, তা আপনারই

পক্ষে সম্ভব। এভাবে শুধু যে সমাজের সংশোধনের জন্যই নতুন পথ বেরিয়ে আসে, তা-ই নয়; বরং এর দ্বারা সেই লোকগুলোও অনেক দিকনির্দেশনা পেয়ে যায়, যারা সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবেলা করছেন। আমি আশা রাখি, আপনার দু'আগুলোতে আমাকে সব সময় মনে রাখবেন।

আপনার হিতকামী

শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ।'

কাশ্মিরের বন্ধুবর্গ, বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও শ্রীনগরের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য এটি একধরনের বিস্ময়কর ঘটনা ছিল যে, দীর্ঘ ৩৬ বছর পর[১] সামান্য একটি কারণে আমি কাশ্মির এসেছি। এই সুযোগটিকে তারা পুরোপুরি কাজে লাগালেন। শ্রীনগর অবস্থানের ৯টি দিন বয়ান-ভাষণের প্রোগ্রামের কারণে কঠিন ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হলো। কোনো-কোনো দিন বয়ানের তিন-তিনটি প্রোগ্রামও আমাকে করতে হয়েছে। গভর্নর তার গভর্নর হাউজে এবং মুখ্যমন্ত্রী শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ পামপুরের জাফরানযারে চমৎকার বৈঠকের আয়োজন করেন। মীর ওয়ায়েজ কাশ্মির মাওলানা মুহাম্মাদ ফারুক সাহেব বিশেষভাবে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং আমাকে আমার চিন্তাধারা ব্যক্ত করার সুযোগ করে দেন। আমি ও আমার দুজন সফরসঙ্গী ডক্টর মুহাম্মাদ ইশতিয়াক কুরাইশি এবং স্নেহাস্পদ আবদুর রাযযাক কাশ্মির ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ওয়াহীদুদ্দীন মালিক সাহেবের মেহমান থাকি।

শ্রীনগর জামে মসজিদে জুমার নামাযের পর – যেখানে শ্রীনগর ও তার আশপাশ থেকে কয়েক হাজার মুসলমান অংশগ্রহণ করেছিল – আমি ভাষণ দান করি, যার শিরোনাম ছিল 'কাশ্মির উপত্যকায় নির্ভেজাল তাওহীদের প্রথম বার্তা ও তার পতাকাবাহী'। মীর ওয়ায়েজ মনযিলে আলেমসমাজ, মসজিদের ইমাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এক মজলিসে জাতীয় জীবনে জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মর্যাদা ও তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের ওপর আলোকপাত করি। জামায়াতে ইসলামী কাশ্মিরের কেন্দ্রীয় অফিসে 'দ্বীনে নববী মেজাজ ও

---

১. প্রথমবার আমি ১৯৪৯ সালে কাশ্মির গিয়েছিলাম।

তার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ের ওপর ভাষণ দান করি। এভাবে এই সফরে আরও অনেকগুলো ভাষণ প্রদান করি।[১]

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি হয়েছিল নুসরাতুল ইসলাম হলে, যেখানে শ্রীনগর ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলোর বহুসংখ্যক আলেম, সাধারণ শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই ভাষণটিতে ছিল ইতিহাস ও মিল্লাতে ইসলামিয়ার একজন বিশ্বপর্যটকের চাক্ষুষদর্শন ও অভিজ্ঞতার নির্যাস এবং বিদ্যাগত ও ঐতিহাসিক ভ্রমণের নানা সওগাত। এখানে আমি তার একটি অংশ তুলে ধরলাম–

'সুধীমণ্ডলি! আপনারা কাশ্মিরের হৃদয় ও মস্তিষ্ক। আপনাদের সিদ্ধান্তই মূলত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। আপনাদের কর্তব্য হলো, আপনারা এই মাটির ইসলামিয়াত টিকিয়ে রাখবেন। আগামীকাল হাশরের মাঠ অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত থাকবেন। মহান আল্লাহ বিচারকের আসনে আসীন হবেন। সেদিন আপনাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, মহান আল্লাহ এই ভূখণ্ডটিকে ইসলামের সম্পদে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এখানে তাঁর অনেক অলীকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা জীবনের ঝুঁকি বরণ করে এই উপত্যকায় এসেছিলেন। তাঁরা এখানকার অধিবাসীদের আল্লাহর বাণী ও বার্তা পৌঁছিয়েছিলেন। তারপর আল্লাহ ইসলামের চারাটিকে প্রথমে ডাল-পাতবিশিষ্ট ও পরে ফলবান বৃক্ষে পরিণত করেছিলেন এবং তাকে শত-শত বছর যাবত সবুজ-সতেজ ও ফলবান-ছায়াবান রেখেছেন। এখানে হাজার-হাজার মসজিদ তৈরি হয়েছিল। হাজার-হাজার মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খানকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অসংখ্য বিজ্ঞ আলেম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তোমাদের একটুখানি অলসতা, মতানৈক্য ও হীনম্মন্যতার ফলে ইসলামের এই বাগিচাটি উজাড় হয়ে গেল!

ইতিহাস আমাদের জানান দিয়ে যায়, ভুল আর ভুলের মাসুলের মধ্যে অনুপাত থাকা জরুরি নয়। অনেক সময় ভুল হয় ছোট; কিন্তু তার শাস্তিটা হয় অনেক বড়, যার আরও অনেকগুলো কারণ থাকে। অনেক সময় এমন

১. মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম 'তোহফায়ে কাশ্মীর' নামে এই ভাষণগুলো প্রকাশ করেছে। এটি পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের মুসলামনদের পাঠযোগ্য বই।

হয়, ছোট একটি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল হয়ে গেল; কিন্তু তার মাসুল শত-শত বছর যাবত গুণতে হয়। জগতের অনেক জাতি কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন করেছে আর শত-শত বছর যাবত তার শাস্তি ভোগ করেছে।'

তারপর আমি বললাম, হিন্দুস্তানের সার্বিক পরিস্থিতির দাবিও এটিই যে, আপনারা আপনাদের বৈশিষ্ট্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টিকে থাকুন। হিন্দুস্তানে তখনই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে, দেশ তখনই মর্যাদা পাবে এবং স্থিতিশীলতা অর্জন করবে, যখন সে আপন বৈশিষ্ট্যাবলি, শান্তিপ্রিয়তা, মানবপ্রেম ও সুস্থ মস্তিষ্ক নিয়ে টিকে থাকবে।

তারপর আমি সেই দুর্বলতাগুলোর কথা উল্লেখ করলাম, যেগুলো এই লক্ষ্যের জন্য ক্ষতিকর ও ভয়ানক প্রমাণিত হতে পারে এবং ইসলামিত্বের সঙ্গে এই ভূখণ্ডের সম্পর্ক ছিন্ন কিংবা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। তার প্রথম বিষয়গুলো হলো মুশরিকসুলভ বিশ্বাস ও কর্ম, যেগুলো কুরআনের অকাট্য বক্তব্যের আলোকে সবসময় দুর্বলতা, ভীতি, কাপুরুষতা সৃষ্টি ও আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চনার কারণ হয়। দ্বিতীয়টি হলো নিজেদের অনৈক্য ও বিভেদ। তৃতীয়টি সম্পদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মোহ এবং তাকে যেকোনো মূল্যে অর্জনের লিপ্সা। তাছাড়া অপচয়-অপব্যয়, মনগড়া রসম-রেওয়াজের অনুসরণ, একাজে পরস্পর গর্ব-প্রতিযোগিতা। আমি চতুর্থ যে বিষয়টি যুক্ত করেছি, সেটি হলো প্রয়োজনের অধিক আবেগ। এই দুর্বলতাটা যখন দলগত কিংবা আঞ্চলিক মেজাজে পরিণত হয়, তখন অনেক বড় বিপদ ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসে বড়-বড় অনেক জাতীয় দুর্ঘটনার মূলে ছিল এই আবেগ।[1] যেসব জাতি-গোষ্ঠী দুনিয়াতে উল্লেখযোগ্য কাজ আঞ্জাম

---

১. কাশ্মিরের মানুষ মাত্রাতিরিক্ত আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল বিশেষভাবে ১৯৭৯ সালে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে পাকিস্তানে ফাঁসিতে ঝোলানোর সময়। সেদিন তাঁর ভক্ত-সমর্থকরা কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং সহিংসতার, এমনকি রক্তপাতের পথও অবলম্বন করেছিল। এমনকি কোনো-কোনো জায়গায় বিভিন্ন সম্মানিত বস্তুর; এমনকি ইসলামের মর্যাদাসম্পন্ন প্রতীকের সঙ্গে পর্যন্ত বে-আদবি ও অপমানজনক আচরণ করেছিল এবং বহু না-করা অপরাধ তাদের টার্গেটে পরিণত হয়েছিল। আমি শায়খ আবদুল্লাহকে এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তিনি ১৬ জুন ১৯৭৯-এর জবাবি পত্রে এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তার স্থানীয় ও রাজনৈতিক কারণগুলো ব্যাখ্যা করেন।

দিয়েছেন কিংবা ইতিহাসে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সভ্যতার জনক বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে অথবা জগতে সত্য দ্বীনের পতাকা সমুন্নত করেছেন, তাঁরা স্বভাবগতভাবে সহনশীল, ধৈর্যশীল, উদার, সাহসী ও আত্মমর্যাদাশীল লোক ছিলেন। হিজরি প্রথম শতকের মুসলমানরা তো ছিলেন এর সর্বোত্তম নমুনা।

যখন কাশ্মিরের ভাষণগুলোর সংকলন 'তোহফায়ে কাশ্মীর' নামে প্রকাশিত হলো, তখন তার একটি কপি আমি শায়খ আবদুল্লাহর নামে পাঠিয়ে দিয়েছি।

তিনি তার প্রাপ্তি স্বীকার করে লিখেছিলেন—

'শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাহেব!

১৯৮১ সালে কাশ্মিরে আপনি যে ভাষণগুলো প্রদান করেছিলেন, তার সংকলন 'তোহফায়ে কাশ্মীর'-এর একটি কপি মুহতারাম আবদুর রহমান কুন্দুর মারফত আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও অন্তর্গত গুণাবলির কারণে বইটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। যেরূপ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনি কাশ্মিরের ইসলামি অবস্থানকে অটুট রাখার ব্যাপারে কথা বলেছেন, সে আপনারই পক্ষে সম্ভব ছিল।

শুভ কামনায়

আপনার সুহৃদ

শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

একটা গুরুতর পারিবারিক দুর্ঘটনা

১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বৈঠকে যোগদানের জন্য আমাকে পবিত্র হেজাজ সফর করতে হলো। ১৫ ফেব্রুয়ারি যখন লাখনৌ ফিরে এলাম, তখন এমন একটা গুরুতর পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যেটা আমার মন-মস্তিষ্ককে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ঘটনাটা হলো, আমার ভাগিনা, বাহুর শক্তি, বংশের গৌরব, 'রেজওয়ান' 'মুছান্নিফ' 'সাওয়ানেহে মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলভী' ও 'হায়াতে খলীল'-এর সম্পাদক মৌলভী মুহাম্মাদ ছানীর মৃত্যুর বেদনাদায়ক ঘটনা। ফেব্রুয়ারির

১৬ তারিখে এমন পরিস্থিতিতে ঘটনাটা ঘটল, যে কিনা মন-মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়াকে আরও বেশি তীব্র ও গভীর করে দিল।[১]

আমার এই ভাগিনা আমাদের বংশের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যগুলোর ধারক ও বাহক ছিল। ছিল একাধারে আলেমে দ্বীন, লেখক, কবি, ঐতিহাসিক, বংশ ও ফারায়েজ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ও হৃদয়কাড়া ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ছিল হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া সাহেব (রহ.)-এর বিশেষ করুণাধন্য ও স্নেহসিক্ত। তাঁর পক্ষ থেকে বায়'আতের অনুমোদনপ্রাপ্ত ছিল। দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও মানুষের চরিত্র সংশোধনের কাজে ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা ও মাদরাসা মাযাহিরুল উলূম এই উভয় প্রতিষ্ঠান থেকে উপকৃত হয়েছিল এবং এই উভয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার ক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যের সমাহার ছিল।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব (রহ.)-এ সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। সফরে ও হযরে (স্থায়ী ঠিকানায় অবস্থানকালীন সময়ে) তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য তার অর্জিত ছিল। ছিল তাঁর পরম আস্থাভাজন। জেলায় দাওয়াতি ও ইসলাহি কাজে সবার আগে-আগে অংশ নিত এবং জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত, যেটি আমাদের বংশের আর কারও পক্ষে হয়ে উঠত না। আমাদের পুরাতন ঠিকানা নাসিরাবাদের সন্নিকটে আমিননগরে ফালাহুল মুসলিমীন নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিল, যাকে সে আপন সন্তানের মতো ভালবাসত। এখন সেটি শুধু রায়বেরেলি জেলারই নয় – সমগ্র ইউপিতে দারুল উলূমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এমন মাদরাসাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় মাদরাসা, যেদি দিন-দিন উন্নতি করে চলছে। পাশাপাশি সে ছিল সর্বজনপ্রিয়, মিশুক, পরিচালনায় বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী, দূরদর্শী, সুক্ষ্মদর্শী ও কর্মতৎপর। আশা ছিল, বংশের রূহানি ও ইসলাহি ধারা – যেটি দীর্ঘদিন যাবত বিচ্ছিন্ন ছিল – তার মাধ্যমে পুনরায় জোড়া লাগবে।

বংশের সদস্যদের মধ্যে সফরে ও হযরে আমি সবচেয়ে বেশি সঙ্গ পেয়েছি তার। ১৩৬৬ হিজরির (১৯৪৭ খ্রি.) হজ্বসফরে আমি তার মতো লোকে সঙ্গ পেয়েছি। তখন সে যে আন্তরিকতা ও যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিল, আমি প্রথম

---

১. আমার হেজায সফরের দিনকতক আগে মরহুমকে রাস্তায় একটা কুকুর আক্রমণ করেছিল। কুকুরটা পাঞ্জা দ্বারা তার কপালে আঁচড় দিয়েছিল। সে সময় ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ডাক্তারগণও কোনো আশঙ্কার কথা বলেননি। কিন্তু সপ্তাহকয়েক পর তার ক্রিয়া প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল আর এটিই বাহ্যিক বিচারে তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল।

খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমি 'রেজওয়ান' ম্যাগাজিনের 'মাওলানা মুহাম্মাদ ছানী হাসানী' সংখ্যায় স্নেহাস্পদ মৌলভী মুহাম্মাদ ছানী মরহুম : কয়েকটি স্মৃতি' নামক নিবন্ধে যা কিছু লিখেছি, তার নির্বাচিত একটি অংশ এখানে তুলে ধরলাম—

'এ ব্যাপারে সমস্ত লক্ষণ ও আলামত বিদ্যমান ছিল যে, স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ ছানী আমার মৃত্যুর পর নিজের প্রতিক্রিয়া লিখবে এবং আমার সঙ্গে তার অসাধারণ সম্পর্ক, সফর ও হযরের দীর্ঘ সাথিত্ব, জীবনের খুঁটিনাটি, মেজাজি বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে স্মৃতিচারণ করবে। আমার জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনার ব্যাপারে বংশের আর কোনো সদস্যর তার মতো জানাশোনা ছিল না। এই হিসেবে ধারণা ছিল, আমাকে নিয়ে তার লেখা স্মৃতিচারণ সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল বলে বিবেচিত হবে। আমাকে নিয়ে লিখতে গেলে যেসব উপাদানের প্রয়োজন হবে, সেসব আমার বংশের আর কোনো সদস্যের তার মতো জ্ঞান ছিল না। বংশের ইতিহাস, পূর্বপুরুষদের বৃত্তান্ত ও বংশলতিকা গোটা বংশে তারই সবচেয়ে বেশি জানা ছিল।

আমাকে আমার জ্ঞানচর্চা ও ঐতিহাসিক কাজগুলোতে বিশেষ করে 'সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ' ও 'হায়াতে আবদুল হাই' রচনাকালে বারবারই তার শরণাপন্ন হতে ও তার সাহায্য নিতে হয়েছিল এবং প্রতিবারই তার জ্ঞানের পরিসর, ঐতিহাসিক অনুভূতি ও গবেষণার আগ্রহের জন্য আমাকে বিস্মিত হতে হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর কুদরত ও তাঁর শান তো আর এসবের ধার ধারে না। এতসব লক্ষণ-আলামত ও বয়সের এই তারতম্য সত্ত্বেও (যেটি ১০/১১ বছরের কম ছিল না) আজ আমাকেই বরং তার সম্পর্কে লিখতে হচ্ছে। এ মুহূর্তে আমার প্রাচীন আরব কবি ও আমার নামে নাম আবুল হাসান ইলতিহামির সেই পঙ্ক্তিটি মনে পড়ছে, যেটি তিনি তার যুবক পুত্রের মৃত্যুর শোকগাথায় বলেছিলেন এবং যেটি আরবির প্রভাবশালী শোকগাথাগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

পঙ্ক্তিটি হলো—

حُكْمُ الْمَنِيَّةِ فِي الْبَرِيَّةِ جَارٍ   مَا هٰذِهِ الدُّنْيَا بِدَارِ قَرَارٍ

'মৃত্যুর বিধান সমস্ত সৃষ্টির ওপর চালু আছে। বাস্তবিকই এই জগত আজীবন থাকার জায়গা নয়।'

এই কবিতায় কবি তার কলিজার টুকরা ছেলেকে উদ্দেশ করে বলেছেন–

وَاَبُوْكَ فِى الْمِضْمَارِ فَسَبَقْتَنِىْ

'আমি আর তুমি একই পথের পথিক ছিলাম। কিন্তু তুমি আমার থেকে এগিয়ে গেছ এবং গন্তব্যে পৌঁছে গেছ আর তোমার বাবা এখনও পথ চলছে।'

হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া সাহেব দিনাদিনই তার মৃত্যুর খবর পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমার নামে একটি দীর্ঘ শোকবার্তা লিখলেন, যার প্রতিটি শব্দ থেকে তাঁর গভীর প্রতিক্রিয়া ও সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের শীর্ষ আলেম ও বুযুর্গদের শোকবার্তাগুলোর মধ্যে এটি ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শোকবার্তা। মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে পহেলা শাবান ১৪০২ (২৪ মে ১৯৮২) খোদ শায়খুল হাদীছ সাহেবের মৃত্যুর ঘটনাটা ঘটে গেল আর আমাদের কাছে মনে হলো, এবার বুঝি আমরা এতিম হয়ে গেলাম।

'ইসলাম ও পাশ্চাত্য' বিষয়ের ওপর দারুল মুসান্নিফীন-এর সেমিনার

দারুল মুসান্নিফীন আজমগড়ের পক্ষ থেকে 'ইসলাম ও নাস্তিকতা' বিষয়ের ১৪০২ হিজরির রবিউল আখার মাসের ২৬-২৮ (মোতাবেক ২১-২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২) তারিখে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের কথা ঘোষণা করেছিল আমার হেজায সফরের আগেই এবং আমি ও স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ রাবে' তার পরামর্শে শরিক ছিলাম। ১৫ ফেব্রুয়ারি যখন আমরা দুজন ফিরে এলাম এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি উল্লিখিত দুর্ঘনাটা ঘটল, তখন দারুল মুসান্নিফীন-এর সেমিনারের মাত্র চারদিন বাকি ছিল। এর দুদিন তো শোকপ্রকাশ করতে আসা লোকদের সঙ্গে সাক্ষাত দিতে এবং নিজের হুঁশ-জ্ঞান স্বাভাবিক করতে চলে গেল।

সেমিনারের মাত্র দুদিন আগে আমি প্রয়োজন অনুভব করলাম, এর জন্য কিছু তো লেখা দরকার। তার কতগুলো কারণ ছিল। একটি কারণ হলো, এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভায় – যেটি ভারতের এমন একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, যার সঙ্গে আমার দায়িত্বশীল পর্যায়ের সম্পর্ক

আছে। তা ছাড়া আরব থেকেও বেশ কজন বিজ্ঞ পণ্ডিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এই সেমিনারে যোগ দেবেন। প্রথমত তো এই সভায় যোগদানের সিদ্ধান্তই স্বয়ং বিরাট এক কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু কর্তব্যের অনুভূতি আর স্নেহাস্পদ সাইয়িদ মুহাম্মাদ রাবে' নদভীর সাহস দেখে – যে কিনা আমার মরহুম ভাগিনার ছোট ভাই এবং যার চোখের সামনে প্রিয় ভাইয়ের অসুস্থতা ও বিরহের সবকটি স্তর অতিক্রম করেছিল – আমিও সাহসী হয়ে উঠলাম।

তা ছাড়া দারুল মুসান্নিফীন-এর পরিচালক আমার শ্রদ্ধাভাজন সাইয়িদ সাবাহুদ্দীন আবদুর রহমান সাহেব এম.এ-এর নিঃসঙ্গতার কথা চিন্তা করে আমরা সেমিনারে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। মনে ভাবনা জাগল, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় খালিহাতে যাওয়া ঠিক হবে না। সেমতে এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আমি আমার চিন্তাধারাকে আরবিতে একটি নিবন্ধের রূপ দিতে শুরু করলাম। সময়ের স্বল্পতার কারণে আমি এমন সময়েও এই ধারাটি চালু রাখলাম, যে সময়ে বহু বছর যাবত লেখা ও লেখানোর কোনো নিয়ম ছিল না।[১] স্নেহাস্পদ মৌলভী নেছারুল হক নদভী আধারাত পর্যন্ত সজাগ থেকে পাণ্ডুলিপিটি কপি করে দেয় এবং এর ধারা দারুল মুসান্নিফীন পৌছা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

সেমিনারে আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি আরব পণ্ডিত ও হিন্দুস্তান-পাকিস্তানের আলেমে দ্বীন অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লামা ডক্টর ইউসুফ আল-কারজাবির সভাপতিত্বে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। আমার নিবন্ধটি মূলত আরবিতে ছিল। স্নেহাস্পদ সাইয়িদ সালমান হুসায়নী নদভী তার কিছু নির্বাচিত অংশ পড়ে শোনায়, যার দ্বারা নিবন্ধের প্রাণ ও তার কেন্দ্রীয় রেখাটি আরব স্কলারদের সামনে এসে পড়ে। আমি সভার উপস্থিতির কথা চিন্তা করে – যাদের বেশিরভাগই আরবি বুঝত না – 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য' বিষয়ের ওপর উরদুতে ভাষণ দিলাম। আরবি নিবন্ধটি পুস্তিকাকারে লাখনৌ ও বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তার উরদু তরজমা 'ইসলাম, পশ্চিমা পণ্ডিতবর্গ ও মুসলমান লেখকসমাজ' নামে এবং তার ইংরেজি অনুবাদ ISLAMIC STUDISE, ORIENTALISTS & MUNLIM NCHOLARS নামে মজলিসে তাহকীকাত ওয়া

---

১. বহু বছর যাবত আমার শুধু সকাল (নিয়মিত প্রয়োজনাদি ও মামুলাত থেকে অবসর হয়ে) ১২ থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত লেখালেখির কাজ করার নিয়ম চলে আসছে। আমার সমস্ত লিখনিসম্পদ এই সময়টিরই শ্রম ও উপার্জন।

নাশরিয়াতে ইসলাম-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই নিবন্ধে ইসলামের নৈতিক শিক্ষার অধীনে বৈধ ও প্রয়োজনের সীমানা পর্যন্ত পশ্চিমাদের বিদ্যাগত প্রচেষ্টাগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং এর পক্ষে সেই গ্রন্থগুলোর সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোতে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো আপত্তিকর বিষয় নেই। তারপর তাদের দুর্বলতাগুলোর অনুসন্ধান ও রাক্ষুসে স্বভাবের সমালোচনা করা হয়েছে এবং স্পর্শকাতর পশ্চিমা কর্মকৌশলের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সর্বোপরি পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যাপীঠগুলোর স্কলারদের লিখিত গ্রন্থগুলোর ওপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত নির্ভরতার বিপদ ও ফলাফলের বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বিভিন্ন ইসলামি বিষয়ের ওপর মুসলিম বিশ্বের প্রচেষ্টাগুলোর মোটামুটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে আরব ও মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমাদের ভাষায় গবেষণা ও শিক্ষামূলক কাজের অভাব ও এই ময়দানে হিন্দুস্তানের স্বাতন্ত্র প্রমাণিত করা হয়েছে। সম্ভবত এ-ই প্রথমবার একটি নিবন্ধে হিন্দুস্তানের আলেমসমাজ ও গবেষণামূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকদের বিদ্যাগত কর্মকাণ্ডের ওপর এত বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো এবং আলোচনা ও গবেষণার ময়দানে সনাতন ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে জ্ঞানার্জনকরা লোকদের আপন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সঙ্গে সখ্য, তার জন্য কঠোর শ্রম এবং এই অধ্যায়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে সপ্রমাণিত করা হয়েছে।

তারপর আরব বিশ্বে লেখালেখি ও আলোচনা-গবেষণার কাজের পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছে। অবশেষে বলা হয়েছে, বর্তমান যুগের জিহাদ ও অনিবার্য কর্তব্য হলো এই মানসিক ও সংস্কৃতিক অধার্মিকতার মোকাবেলা করা এবং সেই বিষের প্রতিশেধক প্রয়োগ করা, যেটা পশ্চিমাদের লেখনি কিংবা গবেষণা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে।

এই সেমিনারের আয়োজন ও অনুষ্ঠান দারুল মুসান্নিফীন-এর গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি সেবাগুলোর মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্য। একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে যেরূপ সাজানো-গোছানো পরিবেশে যেসব বিজ্ঞ আরব পণ্ডিতদের উপস্থিতিতে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং যেসব গবেষণামূলক ও চিন্তাজাগানিয়া নিবন্ধ পাঠ করা হয়েছে, তার জন্য দারুল মুসান্নিফীন-এ গর্ব

করার এবং এর তাওফীকদানের জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার অধিকার রাখে। আশা ছিল, (এবং তার কিছু লক্ষণ প্রকাশও পেয়েছিল) অপরাপর মুসলিম দেশগুলো ও তাদের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলো এর অনুসরণ করবে এবং প্রতিবছর এমন একটি সভা-সম্মেলনের আয়োজন করবে, যার দ্বারা গবেষণামূলক কাজে জড়িত লোকেরা বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করবেন।

তারা পশ্চিমাদের নতুন-নতুন গ্রন্থ ও তাদের উত্থাপিত প্রশ্নমালা ও আপত্তিজনক পয়েন্টগুলোর নোট নেবেন এবং এসব বিষয়ের ওপর গ্রন্থ রচনা ও নিবন্ধ লেখার শক্তিশালী প্রেরণা জাগ্রত হবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, এ ক্ষেত্রে মুসলিম ও আরব দেশগুলো এবং তাদের বিদ্যাগত কেন্দ্রগুলোতে যতখানি প্রতিযোগিতা ও উদ্দীপনার আশা ছিল, তা পূরণ হয়নি এবং একটি বছর কোনো কাজ ব্যতিরেকেই কেটে গেল।

আলজেরিয়ার সেমিনার

আলজেরিয়ায় কয়েক বছর যাবত কোনো-না-কোনো একটি ইসলামি বিষয়ের ওপর সরকারের ধর্মবিষয়ক বিভাগের পক্ষ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কয়েক বছর যাবত আমাকেও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছিল। কিন্তু প্রতিবারই কোনো-না-কোনো একটা প্রতিবন্ধক সামনে এসে দাঁড়াত। ১৪০২ হিজরির (১৯৮১ খ্রি.) সেমিনারের জন্য আমাকে ওখানকার ধর্মমন্ত্রী শায়খ আবদুর রহমান শায়বান-এর পক্ষ থেকে আমি আমন্ত্রণ পেলাম। তাতে অংশগ্রহণের জন্য ব্যক্তিগতভাবেও তিনি আমাকে জোরালে আবেদন জানালেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি ও সেমিনারের ব্যবস্থাপক শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব হাম্মূদাহ পত্র ও তারবার্তা আসতে থাকে।

আলজেরিয়া পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তহওয়া একটি দেশ। এই দেশ স্বাধীনতার সবচেয়ে উচ্চ মূল্য পরিশোধ করেছিল, যেমনটি সে সময় পর্যন্ত কোনো ইসলামি কিংবা প্রাচ্য রাষ্ট্র পরিশোধ করেনি।[১]

---

১. এই কুরবানি পাঁচ লাখ শহীদের আদলে ওখানকার মুসলমানরা পেশ করেছিল। এর বিনিময়ে তারা দেশটিকে ফ্রান্সের কজা থেকে মুক্ত করেছিল।

আলজেরিয়ার শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন শায়খ আবদুল হামীদ ইবনে বাদিস এবং তাঁর ছাত্র ও অনুসারী শায়খ মুহাম্মাদ বশীর আল-ইবরাহীমি প্রমুখ এই মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই আন্দোলন ও চেতনা তাঁরই কুরআন-হাদীছের দরস থেকে জন্মলাভ করেছিল। এভাবে আলজেরিয়া ও হিন্দুস্তানের মাঝে বিশেষ একটি মিল পাওয়া যায় যে, উভয় জায়গারই আলেমগণ আপন সচেতনতা, দখলদার শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, সময়ের দাবি পূরণ ও দৃঢ়তার প্রমাণ দিয়েছেন। খানিক এ কারণেও আমার মনে আলজেরিয়াভ্রমণের আগ্রহ ছিল যে, আমাকে সেই মাটির রং ও স্বাদ দেখতে হবে, যে কিনা লাখো শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে এবং যার আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সন্তানরা ফ্রান্সের মতো বিশ্বশক্তিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল।

এ বছরকার এই সেমিনার ছিল ষোলোতম বার্ষিক সভা, যার নাম ছিল 'মুলতাকাল ফিকরিল ইসলামী' (ইসলামি চিন্তার মোহনা)। এটি ১৪০২ হিজরির শাওয়াল মাসে শুরু হয়ে ১৩ তারিখে শেষ হয়। চাঁদ দেখার ব্যবধানের কারণে পশ্চিমা দেশগুলোতে ঈদ কখনও হিন্দুস্তানের একদিন আগে, আবার কখনওবা দুদিন আগে অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। সে কারণে আমার ঈদের অব্যবহিত পরই রওনা হওয়া জরুরি ছিল, যা কিনা একাধিক মেহমান থাকায় এবং শিক্ষাবর্ষের শুরুর দিককার ব্যবস্থাপনার কারণে কঠিন ছিল। আমি পত্র লিখে আয়োজকদের জানিয়ে রাখলাম, হতে পারে, আমি দুদিন পরে পৌঁছব। তাঁরা মেনে নিলেন। সেমিনারে আমি সেই নিবন্ধটি পাঠ করার অনুমতি চাইলাম, যেটি এই অল্প কদিন আগে 'তাবীআতু হাযাদ্দীনি ওয়া সিমাতুহুল বারিযাতু' (ইসলামের মেজাজ ও তার দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যাবলি) শিরোনামে তৈরি করা হয়েছিল এবং তাতে নবুওতের অবস্থান এবং হাদীছ ও সুন্নতের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করা হয়েছিল। সেমিনারের দায়িত্বশীলগণ অনুমতি দিলেন যে, ঠিক আছে; আপনি এই নিবন্ধটিই পাঠ করুন। এই নিবন্ধটি আমি আমার গ্রন্থ 'আল-আকীদাতু ওয়াল ইবাদাতু ওয়াস সুলূক'-এ (যার উরদু অনুবাদ 'দস্তূরে হায়াত' নামে প্রকাশিত হয়েছে) সংযোজন করার জন্য লিখেছিলাম।[১]

---

১. এই গ্রন্থটি একজন মুসলমানের জীবনের কর্মনীতি ও দিকনির্দেশনা হিসেবে রচনা করা হয়েছে, যাতে আকিদা, ইবাদাত, আখলাক ও আদাব ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বনবীর

আমি চাচ্ছিলাম, এই গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধটি আরব বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সেই চিন্তাবিদ, দ্বীনের প্রচারক ও স্কলারদের সামনে উপস্থাপন করব, যাঁরা এই সেমিনারে যোগদান করবেন বলে আশা ছিল এবং যাঁদেরকে সহজে এক জায়গায় একত্রে পাওয়া যায় না। এই নিবন্ধে দ্বীনের সঠিক প্রাণ ও তার নববী মেজাজ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তার প্রথম ভিত্তিটি রচিত হয়েছে বিশ্বাসের বিশুদ্ধতার ওপর এবং তাতে কর্ম ও প্রচেষ্টার আসল প্রেরণা আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষণ ও পরকালের ভাবনা। এই নিবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, এই যে ধর্মটি আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, এটি বুদ্ধিজীবি, আইনবিদ, চরিত্র ও মনস্তত্ত্ববিদ, রাষ্ট্রের স্থপতি, রাজনীতি, দেশ ও জাতির নেতাদের মাধ্যমে পৌঁছেনি। এই দ্বীন আমাদের কাছে এসেছে নবীগণের মাধ্যমে, যাঁদের কাছে আল্লাহর অহী আসত, যাঁদের ধারা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে শেষ হয়েছে এবং একে বোঝা, বোঝানো, এর প্রচার এবং এর জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টার কাজে মৌলিকভাবে নবুওতের শিক্ষা ও নবীগণের মেজাজ-চরিত্রের অনুসরণ করতে হবে।

ঈদ থেকে অবসর হয়ে ২৮ জুলাই ১৯৮২ স্নেহাস্পদ মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে' নদভীকে সঙ্গে করে – যিনি আলাদাভাবে আমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলেন এবং তিনিও 'লামাহাতুন শুউরিয়্যাতুন ওয়া নাফসিয়্যাতুন ফী কালামির রাসূলি' (নবীজির বক্তব্যে মানবীয় অনুভূতি ও মনস্তত্ত্বের প্রতি যত্ন ও দীক্ষার হৃদয়গ্রাহী আদর্শ) শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন।

দিল্লি থেকে রওনা হয়ে আমরা ২৯ জুলাই আলজেরিয়া গিয়ে পৌঁছলাম। এই সেমিনার প্রতিবছর দেশের কোনো একটি কেন্দ্রীয় শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর পালা ছিল তিলমেসানের, যেটি রাজধানী আলজেরিয়া থেকে প্রায় ৩৫০ মাইল দূরে। আমরা যেহেতু দুদিন পরে পৌঁছেছিলাম এবং দেশের আমলারা সবাই তেলমেসানে ছিলেন, তাই আমাদের রিসিভ করে নেওয়ার তো কোনো লোক আলজেরিয়ার বিমানবন্দরে থাকার কথা ছিল না। সেজন্য আমাদেরকে অনেক সমস্যায় পড়তে হলো। এসেছি আমরা দীর্ঘ সফর করে

শিক্ষা ও আদর্শ উপস্থাপন করা হয়েছে। ঠিক সেই প্রয়োজনের চিন্তা মাথায় নিয়ে, যে প্রয়োজনে আপন-আপন যুগে 'যাদুল মা'আদ' সাফরুস সা'আদাহ' ও 'মালা বুদ্দা মিনহু' লেখা হয়েছিল।

এবং দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছার তাগাদা ছিল। ঠিক এমনি কঠিন মুহূর্তে তাবলীগ জামাতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন এমন একব্যক্তি (যিনি হেজায সফর থেকে ফিরে আসা পিতাকে নিতে এসেছেন। কিন্তু তার পিতাজি তখনও এসে পৌঁছাননি) ফেরেশতা হয়ে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তারই গাড়িতে করে আমাদেরকে শহরের তাবলীগি মারকাযে পৌঁছিয়ে দিলেন। আমাদের ওখানকার বন্ধুরা দেশের ধর্মমন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আমাদের আগমনের সংবাদ প্রদান করেন। মন্ত্রণালয় সঙ্গে-সঙ্গে লোক পাঠিয়ে দিল। তারা এসে আমাদেরকে শহরের বড় একটা হোটেলে নিয়ে তুলল এবং শায়খ আবদুর রহমান শায়বানকে – যিনি তাঁর সব কজন আমলাসহ তেলমেসানে ছিলেন – আমাদের আগমনের সংবাদ জানালেন। তিনি আমাদেরকে সফর সম্পর্কে নানা নির্দেশনা দিলেন।

পরদিন শুক্রবার সকালে আমরা বিমানযোগে তিলমেসান গিয়ে পৌঁছলাম। ধর্মমন্ত্রণালয় ও আলমুলতাকার প্রতিনিধিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাদের নিয়ে গেলেন এবং অতিথিদের সঙ্গে হোটেলে রাখলেন। ওখানে পৌঁছে আমরা জানতে পারলাম, প্রায় সব কটি আরব দেশ থেকে বহুসংখক শীর্ষস্থানীয় আলেম, শিক্ষক ও চিন্তাবিদ এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। ব্যাপকতা ও উঁচ্চ প্রতিনিধিত্বের দিক থেকে কম সেমিনারই আল-মুলতাকাল ফিকরীর এই সেমিনারের মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে। আমার পুরাতন বন্ধুবর্গ, আরব স্কলার ও ইসলামি দাওয়াতের কর্মীবৃন্দ বিপুল সংখ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং অনেক বছরের বিরহের পর সকলের সঙ্গে সকলের সাক্ষাত হলো।

আমি যখন আল-মুলতাকার সম্মেলনে অংশগ্রহণ করলাম, তখন জানতে পারলাম, রাবেতার বিগত সংস্কৃতিবিষয়ক সেমিনারে আমি دور الحديث في تكوين المناخ الاسلامي وصيانته শিরোনামে যে নিবন্ধটি পাঠ করেছিলাম, সেটি পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে বিতরণ করা হয়েছে। এক বৈঠকে আমি ও স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ রাবে' নদভী আপন-আপন নিবন্ধ পড়ে শোনালাম। আমাকে একটি কমিটির সভাপতির দায়িত্বও পালন করতে হলো।

আমরা যখন সম্মেলন থেকে বাইরে বের হতাম, তখন শহরের যুবক ছাত্র ও ছেলেরা আমাদের ঘিরে ধরত। তাদের কাছে রেকর্ডার থাকত। এতটুকু সময়ে যেকটি প্রশ্ন করা সম্ভব হতো, তারা করত এবং আমাদের উত্তর রেকর্ড

করে নিত। তারপর আয়োজকগণ আমাদেরকে কারযোগে হোটেলে পৌঁছিয়ে দিত। আমরা অনুভব করলাম, সবগুলো আরব সরকারের মতো এখানেও জনসাধারণ ও উজ্জীবিত তরুণ-যুবকদের আমাদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মিলিত হওয়াকে ভালো চোখে দেখা হচ্ছে না। আর বুঝতে পারলাম, আমার আরবি রচনা ও দাওয়াতি গ্রন্থগুলো এদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। একটি তথ্য পেয়ে আমি আনন্দের সঙ্গে বিস্মিতও হলাম যে, আমার الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية (মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব) বইটি বিশেষ মনোযোগের সাথে পড়া হয়েছে, যেখানে আমি খোদ আলজেরিয়ার বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে সমালোচনা করেছি। অনেক কলেজের দায়িত্বশীলগণ ছাত্রদের গড়পড়তা আমার সবগুলো বই পড়ার পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে থাকেন।

আমি যেহেতু দীর্ঘ দিনের পীড়াপীড়ি ও প্রবল আগ্রহ দেখানোর পর আলজেরিয়া গিয়েছিলাম, তাই ধর্মমন্ত্রণালয় এবং তার সুযোগ্য ও ধর্মপরায়ণ দায়িত্বশীল শায়খ আবদুর রহমান শায়বান আমার আগমনকে অনেক গুরুত্ব দিলেন এবং আমার সঙ্গে বিশেষ ধরনের আচরণ করতেন। সেমিনার থেকে অবসর গ্রহণের পর তেলমেসানের গভর্নর অতিথিদের আমন্ত্রণ জানালেন। এই জায়গাটি রাবাত ও মরোক্কোর খুব কাছাকাছি ছিল। গোটা দেশটাই যারপরনাই সুন্দর, সভ্য ও উন্নত। দেশের অধিবাসীদের মাঝে, বিশেষ করে তরুণ-যুবকদের মাঝে দ্বীনি চেতনার উপস্থিতি বিদ্যমান, যাকে অনেক সাবধানতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়। আমরা তেলমেসানের পুরাতন স্মৃতিচিহ্ন ও ঐতিহাসিক স্থানগুলোও ভ্রমণ করলাম। ওখান থেকে আমরা আলজেরিয়া এলাম, যেখানে দুদিন অবস্থান করে প্যারিসের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ওখান থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ধরলাম এবং ৮ আগস্ট নিরাপদে হিন্দুস্তান ফিরে এলাম।

তার পরের বছর ১৪০৩ হিজরিতে الاجتهاد ونشأة المذاهب الفقهية শিরোনামে সতেরোতম সেমিনার ছিল। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামিক সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে (যার আলোচনা সামনে আসছে) অংশগ্রহণ করতে হবে বলে – যাকে আমি বেশি জরুরি মনে করলাম – মুলতাকার দায়িত্বশীলদের পীড়াপীড়ি ও তাগাদা সত্ত্বেও তাতে অংশগ্রহণ করতে পারলাম না। এই সম্মেলনে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলূম হাদীছ ও তাফসীরের শিক্ষক

মাওলানা বুরহানুদ্দীন সাহেব সম্ভলী অংশগ্রহণ করেন। আমি এই সেমিনারে পড়ার জন্য যে নিবন্ধটি প্রস্তুত করে রেখেছিলাম, সেটি পাঠিয়ে দিলাম। সেটি সেমিনারে পড়ে শোনানো হলো এবং ছাপিয়ে বিতরণ করা হলো। এই নিবন্ধে আমি তাকলীদ ও ইজতিহাদের ব্যাপারে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর মধ্যপন্থার নীতি উপস্থাপন করেছি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীলঙ্কা সফর, হায়দারাবাদের ভাষণাবলি, বৈরুত ট্রাজেডি, আফগান জিহাদ বিষয়ে ভাষণ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ইসলামিক সেন্টারের উদ্বোধন ও 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য' শিরোনামের নিবন্ধ

শ্রীলঙ্কা সফর

১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো এক তারিখে আমার নামে রাবেতা আলমে ইসলামীর মহাসচিব শায়খ মুহাম্মাদ আলী আল-হারকান-এর পত্র এল যে, সিলুনে নাযীমিয়া ইউনিভার্সিটি নামে বড় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। তার প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব মুহাম্মাদ নাযীম ও তার ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর মুহাম্মাদ শুকরি চাচ্ছেন, আপনি ওখানে আগমন করুন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার বেশ কটি গ্রন্থ সিলেবাসভুক্ত। আমিও সুপারিশ করছি, আপনি এসে পড়ুন এবং বক্তব্য দিয়ে ওখানকার লোকদের ধন্য করুন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীলগণ এতটুকুতেই ক্ষান্ত হননি; বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী পরিচালক মাওলানা শহীদুল্লাহ সাহেবকে লাখনৌ পাঠিয়ে দিলেন, যেন তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ওখানকার বার্তা ও আমন্ত্রণপত্র পৌছান এবং আমার শ্রীলঙ্কা যাওয়ার তারিখ স্থির হয়ে যায়।

এই জোরালো দাওয়াতের জবাবে আমি ওখানকার সফরের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। প্রথমে স্থির হলো, সফর হবে মার্চ মাসে এবং সফরসঙ্গী হবে স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ রাবে' নদভী। কিন্তু পরে মার্চের পরিবর্তে মে মাস ঠিক করা হলো। কারণ, মে মাসের ১১ তারিখে জামেয়ার সনদবিতরণ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হওয়ার এবং জামেয়া থেকে শিক্ষা সমাপনকারীদের সনদ প্রদানের কথা ছিল। তাছাড়া কয়েকটি কারণে মুহাম্মাদ রাবে' নদভী এই সফরে আমার সঙ্গী হতে পারেনি। তার স্থলে স্নেহাস্পদ সাইয়িদ সালমান নদভী এই সফরে আমার সাথী হলো।

৭ মে আমরা দিল্লি হয়ে লাখনৌ থেকে রওনা হলাম। ৯ তারিখে সুইস এয়ারলাইনে বোম্বাই থেকে সরাসরি কলম্বোর উদ্দেশ্যে উড়াল দিলাম। এটি ছিল আমার প্রথম শ্রীলঙ্কা সফর। সে কারণে দেশ ও ওখানকার লোকদের সম্পর্কে আমার মাথায় স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। ছোট কাল থেকেই শুনে আসছিলাম (এবং অনেক আরব পণ্ডিত লিখেছেনও) যে, হযরত আদম (আ.) যখন জান্নাত থেকে বের হন, তখন এখানে অবতরণ করেছিলেন। আজও এখানে তাঁর নামে 'আদম পেক' বা 'আদম পাহাড়' প্রসিদ্ধ আছে, যেখানে তার পদাঙ্কও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কবি হালী মরহুমের এই পঙ্‌ক্তিগুলো আমি শৈশবেই পড়েছিলাম—

سر کوہ آدم سے تا کوہ بیضا
جہاں جاؤ گے پاؤ گے کھوج ان کا

'আদম পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু করে বয়জা পর্বত পর্যন্ত যেখানেই যাবে, তুমি তাঁর সন্ধান পাবে।'

আমাদের মনে হচ্ছিল, যেন আমরা কোনো একটি সুড়ঙ্গপথে চলছি, যার আশপাশ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু উরদুর এই কবিতাটির মর্ম বারবারই আমার উপলব্ধিতে আসছিল—

سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے
ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے

'ভ্রমণপথে পথচারীর জন্য ভালো অতিথিপরায়ণ মেজবান আবশ্যক। এ এমন এক পথ, যেখানে হাজার-হাজার ছায়াদার গাছ বিদ্যমান।'

এই দেশটি খুবই সবুজ-শ্যামল। এখানকার অধিবাসীরা (বিশেষ করে আমাদের মেজবান) ছিলেন বেশ অতিথিপরায়ণ ও উদার। কলম্বো এয়ারপোর্টে ইউনিভার্সিটির একজন দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন। ওখান থেকে তিনি আমাকে জামেয়া আলহাজ্ব মুহাম্মাদ নাযীম সাহেবের বাংলোয় নিয়ে গেলেন। ওখানে কিছু সময় অবস্থান করে আমরা বিরুওয়ালার মহল্লার দিকে রওনা হলাম, যার অবস্থান কলম্বো থেকে ৩৪ মাইল দূরে ভারত সাগরের পূর্বতীরে।

আলহাজ্ব মুহম্মাদ নাযীম মূল্যবান পাথরের একজন ব্যতিক্রমী ও সফল ব্যবসায়ী। তিনি আপন পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা অনেক উন্নতি লাভ করেছেন

এবং শ্রীলঙ্কার শীর্ষ ধনাঢ্য মুসলমানদের একজন। বলতে গেলে তিনি একজন নিরক্ষর ও পশ্চিমা ভাষাগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি জামেয়ার গোড়াপত্তন করেন এবং একাই তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। ডক্টর মুহাম্মাদ শুকরি সাহেবের কাছে জানতে পারলাম, এ ধারার ওপর এই জামেয়ার প্রতিষ্ঠার ধারণাটি এসেছে আমার পুস্তিকা لہا بکر ابا ۷و, ةء, ر থেকে। তার মস্তিষ্ক তার প্রাণ ও তার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুকে পুরোপুরি গ্রহণ করে নিয়েছে, যার সারমর্ম হলো, মুসলিম বিশ্বের বর্তমানকার আসল সমস্যাটা হলো সেই মানসিক ও সভ্যতাগত এরতেদাদ, যেটি শিক্ষিত শ্রেণীর মাঝে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা বিশ্বাসগত এরতেদাদের সীমানাকে স্পর্শ করছে। কিন্তু মুসলিম সমাজ তাতে এক বিন্দুও বিচলিত হচ্ছে না। তার মোকাবেলার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন এমন একটি শিক্ষিত প্রজন্মের দরকার, যারা ইসলামের মর্যাদা ও চিরন্তনতার ওপর হৃদয়ের গভীরতা এবং মানসিক ও বিদ্যাগত দৃঢ়তা ও প্রমাণাদির সঙ্গে বিশ্বাস লালন করবে এবং এই ফেতনার মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকবে। এই চিন্তাটি মাথায় নিয়েই আল্লাহর নামে এই জামেয়ার ভিত্তি রাখা হয়।

হাজী মুহাম্মাদ নাযীম সাহেব তার পুরোপুরি দায়িত্ব গ্রহণ করে নিয়েছেন। তিনি জামেয়ার কেন্দ্রীয় ভবন, একাধিক অফিস, ছাত্রহোস্টেল, শিক্ষকদের থাকার স্বতন্ত্র ভবন, একটি সুপরিসর ও সুদৃশ্য হল, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য কোয়ার্টার, বেশ বড়সড় ও মনোরম একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এই সফরে তিনি আমার দ্বারা জামেয়ার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করান। এসব ভবন ও বিভাগগুলোর পেছনে হাজী নাযীম সাহেব এ যাবত পঞ্চাশ রাখ রুপি নিজের পকেট থেকে ব্যয় করে ফেলেছেন।

একটি ঘটনা দ্বারা হাজী সাহেবের নিষ্ঠা ও আল্লাহভীতির অনুমান করা যায় যে, তিনি নিজের থাকার জন্য বিরুওয়ালায় একটি ঝাঁকজমকপূর্ণ বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন, যার পেছনে তার বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছিল। কিন্তু তার মনে ভাবনা জাগল, নিজের জন্য এই বাড়িটা নির্মাণ করতে গিয়ে অনেক অপচয় করেছি; এর একটি প্রতিকার দরকার। ফলে এর প্রতিকারস্বরূপ তিনি দশটা বাড়ি নির্মাণ করে গরিব-অসহায়দের দান করে দিয়েছেন। আরও জানতে পেরেছি, তিনি মেডিসিন ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রদের দুশো করে ভাতা প্রদান করেন। সাবধানতার খাতিরে তিনি জামেয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করে

নিয়েছেন। কিন্তু নিজের কোনো ছেলেকে এই কমিটির স্থান দেননি, যাতে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় মর্যাদা লাভ করে এবং এটি কোনো পারিবারিক উত্তরাধিকারে পরিণত না হয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স এখন আট বছর। এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপমাপণকারী ছাত্রদের প্রথম দলটিকে এই সনদবিতরণ কনভেনশনে – যেখানে শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও যোগাযোগমন্ত্রী, বেশ কটি আরব ও মুসলিম দেশের রাষ্ট্রদূত ও মুসলিম নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন – আমার হাতে সনদ প্রদান করা হয়। আমাদের দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার প্রস্তুতকৃত কয়েকটি গ্রন্থ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর হলেন ডক্টর মুহাম্মাদ শুকরি, যিনি এডিনবারা ইউনিভার্সিটি থেকে ইমাম আবু তালিব মাক্কীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কূতুল কুলূব'-এর ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। আরবি, ইংরেজি ও তামিল ভাষায় তাঁর সমান দক্ষতা আছে। তিনি তামিল ভাষায় আমার পুস্তিকা ردة ولا ابا بكر لها এর অনুবাদ করেছেন এবং বর্তমানে ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين এর অনুবাদ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তাঁর সহকারী হলেন মাওলানা শহীদুল্লাহ সাহেব, যার বাড়ি বাংলাদেশে। তিনি উরদু, ইংরেজি ও আরবি ভাষায় পুরোপুরি দক্ষতা রাখেন। এখানকার বেশ কজন শিক্ষক জামেয়া আযহার ও সৌদি আরব থেকে প্রেরিত।

সনদবিতরণ সম্মেলনে (যেখানে আমি আরবিতে ভাষণ দিয়েছি) আমি বলেছি, এটি সেই দেশ, যার সম্পর্কে একটি ঐতিহ্যবাহী ধারণা ব্যাপকাকারে প্রচারিত আছে যে, (বর্ণনাটির শাস্ত্রগত বিশুদ্ধতার দায়িত্ব বহন না করে) আমাদের ও মানববংশের প্রধানপুরুষ হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে এখানে অবতরণ করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে লোকসকল! তোমাদের রবও একজন, তোমাদের পূর্বপুরুষও একজন। অর্থাৎ– দুটি সূত্রে তোমরা একজন অপরজনের ভাই। বান্দার সূত্রেও, বংশের সূত্রেও।

এই সত্যতা, বাস্তবতা ও এই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই ঘোষণা, যেটি মানবীয় ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে সুদৃঢ় ভিত্তি ও মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দফা। অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো যদি একবার ঘোষণা করে, তাহলে হযরত আদম (আ.)-এর

অবতরণস্থল হওয়ার কারণে দশবার ঘোষণা দেওয়া উচিত। তারা যদি আস্তে করে ও সাবধানতার সঙ্গে বলে, তাহলে আপনাদের ঢাক পিটিয়ে জোরে-শোরে বলা দরকার এবং আপনাদেরকে এর প্রচারকের দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য।

এই অনুষ্ঠান ছাড়া – যার জন্য আমি এই সফরে গিয়েছিলাম – শিক্ষক, ছাত্র ও আমলাদের সম্মুখে স্বতন্ত্র বয়ান করেছি। একটি বয়ান করেছি কলম্বোতে কুল্লিয়াতুয যাহিরায়, একটি তাবলীগি জামাতের মারকাযে, একটি কলম্বোর জমিয়াতুল উলামার সদস্যদের সামনে। এভাবে আমি মোট আটটি ভাষণ দিয়েছি। ওখানকার ছাত্র ও শিক্ষকসমাজ আমার স্নেহাস্পদ সাইয়িদ সালমানের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে যায় এবং বারবারই তিনি আরবিতে ভাষণ দান করেন। এই ভাষণগুলোতে তিনি তাদের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শ প্রদান করেন এবং নৈতিক ও ধর্মীয় দিকগুলোর প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

এই অঞ্চলটির কাছাকাছি একটি জায়গা আছে বানতুতা। কোনো-কোনো ঐতিহাসিকের ধারণা, এটি ইবনে বতুতার নামে পরিচিত। ইবনে বতুতা তার বিখ্যাত বিশ্বভ্রমণে এখানেও এসেছিলেন। আবু যায়েদ সায়রাফি ও সুলায়মান বণিকের আগমনও প্রমাণিত। বিরুলা থেকে তার দূরত্ব একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার। সমুদ্রতল থেকে তার উচ্চতা ৭০০০ ফুট। ওখানে হযরত আদম (আ.)-এর পদচিহ্ন ছিল বলে দাবি করা হচ্ছে, যার পরিধি সাধারণ মানবপদের হিসেবে পাঁচ পা লম্বা।[১]

কোনো একসময় সিলুন ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মাঝে ভালো সম্পর্ক ছিল। মোট বসতি এক কোটি চল্লিশ লাখ। মুসলমানের হার ৭ শতাংশ। মোট সংখ্যা ১২ লাখ। অধিবাসীরা দৈহিক আকার-গঠন, রং ও জাতীয়তায় দক্ষিণ ভারত, কেরালা ও মাদ্রাজের অধিবাসীদের সঙ্গে মিল খায়। মাটিও ঠিক এই অঞ্চলগুলোর মাটির মতো। শত-শত মাইলজুড়ে সারি-সারি নারিকেল গাছ চোখে পড়ে। মুসলমানদের সঙ্গে সরকারের আচরণ (আমার জানামতে) সে

১. হযরত আদম (আ.)-এর অবতরণ ও তাঁর স্মৃতিচিহ্ন পাওয়ার ব্যাপারে বিশুদ্ধ হাদীছে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে অনেক মুসলমান ঐতিহাসিক ও লেখক বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

সময় খারাপ ছিল না। জুমার দিন এক ঘন্টা সময়ের জন্য সমস্ত অফিস ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিদিন দেড় ঘন্টা রেডিওতে মুসলানদের পছন্দের বিষয় প্রচারের জন্য নির্ধারিত। ঈদ ও রমযানে আরও বেশি সময় দেওয়া হয়। কেবিনেটে দুজন মুসলমান মন্ত্রী আছেন। একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, যার নাম শাহ আল-হামীদ। অপরজন আমার সুহৃদ ও রাবেতার পুরাতন সদস্য মুহাম্মাদ হানীফা মুহাম্মাদ, যিনি তিনটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন। মূল নাগরিকদের ভাষা সিংঘালি। তাদের বেশিরভাগই বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। কিন্তু দক্ষিণ ভারত থেকে আসা লোকদের ভাষা তামিল। সে সময় পর্যন্ত ওখানে সেই ভাষাগত দাঙ্গার কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না, যা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং যা সে সময়কার সবচেয়ে বড় সমস্যা ও পত্র-পত্রিকার প্রধান শিরোনামে পরিণত হয়েছিল।

বৈরুত ও আফগানিস্তানের ব্যাপারে আমার আত্মিক অনুভূতি ও চেতনার বহিঃপ্রকাশ

১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বৈরুতের সেই দুর্যোগময় ঘটনাটা সংঘটিত হয় এবং ফিলিস্তিনি ও লেবাননি মুসলমানদের ভেড়া-বকরির মতো এমনভাবে হত্যা করা হয় যে, তার দৃষ্টান্ত কাছাকাছি অঞ্চল ও নিকট অতীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। মুসলিম বিশ্বের দায়িত্ব ও প্রভাবহীনতা, প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর অসহায়ত্ব ও অনুভূতিহীনতা এবং বৃহৎ শক্তিগুলোর নীরবতা দেখে অন্তরটা চুরচুর হয়ে গিয়েছিল। আরব বিশ্বকে কাছে থেকে দেখার এবং ফিলিস্তিন সমস্যা সম্পর্কে তাদের উদাসীনতা; বরং অপরাধমূলক আচরণ সম্পর্কে অবহিত ছিলাম বিধায় এই অভিজ্ঞতা আমার জন্য নতুন কিছু ছিল না।

১৯৭৩ সালে রাবেতার একটি প্রতিনিধিদল ছটি মুসলিম দেশ সফর করেছিল। আমি সেই দলের একজন সদস্য ছিলাম। এই সুবাদে আমাকে কয়েকটা দিন বৈরুতে থাকতে হয়েছিল। সে সময় আমি বৈরুত সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া ও আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছিলাম। সেই রচনাটিতে আমি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলাম—

'ফিলিস্তিনে তার ভবিষ্যতের দিক থেকে হতাশা, অনাস্থা ও বর্তমান পরিস্থিতি মেনে নেওয়ার মতো নয়। এই বিষয়গুলো শুধু এই দেশটির জন্যই

নয় – গোটা আরব দুনিয়ার জন্য একটি চ্যালেঞ্জেরে মর্যাদা রাখে। এমন পরিস্থিতি সব সময় অব্যাহত থাকতে পারে না; চাই তার অবসানে যতই সময়ের প্রয়োজন হোক এবং তার ওপর আবরণ ফেলার জন্য যত রকমই চেষ্টা করা হোক। বিপরীতে অন্য সবগুলো দেশ জীবনের যতসব নেয়ামত ও বিলাসিতা উপভোগ করছে এবং সর্বত্র বিত্তের প্রাচুর্য বিরাজ করছে।'[১]

এ ক্ষেত্রে এই শব্দগুলোও বেরিয়ে এসেছিল, 'ভবনগুলোর দেওয়ালের গায়ের গুলি-বোমার দাগ আর মানুষগুলোর হৃদয়ে তার ক্ষত দেখুন। শরণার্থী ও ফিলিস্তিনিদের সমস্যা এতটাই জটিলতা, গোলমেলে অবস্থা ও পরস্পর বিরোধিতার শিকার যে, তার নজির জগতের আর কোনো সমস্যার বেলায় পাওয়া দুষ্কর।'

বৈরুতের এসব ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মিডিয়ার জন্য এ বিষয়ে আমি আরবি, উরদু ও ইংরেজিতে একটি বিবৃতি প্রস্তুত করি। তাতে আমি ইসরাইলের হিংস্র ও নির্মম আচরণ, ফিলিস্তিনি শরণার্থী ও মুক্তিকামী মুজাহিদদের জোরপূর্বক বিতাড়ন, লেবাননের মারুনি খ্রিস্টান ও ফ্লানজিস্টদের হাতে ফিলিস্তিনিদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের ওপর আমার গভীর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সাধারণত মুসলিম উম্মাহর প্রতিজন সদস্যের এবং বিশেষত ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব ব্যক্ত করেছি। এই বিবৃতিতের আমি সাফ-সাফ বলেছি–

'এ সময়েও সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের মাঝে সেই রক্তলোলুপতা বিদ্যমান, যাকে আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগের যুগে অজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য ও মানুষখেকো জাতি ও গোত্রগুলোর ঐতিহ্য মনে করা হতো। এই গণহত্যা প্রমাণ করে দিয়েছে, ধর্মীয় বিদ্বেষ ও গোঁড়ামি খ্রিস্টান জগতে ঠিক সেভাবেই জীবিত আছে, যেভাবে দ্বাদশ শতাব্দিতে ইউরোপের ক্রুসেডারদের বুকে ঢেউ খেলছিল। সেই সঙ্গে এই বাস্তবতাটিও দ্বি-প্রহরের সূর্যের মতো উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শুধু মানবীয় বিবেক, নৈতিক অনুভূতি, সুবিচার ও যুক্তিপ্রিয় গোষ্ঠীগুলোর; বরং নানা দেশের সরকারগুলোর নিন্দা-তিরস্কার, জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিবাদ ও তার প্রস্তাবাবলি খড়কুটোর সমানও মর্যাদা রাখে না এবং এখনও পর্যন্ত এই সভ্য দুনিয়ায়

---

১. দরিয়ায়ে কাবুল ছে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক : পৃষ্ঠা ১৩৪

বনের আইন Might Is Right (জোর যার মুল্লুক তার) চালু আছে। তারপর আমি এসব এই পরিস্থিতির অবসানে সেসব ব্যবস্থা ও কর্মনীতির কথা উল্লেখ করেছি, কুরআন ও আসমানি শরীয়ত যার শিক্ষা দিচ্ছে এবং ইসলামি; বরং মানবীয় ইতিহাস তার সফলতার অনেক প্রমাণ ও স্বাক্ষ্য উপস্থাপন করছে।

আরব বিশ্ব ও ইসলামি প্রচারমাধ্যমগুলো আমার এই বিবৃতি ফলাও করে প্রচার করে। পরে আরবি, উরদু ও ইংরেজিতে পুস্তিকাকারেও প্রচারিত হয়। আমার এক সুহৃদ কাজী আফজাল বিয়াবানি – যিনি শিকাগোতে মদীনা প্রেসের মালিক ও ইসলামি গ্রন্থাদির প্রকাশক – আমার এই বিবৃতিটি ১৯৮২ সালের ১৬ নভেম্বর নিজের একটি পত্রসহ মার্কিন প্রেসিডেন্ট মি. রিগ্যানের কাছে প্রেরণ করেন এবং তার অফিস থেকে এর প্রাপ্তিস্বীকারপত্রও এসেছিল, যেটি তিনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

অনুরূপ ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি আরবিতে 'আফগান মুজাহিদদের সালাম' শিরোনামে আফগানিস্তানের সেই মুজাহিদগণের জন্য একটি সমর্থনমূলক প্রশংসাপত্র লিখেছিলাম, যাঁরা কম্যুনিস্ট আক্রমণ ও রাশিয়ার মতো দ্বিতীয় পরাশক্তির মোকাবেলা করে মুসলিম বিশ্বে একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, যার ফলে প্রতিটি দেশের সুস্থ চিন্তার মুসলমানগণ একটি নতুন সাহস ও চেতনা অনুভব করত, যেন তাঁরা বর্তমান যুগে ইসলাম মুসলমানদের লাজ রক্ষা করেছেন এবং প্রমাণ করে দিয়েছেন–

بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں

'বজ্রবৃষ্টির মাঝেও তারা আরামের ঘুম ঘুমাচ্ছে।'

আমার এই বিবৃতিতে কম্যুনিস্ট বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক দর্শনের স্বরূপ নিয়েও আলোকপাত করেছি এবং বলেছি, এই দর্শনের ক্রিয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক আঘাত বিশ্বাস ও আমলের সেসব মৌলিক ভিত্তি এবং নৈতিকতার সেসব মূলনীতির ওপরও গিয়ে পড়ে, যার ওপর সবগুলো আসমানি ধর্ম একমত এবং ইতিহাসের প্রতিটি যুগে যেগুলোর ওপর মানবীয় সমাজের ভিত রচিত হয়েছে এবং যেগুলো মানবীয় স্বভাব ও সুস্থ বিবেকের দাবি। কম্যুনিজম এসব মানবীয় মর্যাদার ভিত্তিগুলোকে গুড়িয়ে দিয়ে তার ধ্বংসাবশেষের ওপর পুরোপুরি একটা কৃত্রিম ও যান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ করতে চায়। এ এক

বেদনাদায়ক বাস্তবতা যে, মানবতার বিরুদ্ধে এই নেতিবাচক, অস্বাভাবিক, অপরাধমূলক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ষড়যন্ত্র এমন সফলতা অর্জন করল, ইতিহাসে যার কোনো নজির পাওয়া যায় না।

তারপর আমি আফগানিস্তানের মুজাহিদদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে বলেছি, আফগানিস্তানই একমাত্র দেশ, যেখানে বিদেশি বাহিনী ও রাজনৈতিক দস্যুদের বিরুদ্ধে নিজেরা সামরিক দিক থেকে অসম ও কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকল, অন্য কোনো মুসলিম দেশে যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এর রহস্য তাদের জাতীয় মর্যাদাবোধ, ধর্মীয় চেতনা, কঠোর মনোভাব ও সৈনিকসুলভ জীবনের মাঝে লুকায়িত।

এই বিবৃতিটি ১৯৮২ সালের নভেম্বরের শেষের দিকে জারি করা হয়েছিল এবং আরবি ও উরদুতে ব্যাপকভাবে প্রচার পেয়েছিল। এটি ছিল দূর দেশের একজন মুসলমানের দ্বীনি চেতনার বহিঃপ্রকাশ এবং সেই নৈতিক ও মৌলিক সমর্থন ও সহযোগিতা, যেটি ভারতের এমন একজন মুসলমান উপস্থাপন করে নিজের বিবেককে ভারমুক্ত ও অন্তরকে প্রশান্ত করেছিলেন, যার উপকরণ কম আর সমস্যা অনেক বেশি।

হায়দারাবাদের ভাষণসমূহ

১৯৮২ সালের ১১ থেকে ১৩ অক্টোবর হায়দারাবাদে বিদেশি ভাষা শিক্ষার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান Central Institute Of English And Forengn Languages এর পক্ষ থেকে আরবি ভাষা প্রশিক্ষণ ও তার সমস্যাদি বিষয়ের ওপর একটি অল ইন্ডিয়া সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রফেসর আবদুল হালীম নদভী আমাকে এই আলোচনা সভা উদ্বোধনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। আমি বিষয়ের সঙ্গে আমার আন্তরিকতা এবং সভার আহ্বায়কের সঙ্গে হৃদ্যতা আছে বলে আমন্ত্রণটি গ্রহণ করে নিলাম এবং সহকর্মীদের নিয়ে (যাদের মাঝে দিল্লির নেহেরু ইউনিভার্সিটির সহকারী প্রফেসর মৌলভী সাইয়িদ আবুবকর হাসানী, নদওয়াতুল উলামার সহকারী পরিচালক মৌলভী মুঈনুল্লাহ নদভী, আল-বা'ছুল ইসলামীর সম্পাদক মৌলভী সাঈদুর রহমান ও স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ রাবে নদভী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) অক্টোবরের ১০ তারিখে হায়দারাবাদ গিয়ে পৌঁছি এবং এখানে আমার পুরনো ঠিকানা বোম্বাই-অন্ধ্র ট্রান্সপোর্টের মালিক আবদুল্লাহ ভাই পাটানির কুঠি বানজারা হিলে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করি।

অক্টোবরের ১১ তারিখে অল ইন্ডিয়া এরাবিক সেমিনারের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, যার সভাপতিত্ব করেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন গভর্নর নবাব মীর আকবর আলী খান। আমি উরদুতে উদ্বোধনী ভাষণ দিলাম। এই ভাষণে আমি বলেছি, আরবি ভাষা আয়ত্ত করার এবং তাতে দক্ষতা অর্জন করার সবচেয়ে শক্তিশালী অনুপ্রেরণা হলো দ্বীনি, আত্মিক, নৈতিক ও মৌলিক। এরই ফলে অনারব জাতিগুলোর আরবি ভাষার ওপর দক্ষতা অর্জন ও তার সেবার সেসব বিস্ময়কর ফলাফল ও কীর্তিমালা জগতের সামনে এসেছে, যার দৃষ্টান্ত না শুধু সেই ভাষাগুলোর ব্যাপারে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, যেগুলোর অর্জন ও তাতে যোগ্যতা সৃষ্টি করার অনুপ্রেরণা ছিল নিছক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিদ্যাগত; বরং খোদ ভাষাভাষী আরবদের মাঝেও অনুসন্ধান করেও পাওয়া যায় না। এই প্রেরণাগুলো তাদের মাঝে বহুসংখ্যক অনারবের মতো অতটা শক্তিশালী ও গভীর ছিল না।

এ ক্ষেত্রে আমি ইরানি বংশোদ্ভূত আরব আলেম ও ভারতীয় আলেমগণের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি, যাঁদের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের নানামুখী সেবা, তাতে সূক্ষ্মদর্শিতা, সুউচ্চ সাহসিকতা এবং এর জন্য নিজেদের জীবনকে পুরোপুরি বিলীন করে দেওয়ার দৃষ্টান্ত খোদ আরব দেশগুলোতেও কয়েক শতাব্দি পর্যন্ত পাওয়া যায় না। এই অনুপ্রেরণা সেই প্রেম, চেতনা, জ্বলন ও বিদ্যুতক্রিয়া সৃষ্টি করে, যার জন্য ভাষাভাষীরাও মাথা ঠোকে এবং উন্মাতাল হয়ে যায়।

এই অনুষ্ঠান থেকে অবসর গ্রহণের পর হায়দারাবাদের বন্ধুরা – যাদের সঙ্গে আমার ধর্মীয় ও চিন্তানৈতিক সম্পর্ক আছে – অনেকগুলো সভার আয়োজন করে। এই সভাগুলো আমি অবলীলায় নিজের চিন্তাধারা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছি। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি, প্রশাসন ও সমাজের নৈতিক অধঃপতন ও দেউলিয়াত্ব, যা কিনা তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে; তাছাড়া ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর, যারা এই উপমহাদেশে আশার শেষ কিরণ ও মানবতার আশ্রয়স্থল এবং যাদের ওপর এক দিকে দ্বীনের দাঈ ও মানবতার সংরক্ষণের দায়িত্বের কারণে এবং অপরদিকে নিষ্কলঙ্ক ও অনুগত ভারতীয় হওয়ার সুবাদে দ্বিগুণ কর্তব্য বর্তায়, তাদের নির্লিপ্ততা হৃদয়কে এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে যে, যেখানেই ভালো ও সমঝদার শ্রোতা পাই, সেখানেই মন ও মস্তিষ্কের ভেতরটায় উত্তপ্ত ঝরনাধারা উপচানো শুরু করে।

এ তো ছিল হায়দারাবাদ, যেখানকার মুসলমানরা অন্য অনেক রাজ্যের মুসলমানদের থেকে ভিন্ন এবং তাদের মাঝে অনেকটাই আত্মবিশ্বাস, প্রাণবন্ততা ও পরিস্থিতির মোকাবেলা করার যোগ্যতা আছে। এ কারণে তাদের আরও বেশি স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক ছিল যে, তোমরা জাতির একটি দাঈ ও নেতৃস্থানীয় সদস্য এবং এই দাওয়তিসুলভ মর্যাদা ও নেতৃত্বসুলভ যোগ্যতার কারণে তোমরা না শুধু নিজেদের হারানো অবস্থানই খুঁজে পেতে সক্ষম হবে; বরং গোটা দেশের সেবাও আঞ্জাম দিতে পারবে।

হায়দারাবাদ অবস্থানের চার দিনে বেশ কটি ভাষণ দিয়েছি। এখানে আমি তার দুটি ভাষণের দুটি অংশ উপস্থাপন করছি মাত্র, যেগুলো গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তার ভূমিকা পালন করছে। একটি হলো সেই ভাষণের অংশ, যেটি আমি 'ভারতে মুসলমানদের দায়িত্ব' শিরোনামে ১৯৮২ সালের ১৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট হায়দারাবাদের বিশাল এক সমাবেশে প্রদান করা হয়েছিল। ভাষণটির শেষে বলা হয়েছিল—

'ইতিহাস বলছে, কোনো জাতির নৈতিক অধঃপতন আগে শুরু হয়। রাজনৈতিক পতন শুরু হয় পরে। গ্রীক, সাসানি সাম্রাজ্য, সনাতন ভারত ও ইসলামি সাম্রাজ্যগুলোর ইতিহাস এর স্বাক্ষ্য দেয়। আমাদের দেশের দায়িত্বশীলগণ, রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবর্গ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালকবৃন্দ, দেশের বিজ্ঞ ও বিদ্বান নাগরিকদের দূরদর্শিতার সঙ্গে দেশের বাস্তব পরিস্থিতির পরিসংখ্যান গ্রহণ করা দরকার এবং সেই ভয়ানক নৈতিক অধঃপতন রোধ করা আবশ্যক, যা কিনা গোটা দেশ ও সমগ্র জাতিকে গ্রাস করে ফেলেছে এবং যার দ্বারা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এ দেশে কেবল অর্থ, ক্ষমতা ও রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারই একমাত্র বাস্তবতা। বাদ বাকি সব শুধু দর্শন ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের 'সরলতা' আর বক্তাদের 'বকওয়াস'।

এর চেয়েও বেশি ভয়াবহ বিষয় হলো, কুমারিকা থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত এই শব্দটি উচ্চকিত করার মতো কেউ নেই। একথা বলার মতো একজন লোকও নেই যে, তোমরা তোমাদের চরিত্র সংশোধন করে নাও, মানবতার পাঠ শেখো, দেশটিকে বাঁচাও। কেউ নেই। কিন্তু একথা বলার লোক হাজার-হাজার আছে যে, আমার দলে চলে এস, অমুকের নেতৃত্ব মেনে নাও। এর

কোনো অভিযোগ নেই যে, যা কিছু হচ্ছে, ভুল হচ্ছে। সবারই দাবি হলো, ভুল-শুদ্ধ যা-ই থাকুক-না কেন; তোমরা আমার দলে, আমার পতাকাতলে, আমার নেতৃত্বে চলে আস। মনের এই ব্যথা, দেওয়ালের এই লিখন, দিগন্তে জ্বলজ্বলকারী উন্নতি-অবনতির তারকা আমি আপনাদের সম্মুখে রেখে দিলাম। এবার আপনাদের, বিশেষ করে তরুণ-যুবকদের কাজ হলো, এর দ্বারা উপকৃত হোন, নিজে বাঁচুন এবং দেশকে বাঁচান।'

অপর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ছিল সেটি, যা আমি মজলিসে ইল্‌মী হায়দারাবাদের সেই সভায় প্রদান করেছিলাম, যেটি ১৯৮২ সালের ১৪ অক্টোবর এডভোকেট জামীলুদ্দীন খান সাহেবের বাড়িতে রাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে হায়দারাবাদের বিপুলসংখ্যক আলেম, মাদরাসা শিক্ষক ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন-সংস্থার নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাতে আমি বলেছি, ওলামায়ে দ্বীনের পদমর্যাদা দৃঢ়তা ও বাস্তবরাদিতার সমন্বিত রূপ। তার অংশবিশেষ এখানে উপস্থাপন করা হলো—

'মুহতারাম! আলেমগণের এটিও একটি কর্তব্য যে, তাঁরা মুসলমানদের জীবনের স্বরূপ, দেশের পরিস্থিতি, আশপাশের পরিবর্তন ও সমাজের দাবি সম্পর্কে অবহিত থাকবেন। তাঁদের চেষ্টা থাকা দরকার, মুসলিম সমাজের সম্পর্ক জীবন ও পরিবেশ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হতে না পারে। কেননা, দ্বীন ও মুসলমানদের সম্পর্ক যদি জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং যদি তারা কাল্পনিক জগতে জীবন কাটাতে শুরু করে, তাহলে দ্বীনের আওয়াজ ক্রিয়াহীন হয়ে যাবে এবং তারা দাওয়াত ও সংশোধনের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে ব্যর্থ হবেন। আর ফলাফল এখানেই ক্ষান্ত হবে না; বরং এই দ্বীনের ধারক-বাহকদের এই দেশে থাকা-ই কঠিন হয়ে যাবে। ইতিহাস আমাদের বলছে, যেখানে আলেমগণ সব কিছু করেছে; কিন্তু উম্মতকে জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করেননি, সেই পরিবেশে নিজেদের কর্তব্য আঞ্জাম দেওয়ার পাঠ শেখাননি, একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার ও সে দেশের নেতৃত্ব অর্জনের যোগ্যতা সৃষ্টির চেষ্টা করেনি, সেখানে ওই দেশ তাঁদের এমনভাবে উগড়ে ফেলেছে, যেভাবে খাদ্যের গ্রাস উগড়ে ফেলা হয় এবং উগড়ে তাদের বাইরে ছুড়ে ফেলেছে। কারণ, তাঁরা নিজেদের জন্য ঠিকানা গড়েননি।

'ভারতের মুসলমান আজ একটি বিজ্ঞোচিত ও বাস্তবানুগ দ্বীনি নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী। আপনি যদি মুসলমানদের একশোজনে একশোজনকে

তাহাজ্জুদগুযার বানিয়ে দেন, সবাইকে মুত্তাকী ও পরহেযগার বানিয়ে দেন; কিন্তু তারা জানে না, দেশ কোন দিকে যাচ্ছে; জানে না, দেশটা ডুবে যাচ্ছে, দেশে অনৈতিকতা মহামারী ও ঝড়ের মতো ছড়িয়ে পড়ছে, দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা তৈরি হচ্ছে, তাহলে ইতিহাস স্বাক্ষী আছে, এমনটা হলে তাহাজ্জুদ তো দূরের কথা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়াও দুষ্কর হয়ে যাবে। আপনারা যদি দ্বীনদারদের জন্য এই পরিবেশে জায়গা তৈরি না করেন, যদি তাদের নিষ্ঠাবান ও সুনাগরিক প্রমাণিত না করেন, যারা দেশটিকে বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করার জন্য হাত-পা ছুড়বে এবং সুউচ্চ একটি ভূমিকা পালন করবে, তাহলে মনে রাখবেন, ইবাদাত, নফল আমল, দ্বীনের প্রতীকসমূহ তো পরের কথা, সেই সময়টাও আসতে পারে যে, মসজিদগুলো টিকে থাকাও কঠিন হয়ে পড়বে। আপনি যদি মুসলমানদের অচেনা বানিয়ে এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন, জীবনের স্বরূপ থেকে তাদের চোখগুলো বন্ধ থাকে এবং দেশে ঘটেযাওয়া পরিবর্তনগুলো, নিত্যনতুন তৈরি হওয়া আইন-কানুন ও জনগণের মন-মস্তিষ্কের ওপর শাসনকারী অনুপ্রেরণাগুলো থেকে বেখবর থাকে, তাহলে নেতৃত্ব তো দূরের কথা; (যেটি শ্রেষ্ঠ উম্মতের প্রধান কর্তব্য) নিজেদের অস্তিত্বের সুরক্ষাও কঠিন হয়ে পড়বে।'

হায়দারাবাদ থেকে ফেরার পথে দুদিন আমাকে আওরঙ্গবাদ থাকতে হলো। (সম্রাট আওরঙ্গজেবের সর্বশেষ তৎপরতার কেন্দ্র হওয়ার কারণে) আওরঙ্গবাদকে আমি স্পেনের গ্রানাডার সঙ্গে তুলনা করি। এখানে মিলৃক আম্বর জামে মসজিদে কাশেফুল উলূম নামে একটি আরবি মাদরাসা আছে, যার সম্পর্ক দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার সঙ্গে। অক্টোবরের ১৬ তারিখে আওরঙ্গবাদ আযাদ কলেজে বিশাল এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, যার সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত কবি জনাব সেকান্দার আলী ওয়াজ্‌দ। বিপুলসংখ্যক শিক্ষক, ছাত্র ও সাধারণ জনতা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। আমি সেই শিক্ষিত যুবসমাজের প্রতি লক্ষ্য রেখে, যারা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য ছিল এবং যাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের বর্ণাঢ্য চিত্র ও সুদর্শন স্বপ্ন ছিল সুবোধ্য ভাষা ও সহজ ভঙ্গিতে আসহাবে কাহফের কুরআনী কাহিনীটি এমন ধারায় বর্ণনা করলাম, যেন বর্তমান যুগ ও পরিবেশে তার থেকে তারা দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের মাঝে ওদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার স্পৃহা জাগ্রত হয়। আমার এই ভাষণটি 'তুহফায়ে

দাকান'-এ 'সাত যুবকের কাহিনী' নামে এসেছে। পরদিন 'সীরাত ও কেরদার কী তাবদীলি কী জরুরত' নামে আওরঙ্গবাদ জামে মসজিদে আরও একটি ভাষণ প্রদান করি।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামিক সেন্টার এবং 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য' নামক নিবন্ধ

১৯৮৩ সালের মে মাসের শুরুর দিককার কোনো একটি তারিখ ছিল। সেদিন হঠাৎ করেই শ্রদ্ধেয় প্রফেসর খালীক আহমাদ সাহেব নেযামীর পত্র পেলাম, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে – যেটি কিনা ব্রিটেনের সর্ববৃহৎ ও বিশ্বের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি – একটি ইসলামিক সেন্টার স্থাপনের চিন্তা-ভাবনা চলছে। এই ইউনিভার্সিটির সাতশো বছরের ইতিহাসে এটিই প্রথম ঘটনা যে, ইসলামের অধ্যয়ন, ইসলাম নিয়ে আলোচনা-গবেষণা ও তার সঙ্গে পশ্চিমা দেশগুলোর জ্ঞানী-গুণী ও সত্যানুসন্ধানীদের পরিচিত করার লক্ষ্যে এই নিরেট খ্রিস্টীয় প্রতিষ্ঠানটিতে একটি গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এই আন্দোলনে St Cross College-এর শিক্ষক ও ভাইস প্রিন্সিপ্যাল Dr. D.G Brouning (যার সঙ্গে ডক্টর ফরহান নেযামীর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে) ডক্টর ব্রাউনিং-এর প্রবল ইচ্ছা, এই মহতি উদ্যোগে আপনি শরীক থাকবেন, এর প্রতিষ্ঠা ও এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র প্রণয়নে সহযোগিতা দেবেন এবং 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য' শিরোনামে একটি নিবন্ধও পাঠ করবেন।

এখানে একটি বাস্তবতা প্রকাশ করায় কোনো সমস্যা মনে করছি না যে, বহু বছর যাবত আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং মাঝে-মাঝে দু'আও করতাম, যেন কখনও এমন একটি সুযোগ হাতে আসে যে, পাশ্চাত্যের সুবিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ কোথাও সমবেত হবেন আর আমাকে তাদের সম্মুখে পশ্চিমা সভ্যতা, জীবনদর্শন, বিশ্বমানবতার সেই চিন্তানৈতিক সভ্যতা ও চারিত্রিক নেতৃত্বের ব্যর্থতার ওপর, যেটি দুর্ভাগ্যবশত তাদের হাতে এসে পড়েছে স্বাধীনভাবে আমি আমার মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পাব আর তাদের সম্মুখে আমি সেই সত্য ও বাস্তবতাকে তুলে ধরতে সক্ষম হব, যেগুলো শোনার সুযোগ বছরের-পর-বছর হাতে আসছে না এবং তাদের অহমিকা সেসব নিয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দিচ্ছে না।

এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই সুযোগটি তৈরি হয়ে যাওয়ায় আমি আমার এই বাসনাটি পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পেলাম। এই আনন্দ আমাকে তার অনুপ্রেরণাগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ এবং বিগত অভিজ্ঞতাগুলোর আলোকে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভুল ব্যবহারের সম্ভাবনাগুলোর সমালোচনামূলক পরিসংখ্যান নেওয়ার সুযোগ দেয়নি যে, অনেক সময় এ ধরনের দূরদর্শিতা ও স্বার্থচিন্তা এমনসব পদক্ষেপ গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, যেগুলো কখনও-কখনও বড় ধরনের কল্যাণের কারণ হয়ে যায়। খুবসম্ভব ইকবাল এমন ক্ষেত্রগুলোর জন্যই বলেছিলেন—

اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل
لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے

'বিবেকের প্রহরী হৃদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে এটাই ভালো। তবে মাঝে-মধ্যে তাকে একাও থাকতে দিয়ো।'

আমি এই আমন্ত্রণটি গ্রহণ করে নিলাম এবং নির্ধারিত তারিখগুলোতে – যে তারিখে আমার জন্য পৌঁছা কষ্টকর ছিল – সামান্য হেরফের করার পরামর্শ দিলাম। ডক্টর ব্রাউনিং আমার এই আবেদন গ্রহণ করে নিলেন। এর কৃতজ্ঞতায় তার পক্ষ থেকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতামিশ্রিত পত্র এল। সেই পত্রে তিনি আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ ও সফরের সম্মতিদানকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন করলেন এবং আমার যেসব গ্রন্থ তার চোখে পড়েছে, সেগুলোর জন্য তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। আমি এই ইঙ্গিতও দিয়ে দিলাম যে, আমি যে দৃষ্টিভঙ্গি, যে জীবনরীতি এবং আলেম ও দাঈয়ে দ্বীনের যে শ্রেণীটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখি, সভা-সমাবেশ ও দাওয়াতগুলোতে তার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। তিনি আমার এই শর্তটিও মেনে নিলেন। আমার ও আমার সফরসঙ্গী মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে' নদভীর ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট ২০-২৫ দিন আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য' শিরোনামে উরদুতে একটি নিবন্ধ তৈরি করে নিয়েছি এবং রওনার দিনদুয়েক আগে বেশ তাড়াতাড়ি করে সাইয়্যিদ মুহিউদ্দীন সাহেব (যিনি আমার বেশ কটি বইয়ের অনুবাদক) তার ইংরেজি অনুবাদ তৈরি করে দিয়েছেন।

আমি স্নেহাস্পদ মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে' নদভীকে সঙ্গে করে ১৯৮৩ সালের ২১ জুলাইয়ের মধ্যরাতে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। লন্ডনের

এয়্রো এয়ারপোর্টে ডক্টর ব্রাউনিং ফরহান নেযামীর সঙ্গে নিজের গাড়ি নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখনই আমাকে অক্সফোর্ড নিয়ে গেলেন। প্রফেসর খালীক আহমাদ নেযামী সাহেব আমার আগেই অক্সফোর্ড পৌঁছে গিয়েছিলেন। মারকাযের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন সভায় অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তানের প্রখ্যাত আইনবিদ এ, কে বারুহি সাহেব (প্রাক্তন ধর্মমন্ত্রী, পাকিস্তান ও চ্যান্সেলর, ইসলামাবাদ ইউনিভার্সিটি) আগমন করেছিলেন। ওখানে প্রতিষ্ঠিতিব্য ইউনিভার্সিটির পরিকল্পনা প্রস্তুতকারী ও মহাপরিচালক শায়খ আমের আলী উমায়রও আমন্ত্রিত ছিলেন। পরদিন ২২ জুলাই সকাল ১০ টায় এ্যাকজামিনেশন হলে সাধারণ সভার আয়োজন ছিল, যেখানে বিদেশি অতিথিবর্গ ও স্থানীয় স্কলার-বুদ্ধিজীবিগণ বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ছিলেন।

আক্ষেপের বিষয় হলো, ইউনিভার্সিটির ছুটির কারণে, তদুপরি ইংল্যান্ডের শিক্ষিতসমাজ ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণীটিকে ব্যাপকভাবে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যবস্থা না থাকার ফলে (ইউরোপের ব্যস্ত জীবনে যার প্রচলন একেবারেই কম) উপস্থিতির সেই সংখ্যাটি ছিল না, আমি যার প্রত্যাশী ছিলাম। কিন্তু তারপরও হল প্রায় ভরে গিয়েছিল, যার একটি সংখ্যা ছিল আমার ভারতীয় বন্ধু, আরব দেশগুলোর দূতাবাসে কর্মরত ও লন্ডনে অবস্থানরত আরবদের। আমার থেকে এই ভুলটা হয়ে গিয়েছিল যে, আমি ইংল্যান্ডের অন্যান্য ইসলামি কেন্দ্রগুলো, বিশেষ করে লিস্টার (Leicester)-এর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দায়িত্বশীলদের এবং বিশেষ করে আমার স্নেহাস্পদ খুররম্ জাহ্ মুরাদ ও তার সহকর্মী মানাযির আহসান সাহেবের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করিনি যে, আপনারা নিজেদের পক্ষ থেকে ইংল্যান্ডের শিক্ষিতসমাজ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গকে এই সমাবেশের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তারপরও লোকজন যা এসেছিল, তা ওখানকার রীতি অনুযায়ী অনেক বেশি ছিল।

আমি প্রথমে ডক্টর ব্রাউনিং-এর মনোবাঞ্ছা, ফরমায়েশ ও আরব অতিথিদের খাতিরে আরবিতে ভাষণ দিলাম। তারপর ইংরেজিতে কয়েকটি শব্দ বলে ডক্টর ফরহান খান নেযামীকে আমার সেই নিবন্ধটি পড়ে শোনানোর জন্য আহ্বান জানালাম, যেটি আমি এই সময়কার জন্য প্রস্তুত করেছি। সেই নিবন্ধটির শুধু একটি অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরলাম–

'সম্মানিত উপস্থিতি! যখন একটি দেশের ভাগ্যই নয় শুধু; মানবীয় সভ্যতাও পতন ও ধ্বংসের দোড়গোড়ায় উপনীত হয়, সেই পরিস্থিতিতে

স্বাভাবিক ও সতর্ক প্রচেষ্টাসমূহ এবং মধ্যম স্তরের সংশোধন ও শিক্ষামূলক কাজের কর্মীদের দ্বারা কাজ চলতে পারে না। শান্ত ও স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এদের উপকারিতার কথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু এমন একটি অস্বাভাবিক ও পরিস্থিতিতে, যখন মানবতা জীবন ও মৃত্যুর দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে, তখন উন্নত স্তরের নৈতিক সাহস, ত্যাগ, ঝুঁকিবরণ করে নেওয়ার মানসিকতা, দুঃসাহসী অভিযান ও প্রতিভাবান মানুষের প্রয়োজন। এ ধরনের লোকেরাই প্রতিটি যুগে মানবীয় সভ্যতাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বের করে এনেছে।

আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। যে পাশ্চাত্য অতীতে সমাজবিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনায় বড়-বড় যোগ্য লোক তৈরি করেছিল, যারা নিজেদের প্রচেষ্টায় দুনিয়ার নকশা বদলে দিয়েছিল এবং সমগ্র জগত তাদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছিল এবং তাদের এসব শ্রম ও অভিজ্ঞতা দ্বারা উপকৃত হওয়া জরুরি মনে করেছিল, সেই পাশ্চাত্যের পরিবেশের ওপর দীর্ঘদিন যাবত স্থবিরতা ছেয়ে আছে। এখন সেখানে মানবীয় সভ্যতা ও সমাজের নতুন নেতৃত্বের জন্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গতি ধ্বংস থেকে গঠনের দিকে ঘুরিয়ে দিতে, রিপুর নিয়ন্ত্রণের শক্তি সৃষ্টি করতে, সমাজকে বিশৃঙ্খলা; বরং সংঘাত থেকে বাঁচাতে এবং বিবদমান শক্তি ও শিবিরগুলোর মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করতে যেসব বৈপ্লবিক ব্যক্তিত্ব ও নবীসুলভ সাহসিকতার প্রয়োজন, পশ্চিমা বিশ্ব দীর্ঘদিন যাবত যা থেকে বঞ্চিত। আজ থেকে পৌনে এক শতাব্দি আগে পাশ্চাত্যবিষয়ক জ্ঞানের পণ্ডিত ও দীর্ঘ সময় পাশ্চাত্যে অবস্থানকারী চিন্তাবিদ ইকবাল পশ্চিমা সভ্যতা ও তার সমাজ সম্পর্কে বলেছেন–

یاد ایامے کہ بودم در خمستان فرنگ   جام او روشن تر آئینہ اسکندر است
جلوۂ او بے کلیم وشعلۂ او بے خلیل   عقل ناپروا متاع عشق را غارت گر است
در ہوایش گرمیٔ یک آہ بے تابانہ نیست
رند ایں میخانہ را یک لغزش مستانہ نیست

ইকবাল বলতে চাচ্ছেন, পশ্চিমা বিশ্বে আল্লাহকে চেনার অনেক উপাদান ও তাঁর কুদরতের বহু চিহ্ন আছে। কিন্তু এমন কোনো সৌভাগ্যবান মানুষ নেই, যে আসমানি শিক্ষা দ্বারা ফয়েজ লাভ করে 'শানে কালীমি'র সঙ্গে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত ও মানুষের হেদায়েতের কাজ আঞ্জাম দেবে। এখানে

বস্তুবাদের বান বইছে এবং এখানে 'আমি জীবন দান করি; আমি মৃত্যু দান করি'র দাবিদার বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইবরাহীম খলীলুল্লাহর সত্যিকার অনুসারী নেই, যে এই ঘোষণা মান্য করতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানাবে এবং নিজে পাল্টা ঘোষণা দেবে, 'আমার রব তিনি, যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন।' তারপর পরীক্ষার আগুনে অবলীলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং তাকে ফুলবাগানে পরিণত করে দেবে।

এখানকার পরিবেশ – যা কিনা চিমনির ধোঁয়া আর অর্থনৈতিক তৎপরতার তাপে উষ্ণ মনে হচ্ছে – প্রকৃতপক্ষে এমন একটা জমাট চাকা, যার মাঝে হৃদয়ের জ্বলন আর অস্থিরতার আহাজারি অনুপস্থিত। এখানকার মানসিকতা প্রেমসম্পদের শত্রু ও হৃদয়সম্পদের লুটেরা। এই পানশালাও যদি মত্ততায় নিপতিত হয়, তাহলে আগে থেকেই তার হিসাব কষে নেয় এবং তার ফলাফল ভেবে নেয়। এটা সেই মত্ততার পদস্খলন নয়, যে বারবার অতীতকালের বিজ্ঞ ও পণ্ডিত লোকদের তার কর্মনীতির ওপর পুনর্বিবেচনা করার ও স্বপ্নবিভোর দুনিয়াকে চমকে দেওয়ার মতো কাজ করেছে। এটি একটি সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার অধীন এবং জ্ঞান ও বিবেকের প্রহরার মধ্যকার একটি পদক্ষেপ, যার ফলে যুগের গতি ও পানশালার পরিবেশের ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না।'

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মেজবানগণ (যারা সবাই ছিলেন পশ্চিমা ও খ্রিস্টান) খাবার ও সভা-সমাবেশে এ বিষয়টির প্রতি পুরোপুরি লক্ষ রেখেছেন, যেন কোনো বিষয় ইসলামের শিক্ষা ও সেই শ্রেণীটির রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী না হয়, যাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে। এই অনুষ্ঠানটি অন্য অনেক অনুষ্ঠানের চেয়ে বেশি পরিশীলিত, পরিমার্জিত ও ইসলামপরিপন্থী উপাদান থেকে পবিত্র ছিল, যেমনটি উন্নত মুসলমানরা অনেক মুসলিম দেশে আয়োজন করে থাকে।

২৩ ও ২৪ জুলাই এই প্রস্তাবিত ইসলামি মারকাযের ব্যাপারে মৌলিক বিষয়গুলোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নীতিমালা নিয়ে আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, ডক্টর ফরহান নেযামী এর প্রথম ডাইরেক্টর ও ডক্টর ব্রাউনিং এর প্রথম রেজিস্ট্রারার হবেন এবং গঠনতন্ত্রকে চূড়ান্ত রূপ দিতে আবার সভা আহ্বান করা হবে। আরও সিদ্ধান্ত হলো, এর কমিটির সদস্যগণ বেশিরভাগই মুসলমান স্কলার হবেন, যাতে এর ইসলামি মেজাজ

অক্ষুণ্ণ থাকে এবং যেন এই প্রতিষ্ঠানটি কোনো ভুল লক্ষ্য কিংবা কোনো গোষ্ঠীবিশেষের ক্রীড়নকে পরিণত হতে না পারে।

এই অনুষ্ঠান থেকে অবসর গ্রহণের পর আরও ছদিন আমি ইংল্যান্ডে অবস্থান করি। এই সময়টিতে আমরা দেশের গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো ইসলামি সেন্টার, মসজিদ, তাবলীগি মারকায ও মুসলিম অধ্যুষিত কতগুলো অঞ্চল পরিদর্শন করি। লিস্টারের ইসলামিক ফাউন্ডেশনটি আমরা বেশ খুটিয়ে-খুটিয়ে পর্যবেক্ষণ করি। সে সময় মুসলমানদের মাঝে প্রদত্ত আমার ভাষণগুলোর অভিন্ন বিষয়বস্তু ছিল ব্রিটেনে মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য, সঠিক কর্মনীতি ও আশঙ্কা ও উপকারিতা চিহ্নিতকরণ। জুলাইয়ের ১৩ তারিখে পান আমেরিকানের বিমানযোগে আমরা দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হই।

আমিরাত ও কুয়েত সফর

আরব আমিরাতের (যেটি সাতটি রাষ্ট্র কিংবা রাজ্য নিয়ে গঠিত এবং যার কেন্দ্র হলো আবুধাবী) আমার এক প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন শায়খ আবদুল্লাহ আল-আলী আল-মাহমুদ, যিনি ১৪০২ হিজরির ২৪ জুমাদাল উলায় (২২ মার্চ ১৯৮২) মৃত্যুবরণ করেছেন। আরব দেশগুলোর সফরে আমি যে কজন ব্যক্তিত্বের নিষ্ঠা, ইসলামপ্রিয়তা, ধর্মপরায়ণতা, মুসলমানদের সমস্যাদি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি, তাদের মাঝে শারেকার শায়খ আবদুল্লাহ আল-আলী আল-মাহমুদ-এর অবস্থান ছিল একদম আলাদা। তিনি শারেকার ওয়াক্ফ প্রশাসন প্রধানের দায়িত্বও পালন করেছেন এবং সর্বশেষ ওখানকার 'মারকাযুদ্দাওয়া আল-ইসলামিয়্যা'র দায়িত্বশীল ও প্রাণপুরুষ ছিলেন। শারেকার প্রশাসক শায়খ সুলতান ইবনে মুহাম্মাদ আল-কাসেমী তাঁকে নিজের শায়খ ও ওস্তাদের মতো মান্য করতেন। তিনি তাঁর সবচেয়ে বড় দ্বীনি পরামর্শক ছিলেন।

তাঁর যে গুণটি আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে, সেটি হলো তাঁর ঈমান ও ইহ্তিসাব (পুণ্যলাভের আগ্রহ নিয়ে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে কাজ করা)-এর মেজাজ। তিনি বেশ কবার হিন্দুস্তান এবং খোদ লাখনৌ এসেছিলেন এবং এ দেশের দ্বীনি সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও দাওয়াতি প্রচেষ্টা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। আমার ও নদওয়াতুল উলামার কর্মীদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। রাবেতা আলমে ইসলামীর সভা হোক কিংবা

কাতারের সীরাত কনফারেন্স হোক বা অন্য কোনো জায়গার আর কোনো সম্মেলন হোক; প্রতিটি প্রোগ্রামে তিনি আমার সঙ্গে থাকার চেষ্টা করতেন এবং সাধারণত নামায পড়ার জন্যও তিনি হোটেলের সেই কক্ষটিতে চলে আসতেন, যেটিতে আমি থাকতাম। তাঁর মৃত্যুতে শুধু শারেকাতেই নয়; বরং গোটা উপসাগরীয় অঞ্চলে একটা ধর্মীয় ও বিদ্যাগত শূন্যতা তৈরি হয়ে গেল। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত নাযিল করুন এবং তাঁকে ক্ষমা করুন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সৌভাগ্যবান ছেলেরা – যাদের মাঝে তাঁর সুযোগ্য ও ধর্মপরায়ণ পুত্র ডক্টর সালেম আবদুল্লাহর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য – সিদ্ধান্ত নিল, মরহুমের স্মরণে তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারটিকে (যেটি কয়েক হাজার গ্রন্থ দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল) গণপাঠাগারে রূপান্তরিত করে দেবে, যেখানে ইসলামিয়াতের উপাদান সবচেয়ে বেশি থাকবে এবং যেটি শারেকার সর্ববৃহৎ পাঠাগারে পরিণত হবে। মরহুমের সঙ্গে আমার বিশেষ যে সম্পর্ক ছিল, যার সম্পর্কে তাঁর পরিবার ও বন্ধুমহল ভালোভাবেই অবহিত ছিল, তার ভিত্তিতে তারা আমার কাছে মনোবাসনা ব্যক্ত করল, আমি যেন এই পাঠাগারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকি, যেটি তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আয়োজন করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

আমি আমার নানা ব্যস্ততা ও অবিরাম সফরের কারণে অপারগতা প্রকাশ করতে চাইলাম এবং লিখলাম, এই অনুষ্ঠান যেন আমার কারণে বিলম্বিত করা না হয় এবং এই মহতি উদ্যোগটি যেন বাস্তবায়ন করে ফেলা হয়। কিন্তু তারা লিখল, যদি এক বছরও বিলম্ব করতে হয় করব; তবু এই অনুষ্ঠান আপনাকে ছাড়া পালন করব না। এখানে এসে আমি আত্মসমর্পণ করলাম এবং তাদের আমন্ত্রণ মঞ্জুর করে নিলাম।

এই অনুষ্ঠানটি ১৯৮৩ সালের ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। আমি স্নেহাস্পদ মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে' নদভীকে সঙ্গে করে রওনা হলাম। ডক্টর সালেম তার জন্য চমৎকার আয়োজন করে রেখেছিল। অনুষ্ঠানে শারেকার প্রশাসক শায়খ সুলতান ইবনে মুহাম্মাদ আল-কাসেমী, আজমানের প্রশাসক শায়খ হুমায়দ ইবনে রাশেদ আন-নাঈমী এবং আমিরাতের কয়েকজন মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাচক্রে রাবেতা আলমে ইসলামীর মহাসচিব ডক্টর আবদুল্লাহ ওমর নাসীফও – যিনি সে সময়ে আমিরাত সফরে এসেছিলেন) এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন।

এই অনুষ্ঠানে আমি একটি ভাষণ প্রদান করি। তাতে আমি দুনিয়ার সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক শিক্ষা আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে, যেটি একজন উম্মী নবীর একজন উম্মী উম্মত এবং একটা অশিক্ষিত ও পশ্চাদপদ দেশে (জাযিরাতুল আরব) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরণের ফয়েজ ও বরকতে সৃষ্টি হয়েছিল এবং যে আন্দোলন না শুধু শিক্ষা ও কলমকে নবজীবন দান করেছে এবং তাদের একে অপরের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করেছে; বরং তাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যময়, হেদায়েতের কারণ, ও নাজাতের উপায় বানিয়ে দিয়েছে। তারপর আমি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মুসলমানদের হৃদ্যতার ইতিহাসের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছি এবং শুরুর শতাব্দিগুলোতে ব্যক্তিগত পাঠাগারগুলো কতখানি বিস্তৃতি লাভ করেছিল তার বিবরণ প্রদান করেছি এবং আলেমদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, 'দেওয়ানে হামাসা'র মতো অমর গ্রন্থ, যার মাধ্যমে আরবি সাহিত্যের প্রশিক্ষণ বরং মাদরাসাগুলোর সিলেবাস কখনও অমুখাপেক্ষী হতে পারে না প্রখ্যাত কবি আবু তাম্মাম-এর কলমে আমীর আবুল ওফার ব্যক্তিগত পাঠাগারে সে সময় সংকলিত হয়েছিল, যখন আবু তাম্মাম অস্বাভাবিক বরফপাতের কারণে একসফরে বাধ্য হয়ে কয়েকটা দিন ওখানে অবস্থান করেছিলেন। তারপর আমি শায়খ আবদুল্লাহ আল-আলী আল-মাহমুদ-এর গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলির ওপর আলোকপাত করি এবং তাঁর সন্তানদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করি, যাকে তারা তাদের পিতার যথাযথ স্মৃতি হিসেবে বরণ করে নিয়েছে।

সপ্তাহব্যাপী এই সফরে আমি আরও কয়েকটি সভায় ভাষণ দান করি। তার একটি ভাষণ প্রদান করি সংযুক্ত আমিরাতের আল-আইন ইউনিভার্সিটির সুপরিসর হলে ১৯ নভেম্বর, যার শিরোনাম ছিল أزمة هذا العصر الحقيقية (এ যুগের প্রকৃত শূন্যতা ও প্রয়োজন)। এই ভাষণে আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি, বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় শূন্যতা হলো এমন একটি আদর্শ ইসলামি সমাজের অনুপস্থিতি, যেটি দেশ ও সরকারের ওপর ইসলামি জীবন ও ইসলামি শিক্ষামালার নমুনা পেশ করবে এবং তার বাস্তবায়নযোগ্য, মানবতার জন্য বরকতময় ও মানবীয় সমস্যাবলির সফল সমাধানের প্রমাণ দেবে। এটা সেই শূন্যতা, যাকে ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দে একটি পরিপূর্ণ জাতির মাঝে ও বিশ্বজনীন আন্দোলন ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে আরব জাতি (ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাকে বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করে) পূরণ করেছিল এবং তার দ্বারা মানবীয় জীবনের একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল।

এই শূন্যতা ভালো-ভালো ব্যক্তি এবং সংক্ষিপ্ত ও সীমিত সমাজ পূরণ করতে পারে না; চাই সে নিজের ব্যক্তিগত সাধুতা ও সৎকর্মে যতই উন্নত হোক। এ কাজ একটি গোটা দেশ, স্বাধীন সরকার ও গোটা একটি জাতির সামগ্রিক পরিমণ্ডলের ওপরই কেবল প্রয়োগ হতে পারে। আর আজকের হতাশা, পদদলিত মানবতা আরব জাতি ও মুসলিম দেশগুলোর কাছে এমনই একটি নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ও বাস্তব নমুনা কামনা করছে। এটিই সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ও মানবতার সবচেয়ে বড় সেবা। আমরা দেখব, আরব এ কাজের জন্য উঠে দাঁড়ায় কি-না এবং পুনর্বার তারা পৃথিবীর নেতৃত্ব হাতে তুলে নেয় কি-না।

একটি ভাষণ প্রদান করেছি উক্ত জামেয়াতুল ইমারাতের গার্লস কলেজে 'মুসলিম সমাজে মহিলাদের বিশেষ ভূমিকা' শিরোনামে। তাতে বলেছি, প্রথম শতাব্দিতে মুসলমানদের রোমান ও ইরানি সভ্যতায় মাঝে একাকার না হওয়ার এবং নিজেদের ইসলামি ও আরবি সভ্যতা ও সমাজকে অটুট রাখার পেছনে বিশেষভাবে একটি বিষয়ের দখল ছিল যে, সে যুগের মুসলিম নারীসমাজ তাদের ঈমানি চেতনা ও ইসলামি বৈশিষ্ট্যাবলিকে সংরক্ষণ করেছে এবং বিজাতীয় সভ্যতাগুলোর প্রভাবের মোকাবেলার প্রমাণ দিয়েছে। আর আজ সেই কোণ থেকেই পশ্চিমা সভ্যতার আক্রমণ আসছে এবং মুসলিম সমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

একটি ভাষণ দিয়েছি সাইয়িদুনা সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) মসজিদে। তার শিরোনাম ছিল الى الاسلام من جديد (নতুন করে ইসলামের দিকে ফিরে আসুন)। একটি ভাষণ দিয়েছি শারেকায় সাইয়িদুনা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) মসজিদে। এই ভাষণে আমি সূরা হূদ-এর ১১৬ নং আয়াত

فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا
مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ○

এর তাফসীর করেছি। তাতে আমি বলেছি, প্রতিটি যুগের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনটি হলো সেসব বিবেকবান, ঈমানদার, ত্যাগী, সাহসী ও নীতিবান লোকদের উপস্থিতি, যারা সমকালের বিকৃতি, নৈতিক অধঃপতন, প্রবৃত্তিপুজা, সুবিধাবাদ ও ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টাগুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার আওয়াজ তুলবে, সেই বানের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে মাঠে নামবে এবং অপশক্তির মোকাবেলায়

ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সর্বকালে এটিই মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।

শারেকা ও দুবাই থেকে নভেম্বরের ২৩ তারিখে আমি কুয়েত সফর করি। কয়েক সপ্তাহ আগে ওখানকার তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মজলিসে ওয়াতানির পক্ষ থেকে পঞ্চদশ হিজরি সনের নববর্ষের অনুষ্ঠানে আমি 'ইসলাম ও মানবীয় সভ্যতা' শিরোনামে বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। আমি একই সফরে এই সবগুলো কাজ সমাধা করে ফেলতে চাইলাম। মজলিসে ওয়াতানি কুয়েত ইউনিভার্সিটির সাইন্স কলেজেরে মাঠে সমাবেশের আয়োজন করল এবং ব্যাপকাকারে আমন্ত্রণপত্র ছড়িয়ে দিল।

১৪০৪ হিজরির ১৮ সফর (২৩ নভেম্বর ১৯৮৩) মাগরিবের নামাযের পর আমি আমার আরবি নিবন্ধটি পড়ে শোনালাম, যেটি পরে الاسلام والحضارة الانسانية শিরোনামে পুস্তিকাকারে আরবিতে প্রকাশিত হয়। এই ভাষণে আমি মোটের ওপর ইসলামের সেই ক্রিয়াগুলো উপস্থাপন করি, যেগুলো গোটা মানবীয় সভ্যতা; বরং মানবীয় জীবনের ওপর বিস্তার লাভ করেছে এবং তার এমন একটি অংশে পরিণত হয়েছে, যাকে কোনো কেমিক্যাল প্রয়োগ করে আলাদা করা যাবে না এবং সেগুলো মানবীয় ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছে। আমি তার ১০টি বিপ্লবাত্মক ক্রিয়া আলাদা-আলাদাভাবে আলোচনা করেছি এবং এ বিষয়ে পশ্চিমা পণ্ডিতবর্গ, ঐতিহাসিক ও ভারতের একাধিক লেখক ও গবেষকের স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করেছি। তারপর বলেছি, এখন মানবীয় সভ্যতা ও সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে মুসলিম উম্মাহকে নিজেদের মধ্যে কী-কী পরিবর্তন সাধন করতে হবে, কী-কী গুণ অর্জন করার প্রয়োজন হবে এবং বর্তমান সভ্যতা ও উন্নতির যুগে তাকে কোন দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা দরকার।

কুয়েতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছি 'মুসলিম বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি' শিরোনামে ওখানকার সর্বজনপরিচিত সংগঠন জমিয়তুল ইসলাহিল ইজতিমায়ী'র মাঠে। সেখানে বিপুলসংখ্যক লোকের সমাগম ঘটেছিল যে, মাঠটি কানায়-কানায় ভরে গিয়েছিল। এই ভাষণটি হয়েছিল ১৯৮৩ সালের ২৬ নভেম্বর। এই ভাষণে আমি বর্তমান মুসলিম বিশ্বের বাস্তব ও প্রকৃত চিত্র পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেছি এবং রাজনীতিতে তার কোনো মর্যাদা না থাকা, ইসলামি চেতনাবোধের অভাব, খোদ তারই দেহের

কোনো-কোনো অংশে আপতিত বিপদ সম্পর্কে তার অনুভূতিহীনতা, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও মুসলমান শাসকদের বিলাসিতাময় ও উদাসীন জীবন, মুসলিম শাসকদের প্রভাবহীনতা, জিহাদের স্পৃহা ও শাহাদাতের বাসনার তিরোহিত হওয়া, যেটি কিনা ছিল মুসলমানদের শক্তির সবচেয়ে বড় উৎস, ক্ষমতাসীন শ্রেণী ও জনগণের মধ্যকার সংঘাত, যা কিনা শাসক শ্রেণীর সবটুকু শক্তিকে মুসলিম জনসাধারণের ঈমানী শিখাকে শীতল করার ও তাদের অনুভূতিহীন বানানোর কাজে নিবদ্ধ করে দিয়েছে এবং বাইরের শত্রুদের থেকে তাদের দৃষ্টিকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে দিয়েছে। সর্বোপরি আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী, হাক্কানী ও রাব্বানী শ্রেণীটির অনুপস্থিতি, যারা প্রতিটি যুগে জমাটবাঁধা মুসলিম সমাজের ঈমানে উত্তাপ, অন্তরে কোমলতা ও চোখে আদ্রতা সৃষ্টি করেছিলেন, তাদেরকে বিত্ত ও বিলাসিতার শ্রোতে খড়কুটোর মতো ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং পরকালের ভাবনাকে জীবন্ত রেখেছিলেন।

এগুলোই সেই কারণ, যার ফলে অনেক মানুষ বলতে শুরু করেছে 'ইসলামি বিশ্ব হলো কাব্যবিদ্যার সমুদ্রের মতো যে, নাম তার সাগর; কিন্তু পানি নেই তাতে এক ফোঁটাও।'

কিন্তু সেই সঙ্গে এটিও একটি বাস্তবতা যে, যদিও এই সমুদ্রের উপরিভাগ শান্ত এবং তার ওপর দীর্ঘদিন যাবত একধরনের স্থবিরতা বিরাজমান; কিন্তু তাতে ঝড় তোলার এবং তার তলা থেকে জীবনের মুক্তা তুলে আনার সেসব শক্তিশালী উপকরণ ও উপাদান বিদ্যমান আছে, যেটি অন্য কোনো জাতি, সম্প্রদায় বা দেশের কাছে নেই। এরই মধ্য থেকে কঠিন-থেকে-কঠিনতর সংঘাতময় ও হতাশাজনক পরিস্থিতিতে এমনসব আলেমে দ্বীন ও সংস্কারক জন্ম নিতে থাকেন, যাঁরা পতনোন্মুখ সমাজকে একদম পাল্টে দিয়েছেন। আমি আমার রচিত গ্রন্থ رجال الفكر والدعوة في الاسلام (সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস) ও ربانية لا رهبانية (সুলুক ও তাসওউফ) এ তাঁদের ও তাঁদের বহুসংখ্যক সংস্কার ও সংশোধনমূলক কাজের বিবরণ প্রদান করেছি, যারা সমাজকে নতুন ঈমানি জীবন দান করেছেন, জিহাদের ময়দানকে সাজিয়েছেন এবং পতনোন্মুখ সমাজে একটি নতুন প্রাণ সৃষ্টি করেছেন। সেই সমুদ্র থেকে আজও যেকোনো সময় ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঢেউ জেগে উঠতে পারে, যেটি গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে।

ইকবালের ভাষায়–

اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی
نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا

'এই সমুদ্র থেকেই উঠে আসে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ, যার তোড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় ঘড়িয়ালদের বাগান।'

আমার এই ভাষণটি ছিল খুবই স্পষ্ট ও তিক্ত। তাতে আমি শ্রোতাদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে চোখ বন্ধ করে সত্য কথাগুলোকে সামনে মেলে ধরার চেষ্টা করেছি, যাতে এ নিয়ে জ্ঞানী ও বিবেকবান লোকেরা চিন্তা করেন এবং সেসব ভুল বোঝাবুঝি ও সুধারণার পর্দা উঠে যায়, ভালো-ভালো শিক্ষিত মানুষ, লেখক শ্রেণী, এমনকি দ্বীনের প্রচারকও যেগুলোর শিকার।

আমার এই সফর হারামাইন শরীফাইনে গিয়ে শেষ হয়। সেখান থেকে ওমরা করে এবং পবিত্র মাদীনায় হাজিরি দিয়ে ডিসেম্বরের ১১ তারিখে ভারত ফিরে আসি।

– দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত –

এ লেখকের অন্যান্য কিতাবসমূহ

০১। মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?
০২। সীরাতে সাইয়্যিদ আহমেদ শাহীদ রহ. (১ম-২য়)
০৩। সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (১ম-৭ম) খণ্ড
০৪। কারওয়ানে জিন্দেগী (১ম-৭ম) খণ্ড
০৫। শায়খুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র)
০৬। হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (র)
০৭। তারুণ্যের প্রতি হৃদয়ের তপ্ত আহ্বান
০৮। হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)
০৯। হযরত মুজাদ্দিদে আল্ ফেসানী
১০। ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান
১১। ইসলাম ঃ ধর্ম, সমাজ সংস্কৃতি
১২। সীরাতে রসূল আকরাম (সা.)
১৩। হযরত আলী-এর জীবন ও খিলাফত
১৪। নতুন পৃথিবীর জন্ম দিবস
১৫। ঈমানদীপ্ত কিশোর কাহিনী
১৬। ইসলামী জীবন বিধান
১৭। সালাত : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
১৮। সিয়াম : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
১৯। হজ্ব : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
২০। যাকাত : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
২১। আরকানে আরবা'আ
২২। ছোটদের আলী মিয়া
২৩। ঈমান যখন জাগলো
২৪। কারওয়ানে মদীনা
২৫। প্রাচ্যের উপহার
২৬। বিধ্বস্ত মানবতা
২৭। আমার আম্মা
২৭। আমার আব্বা
২৮। নয়া খুন
২৯। নবীয়ে রহমত
৩০। পুরানো চেরাগ (১ম-৩য়) খণ্ড
৩১। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব
৩২। বিশ্ব সভ্যতায় রসূল আকরাম (সা.)
৩৩। হযরত আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.)
৩৪। মুসলিম লেখক ও প্রাচ্যবিদদের ইসলাম বিষয়ক গবেষণা মূলক মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৮২২-৮০৬১৬৩; ০১৭২৮-৫৯৮৪৪০